Winter Sun is comfortable to others but not to me

—Photo by S. Mitra

I am not so old as Winter has made me look like

—Photo by A. Dey

Friend indeed in freezing cold

—Photo by A. Dey

Vivekananda Rock—Cape Comorin

—Photo by H. S. Dutt

Winter in Calcutta Maidan

—Photo by S. Mitra

দুখহরণের সুধাক্ষরণের উদাহরণের মালা

প্রথম বার্ষিকী

১৩৫৩

সম্পাদক

কৃষ্ণ চট্টোপা[illegible]

মূল্য তিন টাকা

মুদ্রাকর
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস
ফাইন প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৮এ, নিমতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—Photo by S. Mit

প্রকৃতির সম্পদ!
'লক্ষ্মী ঘি'

সব সমস্যার শেষ সমাধান।
ইতিহাসের সর্ব-শ্রেষ্ঠ দান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

অধ্যায়...

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

(১)

পৃথিবীর বুক থেকে নিয়ত উঠছে তপ্তশ্বাস, ঘৃত-পুষ্ট হোমের জলন্ত শিখায় [illegible]তন, [illegible]শের দিকে···

বাণী-হারা বিশ্বের কাতর প্রার্থনা···

···হে পরম নিয়ামক, হয়েছে লগ্ন, বেদনায় দীর্ণ ধরিত্রীর বুক···দাও পাঠিয়ে তোমার মঙ্গল-দূতকে, যাঁর স্পর্শে পাষাণী অহল্যার মত, আবার জেগে উঠবে এই মৃতা মেদিনী···

যাঁর হাতের মঙ্গল-দীপের আলোকে আবার খুঁজে পাবে অমৃত-পথ পথ-হারা পৃথিবী···

যুগে যুগে উঠেছে জীব-ধাত্রী ধরিত্রীর বুক থেকে এই শিব-আকর্ষণী ক্রন্দন···

সে-ক্রন্দনে টলে উঠেছে অনাদি অনন্তের যোগাসন···

পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি ধরণীতে তাঁর মঙ্গল-দূত···

মানুষের মধ্যে এসে, মানুষের মধ্যে থেকে, মৃত্যুর মধ্যে থেকে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন অমৃত-পথ—

কিন্তু···মানুষের চেহারায় মানুষ তখন করেছে অবিশ্বাস···

বলেছে অসম্ভব···বলেছে বুজরুকী···বলেছে পাগলামী···অপ্রামাণ্য···

মাপতে গিয়েছে জ্যামিতির সূত্র দিয়ে, বৃত্ত আর ত্রিভুজের নির্ভুল অঙ্ক কষে·

তুলেছে সন্দেহ, এক আর একে হয় দুই, এই নিশ্ছিদ্র নির্ভুল গণিতের মধ্যে কি করে আসে এক আর এক তিন··· ?

দেখতে দেখতে ব্যর্থ হয়ে যায় মঙ্গল-দূতের আবির্ভাব, স্বর্গ আর মর্ত্যের প্রাণপণ সব আয়োজন

যে এলো, তাকে প্রত্যাখ্যান ক'রে, তারই জন্যে আবার হাত জোড় ক'রে কাঁদে অবিশ্বাসী মানুষের দল, কোথায় তোমার মঙ্গলদূত ? কোথায় অমৃত-পথ ?

অন্তরীক্ষে হাসেন বিধাতা।

মার [illegible], নিবিড়-[illegible]টকিত অন্ধকারে যার জন্যেই দুহাত বাড়িয়ে কাঁদে [illegible] মানব শিশু

(২)

নির্লজ্জ মানব-শিশু !

তোমার অবিশ্বাসের অন্ধকারে ডুবে গিয়েছে কত ধরিত্রীর আবাহন-মন্ত্র···ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে কত স্বর্গ-মর্ত্ত্যে যাতায়াত···

··· কত বিত্ত, কত চৈতন্য, নানক, কবীর···

···য়েছে ···লে···

দধীচি দিয়েছে হাড়···

বৃত্রাসুর !

(৩)

রাণী রা··· ··· *

কিন্তু গঙ্গার এত ···কাছে থেকে, ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়ে মৃত্যুকে বরণ করতে চাইলো না তাঁর মন।

তাঁর বাসনা অনুযায়ী আদি গঙ্গার তীরে তাঁকে নিয়ে আসা হলো।

জীবনে তাঁর ছিল দুটী বাসনা, ভবতারিণীর প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর অসাক্ষাতে যাতে মন্দিরের সেবা অব্যাহত ···বস্ত করা।

আজ চরিতার্থ হয়েছে। তবে শেষটীর জন্যে মনে বড় ক্ষোভ···তাঁর বড় মেয়ে পদ্মমণি ···তা··· ছেড়ে ···

··· আলোয় গঙ্গার তীরে নিভে আসছে জীবনের প্রদীপ···এখনি হয়ে যাবে শেষ, এবারকার মত ···এমন সময় কে যেন অন্ধকারে জাললো প্রদীপ···সে-প্রদীপের আ··· মৃত্যু-পথ-যাত্রীর চোখে ··· তিনি চীৎকার করে উঠলেন, নিভিয়ে দে, নিভিয়ে দে, ঐ মাটীর পিদিম···তেলের আলো··· ···কার এ মিটমিটে আলোয় ? ঐ যে আসছে আমার মা···আলোয় আলো ক'রে সারা ভুবন !

আত্মীয়েরা সরিয়ে নিয়ে যায় সে-আলো···চারিদিকে মৃত্যুঘন নিস্তব্ধ সন্ধ্যার অন্ধকার !

···ঠাৎ রাণী একবার উঠে বসবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন···তারপর কাকে যেন দেখে বল্লে, উঃ··· ···ক্ষণে তুই এলি মা ? হাঁ, ···, পদ্ম যে ··· করছেনা দলিলে ? কি হবে মা ?

রাণীর দেহ সহসা স্থির হয়ে গেল···আত্মীয়েরা কাছে এসে দেহ স্পর্শ করে বুঝলেন...পিঞ্জর পড়ে ···য়েছে···পিঞ্জর-মুক্ত বিহঙ্গম চলে গিয়েছে···

---

* ইহার ··· ··· সংখ্যা গন্ধভারতে প্রকাশিত হইয়াছে।

(৪)

মথুরবাবু এখন সেই বিরাট সম্পত্তির একমাত্র পরিচালক···রাণী রাসমণি তাঁরই উপর [illegible] দিয়েছেন সে-ভার···কারণ তিনি জানতেন, সে-শক্তি সম্পূর্ণভাবে আছে মথুরের। সেই [illegible] তিনি দিয়ে [illegible] একটী গুরুভার, উন্মাদ রামকৃষ্ণের সেবার দায়িত্ব। মথুরবাবু আনন্দে তা গ্রহণ করেন।

কিন্তু সেই বিরাট জমিদারীর চেয়ে ঢের বেশী ভাবিয়ে তোলে মথুরবাবুকে সেই অদ্ভুত মা··· হৃদয়কে···

মথুরবাবু ছেলেবেলা থেকে শিখেছেন জমিদারী চালাতে, আজ তিনি পাকা জমিদার··· ওজন-করা দৃষ্টি। ইংরেজী-লেখা-পড়া তিনি ভাল করে শিখেছেন···সেকালের তরুণদের মত [illegible] গ্রহণ করছেন নতুন-আমদানী-করা পশ্চিমের বিজ্ঞান-বাদ···অতীন্দ্রিয় বলে কোন কিছু বু[illegible] ঠাকুরের [illegible] প্রস্তুত নয় তাঁর মন···তাঁর গর্ব্ব, তিনি স্বাধীন-চেতা···মুক্ত তাঁর মন···

কিন্তু একে একে ভেঙে যায় তাঁর মনের সব বেড়া···পাগল কি মায়া [illegible] নি আ[illegible] বার তাঁকে টেনে···হারিয়ে যায় তাঁর সব ইংরেজী-শিক্ষা, বিজ্ঞানের বুলি···ন্যায়ের [illegible]···

লুটিয়ে পড়েন ঠাকুরের পায়ে, কেঁদে বলেন, চরণে দাও স্থান।

ঠাকুর হেসে বলেন, ওরে, পায়ে নয়, তুই আছিস্ আমার পাশে···মা যে [illegible] দিয়েছে আমাকে .. তোকে আমার দরকার···নইলে এখানকার রসদ যোগাবে কে? [illegible]

মথুরবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে সে-পদ গ্রহণ করেন···আত্মার নিগূঢ়-পথে, সেদিন উনবিংশ শতাব্দী [illegible] সুরু হয় এক বিরাট আত্মিক-অভিযান...সে মহা-অভিযানের তিনিই প্রথম রসদার···

(৫)

হঠাৎ একদিন মথুরবাবু [illegible], বাবা একটা কথা রাখতে হবে।

ছোট ছেলের মতন ঠাকুর তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

মথুরবাবু একটা দলিলের কাগজ বার ক'রে বলেন, আমার ভয় হয়, আমি [illegible] থাকবো না··· তখন যদি আপনার কোন কষ্ট হয়। তাই আপনার নামে এই সম্পত্তিটা লিখে দিয়েছি···সই ক'রে···

মথুরবাবু কথা আর শেষ করতে পারেন না।

ক্ষিপ্তের মত ঠাকুর লাফিয়ে ওঠেন, ওরে শালা, এই [illegible] আমাকে মজাতে চাও! এতদিন পরে এই তোমার মতলব!

ঠাকুর ছুটতে আরম্ভ করেন···[illegible] কে তাঁকে প্রহার করতে আসছে পিছু পিছু···

মথুরবাবু [illegible] [illegible] [illegible]···পায়ে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চান···

(৬)

জানবাজারে আজ নদিন ধরে চলেছে উৎসব···বিরাট উৎসব···

দেবী দশভূজার পূজা···

মথুর সে-উৎসবের আনন্দে মত্ত···এই উপলক্ষে ঠাকুরও এসেছেন···

তার আনন্দ-রাত্রির ··· বিজয়া-দশমীর বিদায়-বিষণ্ণ সুর···

যেন কাঁদছে···

মথুর বাবু একা বসে শুনছেন সানাইয়ের সেই করুণ মধুর সুর···বিসর্জ্জনের বাজনা···

পুরোহিত লোকের পর লোক পাঠাচ্ছেন, এবার বিসর্জ্জন হবে···বাবুকে একবার নীচে এসে ···রে যেতে বল···

···আসবার কোন লক্ষণই নেই···

··· ···উঠেন, লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে যায়···

শেষকালে পুরোহিত ··· গিয়ে মথুরবাবুকে ডাকেন···

···মথুরবাবুর ···ই চোখ রক্ত-জবার মত লাল···দুই গণ্ড বেয়ে ঝরে পড়ছে অশ্রু-ধারা···

—বাবু···বিস··· ···হয়ে গেল!

··· বাবু ··· ···র্জন করে ওঠেন, না, না···আমার মার হবে না বিসর্জ্জন! আমি দেবো

···নায়। কোন ··· ফলে না।

··· ··· ···তাহলে আমি নিজের হাতে তাকে খুন করবো!

···ও, সন্ত্রস্ত···মথুরবাবুর এ রুদ্র মূর্ত্তি ভয় করে না শুধু একটি মাত্র লোক···ঠাকুর···

···ফিলে ঠাকুরকে এসে ব্যাপারটা জানালো। তিনি ছাড়া এ সমস্যা থেকে ··· কে উদ্ধার করবে?

হাসতে হাসতে ঠাকুর মথুরবাবুর ঘরে এসে তাঁর পাশে বসলেন।

ঠাকুরকে দেখে আবেগে মথুর বাবু বলে উঠলেন, বাবা, আমি মার বিসর্জ্জন দেবো না···নিত্য পূজা করবো! মাকে ছেড়ে আমি থাকবো কেমন ক'রে?

··· বাতুকর দক্ষিণ হাতটী মথুর বাবুর বুকে রেখে সস্নেহে বলেন, ওঃ, তোর এই ভয়? মাকে ছেড়ে থাকতে হবে কে বল্লে তোকে? এ ···দিন বাইরের দালানে বসে তিনি তোর পূজো নিয়েছেন, আজ থেকে তিনি তোর ভেতরে ··· পূজো নেবেন···তোর ভাবনা কি?

এই বলে তিনি মথুরবাবুর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন···মা যেমন দুরন্ত শিশুকে কোমলকর-স্পর্শে ঘুম পাড়ায়···

বাতুকরের ··· ···রুদ্র-মূর্ত্তি নিমেষে শান্ত শিশুর মত হয়ে যায়···

দীপ্তি
হ্যারিকেন লণ্ঠন
সব চেয়ে সেরা স্বদেশী লণ্ঠন
সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য, টেকসই অথচ খরচ কম পড়ে। উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ
আলো দেয়। পাওয়া যায়।
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

একদিন সকাল বেলা ঠাকুর মন্দিরের বাগানে পুজোর জন্যে ফুল তুলছেন, [illegible] ছোট্ট নৌকো নদীর বুক বেয়ে স্নানঘাটের দিকে এগিয়ে আসছে।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে দেখেন, নৌকোটা সামনের ঘাটে [illegible] নৌকো থেকে একজন অপরূপ সুন্দরী নারী ঘাটে এসে উঠলো। পরণে গেরুয়া কাপড়...এলো চুল...হাতে একটা ছোট্ট পুঁটুলী... কতকগুলো বই আর খানকতক কাপড়...বয়স চল্লিশের কাছাকাছি কিন্তু [illegible] হয় যেন তরুণী...

তাড়াতাড়ি ঠাকুর ঘরে ফিরে এসে ভাগ্নে হৃদয়কে ডাকলেন... নারীটির বর্ণনা দিয়ে হৃদয়কে বললেন, যা, ওঁকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আয়!

হৃদয় অবাক্! বলে, জানা [illegible], শোনা নেই, কোথাকার কে? ডাকলে আসবে কেন?

হৃদয়ের অবাক হবার [illegible] কারণ হলো, কোন স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এর আগে তো ঠাকুরের এমন ঔৎসুক্য আর দেখা যায় নি!

হৃদয়ের কথার উত্তরে ঠাকুর বল্লেন, তুই যা তো...গিয়ে আমার কথা বললেই তিনি আসবেন।

হতবাক হৃদয় ঘাটে গিয়ে দেখে, সত্যিই এক অপরূপ-মূর্ত্তি ভৈরবী [illegible] বসে। ভৈরবীর কাছে এগিয়ে গিয়ে ঠাকুরের কথা জানাতেই ভৈরবী তাড়াতাড়ি পুঁটলীটা তুলে নিয়ে হৃদয়ের পিছু পিছু আসতে আরম্ভ করলেন।

হৃদয়ের বুকে তখন ঝড় উঠেছে......

ভৈরবীকে নিয়ে ঠাকুরের সামনে উপস্থিত করতেই ভৈরবী আনন্দে চীৎকার [illegible] এখানে বসে বাছা...আর আমি তোমাকে সারা দেশময় খুঁজে বেড়াচ্ছি...তবে আমি জানতুম [illegible] কোথাও তোমার দেখা পাবোই!

ঠাকুর ছোটি ছেলের মত জিজ্ঞাসা করেন, আমার কথা কেমন করে জানলি মা!

ভৈরবী বলেন, জগজ্জননীর কৃপায় আমার ওপর আদেশ হয়, তোদের তিনজনকে খুঁজে বার [illegible] দুজনের দেখা ইতিমধ্যেই আমি পেয়ে গিয়েছি...বাকি ছিলি তুই...। আজ তোরও দেখা [illegible] গেলাম!

ভৈরবীর কণ্ঠস্বর আবেগে কাঁপতে থাকে...যেন বহুদিনের হারিয়ে-যাওয়া সন্তানকে [illegible] পরে, পেয়েছেন খুঁজে!

নিজের পরিচয় দিয়ে ভৈরবী বলেন, যশোরে এক [illegible] আমি জন্মেছিলুম...কিন্তু [illegible] আমার থাকতে দিল না...তীর্থে তীর্থে ঘুরে শেষকালে [illegible] পেলাম দীক্ষা...[illegible] খোঁজে নিজেকে দিলাম ডুবিয়ে......

ঠাকুর ছোট ছেলের মতন শোনেন সেই অপূর্ব্ব সাধনার কথা···তন্ত্রের কঠোর সব যোগের কথা······

বলেন, তন্ত্রও জানি না, যোগও জানি না···তবে আমার রাতদিন এ কি জ্বালা···সারা গা সময় সময় মনে হয় যেন আগুনে পুড়ে যাচ্ছে···বুকের ভেতর যেন হাফর জ্বলছে···লোকে বলে উন্মাদ হয়েছি···পাগল হয়ে গিয়েছি···মা···মা···সত্যিই আমি কি পাগল হয়ে গিয়েছি? রাতদিন মাকে ডাকি···মার জন্ত কাঁদি···তাই কি মা আমাকে এই কথা বলে অপবাদ দেন?

ভৈরবী সারা দেহ ভাল করে নিরীক্ষণ করেন, বলেন, কে বলে তোমাকে পাগল? আমি শাস্ত্র থেকে প্রমাণ করে দেবো···তোমার হয়েছে মহাভাব···গৌরাঙ্গের যা হয়েছিল!

—তাহলে সত্যি বলছো আমি পাগল হই নি? ঠাকুরের বুক থেকে যেন বোঝা নেমে যায়।

কথায় কথায় সন্ধ্যা হয়ে আসে···ঠাকুর মার প্রসাদ ভৈরবীকে খেতে দেন।

ভৈরবী বলেন, বাছা, আমি খেলেতো চলবে না···আমার সঙ্গে যে আমার একটী আছে···তাকে খাওয়াতে হবে···আমার রঘুবীর······

এই বলে ভৈরবী বুকের মধ্য থেকে ছোট একটী ঠাকুর বার করেন······তাঁর ইষ্টদেবতা রঘুবীর······

মন্দিরের ভাঁড়ার থেকে ঠাকুর রঘুবীরের জন্তে সিধে তৈরী করে দেন। তাই নিয়ে ভৈরবী পঞ্চবটীর দিকে চলে যান। সেখানে ইট পেতে শুকনো ডাল-পালা জেলে ভৈরবী রঘুবীরের ভোগ নিজের হাতে রাঁধেন।

রান্না হয়ে গেলে কলাপাতায় ভোগ সাজিয়ে ভৈরবী রঘুবীরের পুজোয় বসেন। দেখতে দেখতে গভীর সমাধি···ভৈরবীর সর্ব চেতনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। শুধু দুচোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু নীরবে ঝরে পড়তে থাকে·········

বেলা যায়···সন্ধ্যা হয়······ভৈরবী যোগাসনে আত্মসমাহিত······

ওধারে মন্দিরের ঠাকুরের ঘরে ঠাকুর চঞ্চল হয়ে ওঠেন···কে যেন তাঁকে আকর্ষণ করছে···ঘর ছেড়ে উন্মাদের মত তিনি বেরিয়ে পড়েন···কে যেন তাঁকে টেনে নিয়ে চলে পঞ্চবটীর দিকে যেখানে গাছের তলায় ভৈরবী যোগাসনে···মন্ত্রমুগ্ধের মতন ঠাকুর ধীরে ধীরে এগিয়ে যান···যেখানে রঘুবীরের সামনে ভোগ সাজানো ঠাকুর সেখানে গিয়ে বসেন···হাত আপনা থেকে যেন চলে যায় ভোগের অন্নের দিকে···মুখে তুলে দেন রঘুবীরের ভোগ, গ্রাসের পর গ্রাস······

হঠাৎ ভেঙে যায় ভৈরবীর সমাধি···দেখেন, সামনে তাঁর ইষ্টদেবের পাশে বসে উন্মাদ তাঁর রঘুবীরের ভোগ খেয়ে চলেছে···আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন ভৈরবী······

লজ্জিত হয়ে ঠাকুর বলেন, জানি না, কেন এমন করলুম?···তোমার ঠাকুরের ভোগ···

ভৈরবী হেসে বলে, যার জন্তে ভোগ, সে-ই খেয়েছে···পাথরের মূর্ত্তি ছেড়ে আজ আমার রঘুবীর তোমার মূর্ত্তিতে আমার ভোগ গ্রহণ করেছেন···আজ আমি ধন্ত···ধন্ত আমার সাধনা······

এই বলে ভৈরবী তুলে নেন সেই ছোট্ট রঘুবীরের মূর্তিটী এবং গঙ্গার ধারে গিয়ে গঙ্গাজলে তাঁকে দেন বিসর্জন।

—রঘুবীর! আজ আর আমার দরকার নেই তোমার পাথরের মূর্তি।

(৮)

নিভৃতে পঞ্চবটী মূলে ভৈরবী বলেন, তোমার জন্তেই আমার আসা।

ঠাকুর বালকের মতন অবাক হয়ে শোনেন।

বলেন, লোকে আমার পাগল বলে...আমি নিজে কিছু বুঝতে পারি না...রাতের পর রাত চোখ চেয়ে জেগে থাকি...কে যেন ঘুমতে দেয় না...আবার কখনো কখনো কথা বলতে বলতে কে যেন সব জ্ঞান টেনে নেয়...পাথর হয়ে যায় এ-দেহ...দেখি, একরাশ রাঙাজবার সঙ্গে লুটিয়ে পড়ে আছি আমার মার রাঙা পায়...হাঁ, গা, কেন এমন হয়? সত্যিই কি আমি পাগল হয়ে গিয়েছি?

সান্তনা দিয়ে ভৈরবী বলেন, বাছা তুমি যদি পাগল হও তাহলে আমার সব যোগ-[illegible] মিথ্যা··· মার অসীম কৃপায় তুমি আছ মহাভাবে···

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন, ও-সব তো আমি কিছুই জানি না···কোন তন্তর না, কোন মন্তর না...

ভৈরবী বলেন, সেই জন্তেই আমার ওপর আদেশ হয়, তোমার কাছে আসতে··সারাজীবন সাধন করে যা পেয়েছি, সেই চৌষট্টি তন্ত্রের সব কিছু আমি তোমাকে দেবো শিখিয়ে...

পড়ার নামে বালক যেমন ভীত হয়ে ওঠে, তেমনি ভীতভাবে ঠাকুর বলেন, কিন্তু আমার মাকে না জিজ্ঞাসা করে আমি কিছু শিখছি না···মা যদি বলে··তবেই...

ভৈরবী আশ্বাস দিয়ে বলেন, কোন ভয় নেই তোমার···আমি এত সাধ্য-সাধনা যোগ-যাগ করে যেখানে এসে পৌঁছেছি, তুমি তোমার অন্তরের শুদ্ধ অনুরাগে বহু আগেই সেখানে এসে পৌঁছে গিয়েছ...সেখান থেকে কেউ পারবে না তোমাকে নড়াতে···

বালকের মত অহেতুক আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ঠাকুর বলেন, তুমি বলছো···তুমি বলছো আমি পৌঁছে গিয়েছি?

—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে, যে-পথ ভক্তিতে তুমি অনায়াসে অতিক্রম করে এসেছ, জ্ঞান সাধনায় সে-পথের প্রত্যেকটী মোড় তোমাকে আবার হেঁটে আসতে হবে। [illegible] শক্তির তুমি আজ [illegible] অধিকারী, জ্ঞানের দ্বারা তাকে জানতে হবে··অভ্যাসের দ্বারা তাকে করতে হবে [illegible] জন্তেই আমার আসা।

(৯)

স্বয়ং এক ইতিহাস।

কোথায় যশোরের নামহীন এক গণ্ডগ্রাম...সেখানে এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এক কন্যা···

তারপর সে-কন্যা সম্পর্কে আর কিছুই জানি না আমরা। তাকে আবার যখন দেখলাম, তখন দেখি অপরূপ লাবণ্যময়ী যোগবিভূতিভূষিতা ভৈরবী···গুরুদত্ত নাম যোগেশ্বরী···

চৌষট্টি তন্ত্রের প্রত্যেকটি কঠোর যোগ অভ্যাস করেছেন, আয়ত্ত করেছেন···পেয়েছেন সিদ্ধি...

বৈষ্ণব-শাস্ত্রের প্রত্যেকটি গ্রন্থ···শুষ্ক জ্ঞানমার্গ ছেড়ে ভক্তিরসের মধ্যে নিজেকে দিয়েছেন তিনি ডুবিয়ে···

কেমন করে তিনি এলেন দক্ষিণেশ্বরে? কোন্ মহা-নায়কের অভ্রান্ত নির্দেশে তিনি খুঁজে পেলেন উন্মাদ রামকৃষ্ণকে? ঠিক যে-সময়ে রামকৃষ্ণেরও প্রয়োজন ছিল শিক্ষা-গুরুর?

এ মহা-ইতিহাসের কার্য্য-কারণ-সংযোগের মূল-সূত্র কোথায়?

(১০)

এতদিন এক-উন্মাদকে নিয়ে বিব্রত ছিল মন্দিরের লোকেরা···এবার তার সঙ্গে জুড়লো আর-এক উন্মাদিনী···

বাৎসল্য-রসের জীবন্ত প্রতিমা, জননী যশোদা···

রামকৃষ্ণকে ডাকেন গোপাল বলে।

নিজের হাতে ঠাকুরকে দেন খাইয়ে, গোপাল খাবে বলে কোথা থেকে সংগ্রহ করে আনেন ক্ষীর, সর, ননী···

দর্শনে মুহুর্মুহু ভাবাবেশে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন ঠাকুর···

চারদিকে কৌতূহলী জনতা, ব্যঙ্গ করে, বিদ্রূপ করে···কুৎসা রটায়···

নারী-পুরুষের একটী মাত্র সম্পর্ক যারা মানে···ও জানে...

ক্রমশ সংবাদ যায় মথুরবাবুর কাছে···নানাভাবে রঙীন হয়ে···

মথুরবাবুর সংসারী মন দুলে ওঠে সন্দেহে···তিনি জানেন, রামকৃষ্ণ মহাপুরুষ···অসাধারণ শক্তির অধিকারী···জীবনে তার বহু প্রমাণ বহুভাবে তিনি পেয়েছেন···তবুও তিনি তখন পর্য্যন্ত উপলব্ধি করেন নি, সে-মহাপুরুষের মহত্ব কতখানি···সব দ্বিধা, সব প্রশ্নের উর্দ্ধে তখনও পারেন নি সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে...

বিষয়ী মন নিয়ে ভাবেন, ভৈরবী অসামান্যা সুন্দরী···সে সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না।

রাগ হয় ভৈরবীর উপর···সন্দেহও যে হয় না, তা নয়···

একদিন ভৈরবী মন্দির থেকে পূজা শেষ করে বেরুচ্ছেন, মথুরবাবু বিদ্রূপ করে বলে উঠলেন, হাঁ ভৈরবী, তোমার ভৈরবটী কোথায় ?

ইঙ্গিত বুঝতে দেরী হয় না ভৈরবীর। কিন্তু সামান্য নুড়িতে সমুদ্রে জাগে না তরঙ্গ। [illegible], দেখবেন আমার ভৈরবকে ? আসুন !

এই বলে হাত ধরে মন্দিরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে আঙুল দিয়ে দেখান, বিশ্ব-জননীর পদ-তলে বিলুন্ঠিত কাল-ভৈরবের মূর্ত্তি, বলেন, ঐ আমার ভৈরব !

মথুরবাবু অত সহজে দমবার পাত্র নন্। প্রত্যুত্তর করেন, কিন্তু ও ভৈরব যে [illegible]

মূর্ত্তির দিকে স্থির-দৃষ্টি রেখে ভৈরবী বলেন, অচলকে যদি সচল কর[illegible], তবে [illegible]সের আমি ভৈরবী

মথুরবাবু মাথা হেঁট করে চলে যান।

(১১)

ঠাকুরের উন্মাদনার লক্ষণ বেড়ে উঠতে থাকে। দেহের মধ্যে যেন আগুন জ্বলতে থাকে···অসহ্য যন্ত্রণায় গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন···মেঝেতে জল ঢেলে তার ওপর শুয়ে থাকেন···তবু [illegible] সে জ্বালা···প্রতিদিনই যেন বেড়ে চলে···কখন কখন মনে হয় বুকের ভেতর যেন উনুন জ্বলছে···[illegible] তাতে বুক পর্য্যন্ত লাল হয়ে ওঠে···চোখ রক্ত-জবার মত হয়ে যায়···

মথুরবাবু চিন্তিত হয়ে পড়েন···জানাশোনা যেখানে যত বড় কবিরাজ ছিল সকলকে ডেকে এনে দেখান···কিন্তু রোগ কমার কথা দূরে থাকুক, আরো বেড়েই চলে···

সেই সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে জ্ঞান হারান···আবার কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে আসে···শিশুর মতন নেচে ওঠেন···ভ্রূক্ষেপ নেই, বস্ত্র পড়ে গিয়েছে···উপবীত খসে গিয়েছে···

শেষকালে মথুরবাবু ভৈরবীর শরণাপন্ন হলেন। ভৈরবী তখন ঠাকুরের পরামর্শ মত মন্দিরের বাইরে আরিয়াদহের দেবমণ্ডল [illegible] থাকেন।

ভৈরবী হেসে বলেন, আপনারা অকারণে উতলা হচ্ছেন···ইনি উন্মাদ বটে কিন্তু এ-উন্মাদের লক্ষণ কবিরাজী শাস্ত্রে নেই···আছে যোগ-শাস্ত্রে···ঠিক এমনি উন্মাদ হয়েছিল রাই···এমনি উন্মাদ হয়েছিল নিমাই··· ঠিক এমনি সব লক্ষণ···প্রত্যেকটী···লেখা আছে শাস্ত্রে···

মথুর বাবু তর্ক করেন···তর্ক থামিয়ে ভৈরবী বলেন, বেশ তো, আপনাদের কবিরাজী চিকিৎসায় তো কোন ফল ফললো না···আমি একবার আমাদের শাস্ত্রে যে-ব্যবস্থা আছে করে দেখি ?

মথুর বাবু আর আপত্তি করলেন না।

প্রভাতে ভৈরবী নিজের হাতে চন্দন বাটেন। সুগন্ধ ফুল চয়ন করে [illegible] ঠাকুরের গলায় পরিয়ে দেন সেই গন্ধফুলের মালা, অঙ্গে লেপন করেন স্নিগ্ধ চন্দন।

তিন দিন এই চিকিৎসা চল্লো।

তিন দিনের পর বিস্মিত কবিরাজেরা দেখেন, নাড়ী স্বাভাবিক···অঙ্গে কোন উত্তাপই নেই।

ভৈরবী বল্লেন, এ বহ্নি জ্বালা বড় তীব্র···বহ্নি নয়···বিরহ...

(১২)

যা ছিল সীমাবদ্ধ···ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে অদৃশ্য···ভৈরবী এসে তাকে দিলেন ব্যাপ্তি···প্রসারতা···বিজ্ঞাপন···

যা ছিল নামহীন···সংজ্ঞাশূন্য···ভৈরবী এসে করলেন তার নামকরণ···

বল্লেন, এই উন্মাদ···এঁর স্থান এই ছোট্ট মন্দিরের চতুঃসীমানার মধ্যে নয়। বল্লেন, এই-বিশেষ মানুষটী এসেছেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে···

ইনি অবতার···বিশ্ব-মঞ্চ এঁর লীলাস্থল!

মন্দির-বাসীদের মধ্যে পড়ে গেল মহা-কলরোল: বলে কি ভৈরবী? এই উন্মাদ, একে মানতে হবে, ভগবানের অংশ বলে? অবতার? বিশ্বের প্রয়োজনে যাঁর আবির্ভাব? পূজো করতে ব'সে, যাকে তারা দেখেছে, পূজোর মন্ত্র যায় ভুলে···নিজের পরবার কাপড় যে পারে না ঠিক করে রাখতে, তাকে দিয়ে হবে বিশ্বের কোন্ প্রয়োজন সংসাধিত?

অবজ্ঞার হাসি হাসে তারা। মথুর বাবু গায়ে মাখেন না ভৈরবীর সে-কথা।

কিন্তু, শত শত প্রণাম তোমাকে হে নামহীনা, প্রণাম তোমার অন্তর্দৃষ্টিকে···প্রণাম তোমার দিব্য-জ্ঞানকে···প্রণাম তোমার ঘোষণা-বিহীন প্রতিভাকে···সেদিন তুমিই প্রথম চিনেছিলে মানবাকাশের এই নব জ্যোতিষ্কে···তুমিই প্রবল সব-বিরোধিতার সঙ্গে সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠা করেছিলে মানব-ইতিহাসের এই মহা অধ্যায়কে যুগের চেতনার সঙ্গে···উনবিংশ-শতাব্দীর ইতিহাসে তোমার নাম কোথাও নেই কিন্তু উনবিংশ-শতাব্দীর সর্ব-শ্রেষ্ঠ মানবের হে জ্ঞান-ধাত্রী, আমরা আজ তোমাকে জানাচ্ছি প্রণাম···

মথুর বাবুর সন্দেহকে তীব্র আক্রমণ ক'রে ভৈরবী বল্লেন, আপনার দেশের যাঁরা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, তাঁদের আপনি ডেকে আনুন···তাঁদের সঙ্গে আমি শাস্ত্রীয় তর্ক করে প্রমাণিত করবো, এই মানুষ···সাধারণ কোন ধার্ম্মিক নন্···ইনি অবতার···লোক-প্রয়োজনে এঁর আবির্ভাব!

মথুর বাবু বলেন, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে তো বলে অবতার মাত্র দশটী···

ভৈরবী উত্তর দেন, হিন্দুর লিখিত শাস্ত্র এত বিরাট এবং এত ব্যাপক যে তার মধ্যে কোন্‌টী সত্য তা খুঁজে বার করা খুব শক্ত।—যদি ভাগবত ভাল করে পড়ে থাকেন, তাহলে তাতেই দেখতে পাবেন, বাইশ বার ভগবানের অবতারের কথা উল্লেখ করা আছে, যা হয়ে গিয়েছে এবং সেখানে স্পষ্টই বলা আছে যে, একবার দুবার বা দশবার নয়, আরো বহু বহু বার তাঁকে আসতে হবে। তা ছাড়া বৈষ্ণব-শাস্ত্র থেকে আপনাকে আমি দেখিয়ে দেবো যে, সেখানে স্পষ্ট লেখা আছে, গৌরাঙ্গদেবকে আবার দেহধারণ করতে হবে

...ং যে-সব লক্ষণের কথা সেখানে উল্লিখিত আছে, তার প্রত্যেকটী রামকৃষ্ণের মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে···আপনি ...শের যাঁরা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, তাঁদের আহ্বান করুন···আমি তাঁদের প্রত্যেককে আহ্বান করছি···তাঁরা প্রমাণ করে দিন্, আমি যা বলছি তা ভুল···আমি আমার দিক থেকে, শাস্ত্রীয় উক্তি তুলে প্রমাণ করে দেবো, রামকৃষ্ণ সম্পর্কে আমার ধারণা সত্য এবং শাস্ত্র-সম্মত···

ভাবতে ভাল লাগে, যোগেশ্বরীর মত নারী, নারী-প্রগতির বহু আগে, এই বাংলা দেশেতেই জন্মেছিল···

(১৩)

মথুর বাবু ভৈরবীর এই দ্বন্দ্ব-আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন।

সমগ্র পণ্ডিত-সমাজে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। তখন বাংলা দেশে বৈষ্ণব-সমাজে সাধু বৈষ্ণবচরণের যশ, খ্যাতি ও পাণ্ডিত্য অদ্বিতীয় ছিল। সমগ্র বৈষ্ণবদের তিনি নেতা ছিলেন। মথুর বাবুর আমন্ত্রে, বৈষ্ণবচরণ ভৈরবীর সঙ্গে তর্ক-যুদ্ধের এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। সেই সঙ্গে ইন্দেশের বিখ্যাত তান্ত্রিক আচার্য্য গোরীকান্ত তর্কভূষণও এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

গৌরীকান্ত একজন সিদ্ধ-তান্ত্রিক ছিলেন। শাস্ত্র-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগসাধনাও অসাধারণ ছিল। প্রত্যেক বৎসর শরৎকালে দুর্গাপূজার সময় ইনি দুর্গা প্রতিমার বদলে তাঁর স্ত্রীকেই বিশ্বজননীর প্রতীকরূপে পূজা করতেন। হোম করবার তাঁর নিজস্ব একটা ধারা ছিল। প্রথামত মাটীতে হোমের জ্বালানি কাঠ না রেখে, তিনি নিজের বাঁ হাতের ওপর সমস্ত কাঠগুলো সাজিয়ে রাখতেন, তার ওজন এক মণেরও বেশী হতো···তারপর ডান হাত দিয়ে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিতেন এবং যতক্ষণ না হোম শেষ হতো সেইভাবে তাঁর বাঁ হাতের ওপরই হোমের কাঠ জ্বলতো··· *

বৈষ্ণবচরণ প্রথমে আসেন। ভৈরবীর সঙ্গে আলোচনায় তিনি ভৈরবীর প্রত্যেকটী কথা স্বীকার করে নেন এবং বিদায়ের সময় ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করেন।

ঠাকুর বিব্রত হয়ে তাঁকে তুলে ধরেন। সেই মুহূর্ত্তে বৈষ্ণবচরণ এমন দিব্যভাবে অভিভূত হয়ে পড়েন যে, সেই দিন থেকে তিনি ঠাকুরের একজন পরম ভক্ত হয়ে যান।

গৌরীকান্ত যুদ্ধ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আসেন। তান্ত্রিক সাধনার ফলে তাঁর এমন শক্তি হয়েছিল যে কোন প্রতিপক্ষ তাঁর সঙ্গে বেশীক্ষণ জোর গলায় কথা বলতে পর্যন্ত পারতো না। তর্ক-সভায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হুংকার দিতেন, সেই হুংকার শুনে অধিকাংশ প্রতিদ্বন্দ্বী নিস্তেজ হয়ে পড়তেন।

দক্ষিণেশ্বরে কালী-মন্দিরে প্রবেশ করবার মুখে গৌরীকান্ত সেই রকম হুংকার দিয়ে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীকে আহবান করলেন, অবশ্য সংস্কৃত ভাষায়।

* ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরে স্বচক্ষে এই ব্যাপার দুর্গাপূজার সময় দেখেছেন।

ঠাকুর তখন নিরীহ বালকটীর মত বসে ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হলো, কে যেন তাঁর দেহের ভেতর থেকে গর্জ্জন করতে চাইছে। গৌরীকান্তের হুংকারের প্রত্যুত্তরে তিনি গর্জ্জন করে উঠলেন। গৌরীকান্ত গলার স্বর আরো চড়িয়ে দিলেন। তার চেয়েও জোর গলায় ঠাকুর অবিকল সেই শ্লোকটী আবৃত্তি করলেন। তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে গৌরীকান্ত সর্বোচ্চ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন। গৌরীকান্তের সেই গর্জ্জনকে ডুবিয়ে ঠাকুর হুংকার করলেন। সে-হুংকারে গৌরীকান্তের সমস্ত তেজ ম্লান হয়ে গেল। বিস্মিত গৌরীকান্ত দেখেন বৈষ্ণবচরণ ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করে বসে আছেন।

সহসা গৌরীকান্তের তর্ক করবার সমস্ত প্রবৃত্তি যেন নিমেষে কে মুছে দিল···পাছে সেই মহাপুরুষের কৃপা থেকে বঞ্চিত হন, এই আশঙ্কায় তিনি ঠাকুরের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন।

যাঁকে নিয়ে এত কাণ্ড তিনি তখন উঠে বালকের মত নাচছেন, তাঁর আনন্দ, এত পণ্ডিত লোক বলছে, তখন নিশ্চয়ই তিনি পাগল নন্···

(১৪)

ভৈরবী অনুষ্ঠান-অনুযায়ী ঠাকুরকে তান্ত্রিক-সাধনায় দীক্ষা দিলেন।

বিস্মিত ভৈরবী দেখেন, যে-সব প্রণালী আয়ত্ত করতে তাঁর বৎসরের পর বৎসর কেটে গিয়েছে, ঠাকুর মাত্র তিন দিনের মধ্যে তা আয়ত্ত করে ফেল্লেন।

লোকে অবাক হয়ে ঠাকুরের দিকে চেয়ে থাকে।

প্রথম প্রথম ঠাকুর বুঝতে পারেন না।

তাঁর গায়ের রঙ তখন হয়ে গিয়েছে পাকা সোনার মত···সারা দেহ থেকে যেন দ্যুতি ঠিকরে পড়ছে···বদন-মণ্ডল যেন একটা রক্ত-কমল···

যখন বুঝলেন, লোকে তাঁর সেই অপরূপ দেহ-জ্যোতির দিকে চেয়ে থাকে, লজ্জায় মন্দিরে গিয়ে মায়ের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েন, কেঁদে বলেন, এ তুই সারা গায়ে কি দিলি মা! নিয়ে নে··· নিয়ে নে···

তান্ত্রিক সাধনার ফলে মানুষ অসাধারণ শক্তির অধিকারী হয়। তাকে বলে অষ্টসিদ্ধি। সাধারণ ভাষায় বলে সিদ্ধাই।

কিন্তু এই অষ্ট সিদ্ধিই হলো আবার সাধকের পতনের কারণ। এই শক্তি আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ব্যবহার করবার দুর্বার মোহ সাধককে পেয়ে বসে। এবং এই সিদ্ধির সামান্য অংশ লাভ করেই তখন সাধক লোককে ভেল্কী দেখাতে···তাক্ লাগিয়ে গুরুগিরির পসার বাড়াতে···যা করে আমাদের দেশে ধর্ম-সাধনা ক্রমশ গুরুগিরি-ব্যবসায়ে পরিণত হয়ে ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

এই দুর্বার মোহের হাত এড়িয়ে কচিৎ দু'এক জন পারে সচ্চিদানন্দসাগরের তীরে গিয়ে পৌছতে···

যে সিদ্ধির সামান্য অংশ পেলে মানুষ ধন্য হয়ে যায়, সেই অষ্টসিদ্ধি পূর্ণ আয়ত্ত করে ঠাকুর, ছোট ছেলে যেমন করে পুকুরে ঢিল ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তেমনি ক'রে তা ধ্যান-সাগরে ফেলে দিলেন।

বীরাচারে যা কিছু ছিল, ভৈরবী নিঃশেষে তা শিষ্যকে দান করলেন।

গুরু আজ রিক্ত···কিন্তু শিষ্যের ক্ষুধা আরো অপরিসীম···

যে ব্রহ্মানন্দ-স্বাদের জন্য শিষ্যের অন্তর উদ্বেল, ভৈরবী ক্রমশ নিজে অনুভব করেন, সেখানে তিনি নিজেই অনধিকারী···

যাকে শিক্ষা দিতে এলেন, শিক্ষা শেষে, তারই কাছ থেকে প্রেরণা পেলেন, নতুন পথের··· নতুন সন্ধানের···

দেখেন, দীর্ঘ দিনের একত্র বাসের ফলে শিষ্যের মায়ায় তাঁরও মুক্ত-মনে শৃঙ্খল পড়ে গিয়েছে

সন্ন্যাসিনীর কেন এ মায়া?

যা দেবার তা তো নিঃশেষে হয়ে গিয়েছে দেওয়া···

তাই একদিন যেমন বিনা আহ্বানে তিনি এসেছিলেন ঠাকুরের জীবনে, তেমনি নিঃশব্দে এই আবার তিনি অন্তর্নিহিত হয়ে গেলেন তাঁর জীবন থেকে···

বুঝলেন, শিষ্যের অন্তরে এখনো রয়েছে যে ক্ষুধা, তা মেটাবার শক্তি নেই তাঁর···

বিশাল বিশ্বে হারিয়ে গেল ভৈরবী।

(১৮)

এই সময় একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঘুরতে ঘুরতে আর এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত হলেন।

জটাধারী তাঁর নাম।

পরস্পর পরস্পরকে দেখে মুগ্ধ হলেন। বুঝলেন, একই পথের পথিক তাঁরা।

জটাধারীর সঙ্গে ছিল একটী ছোট্ট বিগ্রহ, কিশোর রাম···জটাধারী আদর করে ডাকতেন···রামলালা···

একমুহূর্তও জটাধারী রামলালাকে কাছছাড়া করতেন না। জিজ্ঞাসা করলে, সে সম্পর্কে কোন জবাব দিতেন না কাউকে।

কিন্তু ঠাকুরের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে পারলেন না জটাধারী।

ঠাকুর বুঝলেন, রামলালা জটাধারীর কাছে পাথরের বিগ্রহ নয়···জীবন্ত মূর্তি···তাঁর অনুরাগে পাথর হয়েছে প্রাণবন্ত···রামলালা জটাধারীর পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু···সব···

জটাধারী রান্না ক'রে রামলালাকে কোলে বসিয়ে খাওয়ায়···রামলালার খাওয়া হয়ে গেলে তারপর নিজে খান··বিছানা ক'রে ছোটছেলের মত রামলালাকে ঘুম পাড়ান··ঘুম থেকে উঠিয়ে রামলালার সঙ্গে খেলা করেন··রামলালা দুরন্তপনা করে···জটাধারী হাসিমুখে সহ্য করেন···অসহ্য হ'লে ভর্ৎসনা করেন···আবার ভৎ'সনা করেছেন ব'লে নিজেই অনুতাপে কাঁদেন···

রামলালাকে নিয়েই তাঁর দিন-রাত্রি কেটে চলে যায়…

জটাধারীর পরম সৌভাগ্য—তাঁর ইষ্ট, মূর্ত্তি ধরে তাঁকে দেখা দিয়েছেন…তাঁর প্রেমে তিনি হয়েছেন তাঁর জীবন্ত সহচর…

ঠাকুর বিস্মিত আনন্দে তাঁদের দুজনের শোওয়া-বসা, খাওয়া-দাওয়া, খেলা-ধূলা দেখেন…

একদিন জটাধারীর ঘর থেকে নিজের ঘরে আসবার সময় দেখেন, রামলালা যেন তাঁর পিছু পিছু আসছে…

মনে হলো, হয়ত ভুল দেখেছেন…জটাধারীকে ছেড়ে রামলালা কেন তাঁর সঙ্গে আসবে?

নিশ্চয়ই দেখার ভুল।

কিন্তু প্রতিদিনই এমনি ঘটতে লাগলো। জটাধারীর ঘর থেকে রাত্রিবেলা যেই নিজের ঘরে আসেন, অমনি দেখেন পেছনে আসছে রামলালা।

ক্রমশ রামলালা তাঁকে পেয়ে বসলো।

আদর করে তিনি রামলালাকে কোলে তুলে নেন…কোলে করে নিয়ে ঘুরে বেড়ান…কত যে বায়না রে রামলালা…হাসিমুখে তা ঠাকুর জোগান দেন…

এক এক সময় দুষ্টু ছেলে এমন বায়না ক'রে বসে যে, ঠাকুরের সঙ্গতিতে কুলোয় না। ঠাকুর বুঝোতে চেষ্টা করেন, দুষ্টু ছেলে বোঝে না, বায়না থামায় না। রাগে এক এক দিন তিনি প্রহার করবার জন্যে হাত তোলেন, রামলালা দৌড়ে পালিয়ে যায়।

গঙ্গার জলে স্নান করতে নেমেছেন, কখন রামলালাও জলে নেমেছে…জুড়ে দিয়েছে মাতন…যতবার বলেন, উঠে আয়…উঠে আয়…কে আর কথা শোনে…? শেষকালে রাগে ঠাকুর হাত ধরে জলে তাকে ঠেলে দেন…যতক্ষণ খুসী, থাকো জলে…

উঠে আসেন…দেখেন ভিজে গায়ে ছুটে আসছে রামলালা।

জটাধারী তখন কিছু জানেন না এসব ব্যাপারের। একদিন ভাতরান্না করে খেতে বসে দেখেন, রামলালা নেই…কত ডাকেন…কোন সাড়া নেই…

ছুটে ঠাকুরের ঘরে এসে দেখেন, রামলালা সেখানে ঠাকুরের কোলে বসে দিব্যি আরামে খাচ্ছে!

অভিমানে জটাধারীর দুচোখ ফেটে জল ঝরে পড়ে। বলেন, এমন না হলে বাপকে ফেলে তুমি পরবাসে যাবে কেন?

কয়েকদিন পরে।

দুচোখে ভরা জল। জটাধারী ঠাকুরের ঘরে ঢুকে রামলালার বিগ্রহটী ঠাকুরের হাতে তুলে দিয়ে বলেন, আমি রামলালাকে তোমার কাছে রেখে গেলাম…জানি, সেখানেই সে সুখে থাকবে…সেই আমার চরম আনন্দ…

এই বলে যেমন পথে ঘুরতে এসেছিলেন, তেমনি চলে গেলেন আবার।

সেই থেকে রামলালা রয়ে গেল ঠাকুরের কাছে…

(১৬)

তুমি আর আমি…

তুমি কৃষ্ণ, আমি রাধা…তুমি কাম্য, আমি কামনা।

কখনো তুমি যশোদা, আমি গোপাল…

কখনো আমি যশোদা, তুমি গোপাল…

বেণু বাজিয়ে চলেছ ধেনু চরাতে, আমি চলেছি তোমার চরণ-চিহ্ন অনুসরণ ক'রে সুহৃদ-সখা বন্ধু, অন্তরের মিতা…

তুমি আত্মা…আমি দেহ…

তুমি সাধ্য…আমি সাধনা…তোমাতে আমাতে এই নিখিল বিশ্ব…

ভক্ত আর ভগবান্…

নব-অনুরাগের রাস-মঞ্চে চলেছে দুজনার লীলা…

এক আর একে দুই…

সেই সময় এলো এক রুদ্র সন্ন্যাসী, জাগিয়ে শুষ্ক-জ্ঞানের ঝঞ্ঝা-রোল, গণ্ডুষে শুষে নিয়ে অনুরাগের ভাব-গঙ্গা…

এলো অদ্বৈত-জ্ঞানের জীবন্ত প্রতীক…

নিয়ে সাধনার চরম উপলব্ধি…নির্বিকল্প সমাধি…

ব্রহ্মোতে লীন হয়ে যাবার দুঃসাধ্য তপস্যা…

ভারতের চরম অভিজ্ঞতা…

আমিই সেই…আমিই ভগবান্…

মৃত্যুহীন…জন্মহীন…সুখহীন…দুঃখহীন…ভয়-হীন চির-উন্মুক্ত !

সব কার্য-কারণের অতীত !

এলো উলঙ্গ রুদ্র সন্ন্যাসী…

তোতাপুরী গোস্বামী।

(১৭)

পাঞ্জাবের লুধিয়ানা প্রদেশের নাঙ্গা সন্ন্যাসীদের আস্তানা…

সেখান থেকে একদিন এক তরুণ পাঞ্জাবী যুবক আত্মদর্শন-লাভের সাধনায় নর্মদার তীরে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে…

সেখানে চল্লিশ বৎসর কঠোর সাধনার পর তিনি নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেন…

সর্ব-ইন্দ্রিয়ের বন্ধন-মুক্ত হয়ে তিনি পরম-ব্রহ্মে নিজের সত্বাকে লীন করে দেন…

সেই মহাসমাধি থেকে তিনি পুনরায় জড়-দেহে প্রত্যাবর্তন করেন…অদ্বৈত-জ্ঞান প্রচারের বাসনায়…

সারা ভারত তীর্থে তীর্থে তিনি ঘুরে বেড়ান…অনুসন্ধানে, কোথায় আছে সে দিব্য-আধার যেখানে তিনি এই সাধন-লব্ধ পরম-ধন ন্যস্ত করে যেতে পারেন…

পুরী হয়ে, গঙ্গাসাগর যান…সেখান থেকে ফেরবার পথে গঙ্গার ধারে দক্ষিণেশ্বরের কালী-মন্দির তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে…

মন্দিরের চত্বরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে ঘুরতে ঘুরতে দেখেন, একবস্ত্রে এক অদ্ভুত ব্যক্তি ধ্যানমগ্ন একা বসে আছে…

কাছে এগিয়ে গিয়ে তোতাপুরী স্থির-দৃষ্টিতে সেই অর্দ্ধ-অচেতন মূর্ত্তিটিকে নিরীক্ষণ করে থাকেন…

স্থির বুঝতে পারেন, যে-পুরুষ-সিংহের সন্ধানে তিনি তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এই সেই ব্যক্তি, তাঁরই পথের পথিক…

কোন ভূমিকা না করেই তোতাপুরী ঠাকুরকে সম্বোধন করে বলেন, তুমি যে-পথের পথিক, আমি দেখেছি সে-পথের শেষ…আমি নিয়ে যাব তোমাকে সেখানে…

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন, কি সে ব্যাপার?

তোতাপুরী বলেন, ভারতের তপশ্চর্য্যার শ্রেষ্ঠ ধন…বেদান্তের অদ্বৈতজ্ঞান…আত্মদর্শন…

বালকের মত ঠাকুর বলেন, তা জানি না বাপু…মা যদি বলে তো শিখতে পারি!

চরম-অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেন, মা? মা আবার কে?

ঠাকুর মন্দিরের দিকে দেখিয়ে দেন। তোতাপুরী মনে মনে হেসে ওঠেন, তাঁর কাছে, মন্দির না, পূজা-অর্ঘ, ভক্তি, মন্ত্র সমস্ত নিরর্থক…মায়ার-বন্ধন…যে-বন্ধন মানুষ পারে নিজেই ছিন্ন করতে… দেবতার কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই…

কিন্তু এখন সে-সব তর্ক না উত্থাপন ক'রে তোতাপুরী বল্লেন, বেশ, তোমার মা-কেই জিজ্ঞাসা করে …আমি এখানে কয়েকদিন থাকবো…

(১৮)

কয়েকদিন ব'লে তোতাপুরী দীর্ঘ এগারো মাস সেখানে থেকে গেলেন…

ঠাকুর রাজী হলেন…বেদান্তের শিক্ষা নিতে…মা বলেছেন, ভালই হবে!

তোতাপুরী বল্লেন, যথারীতি তোমাকে সন্ন্যাসে দীক্ষা নিতে হবে…

ঠাকুর পূর্ণ-বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ করেন।

আগেকার জীবনের সব চিহ্ন বিসর্জ্জন দিতে হবে…শূদ্র-ব্রাহ্মণের ঐ [illegible] উপবীত…যা কিছু গত জীবনের…অগ্নিতে দিতে হবে আহুতি…

নব-জীবনের প্রবেশ চিহ্ন স্বরূপ করতে হবে মস্তক-মুণ্ডন...

এলো দীক্ষার দিন...

উপবীত-হীন মুণ্ডিত-মস্তকে রামকৃষ্ণ তোতাপুরীর সম্মুখে আসনে উপবিষ্ট...

প্রথমে করতে হবে পূর্ব্ব-পুরুষদের শ্রাদ্ধ...সেই শ্রাদ্ধের দ্বারা, তিনি সংসার থেকে হলেন বিচ্ছিন্ন... পূর্বাপরহীন···একক···সন্ন্যাসী···

তারপর করতে হবে নিজের শ্রাদ্ধ···নিজেকে স্বেচ্ছায় রুদ্ধ করতে হবে জন্মান্তরের সাধ···সব-কর্ম্ম-ফলভোগের সব ইচ্ছাকে দিতে হবে আহুতি···কোন কামনা নেই···কোন কাম্য নেই···

এই ভাবে একে একে প্রত্যেক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে যেতে রাত্রি শেষ হয়ে আসে···

প্রভাতে গুরু-শিষ্য প্রবেশ করে সাধন-ঘরে···

তোতাপুরী দীক্ষার আগে বেদান্তের শিক্ষার মূল-সূত্রগুলি শিষ্যকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন।

ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু···নিত্য শুদ্ধ, নিত্য বুদ্ধ, চির-মুক্ত···

কার্য্য-কারণ এবং স্থান কালের অতীত···

মায়াবশতই তাঁকে আমরা দেখছি বহু নামে এবং বহু রূপে বিভক্ত...

এই নাম আর রূপময় বিশ্ব···

কিন্তু যা কিছু নাম ও যা কিছু রূপ, সে শুধু মায়ার-সৃষ্টি অলীক বস্তু···

তাই মনকে নিয়ে যেতে হবে নাম ও রূপের-অতীতে···

যা কিছু নাম আর রূপের চিহ্ন মুছে ফেলতে হবে মন থেকে···

ছিন্ন করে নাম-রূপের সহস্র রঙীন খেলনা, বেরুতে হবে মুক্ত শুদ্ধ পুরুষ-সিংহ...

সেখান থেকে তখন সুরু হবে আত্মদর্শনের শিক্ষা···

এই ভাবে বেদান্তের মূল-সূত্রগুলি একে একে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে তোতাপুরী আদেশ করলেন শিষ্যকে ধ্যানে বসতে··সমস্ত নাম-রূপ থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আসতে···

ধ্যানসিদ্ধ শিষ্য যত চেষ্টা করেন, ততই এক জায়গায় এসে তাঁর মন বারবার ফিরে আসে···

যতবার মনকে সব রূপ থেকে সরিয়ে নেন, ততবারই মন যেন বাঁধভাঙ্গা জলের মত এক-রূপের কাছে ছুটে চলে যায়...জগজ্জননীর মাতৃ-রূপ···

মা···মা ব'লে চীৎকার করে ওঠে শিষ্য···

ক্রমশঃ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে থাকেন তোতাপুরী···

ঠাকুর বলেন, কিছুতেই পারছিনে মা-র কাছ থেকে সরিয়ে আনতে মন...

শেষকালে তোতাপুরী ঘরের এককোণ থেকে একটা ভাঙ্গা কাঁচ তুলে নিয়ে দুই ভ্রূর মাঝখানে টিপে ধ'রে বলে উঠলেন, এই যেখানে ফুটছে সেখানে মনঃসংযোগ কর!

কঠিন চেষ্টায় শিষ্য গুরুর নির্দ্দেশ মত সেই আঘাত-বিন্দুতে মনঃসংযোগ করেন।

দেখতে দেখতে অল্পক্ষণ পরেই গভীর সমাধিতে বাহ্য-জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায় শিষ্যের।

এক দৃষ্টিতে গুরু চেয়ে থাকে শিষ্যের দিকে···মুমূর্ষু হরিণের দিকে যেমন করে চেয়ে থাকে পশুরাজ··· দেখেন, ধীরে ধীরে স্থির হয়ে আসছে সর্ব-ইন্দ্রিয়, স্থির···নিথর সর্ব-দেহ···কোন চেতনা নেই···কোন বো··· নেই···প্রাণহীন প্রস্তর মূর্ত্তি···

ধীরে তোতাপুরী আসন ছেড়ে উঠে ঘরের বাইরে চলে আসেন···বাইরে থেকে দরজায় ছেকল তু··· দেন···ছেকল তুলে দিয়ে দরজায় পাহারা দিয়ে বসেন ..যেন কেউ এসে সে ধ্যান ভঙ্গ না করে···

... সজাগ হয়ে আছেন, ঘরের ভেতর-থেকে সমাধি-ভঙ্গের শব্দের জন্যে···সমাধি-ভঙ্গে নিশ্চয়ই রামকৃষ্ণ··· তাঁকে ডাকবেন ··তখন দরজা খুলে দেবেন···

দিন চলে গেল···ঘরের ভেতর থেকে কোন সাড়া শব্দ নেই···যেন ঘরের ভেতর কোন মানুষই নেই...

রাত্রি এলো···তা-ও চলে গেল···তবু ঘরের ভেতর কোন সাড়া নেই···কোন শব্দ নেই···

পরের দিন···চব্বিশ ঘণ্টা তোতাপুরী দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে···বিস্ময়ে তাঁর দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে···সেদিনও চলে গেল···

এইভাবে তিন দিন চলে গেল···রুদ্ধ ঘরের ভেতর থেকে কোন সাড়া, কোন শব্দ নেই···

আর নিজের বিস্ময় ও কৌতূহল ধরে রাখতে না পেরে, তোতাপুরী ঘর খুলে ভেতরে গিয়ে দেখেন, সেই আসনে, ঠিক তেমনি ভাবে, তখনও ধ্যান-সমাহিত বসে আছেন রামকৃষ্ণ···জীবিত, না মৃত, ... বোঝবার কোন উপায় নেই···

তোতাপুরী বেশ ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন, দেহের মধ্যে জীবনের কোন লক্ষণই নেই···অথচ সারা মুখ থেকে যেন এক অপরূপ আনন্দ-আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে···

বিস্ময়ে আপনা থেকে তোতাপুরী বলে উঠলেন, এ ও কি সম্ভব? যা অর্জ্জন করতে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর আমাকে কঠোর সাধনা করতে হয়েছে···সেই দুঃসাধ্য তপস্যার ধন এই ব্যক্তি অনায়াসে একদিনের চেষ্টায় লাভ করলো? একদিনের সাধনায় নির্বিকল্প সমাধি! অসম্ভব!

সন্দেহে ঘন-আন্দোলিত তোতাপুরী স্থির করেন, তিনি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখবেন। হৃদ্-স্পন্দন আছে কি না অনুভব করবার জন্যে তিনি নানা ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন···কিন্তু সব ব্যবস্থাতেই বুঝতে পারলেন সে-··· কোন হৃদ্-স্পন্দন নেই···হৃদ্‌স্পন্দনের কোন চিহ্ন নেই···নাসিকা দিয়ে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসেরও কোন ··· নেই···

নেই সে দেহে জীবনের কোন লক্ষণ···

পড়ে রয়েছে সম্মুখে রামকৃষ্ণের প্রাণ-হীন জড় দেহ···শূন্য পিঞ্জর···

পিঞ্জর-মুক্ত বিহঙ্গম চলে গিয়েছে সচ্চিদানন্দ সাগরের ঊর্মিহীন অমৃত-তীরে···

তোতাপুরী যখন নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলেন...রামকৃষ্ণ নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেছেন.. তখন বিস্ময়ের আর অন্ত রইলো না...শিষ্যের প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁর অন্তর তখন উদ্বেল হয়ে উঠেছে...এ কোন্ দিব্য-পুরুষ যিনি একদিনের সাধনায় এই দুশ্চর তপস্যার ধন নির্বিকল্প সমাধি লাভ করতে পারেন?

কিন্তু এই বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভয়েও তাঁর অন্তর আলোড়িত হয়ে উঠলো...

নির্বিকল্প সমাধিতে যে-মন চলে যায়, তাকে আবার জড়-দেহে ফিরিয়ে আনা অতি কঠিন ব্যাপার.... সাধারণ সাধকরা নির্বিকল্প সমাধির পর আর জীব-দেহে প্রত্যাবর্ত্তনই করেন না...কয়েক দিন নির্বিকল্প সমাধিতে অবস্থান ক'রে, ব্রহ্ম-রমণ-সুখের অবাঙ-মানস-গোচর মহানন্দের মধ্যে তাঁরা জড়-অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন ভাবে মিলিয়ে দেন...একমাত্র যে-সব মহাপুরুষ লোক-শিক্ষার জন্যে পৃথিবীতে আগমন করেন...যাঁদের জীবন কোন নিগূঢ় রহস্য লোকের নির্দ্দেশ-চিহ্নিত.. সেই সব দিব্য-পুরুষই পারেন নির্বিকল্প সমাধি থেকে পুনরায় আবার জড়-দেহে প্রত্যাবর্ত্তন করতে...

তাই তোতাপুরী তাঁর দীর্ঘ দিনের সব অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে রামকৃষ্ণের জ্ঞান উৎপাদনের চেষ্টা করতে লাগলেন...

"হরি ওঁ"..."হরি ওঁ" ধ্বনিতে সমস্ত মন্দির চত্বর মুখরিত হয়ে উঠলো...

কয়েক ঘণ্টার চেষ্টার ফলে সেই প্রাণহীন প্রস্তর-দেহে ধীরে ধীরে প্রাণের লক্ষণ দেখা দিতে লাগলো .. তোতাপুরী মহানন্দে তাঁকে ঘিরে পরিক্রমণ করেন আর বলেন, হরি ওঁ, হরি ওঁ...

দেখতে দেখতে দুই চক্ষু উন্মিলিত করে রামকৃষ্ণ চাইলেন...সামনেই দুই হাত আলিঙ্গনের জন্যে প্রসারিত করে গুরু দাঁড়িয়ে...

—ধন্য...ধন্য...আমি...যে-তোমাকে শিষ্য রূপে পেয়েছি!

বহু, বহু যুগ পরে, এই মৃত্যুময় বিশ্বে একজন মর্ত্ত্যমানুষ নিজের অপূর্ব্ব সাধনা দ্বারা আবার প্রমাণিত হলো, মানব-মনের কি অপূর্ব্ব বিভূতি...মনের এই শৃঙ্খল মোচনই জগতের সব মানুষের মানবীয় ধর্ম্ম...। ধর্ম্মের মধ্যে কোন ভেদ নেই, কোন স্বর্গ-মর্ত্ত্য-নরক নেই.. কোন আচার-অনাচার নেই.. প্রত্যেক মানুষের লক্ষ্য...সব পথের একমাত্র শেষ...

কিন্তু আমাদের ইতিহাসে এই মহাদিনটী আজও পর্য্যন্ত অচিহ্নিতই হয়ে আছে...

(১৯)

তোতাপুরী এসেছিলেন গুরু হবার জন্যে...

গুরু হলেন-ও...

কিন্তু শিষ্যের কাণ্ড দেখে, তাঁর মন থেকে চলে গেল গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক...

গুরু শিষ্যকে করে শ্রদ্ধা...

শিষ্য তাদপদাসে বন্দী ব'লে…

—তিনদিনের বেশী সন্ন্যাসী পারে না কোথাও থাকতে…সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলে যায়…তোতাপুরীর আর হয় না যাওয়া…

আজ যাব…কাল যাব…ঠাকুর দেন না যেতে…

তোতাপুরীও কেমন যেন জোর করেন না বেশী…

অথচ যতদিন চলে যেতে লাগলো, ততই তিনি অস্থির হয়ে পড়েন…একি অন্যায়? তিনি "রমতা" সন্ন্যাসী…তিনি কেন বদ্ধ হয়ে থাকবেন এক জায়গায়? অথচ কে যেন তাঁকে আটকে রাখছে, তা তিনি বুঝতে পারেন। কি উদ্দেশ্য তার?

ঠাকুরের সঙ্গে আজকাল নানাব্যাপারে তোতাপুরীর সঙ্গে চলে সংঘর্ষ…

বৈদান্তিক তোতাপুরী ছিলেন সহজাত মহাপুরুষ…জন্ম থেকেই, আদি চেতনা থেকেই, তাঁর মন ছিল সর্বমোহমুক্ত…কোন মায়ার প্রতিবন্ধক তাঁকে সাধন-পথে ভোগ করতে হয়নি তাই তাঁর বিশ্বাস ছিল…পুরুষকারে…আত্ম-চেষ্টায়…যে-চেষ্টার ফলে তিনি নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেন…

তাই তাঁর বৈদান্তিক মন ঠাকুরের আকুলি-ব্যাকুলি দেখে, প্রতিমা-পূজা, মাতৃ-সম্বোধন…রাতদিন ঠাকুর-দেবতার নাম শুনে, বড়ই বিরক্ত হয়ে উঠতো…ভাবতো…লোকটার এখনও কি ভ্রম! যে-লোক অনায়াসে বেদান্তের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান মুঠোর মধ্যে পেলো, সে আবার অসহায় শিশুর মত কাতর হয়ে কার দরজায় মা, মা, বলে কেঁদে বেড়াচ্ছে? কে এ মা? এ-তো তার নিজেরই মোহ! নির্বিকল্প সমাধি লাভের পরও এই মোহ?

এই নিয়ে নানাব্যাপারে তোতাপুরীর সঙ্গে প্রায়ই ঠাকুরের সংঘর্ষ বাধে…

ঠাকুর এখন তোতাপুরীকে ন্যাংটা বলে ডাকেন…

একদিন তোতাপুরী আর থাকতে পারলেন না…ঠাকুর সকালবেলা উঠে ঠাকুরদের নাম করছেন…

—হরি প্রাণ হে…গোবিন্দ মম জীবন…

—কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হে…

তোতাপুরী বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, আরে, কেঁও রোটি ঠোক্‌তে হো?

অর্থাৎ পশ্চিম-অঞ্চলে মেয়েরা যখন হাত চাপড়ে রুটী তৈরী করে, তখন যেমন একটা পত্‌ পত্‌ শব্দ হয়…তেমনি অকারণে কেন শব্দ করছো?

ঠাকুর হেসে বল্লেন, আরে আমি ঠাকুরদের নাম করছি…ন্যাংটা বলে কি না রুটি ঠুকছি! দাঁড়া, দাঁড়া, ভ্রমর হলে তুমিও বুঝবে…

তোতাপুরী হেসে বলেন, আমি আবার কি বুঝবো?

—বুঝবে আমার মার প্রতাপ কতখানি!

তোতাপুরী অট্টহাস্য করে ওঠে, মা নয়, মায়া···মায়া বৈদান্তিকের কাছে আবার ওসব কি? ব্রহ্মই একমাত্র সত্য···

—হাঁ, ব্রহ্মই সত্য বটে কিন্তু তুমি তো দেখনি, আমি দেখেছি, তোমার সেই ব্রহ্মকেই ··· পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়ে...যতই কেন চোখ বুঁজে তোমার মনকে বোঝাও কাঁটা নেই···কিন্তু যেই পায়ে প্যাট ক'রে ফুটলো কাঁটা অমনি করে উঠলে উহু, উহু···তেমনি যতই কেন মনকে বোঝাও তোমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, পাপ নেই, পুণ্য নেই, সুখ নেই, দুঃখ নেই...জরা-মরণ বিরহিত আত্মা···কিন্তু যেই শরীরে এলো ব্যাধি, এলো অসুস্থতা, এলো সংসারের রূপ-রসের প্রলোভন. অমনি এলো দুঃখ, যন্ত্রণা মোহ.. সব ভুলিয়ে করে তুল্ল ব্যতিব্যস্ত. সেইজন্যে মায়া যদি নিজে দোর না ছেড়ে দেয়···কারুর জ্ঞানলাভ হয় না···দুঃখের নিবৃত্তি হয় না···তাই সেই বিরাট শক্তিময়ী মায়াকেই আমি মা বলে জানি আমি তার সন্তান···মা আমার দয়া করে পথ ছেড়ে দেয়, তবেই তো দেখতে পাই.. নইলে, কিছু হবার জো নেই···কিছু হবার জো নেই···

তোতাপুরীর বৈদান্তিক মনে ভাঙ্গন ধরতে আরম্ভ করে।

(২০)

ঠাকুর গল্প বলছেন···তোতাপুরী শ্রোতা···

রাম সীতা আর লক্ষ্মণ বনে যাচ্ছেন...

সরু বনের পথ, একজনের বেশী একসঙ্গে যাওয়া যায় না···

রাম ধনুক হাতে আগে আগে চলেছেন···তাঁর পিছু চলেছেন সীতা···সবার পিছু পিছু চলেছেন ধনুক হাতে লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ রাম ছাড়া কিছু জানে না···সর্ব্বদাই মনে সাধ, চোখ মেলে যদি কিছু দেখতেই হয়, তবে যেন দেখি, শ্রীরামের ঐ নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রূপ···

কিন্তু চলতে গিয়ে দৃষ্টি-পথে যখন এসে পড়ে পৃথ্বিদুহিতা সীতা···লক্ষ্মণ আর তখন দেখতে পায় না তার রামগুণমণিকে···

ব্যথিত হয়ে ওঠে মন···

সে-ব্যথা বুঝতে পারেন সীতা···তাই চলবার সময় তিনি একটু পাশ কাটিয়ে কেৎরে চলেন...সেই ফাঁক দিয়ে লক্ষ্মণ তখন দেখতে পায় শ্রীরামকে...

তেমনি ধারা, ঠাকুর বলেন তোতাপুরীকে···জীব আর ঈশ্বরের মাঝখানে চলেছে মায়ারূপী সীতা···তিনি যদি দয়া করে সরে না দাঁড়ান, তোর সাধ্যি কি তুই দেখিস? তাই, ওরে ন্যাংটা, শোন আমার কাছ থেকে···ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ···অভেদ রে...ভেদ নেই কোথাও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে...

শিষ্যের কাছে সুরু হয় গুরুর শিক্ষা···

তোতাপুরীর মন বিচলিত হয়ে উঠতে থাকে···না···না···আর এখানে থাকা হবে না···এ যেন কোথায় কি চলেছে চক্রান্ত···বুঝতে পারে না তোতাপুরী···

তবু যাব-যাব করে হয় না যাওয়া...

এমন সময়, বাংলার জল-হাওয়া সইতে না পেরে তোতাপুরী একদিন পড়লো শয্যায়···

(২১)

রোগ ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠতে লাগলো...

আজন্ম পশ্চিমের পাহাড়ে···নর্ম্মদার তীরে...সহজ প্রকৃতির মধ্যে স্বচ্ছন্দে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন···জন্ম থেকে অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী...জানেন না, রোগ কি, শরীরের যন্ত্রণা কি...

বাংলার বাষ্পকণাময় গুরুভার বায়ু কোন্ অতর্কিত ছিদ্র-পথ দিয়ে দেহে প্রবেশ করে প্রথম আক্রমণ করলো পাকযন্ত্রকে···

নিদারুণ অজীর্ণতার ফলে এলো কঠিন উদরাময়।

ঠাকুর ঔষধ-ব্যবস্থা এবং সেবার কোন ত্রুটি করলেন না।

কিন্তু দিন দিন রোগ যেন উগ্রতর হয়ে উঠতে লাগলো। ক্রমশঃ সুরু হলো অসহ্য যন্ত্রণা।

তোতাপুরী স্থির করলেন, মনকে দেহ থেকে সরিয়ে ফেলবেন···কি প্রয়োজন এই দেহের? তিনি তো বহুবার গিয়েছেন চলে, এই দেহকে ফেলে রেখে পেছনে?

বসলেন, সমাধির আসনে···

কিন্তু কিছু দূর গিয়ে আর অগ্রসর হতে পারেন না...ব্যাধিগ্রস্ত দেহ বার বার টেনে আনে মনকে···

পঞ্চভূতের ফাঁদে...ব্রহ্ম তখন কাঁদে···

একদিন রাত্রিবেলায় দেহের যন্ত্রণা প্রবলতম হয়ে উঠলো।...

নিঃশব্দে, অন্ধকারে, তোতাপুরী ঘর থেকে বেরুলেন...

এ দেহ তো নিষ্প্রয়োজন···কি কাজ আর একে বহন করে? অকারণে কেন সইবো এর অত্যাচার? গঙ্গাজলে দেবো বিসর্জ্জন!

এই সঙ্কল্প করে রাত্রির অন্ধকারে তোতাপুরী গঙ্গাতীরে এসে দাঁড়ালেন ..

গঙ্গাতীরে মনকে বহু চেষ্টায় ব্রহ্মচিন্তায় লীন করে তিনি গঙ্গাজলে নামলেন...

কিন্তু যতই জলের মধ্যে চলে যেতে চান, ততই দেখেন, জল যেন সরে সরে যায়...তোতাপুরী আরো অগ্রসর হয়···কিন্তু কই জল! আজ গঙ্গায় ডুবে যাবার মত কোথায় জল?

চলতে চলতে গঙ্গার অপর পারে তিনি চলে এলেন···

সহসা তাঁর চিত্ত-ভূমি উদ্ভাসিত করে এলো দিব্য-জ্ঞান···

অসহায় শিশুর মত চীৎকার করে উঠলেন, মা, মা! মাগো!

অম্বা-রবে দিক্ মুখরিত করে তোতাপুরী আবার গঙ্গার এ-তীরে ফিরে এলেন…

সেই আকুল মাতৃ-সম্বোধনে ঠাকুরের নিদ্রা গেল ভেঙে…

দেখেন বৈদান্তিক তোতাপুরীর দু-চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে জল আর শিশুর মত চীৎকার করে ডাকছেন, মা…মা…মাগো!

অদূরে প্রভাতী সুরে বাজছে নহবৎ…

ম্লান উষার আলো…

গঙ্গার তীরে মাতৃ-মন্দিরে রক্ত-জবা-রক্তিম-চরণে লুটিয়ে পড়ে দুটী প্রাণী…

ভারতের দুই বিরাট ভাব-ধারা মিশে যায় এক মহাসাগরে এসে…

(২২)

তোতাপুরী ঠাকুরের অন্তরে যে অদ্বৈত-জ্ঞানের শিখা জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন, তার আলোয় ঠাকুর দেখলেন…

সব পথ, সব মত, সব বিভেদ আর বিভিন্নতার মধ্যে রয়েছে সেই একই পরম সত্য…

আত্ম-দর্শন…আত্ম-উপলব্ধি ..

যত পথ…তত মত…

কিন্তু সব পথ গিয়ে যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে রয়েছে সেই পরম একই…

সব মত যেখানে গিয়ে মিশেছে, সেখানে রয়েছে মতহীন মহা-ঐক্য…

তবে কেন দ্বন্দ্ব? এত বিভেদ? যুগ-যুগান্ত ধরে একের সঙ্গে অপরের এত সংঘর্ষ?

শেষ হোক্ এই দেশ-কাল-ধর্ম্মের বিচ্ছেদ..শেষ হোক্ এই লক্ষ মতের উন্মাদ মাতামাতি·

বিশ্ব হোক্ এক-পরিবার..

ঠাকুর ঠিক করলেন, শুধু কথা নয়, শুধু বক্তৃতা নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি উপলব্ধি করবেন, এই মহাসত্য…যে মহাসত্য ধ্যানের আলোকে তিনি দেখেছেন অভ্রান্তরূপে…

তাই হিন্দুধর্ম্মের পরিধির বাইরে তিনি বেরুলেন আত্মার বিচিত্র অভিযানে…

(২৩)

সেই সময় দক্ষিণেশ্বরের কাছে এক সিদ্ধ পুরুষ বাস করতেন…গোবিন্দ রাই ছিল তাঁর নাম…

তিনি ইসলাম ধর্ম্মগ্রহণ ক'রে সুফী সাধুদের মতন জীবন যাপন করতেন…

ঠাকুর তাঁর কাছ থেকে নিলেন ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষা…

বেশ, ভূষা…আচার, ব্যবহার সব ফেল্লেন বদলিয়ে…

দেখতে দেখতে ধুয়ে গেল তাঁর মানসিক দৃষ্টি-ভঙ্গী পর্যন্ত...

প্রতিমার স্মৃতি মুছে ফেললেন, ভুলেও দেখতেন না কোন প্রতিমা...

নিত্য কোরাণের নির্দেশমত নমাজ পড়তেন এবং এক মনে সেই এক-ঈশ্বরের ধ্যানে থাকতেন আত্ম-

...রে ...খেন, দীর্ঘ শ্মশ্রু এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ তাঁকে আহ্বান করছেন...সে-আহ্বানে সাড়া

...ডুবে গেল মন...

...গ ক্রমশ ...চিদানন্দময় অপরূপ অস্তিত্ব...আত্মায় আত্মায় অন্তহীন রমণ...

(২৪)

দক্ষিণেশ্বরের কাছে শম্ভু মল্লিকের বাগান।

শম্ভু মল্লিক মাঝে মাঝে ধর্ম্ম-আলোচনার জন্যে ঠাকুরকে ডেকে নিয়ে যান বাগানে।

সেখানে একদিন তিনি ঠাকুরকে পড়ে শোনালেন বাইবেল...খৃষ্টধর্ম্ম...

বাইবেলের সমস্ত নৈতিক উক্তিই ঠাকুর আজন্ম পালন করে এসেছেন...সুতরাং তাঁর কাছে খৃষ্ট-ধর্ম্মের অনুশাসন কিছু নতুন বলেই হলো না...যিশুর বেদনাময় অপরূপ জীবন তাঁর চিত্তকে নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করলো...

একদিন শিশু-যিশু ক্রোড়ে ম্যাডোনার মাতৃ-মূর্ত্তি দেখতে দেখতে তাঁর অপূর্ব্ব ভাবাবেশ হলো...সেই ভাবাবেশে দেখেন, তাঁর মনের পট থেকে তাঁর আজন্ম পরিচিত হিন্দু দেব-দেবীদের মূর্ত্তি যেন কে লেপে মুছে দিল...তিনি ব্যাকুল হয়ে চীৎকার করে উঠলেন...এ তুই কি করছিস্ মা?

কিন্তু সেই অবস্থায় কিছুক্ষণ পরেই দেখেন, এক বিরাট বেদী...তার সামনে সেই প্রাচীন রোমান রীতি অনুসারে ধূপ-ধুনা পোড়ানো হচ্ছে...সুরভিগন্ধে আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ...কোথা থেকে দিব্য-সঙ্গীত ভেসে আসছে...তার মধ্যে দেখেন অসংখ্য নর-নারী...বিচিত্র তাদের বেশ...নতজানু হয়ে তারা ধ্যান করছে...খৃষ্টান নরনারীরা...

তিনদিন ধরে সেই ভাবাবেশে তাঁর কাটলো...চতুর্থদিনের দিন দেখেন, পঞ্চবটীর দিক থেকে এক শুভ্র-মূর্ত্তি দীর্ঘকায় অনিন্দ্যকান্তি পুরুষ তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন...দেখলেই মনে হয় বিদেশী...

বিদেশী আরো কাছে এগিয়ে এলেন...

তখন রামকৃষ্ণ বুঝলেন, এই সেই মানুষের বেদনার ভার নিজের স্কন্ধে নিয়ে যিনি হাসিমুখে বরণ করেছিলেন মৃত্যু...এই সেই মহাযোগী যিশু...

যখন এই চিন্তা করছেন, তখন দেখেন, সেই দিব্য-পুরুষ ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে এসে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁর মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেলেন।

শেষ-সাধনা···

যাকে নিয়ে মানুষের প্রথম সাধনা···আদি সাধনা···উনবিংশ-শতাব্দীর জগৎ যাকে দিল নতুন ... মর্যাদা···ঠাকুর তাকে দিলেন এক অপরূপ দিব্য মহিমা···

নারী···নতুন আসন রচনা করলেন তার···

সংসার-ত্যাগী আজন্ম-বৈরাগ্য-সিদ্ধ সন্ন্যাসী বিশ্ব-কেন্দ্রে স্থাপনা করলো তারিই বিগ্র... জীবনে করে এসেছেন অস্বীকার···স্থাপনা করলো—নারীর বিগ্রহ জীবনের পঞ্চবটী মূলে···

নারী পেলো দিব্য মহিমা...শ্রেষ্ঠ অর্ঘ···সুন্দরতম প্রণাম···

সে-নারীর বিগ্রহ মূর্ত্তি হলেন সারদা দেবী···বিবাহের মন্ত্রে যাঁকে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর পাশে···

তাঁকে কেন্দ্র করে নিঃশেষে সমর্পণ করলেন সমগ্র নারী-জাতির প্রতি তাঁর অন্তরের অপরিমিত শ্রদ্ধা··· অনন্যসাধারণ···

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মে মাসের অমাবস্যা রাত্রি···

সারাদিন মন্দিরে চলেছে আয়োজন মাতৃ-পূজার···শ্যামা মায়ের পূজা··

রাত্রি ঠিক ন'টার সময় লগ্ন দেখে পুজারী বসলেন পূজার আসনে...

পূজারী, ঠাকুর রামকৃষ্ণ···

সামনে পূজার বিগ্রহ···মাতৃ-পূজার বিগ্রহ···স্ত্রী সারদা দেবী···

ঠাকুরের নির্দ্দেশ-মত পট্ট-বসনে দিব্য-মাল্য-চন্দনে বিভূষিতা হয়ে নারী আজ বসেছে উনবিংশ-শতাব্দীর হৃদ্-কেন্দ্রে...পেতে তার প্রাপ্য পূজা···

অর্দ্ধ-অচেতন সারদা দেবী···

পূজারী নিষ্ঠা সহকারে সুরু করেন পূজা···

রাত্রি নিশীথে পূজা-অন্তে জীবন্ত বিগ্রহের চরণে দেন অঞ্জলি, এই তোমাকে দিলাম হে নারী, হে জননী, হে বিশ্ব-ধাত্রী, আমার সব সাধনার ধন···তোমাকে দিলাম আমার জপের মালা...তোমাকে প্রণাম করে আজ শেষ হোক্ আমার সবপ্রণাম !

কৃতাঞ্জলি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাভাবে দেহ ও মন বিলুপ্ত হয়ে যায় সমাধিতে···

পূজারী সমাধিস্থ...

সম্মুখে বিগ্রহও সমাধিস্থ...

মহাকাশে চলে আত্মায় আত্মায় পরম-রস-আস্বাদন...অনন্ত রমণ···

শেষ হলো সাধকের সাধনা...

উনবিংশ-শতাব্দীর সর্ব-শ্রেষ্ঠ সাধনা...মানব-মনের গহনতম অভিযান···

(২৬)

মাত্র একশো বছর আগে, এই বাংলার মাটীতে, মানব-মনের যে-মহা-পরীক্ষা হ'য়ে গেল, আজ কোথায় ... কি মূল্য দিয়েছি তার আমরা আমাদের জীবনে ?

... পরমহংস...তাঁর নাম কি শুধু লেখা থাকবে ইতিহাসের পাতায় ? অসংখ্য মরা-অক্ষরের মধ্যে ... অক্ষর ?

...গ ক্রমশ ক... অবাক হয়ে চেয়ে থাকি তাজমহলের দিকে; বিস্ময়ে ভাবি কি ক'রে মানুষ গড়লো পিরামিড—কিন্তু তা সবার চেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা, মানব-মনের এই দিব্য বিকাশ...বিজ্ঞানের সব বিস্ময়ের চেয়ে বিচিত্র, মানব-মনের এই দুর্লভ অভিযান, সে কি আজকের যুগের যৌবনের কাছে শুধু হয়ে থাকবে গতদিনের ...

নতুন করে লেখা হোক পৃথিবীর ইতিহাসকে...নতুন করে ঘোষণা করুক নতুন জগতের নবীন মানুষের ...না, মানুষের ইতিহাস শুধু নরহত্যাকারীর বিজয়-দুন্দুভি নয়...শুধু রাজ্যলোভীর লুণ্ঠনের হিসাব নয়...জমিদারী সেরেস্তার কোন বৃহৎ সংস্করণ নয়...সম্পত্তি-হস্তান্তরের নির্ভুল সন-তারিখের তালিকা নয়...মানুষের ইতিহাস, মৃত্যুর কোলে বসে মর্ত্য মানুষের অমৃতসাধনার ইতিহাস...অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর সংগ্রামের ইতিহাস...নতুন করে লেখা হোক সে ইতিহাস...

আমাদের পরম গর্ব্বেরই বিষয় সেই দিব্য ইতিহাসের শেষ গৌরবময় অধ্যায় সেদিন অনুষ্ঠিত হয়ে ...ছে, আমাদেরই দেশে...

সমগ্র জগৎ যখন মানুষের মধ্যে যা শ্রেষ্ঠবিত্ত, মানুষের মন...তাকে ভুলে, বাইরের আয়োজনের বিপুল আধিক্যে বস্তুবাদকে চরম বলে গ্রহণ করতে চলেছিল, সেই সময় বিশ্ব-চেতনায় ইতিহাসের সেই মহা দুর্দ্দৈবের লগ্নে এই মহাপুরুষ নিজের জীবন-সাধনার দ্বারা ভারত-চেতনাকে জাগ্রত করে জানালেন যে, মানুষের পরম বিত্ত, তা নেই মানুষের বাইরে...মানুষের পরম বিত্ত রয়েছে মানুষের মধ্যেই, তার অন্তরগুহায় নিহিত...

অপার শক্তির আধার আমি, ভিখারীর মত কোন্ ক্ষুদ্রশক্তি ভিখারীর কাছে পাতবো হাত ?

এ লাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্তি পাবার পথ বিশ্বজগৎকে দেখিয়ে গেলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব...

নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিলেন ভারতবর্ষকে বিশ্ব-জগতের সঙ্গে...

যে ভারতবর্ষ, দিব্য, নিত্য, সত্য ও শাশ্বত।

আদম ও ঈভ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

এক

সেদিনের কথা আজও মনে আছে আমার।

সেই প্রথম যেদিন লীনা এসে ঢুকলো আমাদের কলেজে আই-এস্-সি পড়তে।

ক্লাশের সমস্ত তরুণ ছাত্রদের মনের কোণে সেই বিশেষ মুহূর্ত্তটিতে বেশ একটু চাঞ্চল্য জেগেছিল।

সেদিন ভেবেছিলুম এরকম মনোভাব আমাদের দিক থেকে হয়ত অবৈধ। কিন্তু আজ জ্ঞান ও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছি সেদিনের সে চিত্তচাঞ্চল্য ছিল তারুণ্যের অভিধানে সত্য ও স্বাভাবিক।

জৈব প্রকৃতিকে তো আর অস্বীকার করা চলে না। মানুষ সংযত হ'লেও তার মন প্রবৃত্তিচালিত না হয়ে পারে না। পজেটিভ ও নেগেটিভের আর্কষণ বিকর্ষণ একটা প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক তথ্য।

যে সময়ের কথা বলছি তখন সহ-শিক্ষা ভাল কি মন্দ এর কোনটাই নিঃসংশয়ে মীমাংসিত হয়নি। অভিভাবকদের আশঙ্কা ছিল, এতে ছেলে মেয়েদের অকল্যাণ হ'তে পারে।

এই কল্যাণ অকল্যাণের দুশ্চিন্তা একমাত্র তাঁদেরই লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারেনি, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাটাই ছিল যাঁদের কাছে প্রধান।

তবে, এ রকম বে-পরোয়া শিক্ষানুরাগীর সংখ্যা যে এদেশে খুব বেশী ছিল না সেদিন, একথা বলাই বা।

আমাদের কলেজেরই ধরো ফার্স্ট ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ার পর্য্যন্ত মেয়ে ছাত্রীদের যদি আদমশুমারি নেওয়া হ'ত সেদিন তাহলে দেখা যেতো তাদের সংখ্যা পাঁচটা আঙুলেই গোনা যায়।

যাঁরা সমর্থ বয়সের বাঙালী-মেয়েদের বয়সোচিত নানা সম্ভাব্য দুর্য্যোগের দুর্ভাবনায় শঙ্কিত ছিলেন তাঁরা এই সব অদূরদর্শী অভিভাবকদের নিরুৎসাহ করবার চেষ্টা এবং অপচেষ্টা কোনোটাই বাকি রাখতেন না।

তাঁদের মতে ওঁদের ও কাজটা ছিল সামাজিক নিয়ম ও শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। এমন কি, এটা যে প্রকাশ্যভাবে ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দেওয়ারই নামান্তর এ ধরণের কঠিন কথা বলতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হতেন না।

বে-পরোয়া অভিভাবকেরা এ অভিযোগের উত্তরে কৈফিয়ৎস্বরূপ বলতেন—পারিবারিক পাহারা, যার শাসনের আওতায় ঘরের ঘেরাটোপের মধ্যে যে সব মেয়েরা বেড়ে ওঠে, তাদের চিত্তে ও চরিত্রে চিরদিনই দৃঢ়তার অভাব থেকে যায়। তারা না-পায় আত্মনির্ভরতার শক্তি, না-হয় আত্মরক্ষায় সক্ষম। এই সব পরমুখাপেক্ষী দুর্বল মেয়েরা জাতির জননী হবার যোগ্য নয়। তার চেয়ে, ঘরে বাইরে মুক্ত আবহাওয়ার কোলে, জনতার ভীড়ের চাপে, বিক্ষোভ ও বিপদের মুখোমুখি হয়ে, আনন্দ বেদনার বৈচিত্র্যের মধ্যে গড়ে

ওঠে যে-মন, ... তার ... অভিজ্ঞতালব্ধ স্বাতন্ত্র্যের গুণে ইস্পাতের মতোই ধারালো শক্তির অধিকারী হয়। কঠিন আঘাতেও সহজে নুয়ে পড়ে না।

মুখে তাঁরা যাই বলুননা কেন, আসল কথাটা কিন্তু তা নয়। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা লাভের আর কোনও সুবিধাজনক ব্যবস্থা তখনো এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি করে উঠতে পারেনি বলেই, ঐ উচ্চ শিক্ষার দোহাই দিয়ে তাঁরা সহ-শিক্ষা সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ছেলেদের বিদ্যায়তনে মেয়েদের ... পদ্ধতি তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন অনেকটা নিরুপায় হয়েই। এটার মধ্যে না-ছিল তাঁদের ... মনের দুঃসাহসিকতা, না-ছিল অন্তরের ঔদার্য্য প্রসূত প্রসন্ন অনুমোদন।

... ক্রমশ ক... ভয়ে ভয়ে ও দ্বিধাজড়িত পদে দিয়ে যেতেন তাঁরা মেয়েদের কলেজ-ক্লাশ শুরু হবার অনেক আগেই। প্রত্যহ ছুটির ঘণ্টা পড়তে না-পড়তেই ছুটে এসে যে যার মেয়েকে ধরে নিয়ে যেতেন বাড়ীতে ...তি সুসম্পূর্ণেই।

...জেই, এক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, এখানেও তার কোনোই ব্যতিক্রম হয়নি। অর্দ্ধশতাধিক ছাত্রের মধ্যে ঐ একটি মেয়েছাত্রী লীনা। পরিচয়ের প্রতিযোগিতায় শৃগালের ধূর্ত্ততা অবলম্বন করেও একে একে সব ছেলেই যখন হার মানলে, লীনার অবস্থা দাঁড়ালো আমাদের বিচারে সেই কথামালার দ্রাক্ষাফলেরই সদৃশ—অর্থাৎ—তিক্ত-কটু-কষায়—আরও কত কি!

...ক্লাশের বোর্ডে কোনো কোনো ভূতেরা তার নামে যা তা লিখে রাখতেও লাগল। উড়ো চিঠিও করে ...পড়তে লাগলো তার হাতে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই। তার নামে ছড়া বাঁধাও হয়েছিল। তার প্রত্যেকটি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বিদ্রূপে ভরা।" চলতে লাগলো এমনিতর কত ছোট বড় উৎপাত সেই একটি অসহায় ... উপর।

কিন্তু আশ্চর্য্য তার ধৈর্য্য, এবং তার চেয়েও আশ্চর্য্য তার অসীম ক্ষমা। একটি দিনের জন্যেও ... কোনো ছেলের নামে অভিযোগ করেনি। না কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকের কাছে, না-তার বাড়ীর অভিভাবকদের কাছে। ছেলেদের সকল প্রকার অত্যাচারে সে ছিল একেবারেই নির্ব্বিকার।

কি জানি কেন এই মেয়েটির জন্য আমার অন্তরে সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল অসীম সহানুভূতি। সহপাঠিদের নির্লজ্জ আচরণে আমি কেমন লজ্জিত হয়ে পড়তুম মনে মনে! ওদের অপরাধের ভার যেন আমার মাথার উপর বোঝা হয়ে উঠছে মনে হ'ত।

অথচ, তোমরা শুনলে বোধ করি বিশ্বাস করতে পারবেনা যে ক্লাশের মধ্যে আমিই ছিলুম সেই ...ত্র ছেলে, যে কোনোদিন ঐ মেয়েটির সঙ্গে—আলাপের চেষ্টা করা ত' দূরের কথা, তার সম্বন্ধে কখনো এতটুকু ঔৎসুক্য পর্য্যন্ত প্রকাশ করেনি। যথেষ্ট দূরে দূরেই থেকেছি বরাবর।

তবু যে কেমন করে আমি ওর ব্যথার ব্যথী হয়ে পড়েছিলুম সে রহস্য আজও আমার কাছে অজ্ঞাত। মেয়েটির স্নিগ্ধ শ্যামল রূপের একটা জৌলুস ছিল। তার চেয়েও বেশী ছিল তার লাবণ্যে এক আশ্চর্য্য লালিত্য, যার আকর্ষণ আমার দৃষ্টিতে এনে দিয়েছিল বিশিষ্ট সম্ভ্রম! লীনা হয়ত সেটা লক্ষ্য

করেছিল, কেননা ইদানিং দেখতুম দৈবাৎ তার সঙ্গে কখনো চখে চখে হলেই তার চাহনিতে ফুটে উঠতো শান্ত কৃতজ্ঞতার প্রসন্ন প্রকাশ।

এইটুকু প্রসাদেই ধন্য মনে হ'ত নিজেকে। সেই স্বল্পে সন্তুষ্ট তরুণ মন আজ কোথায় হারিয়েছি কে জানে।

কতদিন দূর থেকে দেখেছি সহপাঠিদের অসৌজন্যতায় তার বুদ্ধিপ্রদীপ্ত ললাটফলক কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে উত্যক্ত বিরক্তির রেখায়। চশমা ভেদ করে তার চোখ থেকে ঠিকরে বেরিয়েছে তীব্র বিদ্যুৎ ঝল্‌কানি। সে তীব্র দৃষ্টির সামনে দুষ্কৃতকারিদের কুঁকড়ে যেতেও দেখেছি।—তারিফ করেছি মনে মনে।

এমনি করে দিনের পরে দিন মাসের পর মাস অন্তর্হিত হয়। বছর ঘুরতে যায়। হঠাৎ একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে তার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল।

কলেজের ক্লাশ শেষ হয়ে গেছে সেদিন একটু অসময়ে। বোটানির প্রফেসর না আসাতে শেষ পিরিয়ডটার আগেই ফ্রী হয়ে গেলুম আমরা। কদিন চেষ্টা করেও কলেজের মাইনেটা জমা দিয়ে উঠতে পারিনি। আজ সময় ও সুযোগ পাওয়াতে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে সোজা অফিসঘরে গিয়ে ঢুকেছিলুম।

যখন কাজ শেষ করে বেরিয়ে আসছি, দেখি আমাদের সেই ক্লাসমেট মেয়েটি গেটের সামনের করিডরে পায়চারি করছে। ধীর মন্থর ক্লান্ত পদপাত। বুঝলুম অনেক্ষণ এই ভাবে অপেক্ষা করছে সে। আমার জন্য নিশ্চয়ই নয়। যদিও কলেজের সবছেলে চলে গেছে তখন। আমি তাকে সেই অবস্থায় দেখে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলুম, কিন্তু সে ক্ষণকালমাত্র, এক সেকেণ্ডও নয়। তারপরই নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হ'য়ে অকারণ অত্যন্ত ক্ষিপ্রপদে ফটকের দিকে পা চালিয়ে দিলুম।

অকস্মাৎ পিছন থেকে সেতারের ঝঙ্কারের মতো মিহিগলায় কে ডাকলে—শুনছেন? আপনি কি সোজা বাড়ী যাবেন?

দাঁড়িয়ে গেলুম। মেয়েটির গলা যেন। কাকে ডাকছে? আমাকে কি? ফিরে তাকিয়ে দেখি মেয়েটি হন্‌হন্‌ করে আমারই দিকে এগিয়ে আসছে। চখে চখে হ'তেই হেসে বললে—অত ছুটচেন কেন? বাড়ী যাবার বুঝি খুব তাড়া আছে?

দীর্ঘদিনের পরিচিত বটে দু'জনেই। কিন্তু, সেই আমাদের প্রথম আলাপ পরিচয়! অপ্রত্যাশিত—সম্পূর্ণ ই অপ্রত্যাশিত। কাজেই একটু থতমত খেয়ে ঢোঁক গিলে বললুম—হ্যাঁ-না, তাড়া তেমন কিছু নেই, তবে, আজ আর টিফিন খাবার সময় পাইনি কিনা—তাই—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মেয়েটি বললে—খুব খিদে পেয়েছেতো? চলুন আপনাকে খাইয়ে দিচ্ছি। আমায় একটু বাড়ী পৌঁছে দেবেন চলুন। আজ দেখছি বাবা, কাকা, খোকা, কেউই আমায় নিয়ে যাবার জন্য এসে পৌঁছতে পারেনি।

বললুম—তাঁরা কেমন করে জানবেন আজ এত আগে বন্ধ হবে কলেজ? দোষ দেওয়া যায় না তাঁদের। চলুন আমি নিয়ে যাচ্ছি—

মেয়েটি হেসে বললে—নিয়ে যেতে হবে না। সঙ্গে থাকলেই যথেষ্ট। পথঘাট আমি চিনি। নিজেই যেতে পারতুম, কিন্তু ভয় আপনাদেরই। আপনার সহপাঠী বন্ধুরা পথে একলা পেয়ে পাছে অপমান করে বসেন।

অপরাধীর মতোই অপ্রতিভ হ'য়ে জানালুম—ক্ষমা করবেন, ওরা ক্লাশে আপনার সঙ্গে যত ছেলেমানুষিই করুকনা কেন, পথের মাঝে আপনাকে অসম্মান করবার সাহস কারুরই হবে না।

—বিশ্বাস, আর নিশ্চয়তা থাকলে আমি এতক্ষণ একলাই বাড়ী পৌছে যেতুম। আপনার চৌকিদারীর সাহায্য নেবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ত না।

—আমার উপরই বা আপনি অকারণ এতখানি বিশ্বাস স্থাপন করলেন কোন্ ভরসায়?…আমার কেমন একটু দুষ্টুমী, দৃষ্টিতে কৌতুক।

—মেয়েদের সম্বন্ধে আপনাকে একটু মোহমুক্ত মনে হয়েছে বলে! বেশ সহজ নির্ব্বিকার কণ্ঠেই বললে সে। তার মুখ থেকে আমার সম্বন্ধে তার মনোভাব এমন সুস্পষ্ট শুনে মন খুশী হয়ে উঠলো। মেয়েটিকে নিয়ে কলেজগেট পার হয়ে রাস্তায় নেমে পড়লুম। অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে বললুম— দেখুন, একটা কথা বলবো, কিছু মনে করবেন না। স্কুলে বা কলেজের ক্লাসরুমের মধ্যে মেয়েদের দেখতে ওরা অভ্যস্ত নয়, তাই ওদের ব্যবহারটা একটু বেহিসাবী হয়ে ওঠে কখনো কখনো, এটা স্বীকার করছি, কিন্তু—

মেয়েটি বাধা দিয়ে বললে—কিন্তু ওইটেই ওদের প্রকৃতিগত বা স্বাভাবিক আচরণ নয়—এই তো বলতে চাইছেন আপনি? আমি সেটা জানি। ওদের চোখ আমাদের দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লেই ওদের ব্যবহারও আসবে ক্রমে সহজ হয়ে। ছেলেদের মধ্যে যারা ভদ্র এবং ভালো, যদিও আমাকে পত্রাঘাত করবার লোভটুকু তারাও সামলাতে পারেনি, কিন্তু, একথা ঠিক, তাদের মধ্যে ইতরতা দেখিনি আজও।

—জানতে চাইলুম—এখনও চিঠি পান নাকি?

মৃদু হেসে বললে—পাই বই কি মাঝে মাঝে। কারো কারো সুরে একটু মধুর রসেরও সন্ধান পাই, কিন্তু তাই নিয়ে কারো কাছে নালিশ জানাতে যাই না আমি।

উত্তেজিত হয়ে বললুম—ওই জন্যেই ত ওরা প্রশ্রয় পায়!

মেয়েটি মিনতির সুরে বললে—রাগ করছেন কেন? অবজ্ঞার মধ্যে প্রশ্রয়ের কোনো আশ্রয় নেই। ভুলে যাবেন না, অভিযোগ আনা মানেই ওদের আচরণটা গ্রাহ্য করা—নয় কি?

কোনও উত্তর দিতে পারলুম না। চুপ করে রইলুম।

মেয়েটি বলতে লাগলো—আমি ওদের এসব নিরীহ অপরাধগুলোকে ভয় করিনি, ভয় করি যারা পশুর ধাপে নেমে এসে কদর্য্যতায় কুৎসিত হয়ে ওঠে, তাদের। চলুন আমরা এসে পড়েছি। এই ডাইনে গলিটায় ঢুকে শেষের বাঁহাতি বাড়ীখানা আমাদের।

ওঃ! তবে ত আপনি কলেজের খুব কাছেই থাকেন। এইটুকু রাস্তাও একলা যাতায়াত করতে পারেন না?

আপনাকে কষ্ট দিলুম বলে আমি দুঃখিত। পথ অল্প বটে, কিন্তু এই নির্জন গলিটা মেয়েদের অপমানিত হবার পক্ষে যথেষ্ট দীর্ঘ বলে মনে করি। আপনারা ভাগ্যবান, পুরুষ হয়ে জন্মেছেন। মেয়ে হ'য়ে জন্মালে বুঝতে পারতেন আমাদের দুঃখ ও দুর্বলতা কতদিকে।

তর্কের নেশা ঘাড়ে চাপলো। বললুম,—জগতের মনীষীরা কিন্তু একবাক্যে বলে গেছেন—নারী বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

—তাঁদের বাক্য ও মন এক ছিল কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমি তাঁদের প্রতি কোনও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতে চাইনি, তবু বলবো, আপনি যদি সন্ধান নিয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন তাঁরা সকলেই ছিলেন অল্পবিস্তর স্ত্রৈণ!

আমি একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলুম—সেকি? আপনার এরকম মনে হবার কারণ কি?

মেয়েটি অকুণ্ঠিত ভাবেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—আপনি না বায়োলজির স্টুডেন্ট? আপনার কম্বিনেশন আর আমার কম্বিনেশন ত' এক। তবে কেন আমাদের সম্বন্ধে আপনার ধারণাটা এমন ধোঁয়াটে হয়ে রয়েছে বুঝতে পারছিনি। আপনি একটু কাব্যের অমরাবতী থেকে নেমে এসে বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে যদি ভেবে দেখেন তাহলে দেখবেন সৃষ্টিকর্ত্তাই স্বয়ং আমাদের উপর অবিচার করেছেন। আমরা তাঁর কল্পনার যে অংশটুকু সম্পূর্ণ করবার ভার নিয়ে এসেছি এ পৃথিবীতে সেটা কেবলই পুরুষের বংশ বিস্তারের প্রয়োজনে লাগবার কাজ। পুরুষদের তিনি মস্ত বড় সম্মান দিয়েছেন। তাঁরা এসেছে এখানে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতিনিধি হয়ে। সেখানে আমাদের স্টেটাস্ হচ্ছে শুধু তাদের উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র!

আমি স্তম্ভিত বিস্ময়ে মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে গেলুম।

মেয়েটি আমার মুখের পানে তাকিয়ে হেসে ফেলে বললে—না, এখান থেকে ফিরতে দেবনা। আপনি যে ক্ষুধার্ত্ত, চলুন। ঐ ত আমাদের বাড়ী দেখা যাচ্ছে। বসতে না চান বসবেন না, কিন্তু না-খেয়ে যাওয়া হবে না।

চলুন যাচ্ছি—কিন্তু—

এর মধ্যে আর কিন্তু নেই। বিশ্বের কবিরা যুগ যুগ ধরে আমাদের জন্য যে স্তুতিগান সঞ্চিত করে রেখে গেছলেন, বিজ্ঞান নিষ্ঠুরহস্তে তাঁদের সমস্ত ফাঁকি ধরিয়ে দিয়েছে। আমরা মেয়েরা শুধু সেই অদৃশ্য ফটোগ্রাফারের ক্যামেরার প্লেট। ছায়াছবি বক্ষে ধারণ করি বটে, কিন্তু যে শক্তি সেই চিত্রকে প্রতিফলিত করে, সেই আলো যে আপনারাই নিয়ে আসেন একথা আমরা ভুলবো কেমন করে?

বুঝতে পারছি তার যুক্তিকে খণ্ডন করা আমার সাধ্য নয়, তবু অনেকটা জিদের বশেই বললুম—আপনার যুক্তিগুলোকে মেনে নিতে পারলে পুরুষ হ'য়ে জন্মাবার সৌভাগ্যে নিশ্চয় গৌরব অনুভব করতে পারতুম, কিন্তু, মুস্কিল হচ্ছে, যাঁরা এদেশে জগজ্জননীরূপে পূজিতা, সেই মায়ের জাতকে আমি কিছুতেই পুরুষের চেয়ে ছোট বলে ভাবতে পারছিনি—

তার কারণ, আপনি এখনও নাবালকত্বের খোলস ছেড়ে বেরুতে পারেন নি। ওই যে জননী, জায়া, ভগিনী, কন্যা, স্বগৃহা, গৃহলক্ষ্মী, দেবী প্রভৃতি আপনাদের মুখের ভাল ভাল বিশেষণ, ওই গুলোইত আপনাদের কেমিক্যাল সলিউশন, সমাজের ডার্করুমে আমাদের মতো এই নেগেটিভ প্লেটগুলিকে বিশেষণের হাইপোয় ডুবিয়ে ডেভালাপ করে আপনারা যা দাঁড় করান অবিকল আমরা তাই হয়ে উঠি। কাঁচের প্লেট—কাঁচের মতোই ক্ষণভঙ্গুর আমরা আপনাদের হাতে। মনের মতো না হ'য়ে উঠতে পারলেই আছাড় মেরে ভেঙে ফেলেন।

—পুরুষকে বড়ো বলছেন, অথচ, পুরুষের উপর আপনার আক্রোশও তো বড়ো কম নয় দেখছি।

—ওটা ঈর্ষা, ইংরিজিতে যাকে বলে জেলাসি। বড়র ঈর্ষাইত ছোটরা বরাবর করে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে মানুষ হই আমরা! জীবনের যত অপ্রয়োজনীয় খুটিনাটির বোঝা কুড়িয়ে ভারী করে তুলি আমরা আমাদের পাথেয়র থলিটি। ছেলেবেলায় পড়া পদ্যপাঠের সেই পুরোনো কবিতাটা মনে পড়ে যাচ্ছে 'সহকার ও লতিকা'! বাস্তবিক, আপনাদের সঙ্গে তুলনায় আমরা তার বেশী কিছু নয়।··· আসুন ভিতরে আসুন। অনেকদিনের নিঃশব্দ পরিচয়ের পর আজ যখন সশব্দে আলাপ শুরু করা গেছে, তখন একটু বসেই যান, কি বলেন? ক্ষতি আছে কি কিছু? আপনাকে মিষ্টিমুখ করিয়ে দেবার সুযোগে আমাদের এই প্রথম আলাপের দিনটাকে স্মৃতি-কটু হওয়া থেকে রক্ষা করি।

মন্ত্রচালিতের মতোই বিনা প্রতিবাদে আমি তার পিছু পিছু তাদের বাড়ীর মধ্যে ঢুকলুম।

ক্লাশের কতো ছেলের বাড়ী কতোদিন গেছি, কোনও রকম সঙ্কোচ বোধ হয়নি কখনো। কিন্তু, ক্লাশের মেয়ের বাড়ী আসা আমার জীবনে এই প্রথম। কেমন যেন একটা লজ্জাবোধ হচ্ছিল, তবু, না এসেও পারলুম না।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ক্লাশে যায়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করে বসে থাকে, কারুর সঙ্গে কখনো ওকে একটা কথা বলতে দেখেনি কেউ। ক্লাশের ছেলেরা তাই আড়ালে ওর নাম রেখেছিল 'বোবা বিবি!'

আমাকে নিয়ে গিয়ে ওর পরিচ্ছন্ন ছোট পড়বার ঘরখানিতে বসিয়ে রেখে ও যখন 'বসুন, এখনি আসছি', বলে ত্রস্তা হরিণীর মতো চঞ্চল পদে চলে গেল, আমি অবাক বিস্ময়ে বসে বসে ভাবছিলুম এ অনর্গল-বচনের প্রচণ্ড আগ্নেয়গিরিকে আমরা ক্লাশসুদ্ধ ছেলে 'বোবা' ভেবেছিলুম! আমরা কি বোকা! 'স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্' সত্যিই দেখছি দুর্জ্ঞেয়!

দুই

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর অস্ত আলোয় অমলিনার সঙ্গে আচম্বিতে যে আলাপ হয়েছিল, ফোর্থ-ইয়ার ক্লাশের ফেয়ারওয়েল মিটিংয়ের দিন পর্য্যন্ত তার হৃদ্যতা অক্ষুণ্ণ ছিল।

মস্ত বড় নাম তার—অমলিনা। আমি যখন অস্ত্রোপচারের দ্বারা তাকে ছেটে ছোট্ট 'লীনা' করে নিতে চাইলুম, আপত্তি করলে না সে। শুধু একটু হেসে বলেছিল—নাম আপনি যাই দিন—নির্বিবাদে গ্রহণ করবো আমি। কিন্তু, বদনাম দিলে সইতে পারবো না। দোহাই আপনার। সেই থেকে অমলিনা হয়েছিল আমার কাছে 'লীনা'—আমার জীবনের প্রথম ও শেষ নারী-বন্ধু সে।

তার অভিপ্রায় অনুসারেই কলেজে আমি লীনার সঙ্গে একটিদিনও কথা বলতুম না। সেও ক্লাশের মধ্যে পূর্ব্বের মতই মৌনী মেয়ে। কমনরুমে ঢুকত না। বসে থাকতো লাইব্রেরীতে গিয়ে।

স্থানটা কমনরুমের চেয়ে নিরাপদ হলেও উৎপাত সেখানেও যেত তাকে তাড়া করে। একদিনের ঘটনা স্মরণ আছে। লীনা একপাশে বসে 'উইমেনস্ রাইট্' বইখানা মন দিয়ে পড়ছে। মোটা আলোয়ান জামা কাপড় পরা মাথায় টিকি স্বদেশী পাণ্ডা বিজয় চাটুজ্যে অনেকক্ষণ তা' লক্ষ্য করে সহসা মতো জিজ্ঞাসা করে ফেললে—আপনি কি 'সাব্‌রেজিস্ট'?

লীনা কোনও উত্তর দিলে না। যেন শুনতে পায়নি এমনিভাবে সে হেঁট হয়ে বইয়ের পাতা উল্টে যেতে লাগলো।

বিজয় চটে উঠলো। রূঢ়ভাবে প্রশ্ন করলে—শুনতে পাচ্ছেন না-কি জিজ্ঞাসা করছি? হাঁ, না, একটা জবাবও কি দিতে পারেন না?

বইয়ের পাতা থেকে নিমেষের জন্য একবার চোখদুটি তুলে পূর্ণদৃষ্টিতে বিজয়ের মুখের দিকে সে ক্ষণকাল চেয়ে রইল। তারপর তার আপাদ মস্তকে মুহূর্ত্তের জন্য বিরক্তিভরা চাহনি বুলিয়ে নিয়ে আবার সে পুস্তক-পাঠে মনোনিবেশ করলে।

সে চাহনিতে কি দেখেছিল সে জানিনি। কিন্তু, দুর্দ্দান্ত বিজয় পরক্ষণেই দেখি মাথা হেঁট করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল লাইব্রেরী ঘর থেকে। মুখখানা তার অন্ধকার হয়ে উঠেছে।

কলেজের ফেরৎ লীনাদের বাড়ী গিয়ে যখন জানতে চাইলুম বিজয়ের সঙ্গে তার কি হয়েছিল আজ,—

লীনা আশ্চর্য্য হয়ে বললে—কই না, কিছুই তো হয়নি! আমি শুধু সেই টিকিধারী ভদ্রলোকটিকে বিনা বাক্যব্যয়ে জানিয়ে দিয়েছিলুম—কারুর অনধিকার চর্চ্চাকে আমি আমোল দিইনা।

আমি আজকাল কোনো কোনোদিন কলেজের ফেরত লীনাদের বাড়ী যাই। তার সঙ্গে আলাপ করতে ভারী ভাল লাগতো। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণমূলক ও তীক্ষ্ণ যুক্তিপূর্ণ তার আলোচনা শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে যেতুম। এমন কোনো বিষয় ছিল না যাতে তার গভীর জ্ঞান ও অনুশীলনের পরিচয় না পেতুম। তার চিন্তাশীল মন আমার মনের অকপট শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছিল।

কি জানি কেন লীনার বাবা আর কাকা আমাকে সুনজরেই দেখেছিলেন। লীনার ছোট ভাই খোকন ত রীতিমতো আমার ভক্ত হয়ে উঠেছিল। লীনার মা আমাকে তাঁর খোকনের সঙ্গে পৃথক বলে মনে করতেন না।

একদিন ওঁদের সকলকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছিলুম আমাদের বাড়ীতে। সেই সূত্রে উভয় পরিবারের মধ্যে বন্ধুত্ব দানা বেঁধে উঠেছিল। ধীরে ধীরে লীনাদের বাড়ী পেয়েছিলাম আমি অবাধপ্রবেশাধিকার।

আগেই বলেছি, আমার প্রকৃতি ছিল একটু ভিন্ন রকম। পাসপোর্ট পাওয়া সত্ত্বেও লীনাদের বাড়ী কিন্তু যাওয়া আসা ছিল [illegible] কম। আমার ধারণা ছিল সহপাঠীরা কেউই এখবর জানে না। কিন্তু, আশ্চর্য্য হলুম একদিন [illegible] গিয়ে। ব্ল্যাকবোর্ডের উপর খড়ি দিয়ে সেদিন বড় বড় হরফে লেখা ছিল—'মলিনা-বিকাশ' অভিনব নূতন নাট্য। যবনিকার অন্তরালে রচিত হইতেছে, লক্ষ্য রাখিবেন। আগামী পূজার [illegible] পূর্ব্বে ফোর্থ ইয়ার ক্লাশের সোশ্যাল ফাংশান উপলক্ষে অভিনীত হইবে। সাগ্রহে প্রতীক্ষা করুন।

বলে রাখি—আমারই নাম—বিকাশ। অমলিনাকে তার অনুমতি নিয়ে আমি 'লীনা' বলি বটে, কিন্তু কলেজের ছেলেরা তার নামের আদ্য অক্ষর বর্জ্জন করে শুধু 'মলিনা' বলেই উল্লেখ করতো। কী উদ্দেশ্য নিয়ে বলতো তা তারাই জানে।

[illegible] একবার ক্লাশের চারিদিকে চেয়ে দেখলুম লীনা এসেছে কি না! আসেনি এখনও!

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

কিন্তু, তৎক্ষণাৎ যেন ইলেকট্রিক শকের মতো মনে পড়ে গেল লীনার সেই কথা কটি—নাম আপনি যাই দিন আমাকে, নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করবো আমি, কিন্তু বদনাম দিলে সইতে পারবোনা!

ছুটে গেলুম বোর্ডের কাছে। সিঁড়িতে লীনার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলুম। ওর হাই হিল জুতোর শব্দ ক্লাশের সব ছেলেরই পরিচিত হয়ে পড়েছিল।

আমাকে বোর্ডের দিকে অগ্রসর হ'তে দেখে সবাই হাঁ হাঁ করে উঠল। পকেট হাতড়ে রুমালখানা খুঁজে না পেয়ে তাড়াতাড়ি কোঁচার কাপড় দিয়েই বোর্ডের উপরের খড়ির লেখাগুলো সজোরে মুছে নিশ্চিহ্ন করে দিলুম। ছেলেদের [illegible] বাধায় দৃকপাত করলুম না।

লীনা এসে ক্লাশে ঢুকলো। ছেলের দলের মধ্যে একটা অট্টহাসির ঐক্যতান উঠলো।

আমার চোখের [illegible] বোর্ডের সেই লেখাটা তখনও যেন জ্বল্ জ্বল্ করছে—'মলিনা-বিকাশ!'

অসহ্য লজ্জায় ও ধিক্কারে সমস্ত মন ভরে উঠলো। সেই মুহূর্ত্তে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে চলে গেলুম।

প্রোফেসার আসছিলেন ক্লাশ নিতে। আমাকে বেরিয়ে যেতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—কোথা চল্লে হে বিকাশ?

'আসছি সার!' বলে আমি একেবারে কয়েকটা লাফে জোড়া জোড়া সিঁড়ি ডিঙিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লুম।

সেই যে বেরিয়ে এসেছিলুম, তারপর, আর একদিনও কলেজে ঢুকিনি। লীনাদের বাড়ীর গলিটাও মাড়াই নি।

বি-এস-সি পরীক্ষার তারিখ ক্যালেণ্ডারের পাতায় প্রতিদিন এগিয়ে আসছে। বাড়ীতে পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত থাকি। এরই মধ্যে একদিন লীনা এসে হাজির।

তাকে দেখে আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলুম। ভাবলুম, কলেজ যাচ্ছিনি কেন হয়ত এখনি জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু, কী উত্তর দেব? আমি তো ওকে কিছুতেই বলতে পারবোনা যে, তোমাকে বদনামের বিশ্রী আবহাওয়া থেকে তফাতে রাখবার জন্যেই তফাৎ হয়ে আছি আমি।

বাঁচিয়ে দিলে লীনাই আমাকে। বললে—আই-এস-সি পরীক্ষায় তোমার সঙ্গে একব্র্যাকেটে দাঁড়াবার সৌভাগ্য হয়েছিল, কিন্তু, তুমি এবারের পরীক্ষার জন্য দেখছি যেরকম কঠোর তপস্যা শুরু করে দিয়েছো—তাতে তোমার নাগাল ধরবার আমার আর কোনো আশাই নেই!

ব্যাপারটাকে হালকা করে লঘু পরিহাসের দিকে মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টায় বললুম—তাই কি আমার তপস্যাভঙ্গের জন্য দেবগণ তাঁদের শ্রেষ্ঠা অপ্সরীকে পাঠিয়ে দিলেন?

—ঈষ! তোমার অহঙ্কার যে দেখছি গগনস্পর্শী হয়ে উঠেছে! বলে, দেবাদিদেব মহাদেব যিনি, তাঁর তপোভঙ্গের জন্যও কোনো মেনকা উর্বশীর প্রয়োজন হয়নি; পাহাড়ী মেয়ে উমাই ছিল যথেষ্ট। জগতে সাধনার ক্ষেত্রে পুরুষ আমাদের চেয়ে তাদের শ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করেছে, এ আমি স্বীকার করি। কিন্তু, আমাদের টানে তারা যে সহজেই নেমে আসে অনেক নীচেয়, এ-ত' দেখেছি। তোমাদের ভোলানো মৃগয়াং করবো বলে বিধাতার দেওয়া অস্ত্রগুলো শানিয়ে নিয়ে যদি নামি আমরা—তোমরা পালিয়ে গিয়ে কি আত্মরক্ষা করতে পারবে?

—সম্ভব নয়। তোমরা যে সেই আদি মানবী ঈভের ঐতিহ্য বহন করে এসেছো আদমের মতো আমাদের অধঃপাতে ঠেলে দেবার জন্য! তোমাদের সঙ্গে কি আমরা পাল্লা দিতে পারি?

—মাভৈঃ। পতনের আশঙ্কায় নিশিদিন কণ্টকিত হয়ে আর নির্জ্জনবাসের প্রয়োজন নেই। আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি। আগামী সপ্তাহে আমরা চলে যাচ্ছি কলকাতা ছেড়ে। বাবা বেহারে বদ্‌লি হয়েছেন।

সামনে আমার আয়না না থাকলেও অনুভবে বুঝতে পারছিলুম যে আমার মুখখানা বোধ করি রক্তশূন্য ও বিবর্ণ হয়ে আসছে।

লীনা চলে যাচ্ছে। কলকাতায় থাকবে না আর ওরা। কিন্তু, এ সংবাদে আমার চারিদিক শূন্য মনে হ'চ্ছে কেন? ওর সঙ্গ আমার একান্ত ভাল লাগে বটে, কিন্তু কতটুকু বা আমি তার সঙ্গ পেয়েছি? ওর মুখের কথা শুনতে খুবই ভালবাসি, কিন্তু এই দীর্ঘ চার বছরের ভিতর ক'দিন তার কাছে বসে সেই অতুলনীয় বাক্‌বিভূতি ভরে নিতে পেরেছি আমার এই মনের বিলাস-করঙ্গে?

চুপকরে রইলে যে!

লীনার কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলুম। শুষ্ক অধরে ম্লানহাসি ফোটাবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে বললুম—তুমি চলে যাবে এটা যে আমার কাছে খুব বড় দুঃসংবাদ তা' অস্বীকার করিনি, কিন্তু, দুঃখ করব না এ নিয়ে। যে মানুষ নিয়ত এত কাছে থেকেও এমন দুরধিগম্য দূরে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারে ত তাকে ধরে রাখবার মূঢ়তা আমি কোনও দিনই করিনি—এ তুমি জানো। সুতরাং তোমার আজকের এই ভৌগলিক অবস্থানের পরিবর্ত্তনকে মাইলের দূরত্ব দিয়ে মেপে নির্ব্বোধের মতো অশ্রুবর্ষণ করতেও আমি চাইনি, কিন্তু তোমার পরীক্ষার কী করবে?

—না হয় ও দিক অঞ্চলের কোনও কাছাকাছি সেণ্টারে এ্যাপিয়ার হলেও চলবে। সেজন্যে আমি ভাবিনি। আমার ভাবনা, তুমি হয়ত বিশ্বাস করতে পারবে না—আমার দুর্ভাবনা—তোমার জন্যেই বেশী।

অর্বাচীনের মতো জানতে চাইলুম—কী সে ভাবনা ?

লীনা মৃদু হাসলে। মুখখানি নীচু করে হাতের এক গাছা চুড়ি অকারণ ঘোরাতে ঘোরাতে ক্ষণকাল ভাবলে। তারপর মুখ তুলে সোজা আমার দিকে চেয়ে বললে—তুমি যে তোমার মনকে জান না তাইত তোমার জন্যে না ভেবে পারিনি। আমি চলে গেলে তখন বুঝতে পারবে। ভৌগলিক অবস্থার পরিবর্তন ও মাইলের হিসাবটা স্টাটিক্‌স্ আর ডাইনামিক্‌সের চেয়েও জটিল। আমি যতই তোমার কাছে দুরধিগম্য হইনা কেন, তবু এই যে দেখবার সুযোগ, আলাপের সুবিধা তোমার আয়ত্তাধীন ছিল এর দাম ... রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা মনে আছে, তোমার জন্মদিনে যেটা সবাই চলে যাবার পর একলা তোমাকে শুনিয়েছিলুম—

- আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে আমার মনে।
- সে আছে বলে
  আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে,
  প্রাতে ফুলফুটে রয় বনে, আমার বনে।
  সে আছে বলে চোখের তারার আলোয়
  এত রূপের খেলা রঙের মেলা অসীম সাদা কালোয়।
  সে মোর সঙ্গে থাকে বলে
  আমার অঙ্গে অঙ্গে হরষ জাগায় দখিন সমীরণে॥

লীনার চলে যাবার কথা শুনে পর্য্যন্ত ওর উপর কেমন একটা রাগ, অভিমান ও চাপা উষ্মা মনের মধ্যে জমে উঠছিল। তাই বোধ করি সে ঐ গানখানি আবেগের সঙ্গে আবৃত্তি করা সত্বেও কঠিন হয়েই বললুম—সকল বিপরীত অবস্থার জন্যই মানুষের প্রস্তুত হয়ে থাকা উচিত। যে-ঘটনা তার আয়ত্তাধীন নয় তার জন্য ... করা বৃথা মনে করি। আজ যদি আমার দু'চোখ অন্ধ হয়ে যায়, আমি আত্মহত্যা করে সে তিমির-... উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করবো না। তোমাকে প্রসন্ন মনে বিদায় দিচ্ছি।

লীনা তখনও হাসছিল। মুখ টিপে বল্লে—অত গুমোর ভাল নয়, বুঝলে ? আমি জানি ওগুলো তোমার শূন্য মনের ফাঁকা আওয়াজ। আচ্ছা, আসি তবে। যাবার আগে যদি আর দেখা করতে না পারি তাই বিদায়ের পালাটা আজই সেরে নিই—

লীনা আজ এই প্রথম গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে আমার পায়ের কাছে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে। উঠে দাঁড়িয়ে সজল চখে বললে—আশীর্বাদ করো যেন লোভে পড়ে কোনদিন আমি তোমাকে ধুলোয় না টেনে নামাই।

লীনা চলে গেল। আমি তখনও পাথরের মতো স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। হঠাৎ শঙ্খধ্বনি কাণে আসতে সচেতন হয়ে উঠলুম। চেয়ে দেখি—সন্ধ্যার সুবিপুল অন্ধকারে পৃথিবীর সব আলো ডুবে গেছে। আমার অন্তরাত্মা শূণ্যতার হাহাকারে কেঁদে লুটিয়ে পড়লো। এই মানুষের মন! কী বিচিত্র তার গতি।

তিন

লীনা আমাকে যথাসময়ে তার ঠিকানা পাঠিয়েছিল। কিন্তু, কেমন যেন একটা দুর্জ্জয় অভিমান আর উদ্ধত জিদ মনের উপর বিশ্বম্ভর পাথরের মতো অনড় হয়ে বসেছিল, যার চাপে সমস্ত চিত্তের উদগ্র আগ্রহ নিয়েও তাকে চিঠি লিখতে পারি নি।

যাবার সময় সে যে-কথাগুলো বলে গিয়েছিল যতই সেগুলো আমার বুকের ভিতর নির্ম্মম সত্য হয়ে উঠে চিত্তকে বেদনায় রক্তাক্ত করে তুলেছে, মনের জিদ্ ততই বেড়ে গেছে। নানা কিছুতেই হার মানবোনা। পুরুষের মনের জোর মেয়েদের চেয়ে কত বেশী আমাকে তা প্রমাণ করতেই হবে।

চিঠি যে আমি তাকে লিখিনি একেবারে তা নয়। একাধিক পত্র লিখেছি। যখনই তার জন্য সমস্ত মন আমার কেঁদে উঠেছে, আমি বসেছি আমার কর্ম্মক্লান্ত দিনশেষে রাত্রির নিস্তব্ধ নির্জ্জনতায় তার সঙ্গে নিভৃতে পত্রালাপ করতে। কিন্তু, সে চিঠির একখানিও আমি ডাকে দিই নি।

সকালে ঘুম থেকে উঠে রাত্রের লেখা চিঠিখানা পড়ে দুঃসহ লজ্জায় লাল হয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি বাজে কাগজের ঝুড়িতে।

কাল সারাদিন লীনার কথা ভেবেছি। ব্যথায় মনটা টনটনিয়ে উঠেছে আমার সকল কাজের মধ্যেও। রাত্রির অবসরে বসেছিলেম তাকে পত্র লিখতে। কখন যে সে চিঠি শেষ করে শুয়েছি মনে নেই। সকালে উঠে প্রাতরাশের পর ডিউটিতে যাবার আগে চিঠিখানা আর একবার পড়ে নিতে বসলুম। সংকল্প করছিলুম এ চিঠিখানা আমি কাল চোখ বুজিয়ে ডাকে ছেড়ে দেব। কিন্তু প্রভাতের আলোয় রাতের সংকল্প ভেসে গেল। চোখ বুজিয়ে ডাকে ফেলে দেবার পরিবর্ত্তে চোখ মেলেই বসেছিলুম সেখানি হাতে নিয়ে। কারণ, হঠাৎ মনে পড়ে গেল—সে চলে যাবার পর একটা যুগ যে ঢলে পড়েছে অতীতের কোলে। যে ঠিকানা সে আমার কাছে পাঠিয়েছিল, আজও কি তার সেখানে থাকা সম্ভব? তার বাবা হয়ত' আবার কোথায় বদলি হয়ে গেছেন। লীনার হয়ত এতদিনে বিবাহ হয়ে গিয়েছে। সে হয়ত স্বামী পুত্র নিয়ে সুখে কোথাও ঘর সংসার করছে। কোথায় সে বেঁধেছে তার সুখনীড়, কে দেবে আমাকে তার সন্ধান।

সেওত বড় কম জেদি নয়। সেই একখানি চিঠির পর আর দ্বিতীয় চিঠি দিলেনা এ পর্য্যন্ত! আমি তার সে চিঠি পেয়েছি কিনা এটাও তার খোঁজ করা উচিত ছিল।

হয়ত আমার কথা এতদিনে সে ভুলে গেছে! চার বছরের একজন সহপাঠির কথা কে আর আজীবন মনে রাখে? তাছাড়া, মনে রাখবার তার এমন কি জরুরী প্রয়োজনই বা আছে? ক্লাশের পঞ্চাশজন ছেলেদের

মধ্যে আমিও একজন ছিলুম বইত নয়। লীনা অবশ্য আমাদের মধ্যে ছিল একমেবাদ্বিতীয়ম্! আমাদের পক্ষে তাকে ভোলা শক্ত।

কি লিখেছি তাঁকে কাল রাত্রে, দেখি একবার ভাল করে—

কল্যানীয়াসু

প্রিয় লীনা, তোমাকে প্রিয় সম্ভাষণে আজও আমার অধিকার আছে কি না জানি না। যেদিন বন্ধু হিসাবে তোমাকে প্রিয় বলবার অধিকার আমাকে দিয়েছিলে, সেদিনের পর একটা দীর্ঘ যুগ চলে গেছে। আজ দলে দলে মেয়েরা কলেজে আসছে। একা একাই ট্রামে বাসে চলা ফেরা করছে। তোমরা অগ্রবর্ত্তিনী হয়ে সকল দুঃখ মাথায় নিয়ে পরবর্ত্তিনীদের জন্য যে পথ করে দিয়ে গেছ, সে পথ আজ নিষ্কণ্টক কিনা জানিনা, তবে নির্ভয় হয়ে উঠেছে দেখছি। তোমরা কি ভয়ে ভয়েই না কলেজে আসতে!

মহাকালের নাগরদোলায় পৃথিবী ঘুরে চলছে অবিরাম।

কোথা দিয়ে যে জীবনের সুদীর্ঘ আরও কয়েকটা বছর গড়িয়ে চলে গেল হিসাব ক'রে দেখতে বসিনি কোনও দিন। শুধু জানি তারা চলে গেছে। কোনও কিছুর জন্যই অপেক্ষা করে থাকেনি।

বি-এস্-সি পাশ করে ছ'টা বছর মেডিক্যাল কলেজে যাতায়াত আমার বৃথা হয়নি। সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশের মধ্যে নব বিদ্যা অর্জ্জনের সাধনায় তোমার অবিস্মরণীয়তাকে ভুলে থাকবার চেষ্টা করতুম।

কিন্তু দুর্বার তার আক্রমণ! তাই সগৌরবে অর্জ্জিত ডাক্তারি ছাপটা ইনস্‌ট্রুমেণ্ট কেসের মধ্যেই পুরে নিয়ে ভেবেছিলুম কোনও পাণ্ডববর্জ্জিত সুদূর পল্লীতে অজ্ঞাতবাসী হয়ে দরিদ্রদের চিকিৎসায় জীবনের বাকি দিনকটা কাটিয়ে দেবো। কিন্তু, পৃথিবীর পশ্চিম আকাশে আগুন জ্বলে উঠলো। বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধে গেল। ভারতবর্ষের নিরন্ন ডাক্তারের দল দুর্ভিক্ষ পীড়িত কাঙালের মতো মিলিটারি সার্ভিস নিয়ে ভারতের বাইরে ছুটলো। নিরুপায় কর্ত্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে সেই সময় আমার মতো একজন নগণ্য নির্গুণ নেটিভের হাতে হাসপাতালের সমস্তভার চাপিয়ে দিয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষ হয়েছে, কিন্তু আমার দায়িত্ব শেষ হয়নি।

কাজেই আমার সে সাধু সংকল্প আজও কাজে পরিণত করতে পারিনি। পল্লীমঙ্গলের কল্যাণ-স্বপ্ন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরীর এক আরোগ্য ভবনে বোধ করি চিরদিনের জন্যই সমাধি লাভ করেছে!

মনে আর কোনও উৎসাহ পাইনি। তোমার বর্ত্তমান জীবনের সকল কাহিনী জানবার জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তুমি যে সসম্মানেই বি-এস্-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলে সংবাদপত্র মারফৎ সে সুসংবাদ পেয়েছিলুম। কিন্তু তার পরের খবর কি? তুমি এখন কোথায় আছো, কেমন আছো, কি করছো কিছুই জানি নি। আশা করি ভালোই আছো এবং সুখেই আছো। মনটা বড় হাঁপিয়ে ওঠে মাঝে মাঝে।

সময়ের দ্রুত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আশে পাশের সব কিছুই বদলে চলেছে। শিক্ষা সংস্কৃতি সমাজ সংসার, এমনকি ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা প্রণালীতেও একটা অবাঞ্ছিত বিপ্লব এসে পড়েছে যেন! রাষ্ট্র আন্দোলনেরও রূপ বদলে গেছে।

এবারের এই যুদ্ধের সময় থেকেই ঘরে ঘরে যা কিছু নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু, তার প্রায় সব গুলিই শুধু দুর্মূল্য নয় দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে আজ।

শান্তি স্থাপিত হয়েছে প্রায় বর্ষকাল হ'তে চললো, কিন্তু জগতের অশান্তি তো দূর হয়নি আজও!

যাক্ সে কথা। আজ দুদিন ধরে—আজাদ হিন্দ ফৌজের মামলার বিরুদ্ধে শহরের চারিদিকে প্রতিবাদ সভার অনুষ্ঠান হ'চ্ছে। ইস্কুল কলেজের ছেলে মেয়েরা এই জাতীয় আন্দোলনে আজ সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে নেমেছে। এসব দেখে আর আমাদের অতীত ছাত্রজীবনের কথা স্মরণ করে এদের প্রতি আমার ঈর্ষা হয়।…কতদিন যে তোমায় দেখিনি! কোথায় তুমি আছো তাও জানিনি।

আমাদের হারানো দিনগুলো আজ যদি ফিরে পেতুম তোমাকে পাশে নিয়ে আমিও ঝাঁপিয়ে পড়তুম এই আন্দোলনে। আমাদের মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ত দেশ মাতৃকার নবীন মুক্তি মন্ত্র 'জয় হিন্দ!'

যাকগে। কি যে সব বাজে বকচি। যা পাইনি তার জন্য শোক করবোনা। আর যা পেয়ে হারিয়েছি তার জন্যেও অনুশোচনা করে তোমার ভবিষ্যদ্বাণীকে সফল করে তুলতে চাইনা। যা আছে সে থাক আমার মনে। দিক তার চাপা আগুন আমার ভিতরটা পুড়িয়ে ছাই করে—আমি আর্ত্তনাদ করবোনা।……

এই পর্য্যন্ত পড়ে চিঠিখানা আর পড়তে পারলুম না। ছি ছি ছি! মিথ্যা কথা। মিথ্যে কথা লিখেছি এসব। আর্ত্তনাদ করবোনা! এইত' চিঠির প্রতিছত্রে আমার আর্ত্তনাদ সকরুণ হয়ে উঠেছে—।

না—না। পুরুষের পৌরুষকে তার অন্তরের দুর্বলতায় ম্লান হ'তে দেবনা।

চিঠিখানা ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফেলে দিয়ে হাসপাতালের কাজে চলে গেলুম।

চার

আজ হাসপাতালে আমার ডিউটি ছিলনা। সহকারীদের উপর ভার দিয়ে চলে এসেছিলুম নিজের কোয়ার্টারে।

আহারাদির পর একটু বিশ্রামের আয়োজন করছি। হাতে ছিল এমাসের মেডিক্যাল জার্নালখানা। অলসভাবে পাতা উল্টে যাচ্ছিলুম। এমন সময় নজরে পড়লো 'পেনিসিলীন' সম্বন্ধে একটা জ্ঞাতব্য প্রবন্ধ। তুচ্ছ অবহেলিত ঘৃণ্য ছত্রাক থেকে বিশ্বের রোগাতুর মানবজাতির যে কী মহাকল্যাণকর নিরাময়ক আবিষ্কৃত হয়েছে ভাবতে ভাবতে মনটা অভিভূত হয়ে পড়লো। এ যে ধূলায় পাওয়া সোনা! কয়লার গুঁড়োয় হীরে!

মানুষের মধ্যেও আছে কত অগণিত তুচ্ছ অবহেলিত ঘৃণ্য লোক। কে জানে একদিন জগতের বিরাট কল্যাণ সাধনে তাদেরও প্রয়োজন হবে কিনা! কে আবিষ্কার করবে, কে নিষ্কাশিত করতে পারবে—তাদের অন্তর্নিহিত সেই মহামানবতার মাঙ্গলিক প্রতিষেধক?

হঠাৎ রাজপথে অগণিত কণ্ঠের উদ্দাম জয়ধ্বনি শোনা গেল—'আজাদ হিন্দ, জিন্দাবাদ!' নেতাজী সুভাষচন্দ্র কি জয়!' কি জানি কেন এই জয়ধ্বনি শুনে মনের ভিতরটা সহসা আনন্দে আন্দোলিত হয়ে উঠলো। সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি উঠে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম।

রাজপথ লোকে লোকারণ্য। যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেই জনতার কেন্দ্র ভেদ করে চলেছে যেন এক প্রাণময় যৌবন প্রবাহ!

আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবী নিয়ে ছাত্র ছাত্রীরা মিছিল করে বেরিয়েছে। দলে দলে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে চলেছে তারা রাজপথ বেয়ে। হাতে তাদের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা! কিন্তু, তার সঙ্গে আরও যা দেখলুম—নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারলুম না! কংগ্রেস পতাকার সঙ্গে রয়েছে—অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত মোসলেম লীগের সবুজ নিশান! হিন্দু মহাসভার ত্রিশূল লাঞ্ছিত গৈরিক কেতন। আবার কাস্তে হাতুড়ি আঁকা সাম্যবাদীদের রক্তাম্বর ধ্বজাও দেখি মিশেছে এসে ওদের সঙ্গে!

তরুণ বাংলার জয় হোক! একি অঘটন ঘটালে তারা? এ যে তাদের এক অসাধ্য সাধন! সুদীর্ঘ 'পঞ্চাশ বৎসরের প্রাণপণ চেষ্টায় কংগ্রেস যা করতে পারেনি, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ বাংলার নবীন দেশাত্মবোধ বন্দেমাতরম্ যা করতে পারেনি, বিগত পঁচিশ বছরের ভারতব্যাপী সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলন যা করতে পারেনি, জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য আজাদহিন্দ্ বাহিনীর আত্মোৎসর্গে, তাদের শৌর্য্য বীর্য্য ত্যাগ ও তপস্যার মহিমায় সেই অসম্ভব আজ সম্ভব হল! আমার মুখ দিয়ে আপনিই বেরিয়ে এল, নেতাজী সুভাষচন্দ্রকি জয়!'

"এক-ধর্মরাজ্য-পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি—"

ছত্রপতি শিবাজীর এই স্বপ্ন এত দিনে সফল হল দেখছি! ভারতের মুক্তিবার্ত্তার দীপ্তমন্ত্রে আজ জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায় এসে মিলিত হয়েছে।

সবার মুখে আজ একই বাণী শোনা যাচ্ছে—জয়হিন্দ্!

সেদিন আর দিবানিদ্রায় বিশ্রাম নেওয়া সম্ভব হল না।

সারাটা দিনই ছেলেদের শোভাযাত্রা, দলে দলে মিছিল, আর তাদের বিপুল জয়ধ্বনি কানে আসতে লাগলো।

স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখতে দেখতে তরুণ কণ্ঠের কলরবে মুখরিত পশ্চিম আকাশে সূর্য্য অস্ত গেল। সন্ধ্যের পর একটু বেরুবো ভাবচি। হাউস-সার্জ্জেন হন্ত-দন্ত হয়ে এসে বললেন এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে এখনি জনকতক এ্যাসিস্ট্যান্ট দরকার! ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে পুলিসের লাঠি চার্জ্জ আর গুলি চালানোর ফলে অসংখ্য ছেলে আহত হয়েছে। ইমিডিয়েটলি এ্যাটেণ্ড করতে পারলে অনেকগুলো ছেলেকে বাঁচানো যেতে পারে স্যার! এরা গুলির মুখে বুক পেতে দাঁড়িয়েছিল, ভয় পায়নি।

'বাঁচাতেই হবে!' বলে পাগলের মতো আমি ছুটলুম এমার্জেন্সী ওয়ার্ডে। এরা যে আমাদের ভবিষ্যতের আশা ভরসা।

হাসপাতালের সমস্ত স্টাফ্ নিয়ে লেগে গেলুম আমরা সেই সব আহত কিশোর বীরদের শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যায়। তাদের প্রতি রক্তবিন্দু আমাদের চখে সেদিন শুধু পবিত্র নয়, অমূল্য মনে হচ্ছিল!

রাত্রি তখন প্রায় নটা হবে। এমার্জেন্সী ওয়ার্ডের টেলিফোনটা ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠলো! আমি তখন সেই দিকেই ছিলুম। রিসিভারটা তুলে জবাব দিলুম—হ্যালো! হ্যাঁ। হাসপাতাল। এমার্জেন্সী ওয়ার্ড। বলুন!

মেয়েলি গলা। কণ্ঠস্বরে ব্যগ্রতা ও উৎকণ্ঠা পরিস্ফুট। জানতে চাইছেন মাখন বলে কোনও ছেলে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে এখানে এসেছে কি-না? চেহারার বর্ণনা দিলেন। বয়স উনিশ, পোষাক পরিচ্ছদের বর্ণনাও দিলেন। বললুম, ধরুন দেখছি। রিসিভার নামিয়ে রেখে এসে খোঁজ ক'রে দেখি, হ্যাঁ, এসেছে সে ছেলে। ছেলেটির তখনও জ্ঞান হয় নি। মাথায় ভীষণ চোট খেয়েছে। বললুম তাঁকে সেকথা ফিরে গিয়ে। ধন্যবাদ দিয়ে তিনি রিসিভারটা রেখে দিলেন। মিনিট কুড়ি পরে পুলিশ দুজন আহত সার্জেন্ট্‌কে পৌঁছে দিয়ে গেল হাসপাতালে। তাদের এ্যাড্‌মিট্ ক'রে নিয়ে ক্ষত পরীক্ষার ব্যবস্থা করছি, ব্যস্ত হয়ে একটি মহিলা এসে ঢুকলেন এমার্জেন্সী ওয়ার্ডে। আমার সঙ্গে মুখোমুখী হতেই ক্ষণকাল মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে বিহ্বলের মতো বললেন—

—তুমি!

—লীনা!

কিন্তু, আমার বিস্ময়কে কিছুমাত্র প্রশ্রয় না দিয়ে লীনা এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে বললে—তুমি আছ এখানে, ভালই হয়েছে। খোকনটা কোথায়? চলো দেখে আসি। এখনো জ্ঞান হয়নি বোধ হয়?

বললুম—খোকন? তোমার সেই ছোট্ট ভাইটি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাখনই ত ছিল বটে তার নাম। খোকন এত বড় হয়ে উঠেছে?

লীনা ম্লান হেসে বললে—উঠবে না? তুমি তাকে দেখেছিলে সাত বছরের ছেলে। তারপর যে এক যুগ কেটে গেছে! আচ্ছা তার আঘাত কি খুব সিরিয়াস মনে হ'ল! কেমন দেখলে?

—সিরিয়াস বলেই মনে হয়।

এই বলে আমি সার্জেন্ট দুটির ক্ষত পরীক্ষায় মন দিলুম। লীনা ব্যস্ত হয়ে বললে—আমায় চট্ করে খোকনের কাছে পৌঁছে দিয়ে এসে তুমি ওদের দেখ না।

আমি গম্ভীরভাবে বললুম: এখন তার কাছে তোমার না যাওয়াই উচিত। তুমি একটু অপেক্ষা করো। তার জ্ঞান হোক আগে। লীনা বললে—আমি অন্যায় সুযোগ দাবী করিনে—ছাত্রদের দেখবার আমার অধিকার আছে। তার হাতের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একখানা কার্ড বার করে আমার হাতে দিলে। তাতে লেখা রয়েছে—

ডাঃ মিস্ লীনা রায় পি-এইচ-ডি

প্রিন্সিপ্যাল, অমৃতসর-শিক্ষামন্দির।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়!

লীনা একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ! লীনা বিবাহ করেনি আজও! সুদূর পাঞ্জাবের অমৃতসরে নির্ব্বাসিত করেছে নিজেকে। তাই বোধ হয় আমার কোনও উদ্দেশ নেয়নি এতদিন।

কার্ডখানা নেড়ে চেড়ে উল্টেপাল্টে দেখে বললুম—তোমার নাম তো 'অমলীনা' ছিল জানি···কিন্তু···এতে···

লীনা ভ্রুকুটি ক'রে বললে এরই মধ্যে ভুলে গেলে সব? অমলিনার জীবনে জন্মান্তর ঘটিয়ে তুমিই একদিন তার নূতন নামকরণ করেছিলে—লীনা! অমলিনা তোমাদের সঙ্গে কলেজের পাঠ্যাবস্থায় মারা গেছে!

লীনার মুখে 'সেই' হাসি! সেই বারো বছর আগের রহস্যভরা আশ্চর্য্য হাসি! সমস্ত মন একটা অপূর্ব্ব আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলো! আমার দেওয়া নামটি নিয়ে আমার লীনা ফিরে এসেছে আজ আমার কাছে।

অচেতন সার্জ্জেন্ট দু'টি পড়ে রইল ষ্ট্রেচারের উপরই। লীনাকে নিয়ে চললুম মাখনের কাছে।

যেতে যেতে ফিস্ ফিস্ ক'রে সে আমায় বললে—ঐ সার্জ্জেন্টরাই তো আমাদের নিরীহ ছেলেগুলোকে গুলি করে মেরেছে। কোনও দয়া কোরনা ওদের। কুণ্ঠিত হয়ে বললুম—কিন্তু, ডাক্তার হিসেবে আমার কর্তব্য—বাধা দিয়ে লীনা বললে—পরাধীন লাঞ্ছিত নির্য্যাতিত ভারতবাসী হিসেবে তোমার কর্ত্তব্য তার চেয়ে ঢের বড়! লীনার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে! ওদের সারিয়ে তুলে যেদিন ছেড়ে দেবে, ওরা তার পরদিনই তুমি নির্দ্দোষী পথচারী হলেও তোমাকেই পশুর মতো গুলি করতে দ্বিধা করবে না। ভারতবাসীর প্রাণের মূল্য নেই যাদের কাছে, তাদের জীবনেরও কোনও মূল্য দিতে চাইনি আমি—

তবু বললুম, কিন্তু মনুষ্যত্বের দিক থেকে—

লীনা যেন ক্ষেপে উঠলো: পশুর সঙ্গে আবার মনুষ্যত্বের সম্পর্ক কিসের? হিংস্র বাঘকে আমরা গুলি করে মারিনি?—বিষাক্ত সাপকে লাঠির ঘায়ে থেঁতো করিনি?—

—তবু, একটা আপত্তি বেরিয়ে এল আমার মুখদিয়ে—কিন্তু······

এর মধ্যে আর 'কিন্তু' নেই। এই সব নির্দ্দোষী সোনার চাঁদ কচি ছেলেগুলোর রক্তের প্রতিশোধ চাই আমি—এ্যাটেণ্ড্ কোরনা ওদের--

বললুম,—কী পাগলের মতো বলছো তুমি লীনা?—সোডাওয়াটারের বোতল ফেটে কাঁচ ঢুকে রয়েছে ওদের গভীর ক্ষতস্থানে। প্রচুর রক্তস্রাবে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। টিটেনাস্ হবে, সেপ্টিক হয়ে মারা যাবে—দু'দুটো প্রাণ—সে হয় না লীনা—কিছুতেই না। তুমি ভুলে যাচ্ছ আমি ডাক্তার। এই হাসপাতালের সমস্ত দায়িত্ব আমার উপর। ওরা কে—কোন জাত—কি করেছে—সে আমার জানবার দরকার নেই। আমার কাছে ওরা দুটি আহত আর্ত্ত মানুষ—আমার পেশেণ্ট্—এ ছাড়া ওদের অন্য কোনও পরিচয় আমার কাছে বড় নয়।

মাখনকে ওরা মেরেছে—আমি স্বচক্ষে দেখেছি—লীনা অস্থির হয়ে উঠে বললে—দেশবাসীর লাঞ্ছনা কি তোমার কাছে কিছুই নয়? তুমি কি বাঙালী নও? এই সরকারী হাসপাতালের দাসত্বের দাবীটুকু তোমার কাছে বড় হয়ে উঠলো?

শান্তভাবে আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম—স্থির হও লীনা তুমি বড় উত্তেজিত হয়ে উঠেছো।

বুঝে দেখ, সংকারী দাসত্বের কোনও প্রশ্নই এখানে ওঠে না। আমি এখানে শুধু চিকিৎসক। আমি বাঙালী বা ভারতবাসী অথবা কাত্রী, সে বিচার করবো না। আমি পীড়িত মানুষের সেবায় ব্রতী চিকিৎসাবিদ্যায় অভিজ্ঞ একজন মানুষ। আমার অতি বড় শত্রুও যদি আহত হ'য়ে আসে এখানে আমার সাহায্যপ্রার্থী হ'য়ে, আমি তাকে পরমাত্মীয়ের মতোই সেবা করবো। কারণ, আমি ডাক্তার আর সে তখন আমার পেশেণ্ট্: এ ছাড়া আর অন্য কোনও সম্পর্কের বিচার করা আমাদের অনুচিত। তা হলে পৃথিবী নরক হয়ে উঠবে যে! মানুষের সভ্যতা অধঃপতনের শেষ ধাপে নেমে যাবে—মানুষের সমাজে আমরা বাস করবো কেমন করে—যদি এ ভাবে ব্যক্তিগত আক্রোশের বশে নৈতিক বুদ্ধি ও কর্ত্তব্য থেকে ভ্রষ্ট হই আমরা?

এই বলে লীনাকে শান্ত করবার জন্য সস্নেহে তার পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে আদর করতে গেলুম।

সে ক্ষণিকের জন্য আমার বুকের উপর ঢলে পড়ে আমার কাঁধে মাথাটি রাখলে।

আমরা তখন এমার্জেন্সি হলের এমন একটা কোনে এসে পড়েছি, যেখানে অল্প আলোছায়ার মধ্যে লীনার লাবণ্যভরা শ্যামল রূপ অপরূপ উজ্জল হ'য়ে উঠেছিল আমার চোখে। লীনা বোধ করি আমার সে মোহ বুঝতে পেরেছিল। নিমেষের মধ্যে কি হয়ে গেল জানি না। মুহূর্ত্তের জন্য আমরা যে পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে ছিলুম এবং আমাদের উভয়ের অধর যে চকিতে মিলিত হয়েছিল এ সুখস্মৃতি রোমাঞ্চিত হয়ে রয়েছে মনে।

পরদিন ভোরবেলাই হাউস সার্জ্জেন খবর পাঠালে পুলিশ সার্জ্জেণ্ট দুজনেই শেষরাত্রে মারা গেছে। সার্টিফিকেট পাঠালুম, সই করে দেবেন। সার্টিফিকেটে লিখেছে দেখলুম একজন টিটেনাস হয়ে মারা গেছে, আর একজনের ক্ষতজনিত রক্ত বিষাক্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে।

তীব্র অনুশোচনায় সমস্ত মন ভরে উঠলো! সার্টিফিকেট দুটো যখন সই করছি, লীনা পাশে এসে দাঁড়ালো। যানবাহনের অভাবে সে কাল রাত্রে হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরতে পারেনি। আমার কোয়ার্টারেই পাশের ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল।

বেদনার্ত্ত কণ্ঠে বললুম তাকে—কী করলে তুমি লীনা—! ছি ছি: এ আমায় কোথায় নামিয়ে নিয়ে এলে? তুমি যে বলেছিলে আমায় কখনো কোনদিন কোনো লোভেই ছোট করবেনা—

লীনা হেসে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে নিবিড় আদরে কানে কানে বললে—তুমি অনেক বড়ো—তোমাকে ছোট করি সাধ্য কি আমার। কিন্তু, ভুলে গেছো বুঝি সে কথা—তুমিইত আমায় বলেছিলে একদিন, আমরা সেই আদি মানবী ঈভের ঐতিহ্য বহন করে চলেচি আজও!

সংস্কৃত নাটকের গল্প

(১) মহাকবি ভাসের মধ্যম

[সংস্কৃত ভাষা অপ্রচলিত হোক্, কিন্তু সংস্কৃত-সাহিত্যের সঙ্গে যদি আমাদের মানসিক যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে বাংলা-সাহিত্য এবং বাঙালী সাহিত্যিকের পক্ষে তা পরম অনুশোচনার বিষয় হবে। তাই বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে, গল্পভারতী এই বিভাগে, আর দুটী বিষয় একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেছে, একটী হলো, সম-সাময়িক অন্য ভারতীয় সাহিত্য থেকে অনুবাদের সাহায্যে সঞ্চয়ন ও সংকলন এবং দ্বিতীয় হলো, অনুবাদ এবং অনুরূপ পদ্ধতির সাহায্যে সংস্কৃত-সাহিত্যের সঙ্গে সাধারণ পাঠকের পরিচয় সাধন। এই দুটী বিষয়ের প্রতি সম্পাদক সহযাত্রী নবীন লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন এবং তাঁদের কাছ থেকে এই বিষয়ে সাহায্য পেলে তিনি কৃতকৃতার্থ হবেন। সংস্কৃত সাহিত্যের বিরাট দেহে আমাদের ভারতীয় কৃষ্টি এবং শিল্পকলার আত্মা বিরাজ করছে। প্রকৃত সাহিত্যের বয়স নেই, তা পুরাতন হয় না। তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ সংস্কৃত কাব্য ও নাটক। আজকের প্রগতিবাদের সঙ্গেও তার বিরোধিতা নেই···বরঞ্চ দেখি, তিন হাজার বছর আগেকার শিল্পী কি অনন্য-সাধারণ মায়ায় আজকের দিনের মনের কথাটী, তার ভাব-ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত সেদিন তাঁদের লেখায় অমর করে রেখে গিয়েছেন। এখানে মহাকবি ভাসের যে নাটকটী গল্পাকারে অনুলিখিত হলো, তার মধ্যে আজকের যুগের একাঙ্কিকার ধরণ-ধারণ, চরিত্র-ব্যাখ্যার আধুনিক কায়দা এবং নাটকীয়তার অভিনবত্ব অতি চমৎকার ভাবে ফুটে আছে। সেইজন্যে আজকের প্রগতির যুগেও এই অতি পুরাতন সংস্কৃত নাটকটীকে মনে হয় "মডার্ণ"...

সম্পাদক]

কল্পতরু
বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট
আয়ুর্ব্বেদীয়
ঔষধাবলীকেই
বোঝায়
প্রতিষ্ঠাতা
মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ
গণনাথ সেন সরস্বতী
এম, এ, এল. এম. এস.
পরিচালক
প্রানাচার্য্য কবিরাজ
শ্রীসুশীল কুমার সেন
এম, এস, সি. কবিরত্ন
আয়ুর্ব্বেদ ভবন
২২৩, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ
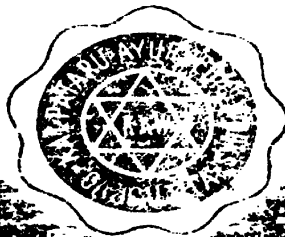
নাটকের পূর্ব্বাভাস
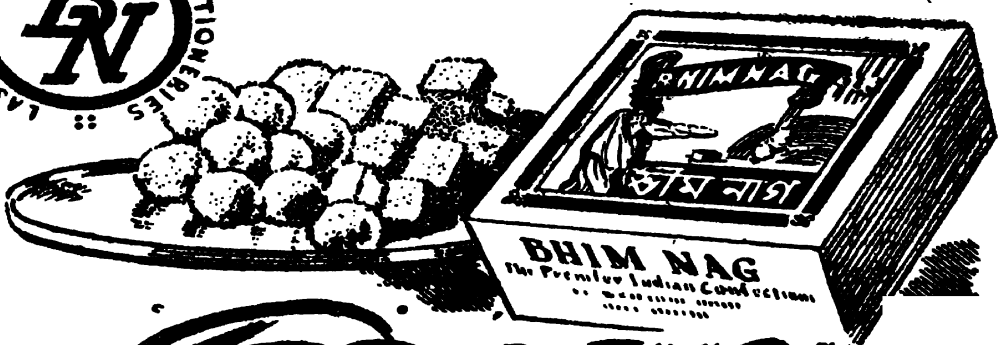
শকুনি কর্ত্তৃক পাশা খেলায় পরাজিত এবং সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, মাতা কুন্তী এবং সহধর্মিণী দ্রৌপদী সহ পঞ্চপাণ্ডব বনবাসে অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

জতুগৃহ হইতে বিদুরের কৃপায় কোন রকমে আত্মরক্ষা করিয়া তাঁহারা সুড়ঙ্গ পথ দিয়া এক নিবিড় অরণ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, তৃষ্ণায় মুমূর্ষু।

অরণ্যে কোথাও জল নাই। শুধু মেঘ-চুম্বী বিশাল মহীরুহ আর সূর্য্যালোকহীন অন্ধকার।

ক্রমশঃ ক্লান্তিতে তাঁহারা সকলেই এক বৃক্ষতলে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন, একমাত্র ভীমসেন, চলন্ত মহীরুহের মতন তাঁহাদের প্রহরীস্বরূপ জাগিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

নিদ্রার হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য ভীমসেন পরিক্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন এবং ক্ষণে ক্ষণে বায়ু-আন্দোলিত বৃক্ষ-ছায়াকে দুঃশাসন ভ্রমে গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছিলেন। সে-গর্জ্জনে অরণ্যবাসী শ্বাপদেরা কোনো নূতন প্রাণী তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে আসিয়াছে মনে করিয়া স্ব স্ব গহ্বরে উৎকর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।

এমন সময় সহসা ভীমসেন দেখেন সমস্ত বনভূমি যেন চকিত-আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিল, বাতাস মদির সুবাসে আচ্ছন্ন···সম্মুখেই দেখেন, স্থিরা সৌদামিনীর মত, অরণ্যের সমস্ত লতার পেলবতা শ্রী-অঙ্গে বহন করিয়া এক অপরূপ ললনা ইঙ্গিতে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে।

সে-আহ্বানে ভীমসেনের রক্ত-ধারায় তরঙ্গ জাগিয়া উঠিল।

জিজ্ঞাসিলেন, কে তুমি বরাননে? আমাকেই বা কেন আহ্বান করছো?

মৃদু হাসিয়া নারী বলে, আমি রাক্ষসী। হিড়িম্বা আমার নাম। এই অরণ্য আমার ভাই হিড়িম্বের রাজ্য। বৃক্ষতলে এতগুলি মানুষকে দেখে তার নর-মাংস-ক্ষুধা প্রবল হয়ে উঠেছে, তাই সে আমাকে পাঠিয়েছে।

বিস্মিত ভীমসেন বলেন, কিন্তু তুমি যদি রাক্ষসী, তবে এত রূপ তোমার কোথা থেকে এলো?

হিড়িম্বা লজ্জিত হইয়া বলে, আপনাকে দেখে। রাক্ষসীর অন্তরে বিধাতা লুকিয়ে রেখেছিলেন যে প্রেম, আজ হে মহাবাহু, আপনাকে দেখে তা বিকশিত হয়ে উঠেছে। তাই প্রেমের বাসনা চরিতার্থ করবার জন্যে আমার এই মায়া-দেহ। এ দেহ আপনার, আমি আপনার দাসী। গ্রহণ করে, আমাকে ধন্য করুন!

তখন ভীমসেন নিজেদের পরিচয় দিয়া বলেন, জ্যেষ্ঠের অনুমতি ব্যতিরেকে আমি তোমাকে কোন কথা দিতে পারি না, হে সুমধ্যমে!

পরিচয় পাইয়া হিড়িম্বা নতজানু হইয়া প্রণাম করে, বলে, হে মধ্যম পাণ্ডব, আমি স্বয়ং জননী এবং জ্যেষ্ঠের আশীর্ব্বাদ নিয়ে আসবো।

এমন সময় অরণ্য কাঁপাইয়া হিড়িম্ব সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভগ্নীর বিলম্ব দেখিয়া তাহার মনে সন্দেহ হয়, বোধ হয় ক্ষুধাতুরা রাক্ষসী নিজেই সমস্ত খাইয়া ফেলিতেছে। কিন্তু রাক্ষসীর অন্তরে যে আর এক ক্ষুধা জাগিয়াছে, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। তাই মায়াদেহে ভগ্নীকে দেখিয়া হিড়িম্বের ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল, হায় হতভাগিনী, যে আমাদের খাদ্য, তাহার খাদ্য হইবার জন্য তুমি মায়াদেহ ধারণ করিয়াছ... ? তোমাকেও ঐ নর-কীটের সঙ্গে একসঙ্গে উদরসাৎ করিব।

প্রেমজর্জরিতা রাক্ষসী ভ্রাতার ক্রোধ হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত, ভীমসেনের শরণাপন্ন হইল। পাছে নিদ্রিতদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, সেইজন্য ভীমসেন কৌশলে বাদানুবাদের মধ্য দিয়া হিড়িম্বকে দূরে সরাইয়া আনিলেন। সেখানে দুইজনের তুমুল মল্ল-যুদ্ধ হইল। সে-যুদ্ধে ভীমসেন রাক্ষসকে শূন্যে কয়েকবার ঘুরাইয়া মাটিতে আছাড় দিয়া নিহত করিলেন।

ততক্ষণে পাণ্ডবভ্রাতাগণ এবং জননী কুন্তী জাগিয়া উঠিয়াছেন। হিড়িম্বা নতজানু হইয়া কুন্তী দেবীর চরণে নিবেদন করে, হে জননী, নির্লজ্জা রাক্ষসীকে ক্ষমা করুন...অনুগ্রহ করিয়া আপনার মধ্যম পুত্রকে অনুমতি প্রদান করুন আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে। আমি শপথ করিতেছি, পুত্রবতী হইলেই আমি আপনার পুত্রকে আপনার নিকটই আনিয়া দিব।

হিড়িম্বার কাতর প্রার্থনায় কুন্তীদেবী অনুমতি প্রদান করিলেন। দেখিতে দেখিতে মায়াবলে হিড়িম্বা ভীমকে লইয়া আকাশ-পথে অদৃশ্য হইল।

অল্পকালের মধ্যেই হিড়িম্বা গর্ভবতী হইল এবং রাক্ষস-ধর্ম্ম অনুযায়ী সেইদিনেই সে সন্তান প্রসব করিল। ঘট অর্থাৎ হস্তী-মস্তকের ন্যায় উৎকচ অর্থাৎ কেশশূন্য বলিয়া জননী তাহার নাম রাখিল, ঘটোৎকচ।

মাতৃ-গর্ভ হইতেই ঘটোৎকচ পূর্ণ যৌবনের দৃপ্ত মহিমা লইয়া পৃথিবীর আলোকে আসিল।

হিড়িম্বা বলিল, পুত্র, পিতাকে প্রণাম কর, কারণ, তোমার পিতার সহিত আমাদের এই শেষ দেখা।

পুত্রকে লইয়া মায়ারূপিণী হিড়িম্বা প্রণাম করিল, বলিল, যদি কোনদিন প্রয়োজন বোধ করেন, পুত্রকে স্মরণ করবেন...আর স্মরণে রাখবেন, এই পৃথিবীর কোনখানে আপনার কল্যাণ-চিন্তায় এক নারী জেগে রইলো..

ভীমসেন ফিরিয়া আসিলেন বনবাসে ভ্রাতাদের নিকট...বিপুল বিশ্বে হারাইয়া গেল প্রেম-দগ্ধা এক রাক্ষসী-নারী।

ইহার পর নাটকটীর আরম্ভ।

নাটকের কাহিনী—

ব্রাহ্মণ কেশবদাস আত্মীয়ের বাড়ী উপনয়ন উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া সপরিবারে যাত্রা করিয়াছেন। পথের মধ্যে পড়িল গভীর অরণ্য।

কিছুদূর অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিবার পর ব্রাহ্মণের মনে আশঙ্কা হইল; বোধ হয়, কোন মায়াচর দৈত্য তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছে।

ব্রাহ্মণ পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, সংহার-রূপী মহেশ্বরের মতন কে একজন তরুণ দৈত্য তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছে।

প্রথমপুত্রও ভীত হইয়া বলিল, পিত, কে এ মৃত্যুরূপী?

মধ্যম পুত্রও থামিয়া গিয়াছিল, বলিল, বাহু গজ শুণ্ডের মত, গায়ের বর্ণ আষাঢ়ের মেঘের মত কৃষ্ণাভ, চোখে ঘৃতপুষ্ট হোমাগ্নির মত তেজ··কে এ রাক্ষস?

ততক্ষণে অনুসরণকারী নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। ভীত ও সন্ত্রস্ত কনিষ্ঠ পুত্র চীৎকার করিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণী কেশবদাসের পার্শ্বে ছুটিয়া আসিয়া কাতর-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, কে তুমি, নিরীহ ব্রাহ্মণদিগকে ভয় দেখাচ্ছ?

অনুসরণকারী মেঘগর্জ্জনে বলিয়া উঠিল, আর বৃথা অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করো না ব্রাহ্মণ!

কেশবদাস পুত্র ও পত্নীকে সান্ত্বনা দিয়া অনুসরণকারীর আদেশের উত্তরে বলিলেন, আমরা নিরীহ ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ, কেন হে মহাভুজ, আপনি আমাদের পথরোধ করছেন?

অনুসরণকারীর কণ্ঠস্বর কোমল হইয়া আসিল। বলিল, জানি ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ সকলের পূজ্য···তবু আমার কাছে আমার মাতৃ আজ্ঞা সকল শাস্ত্র, সকল অনুশাসনের উর্দ্ধে!

অনুসরণকারীর বচন-ভঙ্গীতে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া কেশবদাস বলিলেন, জানতে পারি কি তোমার মাতৃ-আজ্ঞা কি?

অনুসরণকারী উত্তর দিল, আমার জননী বহুকাল ধরে এক ব্রত উপলক্ষে উপবাস করেছিলেন, আজ তাঁর ব্রত-ভঙ্গের দিন। তাই তিনি আমাকে আদেশ করেছেন, একটী মানুষ অন্বেষণ করে নিয়ে আসতে!

সেই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণী কাঁদিয়া উঠিলেন, জলকিন্ন মুনি ঠিকই বলেছিলেন, এ অঞ্চল এখনও রাক্ষস-শূন্য হয় নি···তাঁর কথা না শুনে আজ এই বিপদের মধ্যে পড়লাম! এসো, আমরা সাহায্যের জন্যে চীৎকার করি!

কাতরা জননীর কথা শুনিয়া প্রথমপুত্র বলিল, এ অরণ্যে ঘন মহীরুহ আর অন্ধকারের মধ্যে যেটুকু জায়গা, সেখানে নির্বাসিতেরা ছাড়া আর কেউ থাকতে পারে না!

নির্বাসিতের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ যেন হঠাৎ সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন। বলিলেন, শুনেছি, মহামতি পাণ্ডবেরা নাকি এই অরণ্যেই আছেন!

তাহার উত্তরে প্রথমপুত্র বলিল, আপনার অনুমান ঠিক। কিন্তু পাণ্ডবেরা বোধ হয় আশ্রমে নেই।

কারণ আসবার সময় এক তপস্বীর মুখে শুনেছি, মহর্ষি ধৌম্যের আশ্রমে যে শতকুম্ভ যজ্ঞ হচ্ছে, তাঁরা সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছেন।

তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন।

এতক্ষণ নীরব থাকিয়া অনুসরণকারী বলিয়া উঠিল, অপেক্ষা করবার সময় আমার নেই। জননীর উপবাস-ভঙ্গের লগ্ন প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে আসছে। আপনার তিনপুত্রের মধ্যে একজনকে আমার হাতে সমর্পণ করে, আপনারা চলে যেতে পারেন!

দুঃখের মধ্যেও ব্রাহ্মণ অসহায় ক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, পুত্রকে স্বেচ্ছায় রাক্ষসের হাতে কোন্ পিতা বা মাতা তুলে দিতে পারে?

অনুসরণকারী বলে, আমি তর্ক করতে আসি নি। হয় আপনাদের মধ্যে একজনকে আমার সঙ্গে আসতে হবে নইলে বল-প্রয়োগে আমি আপনাদের সকলকেই বিনাশ করতে বাধ্য হব।

অনুসরণকারীর কথায় ব্রাহ্মণ পরিবারের সকলে পাষাণ-বৎ মূক হইয়া গেল। অবশেষে ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন, তাই যদি হয়, তা হলে, এই বৃদ্ধই তোমার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত। আমার মৃত্যুতে অন্তত আমার সন্তান-সন্ততিরা বেঁচে থাকবে।

ব্রাহ্মণের সংকল্পে ব্রাহ্মণী তাঁহার চরণে পড়িয়া মিনতি জানাইলেন, পত্নী জীবিত থাকতে, আর্য্য নারীর পতি কেন দেহদান করবে? তাতে যে আমার নারী-ধর্ম্মে আঘাত লাগবে। আমিই রাক্ষসের অনুসরণ করছি।

এই বলিয়া ব্রাহ্মণী গমনোদ্যত হইতেই প্রথমপুত্র জননীর হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিল, বলিল, পুত্রের জীবন, পিতা-মাতার সেবারি জন্যেই। সুতরাং আপনাদের রক্ষা করতে যদি আমি প্রাণ দিই, তা হলে জগতে কোন ক্ষতি হবে না, অথচ সন্তান-ধর্ম্মের মহিমাই বৃদ্ধি পাবে।

জ্যেষ্ঠপুত্রের এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া মধ্যম পুত্র বলিয়া উঠিল, আপনি যে যুক্তি দেখিয়েছেন, আমারও সেই যুক্তি। সুতরাং আপনি তো প্রতিবাদ করতে পারেন না। তবে আমার আত্মদানের স্বপক্ষে আমি বলতে চাই যে, জ্যেষ্ঠ পুত্র হলো বংশের বীজ···আমি থাকতে সেই বীজকে আমি নষ্ট হতে দিতে পারি না।

কনিষ্ঠ পুত্র এতক্ষণে নীরব ছিল। সকলের কথা শুনিয়া সে বলিল, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃসম। সেইজন্যে আপনাকে রক্ষা করাই আমার কর্ত্তব্য।

তাহাকে প্রতিবাদ করিয়া জ্যেষ্ঠ বলিল, তুমি ভুল করছো ভাই, বংশের বা বংশ-নায়কের যদি বিপদ উপস্থিত হয়, তাহলে জ্যেষ্ঠকেই তা রক্ষা করতে হয়। এই শাস্ত্র বিধি।

জ্যেষ্ঠ পুত্রের সেই সংকল্প শুনিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। বলিলেন, তুমিই আমার জ্যেষ্ঠ··· আমার জীবন—বৃক্ষের প্রথম ফল···তুমিই আমার অভিলাষ···আমি তোমাকে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারবো না।

ব্রাহ্মণের কথা শেষ হতে না হতে ব্রাহ্মণী কাঁদিয়া বলিলেন, হায়, কনিষ্ঠ যে আমার জীবন-বৃক্ষের শেষ ফল···আমার একান্ত অভিলাষ···তাকে আমি কি করে ত্যাগ করে থাকবো ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মধ্যম পুত্র বলিল, তাহলে আমিই কারুর অভিলাষ নই !

তাহা শুনিয়া অনুসরণকারী বলিয়া উঠিল, সে ক্ষোভ রাখবার দরকার নেই···তুমি আমার অভিলাষ··· অতএব কালবিলম্ব না করে চলে এসো !

মধ্যম অগ্রসর হইল।

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী কাঁদিয়া ভাঙিয়া পড়িলেন।

অনুসরণকারীকে আহ্বান করিয়া মধ্যম পুত্র বলিল, আমি যখন কথা দিয়েছি, তখন তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই যাবো···আর তোমার কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচবার শক্তি আমার নেই ! তবে, আমার একটী অন্তিম মিনতি আছে···

—বল...বল···শিগ্‌গির বল !

—আমি এই মুহূর্তে পিপাসার্ত্ত। অদূরেই জলাশয় রয়েছে। তাই সেখানে গিয়ে আত্মার এই শেষ তৃষ্ণা মিটিয়ে দিতে চাই !

—বেশ···যাও··কিন্তু বিলম্ব করো না !

নতমস্তকে মধ্যম ব্রাহ্মণকুমার জলাশয়ের দিকে অগ্রসর হইল।

তখন ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী এবং পুত্রদ্বয় শোকের উচ্ছ্বাসে কখনও অনুসরণকারীকে শাপ দেন, কখনও ক্ষমা প্রার্থনা করেন, কখনও একান্ত কাতরভাবে ভগবানকে ডাকেন।

এধারে তাহার ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া অনুসরণকারী চঞ্চল হইয়া উঠিল। বলিল, লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যায়, কৈ সে তো ফিরলো না ?

জ্যেষ্ঠ পুত্র বলে, ব্রাহ্মণ-কুমার শঠতা জানে না, সে নিশ্চয়ই ফিরবে !

—কিন্তু আর যে বিলম্ব সইছে না ? তোমার এই ভ্রাতার নাম কি ?

—মধ্যম !

—বেশ, তাহলে আমি একটু এগিয়ে তার নাম ধরে ডাকছি !

এই বলিয়া অনুসরণকারী বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল, ওহে মধ্যম··· এসো···শিগ্‌গির এসো ওহে মধ্যম !

সাড়া না পাইয়া অনুসরণকারী তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, ওহে মধ্যম···কোথায় তুমি ? এসো, এসো, শিগ্‌গির !

সহসা অনুসরণকারী দেখে, সূর্য্যের ন্যায় প্রভাময়, মহীরুহের মত দীর্ঘ বিশালকায় এক পুরুষ দ্রুত তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।

অনুসরণকারী চীৎকার করিয়া উঠিল, ওহে মধ্যম, এসো, লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে যায় !

সহসা সেই বিশালকায় পুরুষ অনুসরণকারীর সম্মুখে আসিয়া বলিল, কি নিমিত্ত এমন তারস্বরে আমাকে ডাকছো ?

অনুসরণকারী বিস্মিত হইয়া ভাবে, ইনিতো সেই ব্রাহ্মণ-কুমার নহেন। এইরূপ অপরূপ আকৃতি যে কোন মানুষের হয় ইঁহাকে দেখিবার পূর্ব্বে পর্যন্ত তাহা আমার কল্পনায় ছিল না। এ বপু যেন জগতের শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় বিষয়। সিংহের ন্যায় ভঙ্গী, কনকতালের মত লম্ববান ভুজদ্বয়, কটিদেশ মুষ্টি-পরিমিত কৃশ, পার্শ্বদ্বয় গরুড়পক্ষ-বিলগ্ন···নয়নযুগল যেন উৎপাটিত দুই পদ্মপলাশ···সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য, ইঁহার অস্তিত্ব যেন আমার সর্ব-ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিতেছে !

তাহার বিস্মিত মৌনতাকে ছিন্ন করিয়া নবাগত বলিয়া উঠিল, বল, যুবক, কেন তুমি আমাকে ডাকছিলে ?

—আপনাকে···আপনাকে তো ডাকি নি ! আপনি কি মধ্যম ?

নবাগত হাসিয়া বল্লেন, হাঁ, জগতে আমি ঐ নামেই পরিচিত। জগতে যাঁরা অবধ্য আমি তাদের মধ্যম, পৃথিবীতে একমাত্র মধ্যম এবং আমার ভ্রাতাদেরও মধ্যে আমি মধ্যম।

সেই কণ্ঠস্বর এবং পরিচয় শুনিয়া ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণী যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। বলিয়া উঠিলেন, নিশ্চয়ই ভগবান আমাদের কাতর প্রার্থনা শুনিয়া, নর-শ্রেষ্ঠ মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

ইত্যবসরে মধ্যম ব্রাহ্মণকুমার জলস্নাত হইয়া উপস্থিত হইল এবং অনুসরণকারীকে আহ্বান করিয়া বলিল, ওহে, চল, আমি এখন প্রস্তুত।

ব্রাহ্মণ নবাগতের হাত ধরিয়া বলিয়া উঠিল, দৈবাগত হে মহাপুরুষ, এই রাক্ষসের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিয়া ভীমসেন অনুসরণকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন অকারণে এই ব্রাহ্মণ বালককে বধ করতে চাইছো ?

—অকারণে নয়···আমার মাতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্যে···

—আমি মিনতি করিতেছি···ছেড়ে দাও এঁদের !

—আমার পিতা স্বয়ং এসে বল্লেও নয় !

যুবকের কথায় এবং তেজে মুগ্ধ হইয়া ভীমসেন বলিলেন, কিন্তু কে তোমার জননী ? পিতাই বা কে ?

—আমার জননীর নাম হিড়িম্বা···জগতের শ্রেষ্ঠবীর পাণ্ডুতনয় ভীমসেনের পত্নী···

মনে মনে ভীমসেন প্রস্ফুটিত শতদলের মত আনন্দে এবং পুত্র-গর্ব্বে বিকশিত হইয়া উঠেন। হাসিয়া ব্রাহ্মণকে বলেন, আপনারা আশ্বস্ত হ'ন, আমিই এই যুবকের সঙ্গে যাচ্ছি !

ব্রাহ্মণ কৃতজ্ঞতায় গদগদ হইয়া বলেন, আমাদের জন্যে আপনি কেন জীবন উৎসর্গ করবেন ?

ভীমসেন হাসিয়া বলেন, আমি ক্ষত্রিয়···ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ব্রাহ্মণকে রক্ষা করা।

ক্ষত্রিয়ের তেজ দেখিয়া অনুসরণকারী ঘটোৎকচ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। বলে, বেশ, তাহলে আপনি আমাকে বাধা দিতে চাইছেন?

—যদি তাই মনে কর, তবে তাই!

—বেশ, তাহলে আপনিই আসুন আমার সঙ্গে! ভীমসেন হাসিয়া বলেন, কিন্তু আমি তো পূজামাত্রসার ব্রাহ্মণ নই যে আদেশ করলেই পিছু-পিছু যাবো…আমাকে যদি তোমার মায়ের কাছে যেতেই হয়, তবে আমাকে জয় করে নিয়ে যেতে হবে!

ঘটোৎকচ হাসিয়া বলিয়া উঠে, আপনি জানেন আমি কে?

ভীমসেন বলেন, জানি বালক, পুত্র তুমি!

ঘটোৎকচ ভাবে, দম্ভ। প্রত্যুত্তরে বলে, আমি যার পুত্র…আপনার ন্যায় ক্ষত্রিয় তাঁর নখেরও যোগ্য নয়।

—উত্তেজিত হয়ো না বৎস…প্রজা মাত্রকেই ক্ষত্রিয় পুত্রজ্ঞান করে…

—এইভাবে আপনি ভাবছেন আমাকে এড়িয়ে যাবেন? অসম্ভব।…অস্ত্র ধরুন!

—অস্ত্র তো ধরেই আছি!

—রহস্য করছেন এখনো?

—রহস্য নয়…এই দুই বাহুই আমার অস্ত্র।

—এ গর্ব্ব করতে পারেন, একমাত্র আমার পিতা ভীমসেন!

—ভীমসেন! ভীমসেন! তুমি কি মনে কর বালক, ভীমসেন ব্রহ্মা, না বিষ্ণু, না যম? ভীরু, কাপুরুষ দুর্য্যোধনের ভয়ে যে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়……

ঘটোৎকচ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে…গুরু-নিন্দা শুনতে আমি অভ্যস্ত নই!

বলিয়াই ঘটোৎকচ ভীমসেনকে আক্রমণ করে। কিন্তু ঘটোৎকচের প্রত্যেক আক্রমণ ভীমসেন অনায়াসেই প্রতিরোধ করেন। এই ভাবে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ দীর্ঘ হইয়া উঠিতে থাকে…সন্ধ্যা আসিয়া পড়ে। ঘটোৎকচ চিন্তান্বিত হইয়া পড়ে…লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যায়…অথচ এই রহস্যময় লোকটাকে এখনও জয় করিয়া উঠিতে পারিল না…তখন ঘটোৎকচ অস্ত্র ত্যাগ করিয়া বলিল, আপনার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা পালন করতে প্রস্তুত আছেন?

—নিশ্চয়ই!

—তা হলে আসুন আমার সঙ্গে……

ভীমসেন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ঘটোৎকচের অনুসরণ করিয়া চলিলেন।

কুটীরে উপস্থিত হইয়া ঘটোৎকচ জননীকে নিবেদন করিল, জননী আপনার আদেশ পালন করেছি… একজন মানুষকে নিয়ে এসেছি।

হিড়িম্বা জিজ্ঞাসা করেন, কি রকম মানুষ?

—নামে মানুষ বটে কিন্তু বীর্য্যে নয়।

—তবে কি ব্রাহ্মণ ?

—নয়।

—তবে কি দেবতা ?

—তাও নয়।

—তবে চল দেখি, কোন্ অপরূপ মানুষকে নিয়ে এসেছো।

কুটীরদ্বারে আসিয়া অদূরে ভীমসেনকে দেখিয়া হিড়িম্বার অন্তর উদ্বেলিত হইয়া উঠে।

ঘটোৎকচ দূর হইতে ভীমসেনকে দেখাইয়া বলে, ঐ সেই মানুষ···

হিড়িম্বা সস্নেহে বলে, দূর উন্মাদ···কে বল্লে ইনি মানুষ ?

বিস্মিত ঘটোৎকচ জিজ্ঞাসা করে, তবে ?

হিড়িম্বা বলে, দেবতা !

ঘটোৎকচ জিজ্ঞাসা করে, কার দেবতা ?

অগ্রসর হইয়া ভীমসেনের পদতলে লুটাইয়া প্রণাম করিয়া হিড়িম্বা বলেন, তোমার ও আমার দেবতা ! আজ আমার সত্যই ব্রত উদযাপন হলো ! পিতাকে প্রণাম কর পুত্র।

ভীমসেন তখন পিতৃগর্ব্বে-উৎফুল্ল পুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। *

---

* পাঠকবর্গ লক্ষ্য করিবেন ফেরদৌসী বা মাথ্যু আর্ণল্ডের শোহরাব ও রুস্তমের বহুপূর্ব্বে এই কাহিনী লিখিত হয়। ভারতীয় সাহিত্যিকের পরম সৌভাগ্য, সে জন্মসূত্রে রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ-কাব্যের উত্তরাধিকার পাইয়া থাকে। এই বহুমূল্য খনিতে যে বিরাট স্বর্ণ-সম্পদ পড়িয়া আছে, তাহা হইতে যে কোন যুগের সাহিত্যিক মুদ্রা আমরা গড়িয়া তুলিতে পারি। তাহাকে অবজ্ঞা করার মানে, নিজেদের আত্মিক ও মানসিক নিঃস্বতাকে ডাকিয়া আনা।

একবার এক সাধু ফকিরের কিছু টাকার দরকার হয়। তিনি বাদশাহ্ আকবরের কাছে চাইতে আসেন।

বাদশাহ্ আকবর তখন নমাজ পড়া শেষ করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিলেন, হে ঈশ্বর, আমাকে ধন দাও, দৌলত দাও ইত্যাদি···

সাধু ফিরে গেল। আকবর তা লক্ষ্য করে সাধুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ফিরে যাচ্ছেন কেন ?

সাধু হেসে বল্লো, এসে দেখলাম আপনিও ধন-দৌলতের ভিখারী : তাই ভাবলাম, চাইতেই যদি হয় আর এক ভিখারীর কাছে কেন ? ভগবানের কাছেই চাইবো !

চুরী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে কলিকাতা সহরে এখানে ওখানে গুটিকয়েক লোন্-অফিস ছিল, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর তাহাদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। লোন্ অফিসের মহাজনী কারবার অতি সরল ও সহজ। অভাবগ্রস্ত মানুষ নিজের অস্থাবর সম্পত্তি—ঘটি বাটি ঘড়ি কলম আনিয়া বন্ধক রাখিয়া টাকা লয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টাকা শোধ হয় না, সময়ের মেয়াদ ফুরাইলে বন্ধকী মাল লোন্ অফিসের সম্পত্তি হইয়া যায়। তখন তাহারা ঐ মাল নিজেদের শো-কেসে সাজাইয়া রাখে এবং সন্ধানী খরিদ্দারের নিকট লাভে বিক্রয় করে।

নগেন যুদ্ধের মরশুমে একটি লোন্-অফিস খুলিয়া বেশ গুছাইয়া লইয়াছিল। দেশে অভাবগ্রস্ত মানুষের কোনও দিনই অভাব নাই, তাহার উপর শাদা-কালো বহুজাতীয় সৈনিকের শুভাগমনে নগেনের ব্যবসা জাপানী খেল্‌না—বেলুনের মত অতি সহজেই ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল। বীর যোদ্ধগণের দৈহিক ক্ষুধা-তৃষ্ণা যখন দুর্নিবার হইয়া ওঠে তখন তাঁহারা বন্ধক রাখিতে পারেন না এমন জিনিস নাই।

নগেনের বয়স বেশী নয়, ত্রিশের নীচেই। সদ্‌বংশে জন্মিবার ফলে সে কয়েকটি নৈতিক সংস্কার লইয়া জন্মিয়াছিল যদিও অর্থোপার্জনের সদসৎ উপায় সম্বন্ধে বাঙালী ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও নৈতিক সংস্কারই নাই। জুতা সেলাই হইতে চণ্ডী-পাঠ পর্যন্ত সব কাজই আমরা নিন্দাভাজন না হইয়া করিতে পারি যদি তাহাতে অর্থলাভ হয়। এই জন্যই বোধ হয় দারোগা হওয়ার আশীর্ব্বাদকে আমরা নিছক পরিহাস বলিয়া গ্রহণ করিনা এবং কালো-বাজারের কালীয় নাগদের প্রতি আমাদের বিদ্বেষও তেমন মারাত্মক হইয়া উঠিতে পারে নাই।

কিন্তু এসব অবান্তর কথা থাক। নগেনের সাফল্য মণ্ডিত বাহ্য জীবন হইতে তাহার অন্তর্জীবনে যে-বস্তু প্রবেশ করিয়াছিল তাহার কথাই বলিব। কিন্তু তৎপূর্বে আর একটি কথা বলিয়া লওয়া প্রয়োজন। ইহাও অবশ্য নগেনের অন্তর্লোকের কথা এবং অতিশয় গুহ্য।

বয়স ত্রিশের কাছাকাছি হইলেও নগেন স্বাস্থ্যবান যুবক, তাহার রক্তের তাপ এখনও কমিতে আরম্ভ করে নাই। কিন্তু তাহার স্ত্রী ক্ষণিকা—সংক্ষেপে ক্ষণা—মাত্র তেইশ বছর বয়সেই তাহার ক্ষণ-যৌবনকে বিদায় দিয়াছিল। শুধু দেহের দিক দিয়া নয়, মনের দিক দিয়াও। ক্ষণা দেখিতে মন্দ নয়, নবযৌবনের আবির্ভাবে তাহার দেহে একটি শান্ত শ্রী দেখা দিয়াছিল; কিন্তু উপর্যুপরি দুইটি মৃত সন্তান প্রসব করিবার পর, তাহার দেহলাবণ্য তো গিয়াছিলই, নারীত্বও যেন হঠাৎ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। যাহা বহিয়া গিয়াছিল তাহা গৃহকর্ম্মনিপুণ সচল সবাক একটি যন্ত্র মাত্র।

নগেন চরিত্রবান যুবক কিন্তু সহজ স্বাস্থ্যবান পুরুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা তাহার ছিল। তাই তাহার দাম্পত্য জীবনের এই অপ্রত্যাশিত অনাবৃষ্টি তাহার অন্তরের কাঁচা ফসলকে শুকাইয়া তুলিতেছিল। খাল কাটিয়া জলসিঞ্চনের কথা তাহার মনেই আসে নাই—তাহার মন সে ছাঁচে গঠিত নয়। কিন্তু বঞ্চিত ব্যর্থ-যৌবনের ক্ষোভ তাহার নিভৃত অন্তরে সঞ্চিত হইয়া কোনও অনর্থের সৃষ্টি করিতেছিল কিনা তাহা কেবল বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরাই বলিতে পারেন।

হয়তো আমার এই কাহিনীর সহিত নগেনের নিরুদ্ধ ক্ষোভের কোনও সম্বন্ধ নাই। কিম্বা—কে বলিতে পারে!

১৯৪২ সালের শেষের দিকে কলিকাতা সহরে নানা বিজাতীয় সৈনিকের আবির্ভাবে তিল ফেলিবার ঠাঁই ছিলনা; এমন বিভিন্ন বর্ণের ও বিভিন্ন আকৃতির মানুষ একই স্থানে সমবেত হইতে পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। এই সময়ে নগেনের লোন্ অফিসে একটি লোক আসিল। মিলিটারী পোষাক পরা লম্বা জোয়ান; মাথার চুল কাফ্রির মত কোঁকড়ানো, গায়ের রং নারিকেল ছোব্ড়ার ন্যায়, চোখের মনি নীল। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলিল,—'আমি একটা জিনিষ বন্ধক রেখে টাকা চাই।'

সে পকেট হইতে একটি ছুরি বাহির করিল। ছুরি না বলিয়া ছোরা বলিলেই ভাল হয়, যদিও পেন্সিল-কাটা ছুরির মত উহা ভাঁজ করিয়া বন্ধ করা যায়। হাড়ের বাঁট দীর্ঘকালের ব্যবহারে ও তামাকের রসে বাদামী হইয়া গিয়াছে কিন্তু ফলাটা সতেজ উগ্রতায় ঝকঝক করিতেছে। ফলাটা প্রায় ছয় ইঞ্চি লম্বা, কিন্তু এমন অদ্ভুত তাহার গঠন যে দেখিলেই চমকিয়া উঠিতে হয়। নগেন সম্মোহিতের মত দেখিতে লাগিল। ছুরিটা যেন ছুরি নয়, বৃশ্চিকের মত ক্রূর জীবন্ত একটা প্রাণী; তাহার ফলাটা বন্য পশুর দন্ত নিষ্কাশনের মত বর্বরোচিত হিংস্রতায় হাসিতেছে।

ছুরি হইতে চোখ তুলিয়া নগেন দেখিল, ছুরির মালিকও পোকার-খাওয়া ঘষা দাঁত বাহির করিয়া ব্যঙ্গভরে হাসিতেছে। নগেনের ব্যবসাবুদ্ধি ফিরিয়া আসিল, সে ছুরিটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল,—'তিন টাকা দিতে পারি।'

ছুরির মালিক বলিল,—'আমার পাঁচ টাকা চাই।'

নগেন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া রসিদ লিখিয়া তাহাকে পাঁচ টাকা দিল। সাত দিনের মেয়াদ, ইহার মধ্যে টাকা শোধ না করিতে পারিলে ছুরি বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। লোকটা রসিদ ও টাকা প্যান্ট্লুনের পকেটে পুরিয়া বলিল,—'ছুরি সাবধানে রেখো, আমার বড় আদরের জিনিষ। শিগ্গিরই আমি খালাস করে নিয়ে যাব।'

লোকটা কেমন একরকম ভাবে নগেনের দিকে তাকাইয়া একটু নড্ করিয়া চলিয়া গেল। নগেন কিছুক্ষণ দ্বারের পানে চাহিয়া রহিল। অদ্ভুত চেহারা লোকটার! কাফ্রির মত চুল, শাদা আদমির মত

চোখ, এসিয়াবাসীর মত রঙ। যেন তিনটি মহাদেশের তিনজন মানুষকে একত্র করিয়া একটি মানুষ তৈয়ার হইয়াছে। কিম্বা ঐ একটা মানুষ হইতেই তিন মহাদেশের তিনটি জাতি বাহির হইয়া আসিয়াছে। লোকটার বয়স অনুমান করা যায় না; ত্রিশ বছরও হইতে পারে, আবার তিন হাজার বছর বলিলেও অসম্ভব মনে হয় না।

ছুরিটা টেবিলের উপর ছিল, সেটা তুলিয়া লইয়া নগেন আবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। কী ধার! নগেন ছুরির ফলাটা নিজের রোমশ বাহুর উপর দিয়া একবার ক্ষুরের মত টানিয়া লইয়া গেল, লোমগুলি ঝরিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ব হর্ষ তাহার দেহকে কণ্টকিত করিয়া তুলিল। সহানুভূতির প্রকৃতিটা অজানা নয়, কিন্তু আরও তীব্র আরও কুটিল—পরকীয়া প্রীতির মত গোপন অপরাধের বিষ মেশানো।

সেদিন সমস্ত কাজকর্ম্মের মধ্যে নগেনের মন ঐ ছুরির দিকেই পড়িয়া রহিল। তাহার মনে হইল, লোকটা যদি ছুরি উদ্ধার করিতে না আসে তো বেশ হয়। ছুরিটা তাহার হইয়া যাইবে; সে আর কাহাকেও বিক্রয় করিবেনা।

ব্ল্যাক-আউটের কল্যাণে সন্ধ্যার সময়েই দোকান বন্ধ করিতে হয়। নগেন ছুরিটি সাবধানে সিন্দুকে বন্ধ করিয়া দোকানে তালা লাগাইয়া বাড়ী ফিরিল। কিছুদিন যাবৎ তাহার মনটা কেমন যেন নিঃসম্বল হইয়া ছিল, আজ তাহার মনে হইল সে হঠাৎ গুপ্তধন পাইয়াছে।

বাড়ী ফিরিয়া সে ক্ষণাকে ছুরির কথা বলিল না, দু'একবার বলি-বলি করিয়া থামিয়া গেল। ছুরিটা ব্যবহারিক জগতে এমন কিছু মহার্ঘ বস্তু নয়; তাছাড়া, নগেন নিজের মনের মধ্যে যে নূতন গুপ্তধন পাইয়াছে, ক্ষণাকে তাহার ভাগ দিতে রাজি নয়। একদিন ছিল যখন তাহারা মনের তুচ্ছতম অনুভূতিও আদানপ্রদান করিয়া সুখী হইত, কিন্তু এখন আর সেদিন নাই।

রাত্রির আহারাদি শেষ করিয়া নগেন শয়ন করিতে গেল। স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি ঘরে শয়ন করে, বছরখানেক হইতে এই ব্যবস্থাই চলিতেছে। বিছানায় শুইয়া কিছুক্ষণ বই পড়া নগেনের অভ্যাস, কিন্তু আজ আর বই পড়িতে ইচ্ছা হইল না। আলো নিভাইয়া সে শুইয়া পড়িল।

ঘুমাইয়া নগেন স্বপ্ন দেখিল, ছুরির মালিক হাতে ছুরি লইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছে, তাহার নীল চোখে উৎকট উল্লাস······কতকগুলা নগ্ন নধর মনুষ্যদেহ তাহার চারিপাশে তাল পাকাইতেছে; লোকটা হাসিতে হাসিতে তাহাদের দেহে ছুরি মারিতেছে। কিন্তু ইহা হত্যার লীলা নয়, ভোগের ক্রীড়া। কী সহজে ছুরি ঐ নগ্ন জীবন্ত মাংসের মধ্যে আমূল প্রবেশ করিতেছে আর রক্তাক্ত মুখে বাহির হইয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে নগেনের শরীর উদ্দীপনায় আনচান্ করিতে লাগিল। নরম মাংসের উপর ছুরির ঐ পুনঃপুন আঘাত তাহার ধমনীর রক্তে যেন আগুন ধরাইয়া দিল।

তীব্র উত্তেজনায় তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। এমন তীব্র উত্তেজনা সে অনেকদিন অনুভব করে

নাই; তাহার দেহের ত্বক উত্তপ্ত হইয়া জ্বালা করিতেছে। সে কিছুক্ষণ বিছানায় বসিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে নামিল, অন্ধকারে হাৎড়াইয়া পাশের ঘরে ক্ষণার শয্যার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণা ঘুমাইতেছে, ঘুমের মধ্যে একটা বিশ্রী শব্দ করিয়া তাহার নিশ্বাস পড়িতেছে। শয্যায় প্রবেশ করিতে গিয়া নগেন সরিয়া আসিল; শয্যার চারিদিকের বাতাস ক্ষণার নিশ্বাসের দূষিত বাষ্পে ভারী হইয়া উঠিয়াছে। একটা দৈহিক বিকর্ষণ নগেনের শরীরের মধ্যে বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। সে ফিরিয়া গিয়া এক গ্লাস জল পান করিয়া নিজের শয্যায় শুইয়া পড়িল।

পরদিন দোকানে গিয়া প্রথমেই নগেন সিন্দুক খুলিয়া ছুরির খবর লইল, ছুরি সিন্দুকের অন্ধকারের ভিতর হইতে চিকমিক করিয়া যেন তাহাকে অভিবাদন করিল। আশ্চর্য্য, ছুরিটা যেন কথা কয়। ফলা খুলিয়া বাঁটটা শক্ত করিয়া মুঠিতে ধরিতেই সে যেন সোল্লাসে বলিয়া উঠিল,—এই তো! এমনি ক'রে আমায় ধরতে হয়। এবার কোথাও বিঁধিয়ে দাও—! নরম জীবন্ত মাংস নেই? আমার কাজই তো নরম মাংসের মধ্যে বিঁধে যাওয়া—!

ঘরের কোণে একটা উঁচু টুলের উপর একটি মখমলের মোটা তাকিয়া রাখা ছিল; কেহ বাঁধা দিয়া গিয়াছে। নগেনের দৃষ্টি পড়িল সেটার উপর। ঘরে তখন অন্য মানুষ নাই; নগেন ছুরি পিছনে লুকাইয়া তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, তারপর সহসা ছুরি তুলিয়া সজোরে তাকিয়ার মধ্যে বসাইয়া দিল। একবার—দু'বার—তিনবার—দ্রুত পরম্পরায় আঘাত করিতে করিতে নগেন যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল, তারপর আবার অকস্মাৎ তাহার রক্ত ঠাণ্ডা হইয়া গেল, অবসাদে মুষ্টি শিথিল হইয়া পড়িল। না, এ যেন দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইবার চেষ্টা; মখমলের তাকিয়া নরম বটে কিন্তু রক্তমাংসের আস্বাদ তাহাতে নাই।

ছুরিটি সস্নেহে সিন্দুকে রাখিয়া দিয়া নগেন সমস্ত দিন লোন্ অফিসের কাজকর্ম করিল, কিন্তু তাহার মন একদণ্ডের তরেও নিরুদ্বেগ হইলনা; প্রত্যেকটি নূতন খদ্দের তাহার দ্বার দিয়া প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুকের ভিতরটা চম্‌কাইয়া ওঠে—ঐ বুঝি সেই লোকটা ছুরি ফিরাইয়া লইতে আসিল! লোকটা অবশ্য আসিল না; কিন্তু মাত্র পাঁচ টাকায় ছুরি বাঁধা রাখার জন্য তাহার অনুতাপ হইতে লাগিল, দশ টাকা কিম্বা পনেরো টাকা দিলেই ভাল হইত, তাহা হইলে লোকটা সহজে ছুরি উদ্ধার করিতে পারিত না।

সন্ধ্যা হইতে না হইতে নগেন তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করিয়া ফেলিল, কি জানি লোকটা যদি আসিয়াই পড়ে। উপরন্তু ছুরিটা দোকানে রাখিয়া বাড়ী ফিরিতেও তাহার মন সরিল না। দোকানে রাত্রে কেহ থাকেনা; যদি চোর ঢোকে? দিন কাল ভাল নয়; নগেন ছুরিটা পকেটে পুরিয়া লইল।

শীতের সন্ধ্যায় আকাশে মেঘ জমিয়া একেবারে অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। কলিকাতা সহরের আলো পর্দানশীন হইয়া ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছে, বাহিরে এক ফোঁটা আসিবার অধিকার নাই। সুতরাং পথ দিয়া যে দু'একজন যাতায়াত করিতেছে তাহাদের অস্তিত্ব কেবল পদশব্দে

অনুমান করা যায়। নগেনের অবশ্য বাড়ী বেশীদূর নয়, দশ মিনিটের রাস্তা; দশ মিনিটের রাস্তা তার উপর পথও একান্ত পরিচিত। তবু নগেন সাবধানে হাঁটিতে লাগিল।

তিন চার মিনিট হাঁটিবার পর তাহার মনে হইল, কে যেন তাহার পিছু লইয়াছে, পিছনে খস্‌খস্‌ শব্দ হইতেছে। সে সতর্ক হইয়া ঘাড় ফিরাইল, কিন্তু অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইল না। পকেটে ছুরিটা শক্ত করিয়া ধরিয়া সে আরও দ্রুত পা চালাইল। পথ ঘাট নিরাপদ নয়, এই ব্ল্যাক-আউটের রাত্রে ঘাড়ের উপর গুণ্ডা লাফাইয়া পড়িলে মা বলিতেও নাই বাপ বলিতেও নাই।

পিছনে পায়ের শব্দ কিন্তু থামিল না, বরং আরও কাছে আসিয়াছে মনে হইল। নগেন চলিতে চলিতে ছুরিটা বাহির করিয়া ফলা খুলিয়া শক্তভাবে মুঠিতে ধরিল, তারপর হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কড়া সুরে বলিয়া উঠিল—'কে?'

পিছনের পদশব্দ খুব কাছে আসিয়া থামিয়া গিয়াছিল; নগেন কিন্তু কোনও মানুষ দেখিতে পাইলনা। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর তাহার মনে হইল, নীচে ফুটপাথের কাছে শাদা রঙের কী যেন একটা নড়িতেছে। সে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; ক্রমশ ঐ শাদা বস্তুটা আকার ধারণ করিল। একটা শাদা কুকুর। নিতান্তই পথের কুকুর; নির্জন পথে মানুষ দেখিয়া খাদ্যের আশায় তাহার সঙ্গ লইয়াছে।

নগেনের ঘনঘন নিশ্বাস পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, কুকুর বুঝিতে পারিয়া তাহার ভয় কমিল। শক্ত মুঠিতে ধরা ছুরিটা সে মুড়িয়া আবার পকেটে রাখিবার উপক্রম করিল।

কুকুরটা অস্পষ্টভাবে কুঁই কুঁই শব্দ করিতেছে, ফুট পাথের উপর পেট রাখিয়া সশঙ্কভাবে একটু একটু ল্যাজ নাড়িতেছে। নগেনের দুই চক্ষু হঠাৎ অন্ধকারে জ্বলিয়া উঠিল। সে সন্তর্পণে আবার ছুরির ফলা খুলিল; তাহার শরীরের মধ্যে রক্তের স্রোত প্রবল হর্ষোন্মাদনায় তোলপাড় করিয়া ছুটিতে লাগিল।

হাঁটু মুড়িয়া নগেন ফুটপাথের উপর অর্ধ-আনত হইয়া মুখে চুক্ চুক্ শব্দ করিল; কুকুরটা উৎসাহ পাইয়া প্রবল বেগে ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে হামাগুড়ি দিয়া তাহার কাছে আসিল। মানুষের কাছে এতখানি সমাদর সে কখনও পায় নাই।

হাতের নাগালের মধ্যে আসিতেই নগেন বিদ্যুদ্বেগে ছুরি চালাইল। 'ঘেউ' করিয়া একটা আর্ত চীৎকার—কুকুরটা বেশী দূর পালাইতে পারিলনা, দু'পা সরিয়া গিয়া কাৎ হইয়া পড়িয়া গেল—

নগেন যখন বাড়ী পৌঁছিল তখন তৃপ্তি ও ক্লান্তিতে তাহার শরীর ভরিয়া উঠিতেছে। একটু হাসিয়া কণাকে বলিল,—'ক্লান্ত বোধ হচ্ছে, আজ বড় খাটুনি গেছে। একটু শুয়ে থাকি গে, খাবার হ'লে ডেকো।'

লুকাইয়া ছুরিটাকে ধুইয়া নগেন উহা বালিসের তলায় রাখিয়া দিল, তারপর নিশ্চিন্ততার নিশ্বাস ফেলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। আঃ, কী আরাম। তাহার দেহ মনে কোথাও এতটুকু অতৃপ্তি নাই।

পরের দিনটা একরকম নেশার ঝোঁকে কাটিয়া গেল। সকালে লোন অফিসে যাইবার পথে সে দেখিল, কুকুরটা ফুটপাথে মরিয়া পড়িয়া আছে, তাহার পাঁজরার সূক্ষ্ম কাটা দাগ হইতে রক্ত গড়াইয়া আছে। পথচারীরা তাহার সম্বন্ধে কোনই ঔৎসুক্য দেখাইতেছে না, পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছে। নগেনও মৃতদেহটা সম্বন্ধে কোনও ঔৎসুক্য অনুভব করিল না।

লোন অফিসে সমস্ত দিনটা আশঙ্কায় আশঙ্কায় কাটিল, কিন্তু সে লোকটা ছুরি উদ্ধার করিতে আসিল না। ছুরিটা আজ আর নগেন সিন্দুকে রাখে নাই, নিজের কোটের বুক-পকেটে রাখিয়াছিল। বুকের কাছে তার স্পর্শটাও যেন পরম তৃপ্তিকর।

সন্ধ্যার সময় দোকান বন্ধ করিয়া সে বাড়ী ফিরিল। আজ আর পথে কোনও ব্যাপার ঘটিল না। বাড়ী আসিয়া যথাসময় আহারাদি করিয়া সে শুইয়া পড়িল। এই কয়দিনে ক্ষণার সহিত তাহার সম্বন্ধ যেন আরও শিথিল হইয়া গিয়াছে, নেহাৎ প্রয়োজন না হইলে কথা কহিতেও ইচ্ছা হয় না। ক্ষণার মনও তাহার সম্বন্ধে এতই নিরুৎসুক যে, স্বামীর জীবনে যে প্রকাণ্ড এক নূতন বস্তুর আবির্ভাব হইয়াছে তাহা সে অনুভবেও জানিতে পারে নাই।

গভীর রাত্রে নগেনের ঘুম ভাঙিয়া গেল, সে অনুভব করিল, ছুরিটা বালিসের তলায় থাকিয়া কথা কহিতেছে,—ছি ছি, এমন রাত্রিটা ঘুমিয়ে কাটালে! ভোগের শুভক্ষণ জীবনে ক'বার আসে? আমি আর কতদিন থাকব তোমার কাছে? কালই হয়তো আমার মালিক এসে আমাকে নিয়ে যাবে। ওঠ, ওঠ, এখনও সময় আছে—অন্ধকার নিরালা সহরে কত ছুটোছাটা শিকার ঘুরে বেড়াচ্ছে—কত লোক ফুটপাথে শুয়ে আছে—

নগেন বিছানায় উঠিয়া বসিল। ছুরিটা বালিসের তলা হইতে বাহির করিতেই তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া তীব্র উত্তেজনার একটা শিহরণ বহিয়া গেল। সে শয্যা হইতে নামিয়া কোট পরিয়া গায়ে একটা র‍্যাপার জড়াইয়া লইল।

বাহিরে যাইতে হইলে ক্ষণার ঘর দিয়া যাইতে হয়, স্বতন্ত্র দ্বার নাই। নগেন নিঃশব্দ পদে ক্ষণার ঘরে গিয়া দেখিল, ক্ষণা লেপ গায়ে দিয়া ঘুমাইতেছে, তাহার মুখ দরজার দিকে। নিশ্বাস চাপিয়া নগেন দ্বারের দিকে গেল, কিন্তু হুড়কা খুলিতে গিয়া খুট করিয়া একটু শব্দ হইয়া গেল।

চমকিয়া জাগিয়া ক্ষণা বলিয়া উঠিল—'কে?'

ঘরের কোণে তেলের রাত্রি-দীপ তখনও নিভিয়া যায় নাই, ক্ষণা ঘাড় তুলিয়া নগেনকে দেখিয়া বলিল—'ও—তুমি'। বলিয়া আবার চোখ বুজিল।

নগেনের বুকের ভিতরটা ধক্ ধক্ করিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ক্ষণা যখন কিছু সন্দেহ না করিয়া নিশ্চিন্তভাবে চক্ষু মুদিল, তখন নগেন বেশ শব্দ করিয়া বাহিরে গেল। বাহিরের খোলা বারান্দায় দাঁড়াইয়া সে ক্ষণেক চিন্তা করিল, আর যাওয়া চলিবে না—ক্ষণা জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহার বুকের মধ্যে অতৃপ্ত

কামনা গুমরিয়া গুমরিয়া গর্জন করিতে লাগিল; ছুরিটাও যেন তাহার বদ্ধ মুষ্টির মধ্যে ফোঁস ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। নগেন ফিরিয়া গিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া নিজের বিছানায় শয়ন করিল।

পরদিনটা নগেনের অসহ্য মানসিক অস্থিরতার মধ্যে কাটিল। কিছুই ভাল লাগে না, কোনও কাজেই মন নাই; দিন যেন কাটে না। থাকিয়া থাকিয়া একটা দুর্দম আকাঙ্ক্ষা বুকের মধ্যে সাপের মত ফণা তুলিয়া উঠিতে থাকে। এই ভাবে দিন কাটিবার পর নগেন বাড়ী ফিরিল, আহারে বসিয়া ক্ষণাকে বলিল—'শোবার ঘরের দরজায় হুড়্‌কো লাগাবার কী দরকার? বাড়ী তো বন্ধই থাকে। কাল মিছিমিছি তোমার ঘুম ভেঙে গেল।'

ক্ষণা সরল মনে বলিল—'বেশ, আজ থেকে দরজা ভেজিয়ে রাখব।'

রাত্রি ঠিক বারোটার সময় নগেন বিড়ালের মত নিঃশব্দপদে বাড়ী হইতে বাহির হইল। আজ আর ক্ষণা জাগিল না।

বাহিরে তখন নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের কম্বল মুড়ি দিয়া কলিকাতা সহর ঘুমাইতেছে। আকাশের তারাগুলা নগেনের মাথার আরও কাছে নামিয়া আসিয়া তাহার হাতের ছুরির মতই নিষ্ঠুর হাসিতে লাগিল। নগেন নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত করিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করিল, তারপর ক্ষুধার্ত শ্বাপদের মত এই গহন অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পরদিন সকালবেলা খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে নগেন দেখিল, স্টপ প্রেসে ছাপা হইয়াছে—গত রাত্রে কলিকাতার অমুক গলিতে একব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে; মৃতদেহে ছয় সাতটি ছুরিকাঘাতের চিহ্ন ছিল। হত্যার কারণ বা হত্যাকারীর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

সংবাদ পাঠ করিয়াও নগেনের মনের ভিতরটা প্রশান্ত নিস্তরঙ্গ হইয়া রহিল, এতটুকু চাঞ্চল্য সেখানে দেখা দিল না। কেবল একটি বিষয়ে তাহার মন সতর্ক হইয়া রহিল—কেহ জানিতে না পারে।

সে-রাত্রিটা গভীর স্বপ্নহীন নিদ্রায় কাটিল। বাঘ মহিষ মারিয়া আকণ্ঠ উদর পূর্ণ করিবার পর যেমন ঘুমায়, তেমনি আলস্যভরাক্রান্ত জড়ত্বভরা ঘুম নগেন ঘুমাইল।

কিন্তু পরদিন আবার তাহার ক্ষুধা জাগিয়া উঠিল। দুপুর রাত্রে আবার সে বাহির হইল।—

আবার খবরের কাগজে বাহির হইল, রাস্তায় ছুরিকাহত একটি মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এ লইয়া বিশেষ হৈ চৈ হইল না, সারা পৃথিবী জুড়িয়া হত্যার যে মত্ত তাণ্ডব চলিয়াছে তাহাতে এই সামান্য একটা মানুষের মৃত্যু কাহাকেও উত্তেজিত করিতে পারিল না।

এইভাবে সাত দিনের মেয়াদ ফুরাইল।

সপ্তম দিনে দোকানে যাইতে যাইতে নগেন মনে মনে মৎলব করিল, আজ যদি লোকটা ছুরি

উদ্ধার করিতে আসে, সে বলিবে ছুরি হারাইয়া গিয়াছে, তোমার যত ইচ্ছা দাম লও। ছুরি সে কিছুতেই ফেরৎ দিবে না।

কিন্তু লোকটা আসিল না। সন্ধ্যা পাঁচটা পর্য্যন্ত দেখিয়া নগেন তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করিয়া ফেলিল, তারপর ছুরি পকেটে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহার যেন আনন্দ আর ধরিতেছে না—ছুরি এখন তাহার। আর ফেরত দিতে হইবে না। সে অনেকক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইল, তারপর অন্ধকার হইলে বাড়ী ফিরিল।

নিজের শয়ন ঘরের নির্জনতায় নগেন ছুরিটি খুলিয়া পরম স্নেহে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। কী সুন্দর জিনিষ। এমন অপূর্ব বস্তু পৃথিবীতে আর আছে কি? ছুরিটিকে সে নিজের বুকে গলায় গালে স্পর্শ করিল। তাহার দেহ আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তারপর হঠাৎ ঘরের বাহিরে ক্ষণার সাড়া পাইয়া সে ক্ষিপ্রহস্তে ছুরি বালিশের তলায় লুকাইয়া ফেলিল।

সে-রাত্রে ঠিক বারোটার সময় তাহার ঘুম ভাঙিল; ছুরি যেন খোঁচা দিয়া ঘুম ভাঙাইয়া দিল। নগেন সম্পূর্ণ সজাগ হইয়া উঠিয়া বসিল; ভিতর হইতে তাগিদ আসিয়াছে, আজও বাহির হইতে হইবে। আজ ছুরিটি প্রথম তাহার নিজস্ব হইয়াছে, আজিকার রাত্রি বৃথা না যায়।

ক্ষণার ঘর দিয়া যাইবার সময় ক্ষণার শয্যার দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। দ্বারের দিকে যাইতে যাইতে সে থামিয়া গেল। ঈষদালোকিত ঘরে বিছানাটা অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে......চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, তেমনি বিছানাটা নগেনকে টানিতে লাগিল। নগেন সতর্কভাবে শয্যার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল···ক্ষণাকে দেখা যাইতেছে, তাহার গায়ের লেপ সরিয়া গিয়াছে; ঘুমের মধ্যে তাহার দেহটা বিকলাঙ্গের মত অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে, খোলা মুখ দিয়া সশব্দে নিশ্বাসপ্রশ্বাস বহিতেছে।

বিরাগ ও ঘৃণায় নগেনের মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল। এই বীভৎস বিকলাঙ্গ মূর্তিটা তাহার স্ত্রী! ইহাকেই লইয়া সে জীবন কাটাইতেছে! ছুরিটা ফিস্ ফিস্ করিয়া তাহার কানে বলিতে লাগিল—বাইরে যাবার দরকার কি? একেই শেষ করে দাও। এই তো সুযোগ। দ্বিধা করছ? ছি ছি, সারা জীবন ধরে এই মড়া ঘাড়ে করে বেড়াবে! নাও নাও, আমি তো রয়েছি, বসিয়ে দাও ওর বুকে। জীবনের রঙ্ বদলে যাবে তোমার—আবার বিয়ে করতে পারবে—নতুন বৌ—

শুনিতে শুনিতে নগেন পাগল হইয়া গেল। তারপর কয়েকমিনিটের কথা তাহার মনে নাই, যখন মাথাটা পরিষ্কার হইল তখন সে দেখিল, বিছানার উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া সে ক্ষণার বুকের উপর ছুরি বসাইতেছে। ক্ষণা একটু নড়েও নাই, যেমন শুইয়াছিল তেমনি মরিয়াছে।

সমগ্র চেতনা ফিরিয়া পাইয়া নগেন সভয়ে একবার ঘরের চারিদিকে তাকাইল, তারপর খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। পাগল হইয়া এ কী করিল সে! নিজের ঘরে খুন করিল! এখন লাস সরাইবে কি

করিয়া? পাড়ায় জানাজানি হইবে। পুলিস আসিবে। পুলিস নিশ্চয় বাড়ী খানাতল্লাস করিবে—তখন ছুরি বাহির হইবে।

মেঝেয় বসিয়া পড়িয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া নগেন ভাবিতে লাগিল···ছুরিটা রক্তলিপ্ত অধরে তাহার কাণে কাণে বলিতে লাগিল—

পাঁচ মিনিট পরে নগেন তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আছে উপায় আছে। সে ক্ষণার হাত হইতে সোনার চুড়িগুলা খুলিয়া লইল, গলা হইতে হার টানিয়া ছিঁড়িয়া পকেটে পুরিল। তারপর নিঃশব্দে বাড়ী হইতে বাহির হইল। ছুরি ও গহনাগুলা সে দোকানে লুকাইয়া রাখিয়া আসিবে। তারপর—

অবয়বহীন ছায়ার মত সে পথ দিয়া ছুটিয়া চলিল। দশ মিনিটের পথ পাঁচ মিনিটে অতিক্রম করিয়া দোকানের রাস্তায় পড়িল।

দোকানের বন্ধ দরজায় ঠেস দিয়া কে একজন বসিয়া আছে। খুব কাছে না আসা পর্য্যন্ত নগেন তাহাকে দেখিতে পায় নাই, দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। লোকটার মুখের কাছে অঙ্গারের মত চুরুটের আগুন জ্বলিতেছে; নগেনকে দেখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, মুখের কাছে মুখ আনিয়া বলিল—'আহ্!'

নগেন চিনিল, ছুরির মালিক। সে জড়বৎ দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার মস্তিষ্ক আর কাজ করিতেছে না, এই অভাবনীয় সংস্থিতির ফলে যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে। লোকটা বলিল—'সন্ধ্যে থেকে এখানে বসে আছি; এত তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করেছিলে কেন? আমার ছুরি দাও।'

লোকটা হাত পাতিল। নগেনের পকেটের মধ্যে ছুরি ও গহনাগুলা একসঙ্গে ছিল, নগেন যন্ত্রচালিতের মত সবকিছু বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল।

লোকটার মুখে চুরুটের আগুন একটু উজ্জ্বল হইল, সে সম্মুখে ঝুঁকিয়া সেই আলোতে হাতের জিনিষগুলা পরীক্ষা করিল; তাহার নীল চক্ষুদুটা ও মুখের খানিকটা দেখা গেল। একটা অমানুষী উল্লাস তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল, গলার মধ্যে চাপা হাসির খস্ খস্ শব্দ হইল; যেন সে সব জানে, সব বুঝিয়াছে। তারপর হঠাৎ সে পিছু ফিরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল; অন্ধকারে তাহার বুটের খট্‌খট্ শব্দ দূরে মিলাইয়া গেল।

নগেনের মনে হইল, তাহার দেহমনের সমস্ত শক্তি ফুরাইয়া গিয়াছে; দুঃসহ অবসাদ ও ক্লান্তি তাহাকে চাপিয়া মাটিতে মিলাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। এই কয়দিন সে একটা প্রবল নেশায় মত্ত হইয়া ছিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই; আজ হঠাৎ ছুরিটা চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে।

পা দু'টা অতিকষ্টে টানিয়া টানিয়া সে বাড়ী ফিরিল।

ক্ষণার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া বিছানার উপর ক্ষণার রক্তমাখা মৃতদেহটা দেখিয়া সে ভয়ে

আর্তনাদ করিয়া উঠিল। সে জানে সে নিজেই এ কাজ করিয়াছে; তবু যেন ইহার জন্য সে দায়ী নহে। কোথাকার এক ভোগ-লোলুপ রাক্ষস ঐ অভিশপ্ত ছুরিটা পাইয়া নিজের লালসা চরিতার্থ করিয়াছে।

ছুটিতে ছুটিতে বাড়ীর বাহির হইয়া সে পাশের বাড়ীর দরজায় গিয়া সজোরে ধাক্কা দিতে লাগিল, 'ও মশায়, রমেশ বাবু, শিগ্‌গির দরজা খুলুন—'

প্রতিবেশী ভদ্রলোক দরজা খুলিয়া বলিয়া উঠিলেন—'এ কি, কী হয়েছে!'

হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া নগেন বলিল—'আমার স্ত্রীকে কারা খুন ক'রে রেখে গেছে।'

'অ্যাঁ! ঢুকলো কি করে?'

'জানিনা। হয়তো আমার স্ত্রী সদর দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল—তার হাতের চুড়ি গলার হার সব নিয়ে গেছে। আসুন শিগ্‌গির—'

*

ইহার পর প্রায় বছরখানেক কাটিয়া গিয়াছে। নগেন আবার বিবাহ করিয়াছে। নূতন বধূটি সুন্দরী নয়, কিন্তু উচ্ছল যৌবনবতী।

মাঝে মাঝে ছুরির কথা নগেনের মনে হয়। তখন তাহার শরীরের স্নায়ুপেশী শক্ত হইয়া ওঠে; সে দৃঢ়ভাবে চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকে, প্রাণপণে ভুলিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ছুরিটা তাহার জীবনে অভিশাপ কি আশীর্বাদ রূপে দেখা দিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারে না।

নবীনা বধূ পিছন হইতে আসিয়া তাহার কাঁধের উপর হাত রাখে, জিজ্ঞাসা করে—'কিসের ধ্যান হচ্ছে?'

নগেনের স্নায়ুপেশীর কঠিনতা শিথিল হয়, ছুরির কথা আর তাহার মনে থাকেনা।

সে হাসিয়া বলে—'তোমার।'

শ্রীসুবোধ বসু

দার্জ্জিলিঙের 'হোটেল হিমাচলের' অতীত ও মধ্যযুগের সহিত পরিচিত ছিলাম, ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে ইহার বর্ত্তমানযুগের সাথেও পরিচয় হইল। ইহার ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে আর সন্দেহ রহিল না। 'হিমাচলের' অতীতকালের সূত্রপাত খৃষ্টোত্তর উনিশ শো একত্রিশ সালে। সেবারও দার্জ্জিলিঙে হাওয়া-পরিবর্ত্তন করিতে গিয়াছিলাম। আমাদের বাড়ির ঠিক নিচেই কার্ট রোডের উপর জীর্ণ চেহারার 'প্যারাডাইস হাউস' ভাড়া লইয়া ঘুস খাওয়ার অপরাধে পদচ্যুত দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের কর্ম্মচারি নিবারণ পাকড়াশি ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। কালো রঙের লিক্‌লিকে লোকটি, বিনয়-নম্রতার আদর্শ, মুখে হাসি লাগিয়াই আছে, 'স্যার', 'স্যার' বলিয়া কথা বলেন, দেখা হইলে সাড়ম্বরে নমস্কার না জানাইয়া ছাড়িবেন না। আমি 'হিমাচলের' অতিথি নই, কিন্তু এমন অমায়িক সদাহাস্যপরায়ণ ও পরোপকার-উৎসুক প্রতিবেশীর সহিত আলাপ না হইয়া উপায় নাই। নম্র নমস্কারের চৌম্বক প্রক্রিয়ায় তিনি আমার দৃষ্টি এবং পরিচয় আকর্ষণ করিয়া ছাড়িয়াছেন।

'আজ্ঞে, স্যার, একদিন আমার হোটেলে পদধূলি দিলে বড় আনন্দিত হব', পরিচয়-পর্ব্ব সমাপ্তির পরদিনই তিনি বিনীত আবেদন জ্ঞাপন করিলেন।

'তাতে আর আপনার কি লাভটা হচ্ছে, বলুন', আমি পরিহাসতরলকণ্ঠে বলি, 'ইচ্ছে করলেও আপনার হোটেলের বাসিন্দা হ'তে পারব না; পুরা একমাসও বাস করব না, অথচ তিন তিন মাসের বাড়ি ভাড়া ইতিমধ্যেই গুণে দিতে হয়েছে, আপনাদের 'সীসন' প্রথার কল্যাণে...'

'আজ্ঞে, স্যার, আপনাকে কি আর আমার গরীব হোটেলে এসে বাস করতে বলবার সাহস আছে?' নিবারণ বাবু বিনীত লজ্জায় বেগুনী হইয়া কহিলেন, তবু আপনাদের মতো লোককে একবার ডেকে নিয়ে দেখাতে পারলে, আমারই উপকার। কলকাতায় কত লোকের সাথে আপনাদের জানাশোনা, একটু রিকমেণ্ড্‌ করলে...বাঙালির প্রচেষ্টায় বাঙালির সাহায্য কি দাবি করতে পারি না, স্যার?...

'তা অবশ্যই পারেন,' আমি তাহার বিনয়ে মুগ্ধ হইয়া কহিলাম।

কর্ম্মহীন দ্বিপ্রহরে প্রায়ই জানালার কাছে দাঁড়াইয়া সুদূর পাহাড়শ্রেণী ও নিকটের কার্টরোডের জনতা লক্ষ্য করি; দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের মেলগাড়ি তাহার খর্ব্বতা সত্ত্বেও জনসাধারণের কিরূপ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে, তাহা লক্ষ্য না করিয়া পারি না; কুলি-মেয়েরা মাল ধরিবার জন্য ছুটিতে থাকে, হোটেল-ওয়ালাদের দালালেরা দৌড় লাগায়, এবং পার্ব্বত্য-জনতা প্রতিদিনই বিস্ময়ে হাঁ করিয়া

দূরদেশাগত বিচিত্র যাত্রীদের দিকে সসম্ভ্রমে চাহিয়া থাকে। নিবারণ বাবু এখনও দালাল রাখিতে পারেন নাই; নিজের এক পিসতুত ভাই তাহার সহকারীরূপে হোটেলে বাস করে, তাহাকেই মক্কেল পাকড়াওয়ের কাজে ষ্টেশনে পাঠান, কোনওদিন বা নিজেই যান। যখন কোনও অতিথিকে পান, রাজোচিত সমাদরে 'হিমাচলে' লইয়া আসেন; অভ্যর্থনার ঘটা দেখিয়া মনে হয়, কেন মিথ্যা বাড়িভাড়া করিয়াছিলাম। 'হিমাচলে' বাস করিতে পারিলে নিজের উপর শ্রদ্ধা বাড়িয়া যাইত। কিন্তু প্রত্যহ মক্কেল মিলিত না; তখন নিবারণবাবুর পিসতুত ভাইয়ের এবং বিশেষতঃ নিবারণবাবুর নিজের মুখখানা দেখিবার মতো হইত; দেখিয়া মায়া না করিয়া পারিতাম না। যে সকল ব্যক্তিরা তাঁহার আবেদন উপেক্ষা করিয়া অন্যান্য হোটেলের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা কি দ্রব্য হেলায় হারাইলেন, তাহা উপলব্ধি করিয়া সেই অনাগত অতিথিগণের প্রতিও আমার মায়া হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এই হতভাগ্যদের সংখ্যাই প্রতিদিন অধিক বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

তবে কি অভ্যর্থনার আন্তরিকতাই বে-দরদী লোকদের 'হিমাচল'-বিমুখ করিয়া তোলে? লোকে অনাদরে অভ্যস্ত হওয়ায় উহাই তাহাদের নিকট স্বাভাবিক মনে হয়; পেট-রোগা লোক যেমন খাঁটি-ঘন দুধ হজম করিতে পারে না, ইহারাও তেমনি আন্তরিক আদর হজম করার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। নিবারণবাবুর মধুর প্রকৃতিতে মুগ্ধ হইয়াছি; তাহার হিত-কামনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমার কি তাহাকে হুঁসিয়ার করা উচিত নয়? তাহাকে এই উপদেশ দেওয়া কি আমার কর্ত্তব্য নয় যে, যাত্রী-পাকড়াও-কালে অত্যধিক আগ্রহ ও অভ্যর্থনা প্রদর্শন করিলে এ-যুগের বিকৃত-রুচি যাত্রীরা স্বভাবতই সন্দেহশীল হইয়া উঠে? উপদেশ দিতে হইলে সর্ব্বদাই বড় অসুবিধায় পড়ি, কেননা আমার উপদেশ অথবা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতটিই ধোপে টিকিবে, সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারি না। তবু মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহাকে যাত্রী-সংগ্রহ কালে আদরের মাত্রা কিঞ্চিৎ হ্রাস করিতে উপদেশ দিলাম, এবং দেখিলাম, এবারও আমার উপদেশ ধোপ সহিল না। নিবারণবাবু বিনয়ে গদগদ হইয়া কহিলেন, না, স্যার, এ আর কি আদর! আপনি নেহাৎ স্নেহ করেন বলেই এই সামান্য আদর-যত্নের প্রশংসা করেন। এখনও ঠিকরকম ব্যবস্থাপত্র করে উঠতে পারিনি,—এরপর যাত্রীদের আদর-আপ্যায়নের দিকে আরও নজর দিতে পারব বলে আশা করি! আমাদের ব্যবসার মূলমন্ত্রটি লক্ষ্য করেছেন কি না, জানিনা স্যার্। অফিস-ঘরের গায়ে ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রেখেছি—'আমাদের মক্কেলরাই আমাদের প্রভু।'

বুঝিলাম, ভুল করিয়াছি। সেবাই যিনি জীবনের মূলমন্ত্র করিয়াছেন, মিথ্যা তাহাকে আমন্ত্রণকালীন উচ্ছ্বাস সংযত করিতে বলিয়াছি। অতঃপর স্টেশনে যাত্রী-আহ্বান করিতে গিয়া বিনয়ে নিবারণবাবুকে বাঁকাইয়া পড়িতে দেখিয়াছি, তবু আর একবর্ণ উপদেশ খয়রাত করিবার সাহস জোগাড় করিতে পারি নাই। কিন্তু মনে মনে স্থির করিয়াছি, কলিকাতায় ফিরিয়া প্রতি পরিচিত ও বন্ধুর নিকট 'হিমাচলের' আন্তরিকতা ও উৎকর্ষের গল্প করিব, এবং ট্রামে-বাসে সবাক্ বিজ্ঞাপন হিসাবে ইহার মহিমা ঘোষণা করিব। গুণের আদর হউক, নিজের স্বার্থে আঘাত না লাগিলে, ইহা আর কে না চাহে!

ইহার পর একেবারে 'হিমাচলের' মধ্যযুগে গিয়া পড়িলাম। ১৯৩৮ সাল; ডাক্তার বলিলেন, যান্, আর দেরি করবেন না; অন্তত হপ্তা দুয়েকের জন্য পাহাড়ে ঘুরে আসুন। লো-ব্লাড্-প্রেসার পাহাড়ে গেলে তাড়াতাড়ি উপকার পাবেন···।' কিন্তু 'পরিবার তায় সাথে যেতে চায়' দেখিয়া তাঁহাকে খরচের কথাটা বুঝাইয়া বলিলাম; তিনি পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য লাভের কথাটা মানিয়া লইলেন না বটে, কিন্তু এক পক্ষের বিরহ জ্বালা সহ্য করিতে রাজি হইলেন।

'হোটেল হিমাচল'কে সাত বৎসরেও ভুলি নাই; ইহার সেবা-ধর্ম্ম এবং অতিথি-আপ্যায়নের কথা মনে করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলাম; দার্জ্জিলিঙের অপরাপর সকল প্রকার ও প্রকৃতির হোটেল সমূহকে উপেক্ষা করিয়া 'হিমাচলের' আত্মীয়তা লাভ করিবার জন্য আগাইয়া গেলাম।

স্টেশনে হোটেল 'হিমাচলের' উৰ্দ্দিপরা যে দালালটি অতি সহজেই আমাকে বগলজাত করিয়া নিজের লোক্-পটাইবার কৃতিত্বে পুলকিত বোধ করিতেছিল, সে বেচারী জানিতে পারে নাই যে, তাহার উপস্থিত ব্যতিরেকেও আমি 'হিমাচলে' যাত্রা করিতাম। কিন্তু তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিলাম না, এবং প্রথামত তাহার দ্বারা হোটেলের অফিসে নীত হইলাম।

ঐ তো কালো-বনাতে ঢাকা টেবিলটার সামনে হিসাবের মস্ত খাতাটার উপর ঝুঁকিয়া হিসাব-পরীক্ষা করিতেছেন আমাদেরই নিবারণবাবু। মূল্যবান সার্জ্জের অটুট-ইস্ত্রি পাঞ্জাবী গায়ে; চুলের টেরি স্পষ্ট এবং সুবিন্যস্ত, আঙুলে একাধিক গ্রহরত্নের একাধিক আংটি। পূর্ব্বের সেই আলুথালু জামা-কাপড়, উস্কখুস্ক চুল এবং অতিশীর্ণ চেহারা আর নাই; এমন কি গায়ের রঙেও যেন একটু জৌলুস দেখা দিয়াছে।

'এই যে নিবারণবাবু,' আমিই অগ্রণী হইয়া কহিলাম, 'চিনতে পারচেন কি?...

নিবারণবাবু খাতা হইতে চোখ উঠাইয়া সেকেণ্ড তিনেক অবাক্ হইয়া চাহিয়া তারপর কহিলেন, 'তা, হ্যাঁ, কোথায় জানি দেখেচি বলে···আপনি একবার উপরের ঐ 'স্নো ভিল্' বাড়িটায় ছিলেন কি···'

'ঠিক চিনেছেন,' আমি আশ্বস্ত হইয়া কহিলাম। 'সেবার সপরিবারে এসেছিলাম। এবার একা এসেছি; ভাবলাম, আপনার এখানেই এসে উঠি। সেবার সব নিজের চোখেই দেখে গিয়েছি তো...এমন আদর-আপ্যায়ন আর নিজের লোক ছাড়া ··'

'এফিশিয়েন্সিকেই আমি সবচেয়ে বেশী মূল্য দিয়ে থাকি,' নিবারণবাবু গর্ব্বিত তৃপ্তির সঙ্গে কহিলেন। 'আমার হোটেল আর পাঁচটা বাঙালি-হোটেলের মতো নয়; চাকরের ডেক দেখা নেই, উচিত মত গরম জল পাচ্ছি না, ঠাণ্ডা-খাবার যেমন তেমন করে' পরিবেশন করা হচ্চে, প্যাসেজে নোংরা জমে যাচ্ছে, ঘর যথেষ্ট রকম ঝাড়পোঁছ হচ্ছে না—এমনটি এখানে হবার উপায় নেই। আপনি দুদিন থাকলেই দেখতে পাবেন, ঘড়ির কাঁটার মতো সব চলচে। আমি বুঝি, এফিশিয়েন্সি, মশায়। এফিশিয়েন্সিই

সাফল্যের মূলমন্ত্র। একবার চেয়ে দেখুন ফ্রেমে বাঁধা মটো'টার দিকে :—'এফিশিয়েন্সি ইজ্ আওয়ার মটো'; শুধু কাগজে নয়, এ আপনি হাতে-নাতে দেখতে পাবেন।··চলুন, নিজেই আপনাকে ঘর দেখাচ্ছি···'

অধিকারীর আচরণে দেওয়ালের 'মটো'কে অবিলম্বেই প্রমাণিত হইতে দেখিয়া খুশিই হইলাম। তিনি তাহার বাঁ হাতের টেবিলের কাছে কর্ম্মনিরত কর্ম্মচারিদের যে-কাহারও হাতেই আমাকে সমর্পণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া স্বয়ংই যে সে ভার লইয়াছেন, ইহাতে বিশেষ খাতিরের স্বাদ লাভ করিলাম। 'মটো' পরিবর্ত্তন করিয়া 'সেবার' স্থলে যে তিনি 'এফিশিয়েন্সি'কে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ইহাই তাহার শ্রীবৃদ্ধির কারণ বলিয়া বিবেচনা করিলাম। আমাকে আর 'স্যার্' বলিয়া সম্বোধন না করিয়া 'মশায়' বলিয়া সম্বোধন করার মধ্যে তাঁহার আত্মমর্য্যাদা বৃদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাহার উপর সম্মান বাড়িল বই কমিল না।

সত্যই 'হিমাচলে'র 'এফিশিয়েন্সি' সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রহিল না। ঠিক সময়ে ঠিক জিনিষটি পাইতেছি; ভোরে মুখ ধুইবার গরম জল, দাড়ি কামাইবার গরম জল, স্নানের গরম জল, চা-টোষ্ট-ডিম একেবারে ঘড়ির কাঁটার মত আসিতেছে। চাকরের প্রয়োজন হইলে হাঁক দেওয়া মাত্র সে 'জু' বলিয়া সাড়া দিয়া হাজির হইতেছে, রাতের লুচি গরম গরম ভাজা হইতেছে, আর পাতে আসিয়া পড়িতেছে—ঠাণ্ডা হইবার ভয়ে একবারে দেওয়া হইতেছে না। আঁচাইবার গরম জল বলার পূর্ব্বেই হাজির হইতেছে, শুইতে যাইয়া কখনও বিছানা অ-ঝাড়া, বালিশ অ-ফোলান, এবং লেপ ও কম্বল অ-মেলা পাই নাই। নিবারণবাবুর সহকারীবর্গের কেহ না কেহ আসিয়া প্রতি বেলাই খোঁজ লইতেছে, এবং নিবারণবাবু স্বয়ংও দুদিন ঘুরে আসিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া গিয়াছেন। ব্যবসার উন্নতির সঙ্গে তাহার কাজও বাড়িয়াছে; সাত বৎসর আগের মতো গায়ে পড়িয়া কথা বলিবার ফুরসৎ তাহার নাই। তবু তাহার মক্কেলদিগের সুখ-সুবিধা এবং মেজাজ-মর্জ্জির প্রতি তাহার সতর্ক দৃষ্টি রহিয়াছে। ঠিকানা হিসাবে যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত না হইলেও এই সব কারণে এখানে বাস করিয়া বড় তৃপ্তি পাইলাম।

দার্জ্জিলিং ত্যাগের সময় সকৃতজ্ঞভাবেই তাহাকে কহিলাম, 'বেশ আরামেই কাটিয়ে গেলাম আপনার এখানে দুটি সপ্তাহ। আপনার ব্যবসার আরও উন্নতি হোক, এই কামনা করি।'

'ধন্যবাদ।' নিবারণবাবু টাকার চেঞ্জ গুণিয়া দিতে দিতে কহিলেন, 'বন্ধুবান্ধব কেউ দার্জ্জিলিঙে এলে এখানেই পাঠিয়ে দেবেন। এফিশিয়েন্সির যদি কোনও দাম থাকে, তবে তারা এলে ঠকবেন না। আমার লোকেরাই কুলি জোগাড় করে' আপনাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবে। আমি নিজেও যেতে পারতাম কিন্তু একটা চায়ের 'ডীল্' সম্পর্কে একটু পরেই লোকজন আসচে···'

'তার কোনও দরকার নেই,' আমি কহিলাম, 'আপনি স্বচ্ছন্দে বসে চায়ের ব্যবসা করুন।'

ইহার পর একেবারে আধুনিক কাল, অর্থাৎ ১৯৫৫ সালের সংবাদ দিতেছি। এবারও দার্জ্জিলিং আসিয়াছিলাম; প্রতি সাত বৎসর অন্তর যেরূপ ভাবে আমাকে দার্জ্জিলিঙে আসিতে হইতেছে, তাহাতে চাঁদের বুকে কোনও নূতন কলঙ্করেখার আবির্ভাবের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ আছে, সহজেই এই বিশ্বাসে উপনীত হইতে পারিতাম; কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদেরা অর্থনৈতিক সঙ্কটের ব্যাখ্যা হিসাবে চাঁদের কলঙ্ককে বাদ দেওয়ায় আমার অর্থহানি-যোগকে এই সহজ তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে ভরসা পাইতেছি না। আদর-আপ্যায়নের কথা উল্লেখ করিয়া গৃহিণীর নিকট 'হিমাচলে' বাস করার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। তিনি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, 'আদর-আপ্যায়ন! চুলোয় যাক আদর-আপ্যায়ন। ইনিদি-রা যাচ্ছেন, চক্রবর্ত্তীরা যাচ্ছে, এদের কাছে আমার মাথা কাটাতে চাও?' অর্থাৎ অমন কম-সম্ভ্রান্ত হোটেলে বাস করিয়া তিনি সম্মান খোয়াইতে পারিবেন না!

দার্জ্জিলিঙে আসিয়া দেখিলাম, দুনিয়ার সমস্ত লোকই এখানে আসিয়া হাজির হইয়াছে, এবং প্রত্যেকেই এত পরিমাণ স্বাস্থ্যপ্রদ ফগ্ গিলিয়া ফেলিতেছে যে, দার্জ্জিলিঙ শহরে ও-বস্তুটির ঘাট্‌তি দেখা দিবার উপক্রম হইয়াছে—কুয়াশা দূর হইয়া সর্ব্বত্র রৌদ্র চকচক করিতেছে।

ক'দিন ধরিয়াই গৃহিনীর অজ্ঞাতসারে একবার 'হিমাচলে' উপস্থিত হইয়া নিবারণবাবুর খোঁজ লইবার লোভ হইতেছিল, এমন সময় একটা একান্ত সঙ্গত অজুহাত মিলিয়া গেল। শুনিতে পাইলাম, আমাদেরই দত্ত চৌধুরি 'হিমাচলে' আসিয়া উঠিয়াছেন। ভাবিলাম, খবরটা গৃহিনীকে জানাইয়া 'হিমাচলে'র প্রতি তাহার তাচ্ছিল্যের জবাব দেই। দত্ত চৌধুরি নামজাদা ব্যারিষ্টর, বিলাতী ধরণে হাসি এবং ফরাসী ধরণে কাশিতে পারিলে তিনি সেইরূপই করিয়া থাকেন। তাঁহার ন্যায় ঘোরতর সাহেব এবং বিখ্যাত ব্যক্তিই যদি 'হিমাচলে' আসিয়া বাস করিতে পারেন, তবে হোটেলটির মর্য্যাদা সম্বন্ধে কি সামান্য সন্দেহ পোষণ করাও সম্ভব? অথচ ঠিকানাটা যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত হইবে না, এই ভয়েই কি গৃহিনী 'হিমাচলের' 'এফিশিয়েন্সি'র আরাম হইতে আমাকে এবং সপরিবারে নিজেকে বঞ্চিত করিলেন না?

মাধ্যাহ্নপূর্ব্ব ভ্রমণ শেষ করিবার মুখে 'হিমাচলে' হাজির হইলাম। নিবারণবাবুর অফিসঘরের কাছে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেই ক্ষুদ্র বহির্কক্ষটিতে অন্যূন পাঁচজন অতিথি কিল্‌বিল্ করিতেছে, অফিসের নাম গন্ধও সেখানে নাই। তবে তাহাদেরই কাছে অফিসের ঠিকানা পাইলাম, এবং পশ্চিম-প্রান্তের কটেজটির দিকে অফিসঘরের সন্ধানে অগ্রসর হইলাম। চিনিতে কোনই অসুবিধা হইল না, দেখিলাম দরজার পাশেই কালো রঙের কাঠের ফলকে শাদা অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—'মিঃ এন্ পাকড়াশি।'

দুএকবার দরজার কাছ হইতে অসার বিদেশী কায়দায় ভিতরে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু যেরূপ উচ্চকণ্ঠের বাদানুবাদ কর্ণে প্রবেশ করিল তাহাতে আমার এইপ্রকার আবেদনের ব্যর্থতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ রহিল না, এবং বিনা অনুমতিতে হোটেলের অফিসঘরে প্রবেশ এমন কোনও সৌজন্য-বিরুদ্ধ কর্ম্ম হইবেনা সিদ্ধান্ত করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম।

ভিতরে তখন রীতিমত বাক্‌-যুদ্ধ চলিয়াছে; কেহই আমাকে নজরে আনিল না। কিন্তু অচিরেই আমি সকল কিছু নজরে আনিয়া ফেলিলাম। জন তিনেক নিরীহ চেহারার ভদ্রলোক বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার এ-প্রান্তে দাঁড়াইয়া বিভিন্ন স্বরগ্রামে বেখাপ্পা ঐক্যতান তুলিয়াছেন, এবং অপর প্রান্তে ঘূর্ণ্যমান চেয়ারটায় কোনও প্রকারে বৃহৎ কলেবরটি আঁটাইয়া চোস্ত সাহেবী পোষাক আঁটা একজন ভদ্রলোক একাই একশো হিসাবে রাসভনিন্দিত কণ্ঠে তাহাদের ঐক্যতান ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছেন। তাহার পশ্চাতে জন পাঁচেক কর্ম্মচারি অ্যাসেম্ব্লির গভর্ণমেণ্ট-নির্ব্বাচিত সদস্যদের মত গভীর আনুগত্যে মাথা নিচু করিয়া প্রভুর পক্ষ সমর্থনের জন্য নির্ব্বাক ভাবে অপেক্ষা করিতেছে। কর্ম্মচারিদের এই পরিবেশই আমাকে সাহায্য করিল; বুঝিলাম ঘূর্ণ্যমান চেয়ারের স্থানাভাবক্লিষ্ট উপবেশনকারীই আমাদের নিবারণবাবু, 'হিমাচলে'র ভূতপূর্ব্ব রোগা প্রোপাইটর! ধুতি পাঞ্জাবির বদলে দামি বিলাতি পোষাক গায়ে উঠিয়াছে; চেক্‌নাইয়ে এবং পরিধিতে দেহের যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাতে নবজন্মলাভের কথা আর অবিশ্বাস করা যায় না। অফিসের আসবাবপত্রের উন্নতি নিন্দুকদেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া ছাড়িবে। স্তম্ভিত, মুগ্ধ, বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

'হবে না, মশায়, হবে না' নিবারণবাবু গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, 'ও সব আব্দার আমার এখানে চলবে না। যা গরম জল পান, তাতেই চালাতে হবে; কয়লার দাম জানেন তো? সব গণ্ডার মর্জ্জি মেনে চলতে হলে আমার চলবে না। পছন্দ না হয় অন্যত্র চলে যান, কাউকেই মাথার দিব্যি দিয়ে এখানে থাকতে বলচি না···গণ্ডা-গণ্ডা লোক আসচে, ফিরিয়ে দিতে হচ্চে; লোকের জ্বালায় জীবন অতিষ্ঠ হয়েছে।···'ফেড আপ' 'ফেড আপ' মশায়, আমরা 'ফেড্‌ আপ্‌'···চাইনে লোক, লোক চাইনে মশায়··· তবু আপনারাই কাকুতি-মিনতি করে' আসবেন, তারপর ঢুকে বসেই হুকুম চালাতে শুরু করবেন। ওটি চলবে না, মশায়, আমার এখানে ওটি চলবে না। যা ব্যবস্থা আছে, তার সঙ্গেই মানিয়ে চলতে পারেন ভাল, নইলে অন্যত্র······

'কিন্তু আজ দুপুরের খাওয়াটা একবার নিজের চোখে দেখেচেন কি মিঃ পাকড়াশি? অভিযোগকারীদের একজন প্রতিবাদ করিল, 'এ খাওয়া ভদ্রলোকে খেতে পারে? তিন টাকা চার্জ্জের জায়গায় দুর্ম্মূল্যের বাজার বলে দৈনিক সাড়ে সাত টাকা করে নিচ্ছেন, ডাঁটা-চচ্চড়ি, ট্যাংরা মাছ, বিউলির ডাল খাইয়ে দায় মেটাবেন, তার কোনও প্রতিবাদ করতে পারব না?'······

'চলে যান না, মশায়। কে আপনাকে থাকতে বলচে। স্বচ্ছন্দে চলে যান। যেখানে আপনার জন্য রাজভোগ সাজিয়ে রেখেছে, সেখানেই চলে যান'······

'খুব কথা শিখে গেছেন', অসন্তুষ্ট অতিথিদের অন্যজন হুইসিলের মতো গলায় কহিল, চলে যান! হোটেলগুলিতে জায়গা নেই বলেই তো তেজ দেখান হচ্ছে। নইলে, মশায়, ক'বছর আগে আপনাকেই দার্জ্জিলিঙ ইষ্টিশানে গলায় কাপড় দিয়ে যাত্রী যোগাড় করতে দেখিনি? যুদ্ধের কল্যাণে লাল হয়ে উঠে বড়ই বীরত্ব দেখাচ্ছেন···বলে কিনা, 'ফেড্‌ আপ্‌!'······

'দেখুন,' নিবারণবাবু সহসা রাজোচিত গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া বিলম্বিত লয়ে মোটা গলায় কহিলেন, 'কথা কাটাকাটি করবার আমার সময় নেই। কৈফিয়ৎ দেওয়ারও সময় নেই। ঐ দিকের দেওয়ালে তাকিয়ে দেখুন। আমাদের 'মটো'—'টাইম ইজ্ মানি'...

উহারা তাকাইয়া দেখিলেন কি না লক্ষ্য করিলাম না, আমি নিজে তাড়াতাড়ি চাহিলাম। 'টাইম ইজ্ মানি!' 'হিমাচলের' 'মটো' কয়েক বৎসর পর পর বদলাইয়া ঠিক জগৎব্যাপী পয়সা কামাইবার সময়টিতে যে 'টাইম ইজ্ মানি'তে আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহাতে চমকিত না হইয়া পারিলাম না। সময়ের সহিত চলিবার এই আশ্চর্য্য দক্ষতা নিবারণবাবু কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন?

'বেশ, ও-বেলা থেকে তবে আমরা অন্যত্রই যাব।' অতিথিবর্গের পূর্ব্বোক্ত প্রথমজনের কণ্ঠে অভিমান! ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে শুয়ে থাকব, তবু আপনার মতো হোটেল-ওয়ালার আস্তানায় থাকব না। পয়সা দিয়ে হোটেলে থাকব, তাও যেন অনুগ্রহ করচেন'...

'তাই যাবেন।' নিবারণবাবু মুখ নিচু করিয়া কাগজে আঁক কাটিতে কাটিতে কহিলেন। দৈনিক সাড়ে দশ টাকা করে' গুণে দিয়ে থাকবার জন্য পাঁচগণ্ডা লোক মাথা কুটচে, খড় ভয়টা দেখাচ্চেন...ওহে, অবিনাশ, ওদের রুম্‌টায় আর দুটো খাট ঢুকিয়ে ঐ পাঁচজনের ফ্যামিলির জন্য ঠিক করে' রেখো...তাদের কথা দিয়েচি, জায়গা দিতেই হবে, নইলে নতুন লোক আর নয়...'ফেডআপ' মশায়, আমরা 'ফেডআপ'—কি চাই আপনার?'......

এতক্ষণে নিবারণবাবুর দৃষ্টি আমার দিকে পড়িল। আমি পরিচিতের হাস্য করিয়া আগাইয়া গেলাম।

'চিনতে পারচেন, নিবারণবাবু?'

'হয়তো দেখে থাকব,' নিবারণবাবু একটা ফাইল টানিয়া লইলেন। 'বছর বছর কত লোক আসচে, ওর আর হিসেব রাখতে পারি না।.. জায়গা চাই? জায়গা দিতে পারব না, মশায়। ফেড্ আপ, ফেড্ আপ। কেন যে আপনারা সব পূর্ব্বে ব্যবস্থা না করে দার্জ্জিলিঙ ছুটে আসেন! অসম্ভব, অসম্ভব। এখানে জায়গা হবে না......'

কহিলাম, 'জায়গার খুব প্রয়োজন নেই। একটি বন্ধুর খোঁজে এসেচি। তবে আপনার উন্নতিও দেখে গেলাম। 'মটো'টা ঠিক সময়-অনুযায়ীই করেচেন।......'

'সবাই এটা বুঝতে পারে না, মশায়,' নিবারণবাবু এইবার বিগলিত হইয়া কহিলেন। 'আপনিই বলুন, সময় কি হেলায় হারান উচিত? সময়ের সদ্ব্যবহার করলে তবেই ভাগ্য তার প্রতি সদয় হয়ে ওঠে...কিন্তু দেশের লোক কি তা বুঝতে পারে?...তা আপনি যখন আমাদের পুরোনো বোর্ডার বলছেন, তখন উপরতলায় আপনার একটা জায়গা করে' দেওয়া যেতে পারে। দামটা একটু বেশী পড়বে—ডেইলি পনেরো টাকা...পাশের ঘরেই কলকাতার নামজাদা ব্যারিস্টর দত্তচৌধুরী-সাহেব আছেন।...কোথাও

জায়গা পান না···বিলিতি, পার্শী, বাঙালী সব হোটেল ঘুরে' হতাশ হয়ে আমার শরণাপন্ন হলেন। কি করি বলুন, দেশের একজন গণ্য-মান্য লোক, নিরুপায় হয়ে কলকাতা ফিরে যাবেন, এ তো আমাদেরই লজ্জার কথা হ'তো। একটা বন্দোবস্ত করে' দিলাম।···তা উনি অ্যাপ্রিশিয়েট করতে জানেন··দরাদরি নেই, দৈনিক কুড়ি টাকাতেই রাজি হয়ে আছেন······

দত্তচৌধুরীর টাকার অভাব নাই জানি, কিন্তু সে 'হিমাচলে'র ডাঁটা-চচ্চড়ি চিবাইতেছে, ইহা ভাবিতেও শিহরিয়া উঠিলাম। গৃহিণীর দূরদর্শিতার তারিফ করিলাম এবং অবিলম্বে যাইয়া দত্তচৌধুরীকে আমাদের আতিথ্য গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করিবার সংকল্প করিলাম।

'একটা লোক দিতে পারেন, দত্তচৌধুরী-সাহেবের ঘরটা আমাকে দেখিয়ে দেবে?'

'চেনেন বুঝি!' নিবারণবাবু নির্লিপ্তভাবে কহিলেন। 'ওরে চন্দ্র সিং, এই সাহেবকে···ওটা বুঝি আবার রসুই ঘরে কাজ করচে···আর বলেন কেন, চাকর-বাকরের এমন অভাব··তা ছাড়া মাইনে হাঁকছে আগের ডবল···ওহে অবিনাশ, কি করছ তুমি? হিসেবটা হয় নি এখনো? এই ভদ্রলোককে একবার··· তা আপনিই চলে যান না···'ডেইজি কটেজে'র হল-ঘর দিয়ে সোজা ঢুকে বাঁ দিকে দোতলার সিঁড়ি পাবেন।···উপরে উঠে সিঁড়ির ধারেই ঘরটা··আর পাশের ঘরটাও খালি আছে, সেটাও দেখে আসতে পারেন···কিন্তু পনেরো টাকার কমে দিতে পারব না, অনুরোধ করবেন না···'

অনুরোধ করিলাম না, দত্তচৌধুরির ঘর-অনুসন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলাম।

বিয়র্ণসন্ আজ বৃদ্ধ···একদা যৌবনে তাঁরই অগ্নি-অক্ষর নরওয়ের যুবকদের মনে জাগিয়ে দিয়েছিল নতুন জাতি-প্রেম, নতুন সাধনার সংকল্প···

তারপর বহুদিন চলে গিয়েছে। গল্পে, নাটকে, উপন্যাসে, কবিতায় বিয়র্ণসন্ নরওয়ের সাহিত্যকে অপরিচয়ের অন্ধকার থেকে জগতে তুলে ধরেছেন।

তাঁর সাহিত্যের প্রেরণায় দেশে এসেছে নতুন ভাবের জোয়ার—নতুন সাধকের দল।

নতুন সাধকের দল, তারা ভুলে যায় বৃদ্ধের দান। বৃদ্ধের বিরুদ্ধে শোভাযাত্রা করে তারা এগিয়ে আসে, বৃদ্ধের বাড়ীর দিকে, বৃদ্ধকে করবে অপমান।

জানলা থেকে দাঁড়িয়ে বিয়র্ণসন শোনেন যৌবনের মুখে সেই ক্রুদ্ধ-বাণী।

একজন ভক্ত বলে, আপনি আদেশ করুন, ওদের শাস্তির ব্যবস্থা করি!

বিস্মিত হয়ে বিয়র্ণসন বলেন, এ কি বলছো তুমি! শাস্তি দেবে কাকে? এ যে আমার জীবনের সব চেয়ে বড় জয়-মুহূর্ত! শুনছো না, ওরা আমাকে গালাগাল দিতে আসছে, কিন্তু ওদের মুখে আমারই গান, My norge, my norge!

পাশাপাশি

শ্রীআশালতা সিংহ

মেয়েদের স্কুলের উপরতলায় শিক্ষয়িত্রীদের থাকবার জন্যে ঘর দেওয়া হয়েছে। এ সহরে এই একটিই মেয়েদের উচ্চইংরিজী স্কুল। সম্প্রতি গঙ্গার ধারে প্রকাণ্ড একটি ত্রি-তল বাড়ীতে স্কুলটি উঠে এসেচে। গভর্ণমেন্ট অনেক টাকা দিয়েচেন, স্কুলের জন্যে নিজস্ব এই তেতালা বাড়ী ও আশেপাশে প্রচুর জমি কেনা হয়েচে। জনসাধারণেও যথেষ্ট সাহায্য করচে। কিন্তু স্কুলের এই বিরাট সাফল্য এবং সর্ব্বাঙ্গীন জনপ্রিয়তার মূলে রয়েচেন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী লাবণ্যলেখা দেবী। বস্তুতঃ লাবণ্যকে দেখলে বোঝবার যো নেই যে, সে এতবড় একটা স্কুলের প্রধান কর্মকর্ত্রী। সব জড়িয়ে ছোট সুকুমার একটি মেয়ে। দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না এই মেয়েটিই আবার এম, এ, বি, টি পাশ করেচে। চেহারাটি সুন্দর এবং সুশ্রী। কেবলরংফর্সা অনেক মেয়ে আছে যাদের মুখে অন্তর্প্রকৃতির বুদ্ধি-দীপ্ত লাবণ্য ছায়া ফেলেনি বলে সে মুখমুকুরে সৌন্দর্য্যের আভা নেই। কিন্তু লাবণ্যের তা নয়, তার মুখ ,বুদ্ধিতে, চরিত্রের মাধুর্য্যে এবং স্বভাবের কোমলতায় আভাময়। লাবণ্য যখন মেয়েদের পড়ায়, তারা প্রত্যেকটি কথা যেন সমস্ত অন্তর দিয়ে শোষণ করে। লাবণ্য যখন তাদের গান শেখায় কিংবা শারদোৎসব, বসন্তোৎসব বা স্কুলের কোন উৎসব উপলক্ষ্যে গান-বাজনার ছোট-খাট অভিনয় মেয়েদের দিয়ে করিয়ে নেয় তখন গানের সুরে সুরে সেখানে যেন অমরাপুরী নেমে আসে। মেয়েদের বাড়ীতে বিয়ে, জন্মতিথি, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, যে কোন উৎসব হলেই লাবণ্যর নিমন্ত্রণ থাকে। মেয়েদের মা মাসী দিদি কাকীমার দল লাবণ্যের সঙ্গে আলাপ করে মোহিত। এক কথায় লাবণ্যকে বাদ দিয়ে স্কুলের অস্তিত্বের কথা ভাবাও যায় না। সম্প্রতি যে নূতন বাড়ীতে স্কুলটি উঠে এসেচে এখানকার চারিদিকের পরিবেশটি এত চমৎকার যে, লাবণ্য মুগ্ধ হয়েছে। বিস্তৃত কম্পাউণ্ডের চারিদিকে দীর্ঘ য়ুকালিপটাস্ গাছের সারি, উত্তরদিকে গঙ্গার ধারা বয়ে চলেছে। সকালে বিকালে গঙ্গার ধারের রাস্তাটা দিয়ে লাবণ্য বেড়াতে বার হয়। স্কুলের পাশেই সরকারী উকীল মনোরঞ্জনবাবুর বাড়ী। তাঁর দুই মেয়ে অচিরা আর চিত্রিতা স্কুলে পড়ে, তারাও এসে লাবণ্যের এই নিত্য ভ্রমণের সঙ্গিনী হয়। অচিরা আর চিত্রিতার সঙ্গে লাবণ্যের অনেকটা বন্ধুনীর মত সম্পর্ক। শিক্ষয়িত্রীসুলভ গাম্ভীর্য্য তার মধ্যে যেন নেই বল্লেই হয় তবু তার ব্যক্তিত্বের এমন একটা আকর্ষণ যে, সহজ ভাবেই লোকে তার কর্ত্রীত্ব স্বীকার করে নেয়। তেতালার উপর শিক্ষয়িত্রীদের থাকবার কোয়াটার্স, সেখান থেকে মনোরঞ্জনবাবুর তেতালার সমস্তই চোখে পড়ে। লাবণ্যের বসবার ঘর থেকে যে ঘরখানি চাইলেই চোখে পড়ে, সেটিতে চিত্রিতা আর অচিরা দুই বোন থাকে। দৈনন্দিন জীবনের অনেকখানি অংশ তাই এদের পরস্পরের পরিচিত। স্কুল থেকে ফিরে এসে লাবণ্য হয়তো চুল বাঁধতে ব'সে

তখন দুইবোন্ নিজেদের ঘরে ব'সে লাবণ্যর শেখানো গান অভ্যাস করতে করতে চেঁচিয়ে বলে, ও লাবণ্যদি শুনুন না, এইখানটা ঠিক হচ্চে কিনা! আজ আচার নেবেন? মা যা সুন্দর তেঁতুলের আচার দিয়েচেন আজ! ছাদে শুকোতে দিয়েচেন, আমি খানিকটা চুরি করে এনেচি। অচিরা, যা না ভাই দৌড়ে দিয়ে আয় লাবণ্যদিকে। কলাপাতায় মুড়ে রেখেচি।

দিন কয়েক থেকে তেতালার এই সুন্দর বড় ঘরখানি থেকে দুইবোনকে নির্ব্বাসন দিয়ে রাজ-মজুরে মহা উৎসাহে কাজে লেগেচে। মেঝেতে মার্ব্বেলগুঁড়ো মিশিয়ে নতুন করে বসানো হচ্চে, দেয়ালে নতুন রং দিয়ে পেণ্টিং করা হচ্চে। লাবণ্য জানালায় মুখ বাড়িয়ে আর অচিরা, চিত্রিতার দেখা পায় না। বৈকালিক ভ্রমণে বার হয়ে প্রশ্ন করলে, ব্যাপার কি?

'ওমা, জানেন না বুঝি এই মাসের বাইশে যে দাদার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। আমাদের ঐ ঘর-খানা নতুন বৌদিকে ছেড়ে দিতে হবে। ঐ ঘরেই হবে ফুলশয্যা। লাবণ্যদি, আপনাকে কিন্তু ফুলশয্যার দিনে সেই গানটা গাইতেই হবে, 'যে তরণীখানি ভাসালে দু'জনে আজিহে নবীন কাণ্ডারী!' আর আমাদের একটা গান খুব ভালো করে শিখিয়ে দিতে হবে, বৌবরণের দিনে আমরা গাইব।' লাবণ্য কোন উত্তর না দিয়ে পথ চলতে লাগলো। মনে পড়ে গেল, ঐ পেটেণ্ট গান "যে তরণীখানি ভাসালে দু'জনে আজি হে নবীন কাণ্ডারী!" সে কতবার কত বিয়ের সভায় গেয়েচে। এই সেদিন স্কুলের ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়তো সুবালা, পরীক্ষার ক'দিন আগে তার বিয়ে হ'য়ে গেল। মেয়ের অভিভাবকদের কাছে সে ঈষৎ অনুযোগ জানাতে গেছিলো, আর কয়েকটা মাস পড়লেই মেয়েটি ম্যাট্রিক পাশ করতে পারতো···বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে, ক্লাসে বরাবর ফার্ষ্ট হয়। কয়েকটা মাস সবুর করে বিয়েটা দিলে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত। সুবালার রাঙা দিদিমা তার কথা শুনতে পেয়ে বিয়ের সুপুরি কুচোতে কুচোতে জাঁতিটা গালের উপর ধরে বড় বড় অবাক চোখে চেয়ে বল্লেন, ওমা, সে কি কথা, মেয়ের বিয়ে ব'লে হ'লে খালাস পাই, গঙ্গাচান করি। তা কিনা আবার মেয়ে পাশ দেবে বলে আটকে রাখব! এমন অলুক্ষুণে কথা এ বাড়ীতে যেন না হয়। কি করবে কি, এল-বিয়ে পাশ করে কি মেয়ে ইস্কুলে মাষ্টারি করবে?

লাবণ্য একটু আহত হয়ে চলে আসবার উপক্রম করতেই সুবালা এসে তাকে জড়িয়ে ধরে অনুনয়ের কণ্ঠে বললে, লাবণ্যদি আপনি ওঁদের কথায় কাণও দেবেন না। ওঁরা কি জানেন আপনি আমাদের কত ভালোবাসেন! সুবালার সুন্দর মুখে লজ্জার ছায়া আর তার সঙ্গে কাতর মিনতি! সুবালার বাসর ঘরেও লাবণ্য এই একই গান গেয়েছিল: 'যে তরণীখানি ভাসালে দু'জনে আজিহে নবীন কাণ্ডারী!' নীহারের পিস্তুতো দাদা আঁর পুষ্পের খুড়তুতো বোনের বিয়েতেও সেই চির পুরাতন গানটিই নতুন করে গাইবার জন্যে বারংবার আবেদন নিবেদন এসেছিলো।

কত নবীন দম্পতী, তারই চোখের সুমুখে তরণী বেয়ে চলে গেল। লাবণ্যের উপর ভার পড়েছে কেবল স্মিতহাস্যে এবং মধুর গলায় তাদের উৎসব সভাকে মুখর করে তুলবার। গঙ্গার ধারের পথটা

সোজা ডাক বাংলায় গিয়ে পড়েছে। তারপর বাঁদিকে একটু ঘুরে কমিশনারের কুঠির দিগন্তবিস্তৃত হাতার ভিতর দিয়ে চলে গেছে। এই রাস্তাটা ধরে লাবণ্য রোজ বেড়ায়। কমিশনারের বাংলোর পাশ দিয়ে আসবার সময় নাম-না-জানা কি এক রকম লতার গায়ে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ধরে আছে, সেইদিকে চেয়ে লাবণ্য একটু উন্মনা হ'লো, গঙ্গার পরপারে নীল বনরেখা, তারও ওধারে সন্ধ্যার তটরেখায় সারি সারি দীপমালার মত কৃষক-কুটীরগুলির ক্ষীণ সন্ধ্যাদীপের আলো তার মনকে বিধুর করে তুললো। দুপাশে অচিরা আর চিত্রিতা তখনও সমানে বকে চলেছে, বুঝলেন লাবণ্যদি আমরা দু'জনে মিলে বৌবরণের দিনে 'ওগো বধূ সুন্দরী' ঐ গানটা গাইবো ঠিক করেচি, বেশ হবে না? জানেন বৌদিকে আমরা বিয়ের আগেই দেখে নিয়েচি। কেমন করে জানেন? ক'লকাতায় বাবা যখন মেয়ে দেখতে যান, দাদা আর আমরাও সঙ্গে গিয়েছিলাম। ঠিক হ'লো বৌদিকে তাঁর মা বাবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলে বেড়াতে নিয়ে যাবেন, আমরাও সেখানে যাব। দাদা আবার বিলেত-টিলেত ঘুরে ব্যারিষ্টার হ'য়ে এসেছে কিনা, নিজে দেখে শুনে পছন্দ না করলে তো আর হবে না।

জানেন, বৌদি কিন্তু আপনার মতই এম, এ, পাশ। নামটা কি জানেন? সুলতা—বেশ নাম সুলতা, নয়? আপনার পছন্দ হচ্ছে?

চিত্রিতা একটু বিজ্ঞের ভঙ্গীতে বললে, সুলতা একটা সেকেলে নাম। এম, এ পাশ করা মেয়ের উপযুক্ত নাম মোটেই নয়। মনে নেই রবীন্দ্রনাথের সেই গল্পটা কি নাম ভুলে যাচ্ছি, সেইটে পড়েই না মা তোর নাম রেখেছিলো অচিরা।

লাবণ্য একটু যেন অন্যমনেই পথ চলছিলো, এখন হঠাৎ ব্যগ্র হয়ে বললে, কি নাম তোমাদের যিনি বৌদি হবেন? সুলতা? ক'লকাতায় বাড়ী। আমি এক সুলতাকে চিনি, আমরা একসঙ্গে বেথুন থেকে বি, এ পাশ করে য়ুনিভার্সিটিতে এম, এ পড়তাম। তার বাবার নাম ছিল ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ। বালিগঞ্জের ওইদিকে তাদের বাড়ী, ঠিক লেকের ধারেই।

অচিরা ও চিত্রিতা একসঙ্গে বলে উঠলো, তিনিই নিশ্চয়। বৌদির বাবার নামও ভূপেন্দ্রনাথ। লেকের ধারেই তাঁদের বাড়ী। বা রে, বেশ মজা তো! আপনারা দু'জনে কেমন একসঙ্গে পড়েছিলেন। আবার এখানেও কেমন পাশাপাশি থাকবেন। বেশ মজা হবে, নয়? ঠিক গল্পে উপন্যাসে যেন এমনই পড়া যায়, নয় লাবণ্যদি? লাবণ্য কিছু না বলে একটা নিঃশ্বাস ফেললে। ছোট মেয়ে ওরা সংসারের কিছুই জানে না। জানে না যে, পাশাপাশি বাস করলেই পাশাপাশি থাকা যায় না। সুলতা আর তার মধ্যে এখন আকাশ পাতাল তফাৎ। সুলতা ব্যারিষ্টারের বৌ, নামজাদা গভর্ণমেণ্ট উকীলের পুত্রবধূ, ধনী অভিজাত-দুহিতা আর লাবণ্য স্কলারশীপের টাকায় পড়ে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হয়েচে। সামাজিক পদমর্য্যাদায় তার স্থান লোকে বড় জোর নাসিকা একটুখানি উন্নমিত ক'রে বলবে, স্কুলের মাষ্টারনি! এর চেয়ে বেশি তার আর কিছু প্রাপ্য নয়। অচিরা তখনও বকে চলেচে: আরতো মোটে তিন দিন দেরী দাদার

বিয়ের। এই ক'দিন আর স্কুলে যেতে পারবো না লাবণ্যদি! বিকেলের দিকে আপনার ওখানে কাল থেকে যাব গান শিখতে।

লাবণ্য এর আগে অনেক বিবাহ সভায় গান করেচে, অনেক উৎসবমুখর রাত্রি তার হাসিতে, ব্যক্তিত্বে, সৌজন্যে অপরূপ হ'য়ে উঠেচে। কিন্তু সুলতার ফুলশয্যার দিনে সে সহজভাবে কিছুতেই যেন সবারই সঙ্গে যোগ দিতে পারচে না। সুলতা কী সুন্দর হয়েচে দেখতে! দু'জনকে চুলচেরা বিচার করে মিলিয়ে দেখলে লাবণ্যই বেশি সুন্দরী একথা স্বীকার করতেই হবে। লাবণ্যের গায়ের রং শুভ্র, তার নাক মুখ চোখ নিখুঁত। কে যেন তুলিতে এঁকেচে। বাঁশির মত নাক, আকর্ণ বিস্তৃত চোখ, ধনুকের মত বাঁকা ভ্রূলতা, তন্বী দেহবল্লরী। কিন্তু আবার একথাও সবাই স্বীকার করবে যে, সুলতাকে আজকের রাত্রিতে লাবণ্যের চেয়ে অনেক ভালো লাগছে দেখতে। একেই কি কবিরা বলেন, ভাষাতীত ব্যঞ্জনা? বস্তুপুঞ্জের অতীত সূক্ষ্ম কোন আলোকধারায় সে যেন এইমাত্র স্নান করে এসেছে। ফুলের মালায় মালায় তাকে আচ্ছন্ন করে তুলেছে সবাই···এমন সময় লাবণ্য একটি সুন্দর গোলাপের তোড়া হাতে করে নূতন বৌয়ের সামনে এসে দাঁড়ালো! সুলতা কয়েক মুহূর্ত তার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে বললে: তুমি এখানে লাবণ্য!

অচিরা হাততালি দিয়ে হেসে উঠলো: কী মজা, আমি আগে কিচ্ছু বলিনি। লাবণ্যদিকে দেখে প্রথমে বৌদি কী রকম অবাক হ'য়ে যাবে তাই ভাবছিলাম।

সত্যি সুলতা খুব অবাক হয়েছে কিন্তু খুসী হয়েছে তার চেয়েও বেশি। নূতন জীবনের মুখে পুরোন দিনের স্মৃতিজড়িত এমন একটি সান্নিধ্য লাভ করবার কথা সে স্বপ্নেও কল্পনা করেনি।

লাবণ্য কিন্তু একটু ম্লান হয়ে রইলো। অনেক বিয়ের সভায় সে গান গেয়েচে কিন্তু আজকের সভায় তার গলা কেঁপে গেলো। কিশোর বয়স থেকে যার সঙ্গে বন্ধুত্ব, একি তার প্রতি ঈর্ষা? না, তা নয় কিন্তু নবজীবনের যে উর্ম্মিমুখর স্রোতের কলগান এতদিন সে মন দিয়ে শোনে নি, একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পাশ কাটিয়ে দাঁড়িয়েছিল, আজ হঠাৎ সেই ঢেউয়ের ধাক্কা তার তরুণ মনে এসে আঘাত করলো। মনে মনে হয়তো নিজের অজ্ঞাতেই একবার তুলনা করে দেখেছিল, এমনই ঘরে এমনই আলোকমুখরিত উৎসবের মাঝে সে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আসনে ব'সতে পারতো; এতটুকু বেমানান হ'তো না যদি কেবলমাত্র সে ধনীর দুহিতা হো'ত।

প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়, লাবণ্য স্কুল থেকে এসে তার নিজের ঘরের দক্ষিণদিকের জানালাটি খুলতেই চোখোচোখি হ'য়ে গেল সুলতার সঙ্গে। সুলতা তখন গা ধুয়ে ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছিল। মালী ফুল দিয়ে গেছে ঘরে, তারই থেকে বড় একটি গোলাপ বেছে নিয়ে সে সযত্ন-রচিত কবরীতে গুঁজে দিচ্ছে। লাবণ্য জানালার কাছ থেকে সরে এ'ল। একান্ত নিবিষ্ট প্রসাধনরতা সুলতা তাকে দেখতে পায়নি। তার নিজের ঘরের আয়নাটার কাছে দাঁড়িয়ে আপন চেহারার পানে চেয়ে সে দেখলে, গোলাপ নিয়ে আবিষ্ট প্রসাধনের তার সময় কোথা! পাঁচ ছ'ঘণ্টা স্কুলের পরিশ্রমের পর মুখে বিবর্ণ, বিশীর্ণ,

ক্লান্তি রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে। কিছুক্ষণ আনমনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাবণ্যের মুখে দৃঢ়সংকল্পের রেখা ফুটে উঠ্‌লো। এখানে চাকরি নেবার আগে ইংরিজী সাহিত্যের একটা বিশেষ যুগের বৈশিষ্টতা নিয়ে সে গবেষণার কাজে নিযুক্ত ছিলো, ডক্টরেট উপাধির জন্যে, স্থির করলে আবার সেই লেখাটায় হাত দেবে। পরের দিন থেকে সে লেখাপড়ার কাজে তন্ময় হয়ে গেল। ডাকে প্রতিদিন তার নামে রাশি রাশি বইয়ের পার্শেল আসতে লাগ্‌লো। ক'লকাতার নানা লাইব্রেরী থেকে দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ করে আনবার ব্যবস্থা করলে। দক্ষিণদিকের জানালা খোলাই থাকে। অজস্রদক্ষিণা বাতাস, অকৃপণ জ্যোৎস্না তার ঘরের আনাচে-কাণাচে এসে লুটিয়ে পড়ে; কিন্তু লাবণ্যের চেয়ে দেখবার সময় নেই। টেবিল-বাতি জ্বেলে রেখে সে গভীর রাত্রি অবধি লেখাপড়ার কাজে ডুবে থাকে। এই অত্যধিক পরিশ্রমে তার দেহলতা আরও শীর্ণ হয়ে গেছে কিন্তু মুখে-চোখে একান্ত তপস্যার একটি স্নিগ্ধ জ্যোতি ফুটে উঠেচে। লাবণ্যের তপস্যা বৃথা গেল না। কিছুদিন কেটে গেল, তারপর সমস্ত কাগজে শ্রীযুক্তা লাবণ্য দেবীর অসামান্য সাফল্যের কথা আড়ম্বরের সহিত ঘোষিত হ'লো। স্কুলে এবং তাও মফঃস্বলের স্কুলে শিক্ষকতা করতে করতে এমন অপূর্ব্ব জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ মৌলিক গবেষণা করা যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই দুরূহ। নারীকে আজ জ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে আসন পেতে দেবার শুভমুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়েচে। শুধু এদেশে নয় য়ুরোপেও লাবণ্যের খ্যাতি তার বিলিতী কাগজে সাহিত্য-সম্পর্কিত নানা লেখার ভিতর দিয়ে ছড়িয়ে গেল। এখনও ক'লকাতার কত লোভনীয় কাগজের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সে যে কেন এই মফঃস্বলের শহরে রয়েচে লোকের সে এক বিস্ময়। লাবণ্য বলে, এই নিরালা বনময় আবেষ্টনে তার লেখার সুবিধে। এখানকার এই নির্জ্জনতা, এই গঙ্গাতীর, এই অবাধ মুক্ত প্রকৃতি তার মনকে অভিনিষিক্ত করে রাখে। অচিরা আর চিত্রিতা আর আমোল পায় না। বড় একটা জিনিষের সামনে ছোটরা সহজেই সঙ্কুচিত, ভীত ভাব অনুভব করে। তাদের কলাপাতায় মোড়া কুলের আচার, তাদের ছোটখাট উপহার, তাদের শতবার করে আসা-যাওয়া কখন আপনিই মুছে গেছে। ওদিকে দৃক্‌পাত করবার অবসর লাবণ্যেরও ছিলো না। এমন সময় হঠাৎ একদিন ঘটা করে অচিরাদের বাড়ী থেকে নিমন্ত্রণ এলো। ক্রীসমাসের শুভ পুণ্যদিন স্মরণ করে সুলতার স্বামী ব্যারিষ্টার সাহেব বড়দিন যাপনের জন্য লাবণ্যকে আমন্ত্রণ করেচেন। নিমন্ত্রণকার্ড হোষ্টেস্ সুলতা দেবীর নামেই ছাপা হয়েচে। লাবণ্য মনে মনে একটু হাসলে। এতদিন ব্যারিষ্টারসায়েবদের পক্ষ থেকে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় নাই, বরঞ্চ একদিন অধিক রাত্রিতে কথঞ্চিৎ অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় বাড়ী ফিরে তিনি একটু উচ্চস্বরে ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর স্ত্রী সামান্য একটা স্কুল মাষ্টারনির সঙ্গে বেশি মাখামাখি করলে সমাজে প্রেষ্টিজ রাখা দায় হবে। সুলতা তাড়াতাড়ি সামনের জানালাটা বন্ধ করতে এসেছিল পাছে লাবণ্যের কানে যায়। কিন্তু কথা যেখানে পৌছাবার পৌছেছিল। তবু আজ সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলে। সন্ধ্যেবেলায় গ্রামোফোনের রেকর্ডে সস্তা বিলিতী ব্যাণ্ডের গৎ বাজছিল, টেবিলের উপর ক্রীস্‌মাস কেক্ রাখা, বাতি জ্বলছে। হ্যাট্ রাখবার র‍্যাক্‌টায় ক্রমশঃ টুপি জমে উঠছে। আয়োজন সম্পূর্ণ, অতিথিরাও একে একে সমবেত হচ্ছেন; এমন সময় লাবণ্য শান্তমুখে ধীর পদক্ষেপে ঘরে ঢুকলো। ব্যারিষ্টার সায়েব তাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করে ইংরিজী কণ্টকিত

দুএকটা বাংলা শব্দ যোগে যা বল্লেন, তার মোটামুটি অর্থ এইরকম দাঁড়ায়:—বাংলায় সেই যে একটা কথা আছে গেঁয়োযোগী ভিখ্ পায় না, এক্ষেত্রেও হয়েচে তাই। নাকের ডগায় এমন বিদুষী আছেন সে কথা তাঁরা জানতেনই না, যদি না কাল একটা নামজাদা বিলিতী কাগজে লাবণ্য দেবীর ফটো আর লেখার অজস্র স্তুতি এবং সংক্ষিপ্ত জীবনী তাঁদের চোখে না পড়তো। এমন কি স্বয়ং কমিশনার সায়েব আজ ডেকে বল্লেন, বোস, আমাদের এই সহরের স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী এমন এ্যাকমপ্লিশ্‌ড্! এ যে আমাদেরই গর্ব্ব! আমি এখনই গভর্ণমেণ্টের কাছে আন্দোলন করে মেয়েদের এই হাইস্কুলের সঙ্গে মেয়েদের একটা প্রথম শ্রেণীর কলেজ যোগ করে দেব। এঁকেই হতে হবে প্রিন্সিপাল। বোস সায়েব তখন সবিনয়ে নিবেদন করেচেন, লাবণ্যদেবীর সঙ্গে তাঁদের বিশেষ অন্তরঙ্গতা। বোস সায়েবের স্ত্রী আর লাবণ্য দেবী একসঙ্গে বরাবর এম, এ পর্য্যন্ত পড়েচেন। আজ কমিশনার সায়েবেরও এখানে নিমন্ত্রণ আছে। লাবণ্য দেবীর সঙ্গে চাক্ষুষ আলাপ পরিচয় হ'লেই শীঘ্র তিনি কলেজের প্রোপোজালটা পেষ ক'রবেন।

লাবণ্য এত কথার প্রত্যুত্তরে কিছুই বললেনা। সোফায় ব'সে নিঃশব্দে কেবল একটু হাসলে। তার চোখ গিয়ে পড়লো সুলতার নিপুণরচিত কবরীর উপর। মশালের মত উঁচু করে বাঁধা এলো-খোঁপার উপর সেদিনও রক্তরঙের একটা গোলাপ রয়েচে অগ্নিশিখার মত ঊর্দ্ধমুখী হয়ে। চেয়ে চেয়ে তার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো।

পার্টি শেষ হতে একটু রাত হয়েছে। কিন্তু লাবণ্যের রাত্রি জেগে লেখাপড়া করাই অভ্যেস। টেবিল-বাতির সামনে বসে একমনে একটা অর্দ্ধসমাপ্ত লেখা সে শেষ করছিল। জানালাটা খোলা। তার প্রশান্তমুখে নিবিড় তন্ময়তার ছাপ। সুলতা শয্যাগ্রহণ ক'রবার আগে সেইদিকে চেয়ে নিজের অজ্ঞাতেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। পাশাপাশি, অথচ কত দূরে। একদিন রাত্রি জেগে সে'ও লাবণ্যর মত পড়াশোনায় ডুবে গিয়ে গভীর আনন্দ পেয়েছিল। সেদিন যেন জন্মান্তরের। সারাদিন ইংরিজী বুকনি-খচিত কথা, সাজসজ্জা, রেকর্ডে জ্যাজ্ বাজনা আর সামাজিকতার বাঁধা বুলি আওড়িয়ে তার মন ক্ষতবিক্ষত। কাপড়টা বদলিয়ে মাথার খোঁপাটায় হাত পড়তেই সেই গোলাপটা হাতে ঠেকলো তার। এটা আবার কেন! একটু অভিমান ভরে ফুলটা খুলে সে ছুঁড়ে দিলে। বোস সাহেবের সেদিন বড়দিনের পুণ্যবাসর যাপন করতে পানীয়টা কিছু অতিমাত্রায় উদরস্থ হয়েছিল। সাধারণ নিয়মবশতই তিনি গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। ফুলটা সজোরে নিক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর পায়ের কাছে গিয়ে পড়লো।

সুলতা উঠে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালো ··একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিশে গেল···

লাবণ্য তখন হাতের লেখা বন্ধ করে দিয়ে, চোখ বুঁজে ভাবে, সুলতার কবরীতে সেই রক্ত-গোলাপ··· একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিশে যায়···

মাঝখানে আকাশে হাসে চতুর্দ্দশীর চাঁদ!

ভারতের সুবিখ্যাত নৃত্যনিপুণা ছায়াচিত্র শিল্পী শ্রীমতী সাধনা বসু বলেন —

ওটীন ক্রীম অপরিহার্য্য

নাচ ও ছায়াচিত্র জগতের অপরাপর সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতৃবৃন্দও এই অভিমত সমর্থন করেন।

OATINE CREAM is indispensable for my toilet. I have been using it for a long time, and find it delightful, and extremely necessary to preserve a perfect skin.

Sadhona Bose

Oatine

SNOW *for* **DAY • CREAM** *for* **NIGHT**

বনস্পতির দুঃখ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

অনেক ধাক্কা খেতে খেতে শেষ বয়সে বামাচরণবাবু যেন একটু দাঁড়িয়েছেন বলে মনে হয়। ছেলেরা প্রায় সকলেই রোজগার করছে। পুরোনো দেনাপত্র শোধ হয়েছে, বাড়িখানার যৌবন ফিরে এসেছে, অর্থের অভাব আর নেই। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, সংসারে মানুষ যা চায় তার সবই তিনি পেয়ে গেছেন।

তবু তাঁর মনে শান্তি নেই। বাইরের কেউ জানে না, এমন কি তাঁর স্ত্রী পর্যন্ত না—শুধু তিনিই জানেন, তাঁর মনে শান্তি নেই।

বড় ছেলে এসেছে পাঁচ বৎসর পরে এলাহাবাদ থেকে সপরিবারে তিন মাসের ছুটি নিয়ে। ফুলের মতো ফুটফুটে তার ছেলে মেয়ে। এই অজ পাড়া-গাঁয়ে কি করে তাদের যত্ন করবেন, সে একটা চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছুই এখানে পাওয়া যায় না। ঘরে দুধ আছে, গুড় আছে, মুড়ি আছে, চিঁড়া আছে। কিন্তু সেকি তাদের মুখে রুচবে? ওরা মানুষ হয়েছে যে অন্য রকমে। বামাচরণবাবুদের মতো ক'রে তো নয়। ওদের সাজ-পোষাক চালচলন দেখে বামাচরণবাবুর বেশ চিন্তা হয়েছে।

এই কুসুমপুর গ্রামখানি বড় নয়। হাজার দুয়েক লোকের বাস হবে। অধিকাংশই দরিদ্র কৃষক। কিছু ব্রাহ্মণ-কায়স্থ আছে। তাঁদের কেউ গ্রামের স্কুলে মাষ্টারী, কেউ বা বাইরে-বাইরে চাকরীও করে। কিন্তু অধিকাংশই বিশেষ কিছু করে না। বামাচরণবাবুই এই গ্রামের ষোলোআনা জমিদার। জমিদারীর আয় অবশ্য বেশী নয়, কিন্তু দাপ যথেষ্ট। কেউ ভয়ে, কেউ বা ভক্তিতে বামাচরণবাবুকে যথেষ্ট খাতির ক'রে চলে।

কিন্তু পাড়াগাঁয়ের জমিদারের চাল-চলন খুব ভারি নয়, নিতান্তই শাদা-মাটা। পোষাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া, আচার-ব্যবহার গ্রামের আর পাঁচ জনের মতো নিতান্তই সাধারণ এবং গ্রাম্য। নাতি-নাতিনীদের চাল-চলনে তিনি ভড়কে গেলেন। তারা ঘণ্টায়-ঘণ্টায় পোষাক বদলায়। এক একটা ছেলে মেয়ের যে এতগুলো করে পোষাক দরকার হয় একথা ভাবতে তাঁর বিস্ময়ের আর শেষ থাকে না। নিজের স্ত্রী এবং পুত্র কন্যার জন্যে এত বড় অপব্যয় লোকে কি ক'রে করে, তাঁর কালের বিচারে তিনি তার থই পান না।

তবু উপায় কি!

কতকাল পরে তাঁর কত আদরের নাতি-নাতিনী, তাঁর কত স্নেহের পুত্র-পুত্রবধূ এসেছে। যেমন ক'রেই হোক, তাদের সাধ মেটাতেই হবে। নইলে তিনি কিছুতেই শান্তি পাবেন না।

গ্রামের এক প্রান্তে জেলাবোর্ডের বড় রাস্তার ধারে কিনু ময়রার মুড়ি-মুড়কির দোকান আছে। রাহী লোক যাওয়া-আসার পথে সেইখানে বিশ্রাম করে, কিছু-কিছু মুড়ি-মুড়কি কিনে খায়। ওরই মধ্যে যারা একটু সৌখীন লোক, রোদে রাস্তা হেঁটে এসে মুড়ি-মুড়কি চিবুতে পারে না, তাদের জন্যে ভাগ্যক্রমে বোঁদেও পাওয়া যায়। সেরকম খদ্দের তো বেশি পাওয়া যায় না। সুতরাং অধিকাংশ লোকের ভাগ্যেই বাসি বোঁদে জোটে। কড় কড়ে শুকনো বোঁদে, তার উপরে চিনি জমে গেছে। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের রাহী লোক, তাই যে তারা কত পরিতৃপ্তির সঙ্গে খায় চোখে না দেখলে বোঝা যায় না।

গ্রামে ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে কিনুই রসগোল্লা-পান্তুয়া তৈরী করে। বামাচরণবাবু কিনুকে ডেকে পাঠাতে সে জোড়হাতে এসে দাঁড়ালো।

—কি হুকুম বাবু!

—আমাকে কিছু মিষ্টি তৈরি করে দিতে হবে যে বাবা।

হাসলে ওর সর্বশরীর আন্দোলিত হয়ে ওঠে।

একগাল হেসে বললে, বেশ তো বাবু। নাতি-নাতিনীরা শহর থেকে এসেছে। মিষ্টি তো তৈরি করতেই হবে। আজই আমি এসে ভিয়েন চড়াব।

বামাচরণবাবু বললেন, কিন্তু রাম মুখুয্যে মহাশয়ের শ্রাদ্ধে যেমন পান্তুয়া হয়েছিল, তেমনি পান্তুয়া আমাকে তৈরি করে দিতে হবে।

—আজ্ঞে, তার চেয়ে ভালো পান্তুয়া হবে। কিছুমাত্র চিন্তা করবেন না আপনি।

কিনু হাত নেড়ে বামাচরণবাবুকে আশ্বস্ত ক'রে চলে গেল।

দুপুরে খেতে বসে বড় ছেলে বিনয়ের সঙ্গে বামাচরণবাবুর কথা হচ্ছিল:

বিনয় জিগ্যেস করলে, সাধনকে দেখছিনে বাবা?

সাধন বিনয়ের সর্বকনিষ্ঠ ভাই।

বামাচরণবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, তাকেই নিয়ে ভাবনা হয়েছে বিনয়। তুমি এসেছ, এর একটা ব্যবস্থা ক'রে যাও।

বিনয় বললে, তার জন্যে ভাবনা কিসের বাবা! অমন ভালো ক'রে এম-এ পাশ করেছে, আজকের বাজারে তার কি চাকরীর অভাব হবে! চলুক না আমার সঙ্গে।

—সেইটেই তো ভাবনার কথা। চাকরী সে করবেনা বলছে।

—ব্যবসা করবে? সে তো আরও ভালো। কিছু টাকা তাকে দিন। ক'লকাতায় রতীনের কাছে থেকে একটা ব্যবসা ফাঁদুক। তার চেয়ে ভালো আর কিছুই হতে পারে না।

এবার অসহিষ্ণুভাবে হাত নেড়ে বামাচরণবাবু বললেন, ওরে না বাবা, চাকরী কি ব্যবসা কিছুই সে করবে না।

বিনয় সবিস্ময়ে বললে, তবে!

—সে দেশের কাজ করবে। তোমরা আসবে বলে পরশু থেকে কত আনন্দ সে করছিল। কাল হঠাৎ খবর পেলে পাশের গ্রামে মুসলমান পল্লীতে কলেরা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। কে কার মুখে জল দেয় এমনি অবস্থা। খবর পেয়েই তার দল নিয়ে সেখানে সে ছুটেছে।

—সর্বনাশ! আপনি নিষেধ করেননি?

—সে কি আমাকে জানিয়ে গেছে? না, নিষেধ করলেই শুনতো?

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন।

একটু পরে বামাচরণবাবু বললেন, তোমরা এসেছ জানে। সুতরাং যতক্ষণের জন্যেই হোক, আজ বিকেল নাগাদ একবার আসবে ব'লে আশা করছি।

—সেইটেই ভয়ের কথা বাবা।

—কেন?

—ছেলেপুলের বাড়ী। ছোঁয়াচে রোগ ঘেঁটে আসছে। কলেরার টিকেও বোধ হয় নেয়নি।

—না।

—তাহ'লে?

বামাচরণবাবু চিন্তিত হলেন। স্থির করলেন, এখনই একজন লোক পাঠিয়ে তাকে আসতে নিষেধ করবেন। সত্যিই তো ছেলেপুলের বাড়ী। ভয়ের কথা তো আছেই।

কিন্তু এ কী অশান্তি!

খেতে-খেতে বিনয় আবার জিজ্ঞাসা করলে, রতীনের খবর কি?

বামাচরণবাবুর তিন ছেলে। মেজ রতীন ক'লকাতায় একটা মিশনারী কলেজে অধ্যাপনা করে। এবং আরও বোধ হয় কিছু কিছু করে। সে একেবারে সাহেব মানুষ। সাজ-পোষাক থেকে চুরুট খাবার ভঙ্গিতে পর্যন্ত।

বামাচরণবাবু বিরক্তভাবে বললেন, জানিনে।

—কাছেই তো থাকে। মাঝে-মাঝে আসে না?

—কচিৎ।

উভয়েই নিঃশব্দে আহার করতে লাগলেন।

একটু পরে বিনয় আবার জিজ্ঞাসা করলে, সেই যে কথাটা তার সম্বন্ধে শোনা যাচ্ছিল, সেটা সত্যি না মিথ্যে?

এই আশঙ্কাই বামাচরণবাবু করছিলেন।

একটি বিধবা কায়স্থ কন্যাকে রতীন বিবাহ করতে যাচ্ছে, এই খবরটা এই গ্রামের রতীনের কয়েকজন বন্ধুর মারফৎ মাসকয়েক আগে বামাচরণবাবুর কাণে এসে পৌছেছিলো। এর মধ্যে রতীন আর গ্রামে

আসেনি। খবরটা এমনি যে, বামাচরণবাবু এ সম্বন্ধে তাকে কোনো পত্রও দিতে পারেননি। সুতরাং খবরটির সত্যমিথ্যা সম্বন্ধেও নিশ্চিতভাবে কিছু জানতে পারেন নি।

বললেন, কে জানে সত্যি না মিথ্যে। সে আসেওনি, কোনো খবরও দেয়নি। তুমি জানলে কি ক'রে?

—আমাকেও ওর একটি বন্ধু চিঠি দিয়েছিলো। ব্যাপারটা সত্যি কি না জানবার জন্যে আমি রতীনকে চিঠিও দিয়েছিলাম।

—তারপরে?

—সে জবাব দিয়েছিল। কিন্তু বিয়ে সম্বন্ধে কোনো উল্লেখই করেনি। তাইতেই সন্দেহ হচ্ছে, খবরটা হয়তো একেবারে মিথ্যে নয়।

বামাচরণবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বললেন, লোকে বলে আমি খুব সুখে আছি। এই তো আমার সুখ! এক ছেলে সাহেব—সে যে কখন মুখ হাসাবে ঠিক নেই। এক ছেলে স্বদেশী, সেও যে কখন কি ক'রে বসে ভাবতে গেলে গলা শুকিয়ে যায়। এই আনন্দে আমি রয়েছি!

বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, এখানকার ডাক যায় কখন?

—সে অনেকক্ষণ চলে গেছে। সকালেই ডাক যায়। কেন?

—রতীনকে একখানা চিঠি লিখব ভাবছি। কতদিন পরে এলাম, তাকে দেখতে বড় ইচ্ছা করছে। আসবার জন্যে একখানা চিঠি লিখে দিই, কি বলুন?

বামাচরণবাবু খুশি হ'য়ে বললেন, বেশ তো। আমার কাছে একখানা পোষ্টকার্ড আছে বলে মনে হচ্ছে। খুঁজে তোমাকে দিচ্ছি। আজ চিঠি লিখলে কালকের ডাকে যাবে। পরশু সে পেয়ে যাবে। সামনেই গুডফ্রাইডের ছুটি। সেই ছুটিতে তাকে আসতে লেখো। দিনকয়েক থাকতেও পারবে।

বিনয় হেসে জিজ্ঞাসা করলে, সে কি দুর্দান্ত সাহেব হয়েছে?

—কি জানি বাবা। সকালে দু-চোঙা পরে বেরিয়ে এল, আমি ওর দিকে চাইতে পারলাম না। অন্য ঘরে চলে গেলাম।

বিনয় বুঝলে, বামাচরণবাবু পায়জামার নাম জানেন না। মনে-মনে সে হাসলে।

বামাচরণবাবু বললেন, সে যা-খুসি পরুক বিনয়, তার জন্যে কিছু বলিনে। কিন্তু মুরগীর ডিম খায়! বামুনের ছেলে মুরগীর ডিম খায়, শুনেছ কখনও? আমি নিজে দেখিনি অবশ্য, তবে শুনেছি গলার পৈতেটাও ফেলে দিয়েছে! বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের বাড়ী, সামনে রাধাবল্লভের মন্দির। সেই বাড়ীর ছেলের এই মতিগতির কথা যখন ভাবি, সত্যি বলছি বিনয়, তখন আমার পেটের মধ্যে হাত-পা ঢুকে যায়! রাত্রে ঘুমুতে পারিনে।

—অন্যায়!

কোনোরকমে মুখ নিচু ক'রে এই একটা কথা বিনয় বলতে পারলো, তার পেটের ভেতরটা হাসির চোটে গুলিয়ে উঠছিলো। মুরগী সে নিজেও সপরিবারে খায়।

বামাচরণবাবু উঠতে উঠতে বললেন, আমি এখনই পোষ্টকার্ডখানা তোমার ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। বেশ ভালো ক'রে লিখে দাও রতীনকে আসতে। আমার বিশ্বাস আসবে। তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে নিশ্চয়ই আসবে। সামনে ছুটিও পাবে গুডফ্রাইডে'র।

পুত্র স্নেহাতুর পিতা চিঠি লেখার কথাটা আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে গেলেন। জীবনের অপরাহ্নকালে সব ক'টিকে একত্রে দেখবার জন্মে তাঁর প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। প্রজারা বামাচরণবাবুকে দুর্দান্ত জমিদার বলেই জানে। তাঁর দাপটে বাঘে-বলদে একঘাটে জল খায়। প্রয়োজন হ'লে তিনি যে কত নিষ্ঠুর হতে পারেন তাও তারা স্বচক্ষে দেখেছে। তাঁর শক্তিকে তারা ভয় পায়, সমীহ করে। কিন্তু যেখানে তিনি পিতা, সেখানে যে তিনি কত অসহায় এবং কত দুর্বল, বামাচরণবাবুর অন্তর্যামী ছাড়া সে কথা আর কেউ জানে না। হৃদয়ের অন্তঃস্থলের সেই দুর্বলতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সন্তর্পণে এবং সতর্কতার সঙ্গে তিনি পদক্ষেপ করেন। তাঁর জমিদারী নীলরক্ত ধীরে প্রবাহিত হয়।

ফাল্গুন শেষ হয়ে সবে চৈত্র পড়েছে। গাছের পাতায় সবুজ ক্রমেই গাঢ় হয়ে আসছে। গরমের আভাষ জাগছে, কিন্তু শীত এখনও একেবারে শেষ হয়নি। পাখীরা একটি-দুটি করে ডাকতে আরম্ভ করেছে।

ইতিমধ্যে বৃষ্টি নামলো। ভোর থেকে সুরু হয়েছে, সমস্তদিন গেল এর আর বিরাম নেই।

সন্ধ্যের ট্রেনে আসবে রতীন। একে সে সহজেই দেশে আসতে চায় না। তার উপর এই বৃষ্টি এবং কাদা!

বামাচরণবাবু তার জন্মে চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

স্টেশন দূরে নয়, মাইল খানেকের মধ্যে। কিন্তু এই পথটাই বা সে আসবে কি করে? আলো-ছাতা নিয়ে লোক অবশ্য একজন যাচ্ছে তাকে নিয়ে আসতে। কিন্তু পথের কাদার কথা ভেবেই বামাচরণবাবু উদ্বেগবোধ করতে লাগলেন।

—ও বিনয়, স্টেশনে গরুর গাড়ীটা পাঠাবো না কি?

—গরুর গাড়ী? কি ব্যাপার?

—রতীন আসছে যে সন্ধ্যার ট্রেনে। টেলিগ্রামখানা দেখনি?

—দেখেছি। কিন্তু এইটুকু পথ, গরুর গাড়ী না গেলে সে আসতে পারবে না?

—না, না। পথের জন্মে তো নয়। কিন্তু কোট-পেণ্টুলুন প'রে এই কাদায় হাঁটা কি তার সুবিধা হবে?

বাবার স্নেহকাতর মুখের দিকে চেয়েও বিনয় বিরক্ত না হয়ে পারলো না। বললে, কিচ্ছু অসুবিধা হবে না বাবা। সে যত সাহেবই হোক, এই গ্রামেরই তো ছেলে! জল-বৃষ্টি-কাদা, এখানকার কিছুই তার অপরিচিত নয়।

—তাহলে থাক।

ব'লে বামাচরণবাবু চলে যাচ্ছিলেন।

বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, সাধন কি আজও চলে গেছে সেইখানে?

আকাশে হাত তুলে বামাচরণবাবু বললেন, আজও? তুই ভাবছিস কি বিনয়? ওর তো এখন মরশুম পড়ে গেছে। একমাসের মধ্যে তুমি আর ওর টিকি দেখতে পাবে না। আমি তোদের ব'লে রাখছি বিনয়, দেখবি ও একদিন অপমৃত্যু মরবে। হয় কলেরা-বসন্তর হাতে, নয় সাপে কেটে।

বামাচরণবাবু ক্রুদ্ধভাবে চলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তাহ'লে গরুর গাড়ী আর পাঠাবার দরকার নেই। কি বল?

—না, না।

—তাহলে বংশী একটা আলো আর ছাতা নিয়ে চলে যাক। ও বংশী! সে ব্যাটা আবার কোথায় পালালো দেখ।

বংশী শিশুকাল থেকে এই বাড়ীতেই মানুষ। বামাচরণবাবুর পেয়ারের চাকর ব'লে গ্রামের মধ্যে তার একটা খাতিরও আছে। বাবু এবং গিন্নীমা উভয়েই তাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। তার ফলে সে বেজায় কুড়ে হয়ে পড়েছে। শ্রমসাধ্য কাজে হাত দেবার চিন্তাতেই তার জ্বর আসে। স্টেশনে রতীনকে এই বৃষ্টিতেও আনতে যেতে তার আপত্তি নেই। কিন্তু রতীনকে সে চেনে। রতীন যে পরিমাণে সাহেব সেই পরিমাণে কৃপণ। সহজে তার হাত দিয়ে জল গলে না। বংশীকে দেখলে নির্ঘাত সে মোট-পোঁটলা বংশীর ঘাড়ে চাপাবে, কুলী করবার নামও করবে না।

মোট বইতেই বংশীর আপত্তি। সুতরাং বামাচরণবাবু কিছুতেই তার সাড়া পেলেন না। অগত্যা কেষ্ট গেল। আর বামাচরণবাবু ভাবতে লাগলেন, কেষ্ট তাকে খুঁজে পেলে হয়।

বামাচরণবাবু একবার ঘর একবার বার করেন আর থেকে-থেকে ঘড়ি দেখেন।

—ওরে ন'টা বাজে যে! কেউ তো ফিরলো না।

বংশী তামাক সেজে কল্‌কেটা গড়গড়ার উপর বসাতে বসাতে বললে, আজ্ঞে ট্রেন এখনও তো যায়নি।

—না, যায়নি। তুই ব্যাটা তো ট্রেনের সবই জানিস।

—আজ্ঞে, ট্রেন গেলে শব্দ পাওয়া যেত।

—শব্দ পাওয়া যেত! ব্যাটাকে বললাম যেতে। ফাঁকিবাজটা কোথায় সরে পড়লো। এখন ট্রেনের শব্দ শুনছে ঘরে বসে-বসে!

বংশী আর সাড়া-শব্দ না দিয়ে পালালো।

একটু পরেই ঝুপ ঝুপ ক'রে ছাতা মাথায় দিয়ে লোক আসার শব্দ পাওয়া গেল। সঙ্গে-সঙ্গে ভিতর থেকে নারীকণ্ঠের কলরব শোনা গেল: এই যে, এরা এসে গেছে!

কে এসে গেছে, না বললেও বোঝা যায়।

বামাচরণবাবু নিরুদ্বেগে তাকিয়া ঠেস দিয়ে গড়গড়া টানতে লাগলেন জমিদারী চালে। এই লোকটিই যে একটু আগে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন, সেকথা বোঝবার চিহ্নমাত্রও রইলো না।

বংশী ছুটে এসে ব্যস্তভাবে খবর দিলে, মেজবাবু এসেছেন।

বামাচরণবাবু তার সাড়া দেবারও প্রয়োজন বোধ করলেন না। শুধু নিস্পৃহভাবে শান্তকণ্ঠে বললেন, তামাকটা বদলে দিয়ে যা।

মিষ্টি মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছিলো বিকেলবেলায়। নিমের ফুল ঝরছিলো ঝুরঝুর ক'রে। অনেকদিন পরে রতীন ব'সে আছে একখানা ডেকচেয়ারে নিমতলায়।

বিনয় বললে, গ্রামের ভিতর দিয়ে যাবে না কি একটু বেড়াতে?

গ্রামের সঙ্গে কোনো দিক দিয়েই রতীন যেন সংযোগের নিবিড়তা বোধ করে না। এতকালকার যোগসূত্র শিক্ষা সংস্কৃতি, দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে কেমন যেন শিথিল হয়ে গেছে।

আলস্য ভেঙে রতীন বললে, আপনিই ঘুরে আসুন। কলকাতার কোলাহল থেকে এসে এই নিস্তব্ধতা বেশ লাগছে। কোথাও বেরুতে ইচ্ছা করছে না।

বিনয় আর জেদ করলে না। একাই বেড়াতে বেরুলো। রতীন ব'সে রইলো একা। পাড়াগাঁয়ের নিঝুম অপরাহ্ণ। মাথায় ঝুর ঝুর ঝ'রে পড়ছে নিমফুল নিঃশব্দে। বেশ লাগছে।

কাল সন্ধ্যায় এসেছে রতীন। এর মধ্যে বামাচরণবাবুর সঙ্গে তার একবার মাত্র দেখা হয়েছে। তাও আধ মিনিটের জন্যে।

বামাচরণবাবু জিগ্যেস করলেন, ভালো আছ?

রতীন বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

ব্যস। আর কিছু না। বামাচরণবাবু যেখানে যাচ্ছিলেন সেখানে চ'লে গেলেন। রতীনও চ'লে গেল।

এক'দিন বামাচরণবাবু আর বিনয় একসঙ্গে ব'সে খাচ্ছিলেন। রতীন আসায় বামাচরণবাবু পৃথক ঘরে খেতে বসেন। বিনয় আর রতীন বসে একসঙ্গে।

এর জন্যে রতীনের মনে যে কোনো ক্ষোভ আছে তা নয়। সে নিজেও বাপের সঙ্গে বসে খেতে অস্বস্তি বোধ করে। বস্তুতঃ খাওয়া-দাওয়া, বলতে গেলে সমস্ত ব্যাপারেই, বামাচরণবাবু যে তাকে সম্ভবমতো এড়িয়ে চলেন, এটা অন্য সকলের চোখে বিসদৃশ লাগলেও, তার নিজের চোখেই পড়ে না। বরঞ্চ তার মনে হয়, সেকেলে বৃদ্ধ বাপের সঙ্গে নিতান্ত সাধারণ কুশলপ্রশ্ন বিনিময় ছাড়া আর কি আলোচনাই বা হ'তে পারে? সে বিয়ে করেনি। সংসারী নয়। জমি-জমিদারী, ঘর-বাড়ী, লৌকি-লৌকিকতা, এ সব সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই। সুতরাং বাপের থেকে দূরে-দূরেই সে বরঞ্চ ভালো থাকে।

শুধু বাপের সঙ্গেই নয়, সমগ্র গ্রামের সম্পর্কেই তার এই মনোভাব। গ্রামের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন অথবা পরিচিত লোকেরা কেউ এলে তাদের সঙ্গে নিতান্ত ভদ্রতারক্ষার জন্যেই হেসে দুটো কথা বলে।

নইলে কেউ এলো, কি এলো না, তা নিয়ে তার কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই—কোথাও গিয়ে কারও সঙ্গে দেখা করারও তার আগ্রহ নেই।

গ্রামে কচিৎ-কখনো এলে এইটুকুই তার ভালো লাগে: এই নিমগাছের স্নিগ্ধ ছায়া, এই শান্ত নিস্তব্ধতা এবং এই দূর বিস্তৃত উন্মুক্ততা। তার বেশি এই গ্রামের কাছ থেকে অথবা কোনো গ্রামের কাছ থেকেই সে প্রত্যাশা করে না।

যতদিন অথবা যতক্ষণ সে গ্রামে থাকে, এইখানেই সে অধিকাংশ সময় থাকে—প্রায়ই একা, কখনও কোনো বন্ধুবান্ধবও আসে।

হঠাৎ বাড়ীর ভিতরের দিকের শিকলটা বেজে উঠলো।

রতীন চমকে সেই দিকে চাইতেই দরজার ফাঁক থেকে একখানি হাত ইসারায় তাকে ডাকলে। সঙ্গে সঙ্গে হাতের চুড়িগুলোও বেজে উঠলো।

এবারে আর রতীন না উঠে পারলো না।

নিমগাছের মৃদুমন্দ হাওয়া, ডেকচেয়ারের আরাম-বিলাস ছেড়ে তাকে উঠতে হোল। হাসতে হাসতে সে ভিতরে গেল।

ভিতর মানে, এই ঘরখানিকে ভিতর বললে ভিতর, বাহির বললে বাহির। সদর এবং অন্দরের মধ্যে এই ঘরখানিই সেতুস্বরূপ।

ছেলেবেলায় এইখানিই ছিল ওদের পড়বার ঘর।

বালাখানার প্রকাণ্ড বড় বারান্দায় যখন বামাচরণবাবুদের আড্ডা বসতো—কখনও তাস-পাশা-দাবা, কখনও রামায়ণ-মহাভারত সুর ক'রে পড়া, কখনও বা স্রেফ ভুতের গল্প,—এই ঘরে পড়তে বসে খেলোয়াড়দের চীৎকারে কখনও ওরা উচ্চকিত হয়ে উঠতো, রামায়ণ-মহাভারতের সুরে ওদের মন কখন পড়া থেকে ছুটে চলে যেত পৌরাণিক যুদ্ধক্ষেত্রে, কখনও বা ভুতের গল্প শুনতে শুনতে ভয় ও আনন্দে মেশানো এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করতো।

এই সেই ঘর।

কত কাল পরে এই ঘরে এসে রতীন মুহূর্তকালের জন্যে থমকে দাঁড়ালো। ওই সেই গোল টেবিলটা, আর সেই একহাত-ভাঙা চেয়ার। রতীনের মনে পড়লো, এক গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে এই ঘরে অবিনাশের সঙ্গে খেলা করতে-করতে চেয়ারটা উল্টে পড়ে ভেঙে যায়। তার জন্যে বাপের কাছে এবং দাদার কাছেও কী ভীষণ বকুনীই সে খেয়েছিল!

সেই ঘর···সেই গোল টেবিল···সেই হাতভাঙা চেয়ার! কিন্তু সেই রতীন আজ কোথায়?

বললে, বলো কি হুকুম?

—বিয়ে কি করবে না ঠিক করেছ?

—না। ততদূর এখনও যাইনি।

—তাহ'লে কতদূর গেছ সেটা দয়া ক'রে আমাদের জানাবে?

রতীন হাসলে, খুব মনের আনন্দে হাসলে। এখানে এসে পর্যন্ত তো নয়ই, বোধ করি অনেকদিনই সে এমন ক'রে হাসেনি।

বললে, মনে পড়ে বৌদি, সেইবারেই বোধ হয় তোমাদের বিয়ে হ'ল। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। সবাই যে-যার ঘরে শুয়ে। নীচে লক্ষ্মীর ঘরে আমরা দুজনে তাস খেলছিলাম। হঠাৎ আমার মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি জাগলো।

—হাঁা, হাঁা। মনে আবার পড়বে না? সেই ভত্তি-দুপুরে তুমি বেরুলে বাগান থেকে কাঁচা আম পেড়ে আনতে।

রতীন বললে, ভাঁড়ার থেকে তুমি আনলে নুন-লঙ্কা। সেই আম ছেঁচা হ'ল। দুজনে খেলাম। মনে পড়ে?

বৌদি হেসে বললে, মনে হচ্ছে সে সব যেন সেদিনকার কথা।

—তার পরে কি হ'ল বৌদি?

—কি হ'ল? তোমার জ্বর হয়েছিলো বোধ হয়, না?

রতীন বললে, জ্বর মানে? রীতিমতো টাইফয়েড, ঠিক তার পরদিন থেকেই। বাঁচবার আশা ছিল না। তুমি কি রকম কাঁদতে মনে নেই? তোমার ধারণা হয়েছিল, কাঁচা আম খাওয়ার জন্যেই বোধ হয় আমার অসুখ।

—তা হবে। সে সব ঠিক মনে পড়ে না।

—মনে ঠিকই পড়ে বৌদি। শুধু ছেলেবেলার সেই দুর্বলতার কথা আজ স্বীকার করতে লজ্জা পাচ্ছ। কিন্তু সেদিন যদি আমি মারাই যেতাম বৌদি?

এইবারে বৌদির চোখ ছলছল ক'রে উঠলো। বললে, ছিঃ! ওকথা বলতে নেই। তুমি বিয়ে করবে কি না সেই কথার জবাব দাও।

—জানিনে তো।

—আচ্ছা, একটা কথা আমার কাছে সত্যি বলবে?

—সম্ভব হ'লে নিশ্চয় বলব বৌদি। কি কথা বলো তো? সেই বিয়ের কথাটা তো?

—হ্যাঁ। সত্যিই কি তুমি বিধবা কায়স্থ-মেয়ে বিয়ে করতে যাচ্ছ?

—কিন্তু সে-মেয়েটি বিধবা নয় বৌদি, কুমারী।

—কিন্তু কায়স্থ তো?

—হ্যাঁ কায়স্থ,—অন্ততঃ আমি যতদূর জানি।

বৌদি মাথা নেড়ে বললে, তাহ'লেই হ'ল—আমাদের স্বজাতি তো নয়। কেন, ব্রাহ্মণের ঘরে কি ভালো পাত্রী নেই?

—সে অপবাদ তো দিইনি বৌদি। তোমার সামনে দাঁড়িয়ে সে মিথ্যে অপবাদ দোবই বা কোন্ মুখে?

বৌদি ওর জোড়হাতে কথা বলবার ভঙ্গিতে না হেসে পারলে না। কিন্তু এত সহজে ছেড়ে দেবা মেয়ে সে নয়।

বললে, তা আমাদের ঘর ছেড়ে যখন কায়স্থর মেয়েকে পছন্দ করেছো, তখন কথাটা সেই রকমই দাঁড়ালো বই কি।

—মোটেই সে রকম দাঁড়ালো না বৌদি। কে কখন কাকে কেন পছন্দ করে সে কি কেউ জানে? মেয়েটিকে আমার ভালো লেগেছে। কিন্তু কেন ভালো লেগেছে তা জানিনে।

—তাহ'লে তাকেই বিয়ে করছ তো, বুড়ো বাপ-মার মনে কষ্ট দিয়ে?

—বুড়োদের কষ্ট কে রোধ করতে পারে বৌদি? তাঁদের সে-কাল আর নেই। মানুষ বদলেছে, হাওয়া বদলেছে। সে হাওয়ার সঙ্গে তাল রাখতে না পারলে তাঁদের কষ্ট তো পেতেই হবে। তাহ'লে সমস্ত কথা তোমাকে বলি। আপত্তি যে শুধু তোমাদের তরফেই, ব্রাহ্মণ ব'লে, তা নয়—কায়স্থ হ'লেও তাদের তরফেও ঠিক এই রকম আপত্তি। দীর্ঘকাল যে প্রথা চ'লে আসছে তা ভাঙতে সকলেরই আপত্তি।

—সে তো খুবই স্বাভাবিক।

—নিশ্চয়। কেবল অস্বাভাবিক এইটে যে, তোমরা আমাকে এবং তারা সেই মেয়েটিকে স্বাভাবিক প্রাচীন প্রথায় মানুষ করোনি। আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে ইংরিজি লেখাপড়া শিখিয়েছ।

নারীর কৌতূহল, বৌদি না জিজ্ঞাসা করে পারলে না:

—মেয়েটিও খুব লেখাপড়া শিখেছে বুঝি?

—এবারে এম-এ দিচ্ছে।

—তাই বুঝি? কিন্তু বামুনের মেয়ে এবারে কি একটাও দিচ্ছে না? তাদের কাউকেই পছন্দ করো না কেন?

রতীন হেসে বললে, পশ্চিমে এত সহর ঘুরে বেড়ালে বৌদি, কিন্তু তুমি এখনও সেই সেকেলেই আছ। পছন্দর উপর কি জোর চলে? তা ছাড়া আমি পছন্দ করলেই পতিসৌভাগ্যে আত্মহারা হয়ে তিনিও সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পছন্দ করবেন, তারই বা কি মানে আছে? একালের মেয়েদেরও ঠিক পুরুষের মতোই একটা নিজস্ব মত এবং রুচি আছে, তা জানো না?

বৌদি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলে। তারপর বললে:—

—আচ্ছা, আমরাও মত দিচ্ছিনে, তাঁরাও মত দিচ্ছেন না। এইবারে তোমরা কি করবে?

—তা প্রজাপতি ব্রহ্মাই জানেন। কিন্তু তোমরা এখনই থেকে ব্যস্ত হয়ে মাথাখারাপ কোরো না, এই আমার অনুরোধ।

রতীন আর দাঁড়ালো না। হাসতে-হাসতে পালিয়ে গেল।

•

সেই ডেকচেয়ারটিতে রতীন ফিরে এসে বসলো।

তার একটু পরেই ঝোড়ো কাকের মতো ঝুপ ঝুপ ক'রে এসে সাধন তাকে প্রণাম করলে।

শশব্যস্তে রতীন পা সরিয়ে নিয়ে বললে, থাক থাক। আর প্রণাম করতে হবে না। এই আসছিস?

রতীনের পায়ের ধুলো মাথায় বুলিয়ে সাধন বললে, হ্যাঁ। বড়দা কোথায় গেলেন?

—পল্লীজননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

—আপনি যাননি?

—পল্লীজননীর উপর আমার অনুরাগ বোধ করি বড়দার চেয়ে কম ব'লে।

—সে কি গর্ব ক'রে বলবার কথা মেজদা? যে গ্রামে আমরা জন্মেছি, মানুষ হয়েছি—

—মানুষ তোমরা গ্রামে হওনি ভাই, গ্রামের বাইরেই হয়েছ। গ্রামের ব[illegible] যারা যায়নি, তারা যা মানুষ হয়েছে, সে তো সর্ব্বক্ষণ চোখেই দেখতে পাচ্ছ।

সাধন হেসে ফেললে। বললে, তা খুব দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু মানুষের পরিমাপ যদি হৃদয় দিয়ে করতে হয়, তাহ'লে আমি বলবো, গ্রামে এমন লোক অনেক আছে মানুষ হিসাবে যারা কারও চেয়ে খাটো নয়।

রতীন উত্তরে শুধু একটু উপেক্ষার সঙ্গে হাসলে।

বললে, বোসো, বোসো। তোমাকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে। তোমার রোগীগুলির অবস্থা কি বলো।

—ভালোই, অর্থাৎ যারা মরবার তারা মরে গেছে। যারা মরতে পারলে না, তারা পরবর্তী সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করছে। তারও বোধ হয় দেরী হবে না। বসন্ত আরম্ভ হ'ল ব'লে। তাতেও না কুলোয় ম্যালেরিয়া তো আছেই।

রতীন খুব বিজ্ঞের মতো জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, এই যে পাড়াগাঁয়ের লোকেদের জীবন, একদিন জন্ম নেওয়া এবং আর একদিন ম'রে যাওয়া—এর কোনো সার্থকতা তুমি খুঁজে পাও?

—না। কিন্তু সে কার দোষ মেজদা? পাড়াগাঁয়ের লোকেদের, না এই দেশেরই যাঁরা বড় হ'য়ে বাইরে চলে গেছেন, গ্রামের সঙ্গে অসীম ঘৃণায় যাঁরা যোগসূত্র ছিন্ন করেছেন, তাঁদের?

রতীন উত্তরটা এড়িয়ে গেল। বললে, কি জানি। বোধকরি এই এদের বিধিলিপি। কিন্তু তুমি কি এদেরই মধ্যে সমস্ত জীবন কাটিয়ে দেবে? লেখাপড়া শিখেছ, বড় হবার কোনো চেষ্টা করবে না?

—না মেজদা। একলা বড় হবার উপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে। পারি, এদেরও বড় ক'রে তোলবার চেষ্টা করব। নয়তো এদেরই সঙ্গে এদেরই মতো ছোট হয়ে থাকব।

রতীন হেসে বললে, আমার আশঙ্কা হচ্ছে, সাধন, তাহ'লে সারাজীবন তোমাকে হয়তো ছোট হয়েই থাকতে হবে, বড় হওয়া আর ঘটে উঠবে না।

—না ঘটে ওঠে, তাতেও দুঃখ করব না। তুমি বোসো মেজদা, আমি স্নানটা করে আসি। রোগী ঘেঁটে আসছি।

সন্ধ্যায় রাধাবল্লভের আরতি হয়ে গেল।

বামাচরণবাবু এই সময়টায় নিয়মিতভাবে যুক্তকরে মন্দিরের নাটমন্দিরে এসে দাঁড়ান। ঠাকুরদালানে আধঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে থাকেন তাঁর গৃহিণী। পাড়ার প্রসাদলোভী ক'টি বালক কাঁসর বাজায়। মুচির সঙ্গে জমি চাকরান বন্দোবস্ত আছে, তারা এসে ডগর বাজায়। শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সবাই প্রণাম করে। বামাচরণবাবুর স্ত্রী নিজের হাতে উপস্থিত সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করেন।

আজকেও তার ব্যতিক্রম হোল না। প্রসাদ-বিতরণের শেষে মন্দির অন্ধকার হয়ে গেল। সেই অন্ধকার মন্দির-প্রাঙ্গনে বামাচরণবাবু একা পায়চারী করতে লাগলেন।

বিনয় বেড়িয়ে ফিরছিল।

প্রাঙ্গনে একটি ছায়ামূর্তিকে একা অন্ধকারে পাদচারণ করতে দেখে সে একবার থমকে দাঁড়ালো। ডাকলো: বাবা?

বামাচরণবাবু দাঁড়ালেন। স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, বিনয়? বেড়িয়ে ফিরলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। অন্ধকারে বেড়াচ্ছেন? একটা আলো দেয়নি কেউ?

—আলোর দরকার নেই বাবা। তুমি ভিতরে যাও, হাতমুখ ধোও গে।

বিনয় ভিতরে গেল না। বামাচরণবাবুর কণ্ঠস্বরে সে যেন অশ্রুর আভাস পেল। ধীরে ধীরে এগিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, আপনার শরীর কি ভালো নেই বাবা?

—ভালোই আছে তো?

—কি যেন ভাবছেন মনে হচ্ছে?

—ভাবছি?—বামাচরণবাবু হাসলেন—ভাবনার অনেক কারণ আছে বাবা।

বামাচরণবাবু থামলেন। বিনয় জিজ্ঞাসুভাবে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে পায়চারী করতে লাগলো।

একটু পরে বামাচরণবাবু বলতে লাগলেন:

—ভাবনার অনেক কারণ ঘটেছে বিনয়। বয়স ষাট পেরিয়ে গেল। আমার বাবা মারা যান পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে। আমিও হয়তো তার চেয়ে বেশি বাঁচবো না। তাই যত দিন যাচ্ছে, চারিদিকে চেয়ে ততই ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে। এর আর কোনো কিনারা পাচ্ছি না।

—কী আপনার ভাবনা?

—অনেক। সেইটেই বলব। তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র। এবংশের মান-মর্যাদা এই বংশের কুলপ্রথা রক্ষা করবার দায়িত্ব প্রধানতঃ তোমার। সুতরাং তোমাকে আমার দুর্ভাবনার কথা বলা উচিত। অনেকদিন পরে তুমি এলে। আবার কবে আসবে, তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে কি না তার কিছুই ঠিক নেই। সুতরাং আমার দুর্ভাবনার কথা তোমার এবারেই জেনে যাওয়া দরকার।

বামাচরণবাবু একটু থেমে গলাটা ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিলেন।

বললেন, আমাদের বংশের ইতিহাস তুমি জান। দায়ুদ শা'র আমলে তাঁর দেওয়ান জঙ্গল কেটে এই গ্রামের পত্তন করেন। সেই থেকেই এই গ্রামে আমাদের বাস, এই গ্রামের আমরা জমিদার। সামনে ওই যে মন্দির এও আমাদের পূর্বপুরুষের কীর্তি। ওই বিগ্রহ-মূর্তি আমাদের পূর্বপুরুষ বৃন্দাবন থেকে এনে এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই থেকে এই বিগ্রহের আমরা সেবাইত। রাধাবল্লভ আমাদের কুলদেবতা। কুলদেবতার ভোগ না হওয়া পর্যন্ত আমরা অন্নগ্রহণ করি না, তাঁর আরতির সময় আমরা অনুপস্থিত থাকি না। আমি পর্যন্ত তার ব্যতিক্রম হয়নি। দোল-রাস, বার-ব্রত দেবসেবার যা-কিছু অঙ্গ জ্ঞানতঃ আমি তার ত্রুটি করিনি। ভাবছি, এর পরে কি?

—এর পরেও সে ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি হবে না বাবা।

বামাচরণবাবু অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে হাসলেন।

বললেন, কি করে? তুমি বাইরে চাকরী করো। রতীনটা ম্লেচ্ছভাবাপন্ন, তার কথা ছেড়েই দাও। বাকি সাধন। কিন্তু আমার আশঙ্কা, দেবোত্তরের আয় থেকে এই নাটমন্দিরেই সে হয়তো হাড়ি-বাগ্দী-মুচি-ডোমের ছেলেদের নিয়ে একটা নৈশ-বিদ্যালয় বসাবে। দেবসেবার ত্রুটি হবে, অতিথি-সেবা হয়তো বা বন্ধই হয়ে যাবে।

—যাতে তা না করতে পারে তার একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা ক'রে যান বাবা।

—পাকা ব্যবস্থা?—বামাচরণবাবু আবার হাসলেন, পাকা ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হ'লে আমি কি পরলোক থেকে এসে তার নামে মামলা করব বিনয়, যে পাকা ব্যবস্থার কথা বলছ?

বিনয় বুঝলে কথাটা সত্যি। সে নীরব রইল।

বামাচরণবাবু বললেন, আমার সব কথা আমি হয়তো তোমাদের বোঝাতে পারব না বিনয়। এই গ্রাম, ওই রাধাবল্লভ দেবতা এবং আমাদের বংশ, এ আমার কাছে একসূত্রোয় গাঁথা। এর একটি থেকে আর একটিকে পৃথক করতে গেলেই মালা যাবে ছিঁড়ে। এই গ্রাম এবং রাধাবল্লভঠাকুর থেকে বিচ্ছিন্ন

হলেই আমাদের বংশের বৈশিষ্ট্য চলে যাবে, আমরা তখন নিতান্ত সাধারণ হয়ে যাব, আমাদের বংশের সত্তা যাবে হারিয়ে—এই কথাটা আমি তোমাদের কি ক'রে বোঝাব জানিনে। আধুনিক শিক্ষায় এবং বাইরে থেকে-থেকে এই বোধ তোমাদের লোপ পেয়েছে। আমার সঙ্গে এবং আমাদের বংশের ধারার সঙ্গে কিছুতেই তোমাদের মিল খাওয়াতে পারছি'না, এই আমার দুঃখ, আমার দুশ্চিন্তা!

বংশী এসে বললে, আপনার আহ্নিকের জায়গা হয়েছে বাবু।

—হ্যাঁ যাই। নারায়ণ! নারায়ণ!

বামাচরণবাবু চলে গেলেন। বিনয় স্তব্ধভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো।

মন্দির প্রাঙ্গনের একপ্রান্তে একটা ছোট আতাগাছ খানিকটা ঝোপের সৃষ্টি করেছে। সেইখানে নিঃশব্দে শুয়েছিল বামাচরণবাবুর পোষা কুকুর ভুলো। আহ্নিকের পরে বামাচরণবাবু আহারে বসেন। কিছুদিন থেকেই বালাখানার মজলিস এবং মজলিসের শেষে অধিক রাত্রে আহার তিনি ছেড়ে দিয়েছেন।

শরীর দিন দিন অশক্ত হয়ে আসছে। রাত্রের ঘুম গেছে ক'মে। কিছুক্ষণ ঘুম প্রথম রাত্রেই হয়। সেজন্যে তিনি সকাল-সকাল খেয়েই শুয়ে পড়েন। আহারান্তে পাতের একমুঠো ভাত ভুলোকে দেওয়া তাঁর অভ্যাস।

সুতরাং দুটি ভাত পাওয়ার লোভে ভুলো আতাতলার নিদ্রা ছেড়ে গা ঝেড়ে উঠলো।

তার গা-ঝাড়ার শব্দে বিনয়ের চমক ভাঙলো।

রাত বোধকরি ন'টা হবে। এক ফালি সরু বাঁকা চাঁদ চাটুয্যেদের নারিকেল গাছের আড়ালে উঁকি দিচ্ছিল।

বিনয় বাড়ীর দিকে পা বাড়াবে এমন সময় সাধনের কলকণ্ঠ শোনা গেল:

—আপনি এখানে বড়দা? একা?

শান্তকণ্ঠে বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, তুমি ফিরলে কখন?

—বিকেলে। মেজদার সঙ্গে দেখা হ'ল। শুনলাম আপনি গ্রামের মধ্যে বেড়াতে গেছেন। স্নান ক'রে এসে দেখলাম তখনও ফেরেননি। সন্ধ্যা হয়ে গেছে দেখে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। ক'দিন থেকে হঠাৎ বেশ গরম পড়ে গেছে। এখন অন্ধকারে বেরুনো ঠিক নয়। সাপ বেরুচ্ছে।

বিনয় ভয় পেয়ে গেল।

বললে, বলো কি? বিষাক্ত সাপ?

—হ্যাঁ। একটু আগে হাড়িরা একটা মস্ত বড় কেউটে সাপ মারলে।

—কোথায়? রতীন এসে জিজ্ঞাসা করলে।

—হাড়িপাড়ায়।

—এই দেখ!—রতীন যেন জমে গেল। বললে, তোমরা রাগ করো সাধন, কিন্তু বলতো এইভাবে মানুষ গ্রামে বাস করতে পারে? গ্রীষ্মে জলের কষ্ট, বর্ষায় কাদা, শরৎ-হেমন্তের ম্যালেরিয়া চলবে ফাল্গুন পর্যন্ত, তারপরেই আরম্ভ হবে বসন্ত-কলেরা। সাপ-বাঘ-মহামারী-জলাভাব খাদ্যাভাব, ভদ্রলোকে কী ক'রে থাকে বলো?

সাধন হো হো ক'রে হেসে উঠলো। বললে, মেজদা, তুমি গ্রামে থাকতে ভালোবাসো না, সুতরাং থেকো না। কিন্তু অজুহাত তুলো না।

রতীন রেগে বললে, ওগুলোকে তুমি অজুহাত বলো? ওগুলো কি মিথ্যে?

সাধন বললে, মিথ্যে কেন হবে? তবু অজুহাত। আমাদের গ্রামগুলোতে অনেক অসুবিধা আছে। তাই বলে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে? তুমি গ্রামের জমিদার, গ্রামের জলকষ্ট দূর করো। তুমি লেখাপড়া শিখেছ, গ্রামের লোককে শেখাও কেমন করে গ্রাম পরিষ্কার রাখতে হয়, মহামারী দূর করতে হয়, কেমন ক'রে মানুষের মতো বাঁচতে হয়। পালিয়ে যাওয়াটা তো প্রতিকার নয়।

বিনয়ের মনে পড়লো বামাচরণবাবুর কথা। গ্রামকে ভালোবাসেন দুজনেই, বামাচরণবাবুও সাধনও। কিন্তু দুজনের দৃষ্টিভঙ্গিতে কত তফাৎ! বামাচরণবাবু গ্রামের কথা ভাবেন তাঁর বংশমর্যাদার দিক থেকে। তাঁর কাছে এই গ্রাম, রাধাবল্লভ বিগ্রহ এবং তাঁর জমিদারী মর্যাদা একসূতোয় গাঁথা। সাধন দেখছে, নতুন যুগের নতুন আলোয়। তাই গ্রামের উপর দুজনেরই যথেষ্ট ভালোবাসা থাকলেও দুজনের মধ্যে সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের বিস্তৃত ব্যবধান গড়ে উঠেছে।

বিনয় বললে, একটু আগে বাবার সঙ্গে এইখানে এই কথাই হচ্ছিল। তাঁর মনে ভাবনা হয়েছে, তাঁর অবর্তমানে এই বংশের ধারা লোপ পেয়ে যাবে। রাধাবল্লভের নিত্যভোগ হয়তো হবে, কিন্তু গাঙ্গুলীবাড়ীর কেউ কুলপ্রথা মতো সেখানে উপস্থিত থাকবে না। কেউ উপস্থিত থাকবে না সন্ধ্যারতির সময়।

সাধন বললে, আমি থাকবো বড়দা।

বিনয় হেসে বললে, তা তিনি জানেন। কিন্তু তোমার উপর তাঁর আস্থা নেই। বরং আশঙ্কা আছে এই জন্যে যে, কুলপ্রথার ব্যতিক্রম ক'রে দেবোত্তরের আয় থেকে তুমি হাড়ি-বাগ্দীদের নিয়ে এই নাটমন্দিরেই একটা নাইট-স্কুল খুলবে।

সাধন বললে, সে ইচ্ছা সত্যিই আমার মনে-মনে আছে বড়দা।

বিনয় বললে, সেইটেই তাঁর দুর্ভাবনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—কিন্তু সেটা কি খারাপ বড়দা?

বিনয় বললে, সে বিষয়ে আমাদের বিবেচনার কথা হচ্ছে না সাধন। বাবার বিবেচনার কথা হচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমার মনে হয়, তাঁর আশঙ্কা রতীনের উপর থেকে তোমার উপর কম নয়।

হাতে তালি বাজিয়ে রতীন বললে, Good! ভাই স্বদেশীওয়ালা, তোমার পল্লীপ্রীতির দম্ভ একটুখানি কমাও। তোমারও সম্বন্ধে বাবা যে আশঙ্কা পোষণ করেন, এই কথাটা কান পেতে শোনো।

সবাই হাসলে।

বিনয় বললে, হাসির কথা নয়! বাবার কণ্ঠস্বরে আজ অশ্রুর আভাস পেয়ে মনটা খারাপ হয়ে আছে।

রতীন বললে, এর আর প্রতিকার কি বড়দা? আমরা নিশ্চয়ই আর বাবার সেই পুরোণো শতাব্দীতে ফিরে যেতে পারি না।

বিনয় বললে, সেও বুঝি। কিন্তু বাবার চোখে জল, এও সহ্য করা আমার পক্ষে কঠিন। সেই থেকেই এই একটা কথাই আমি ক্রমাগত ভাবছি।

সাধন জিজ্ঞাসা করলে, ভেবে কূল-কিনারা কিছু পেলেন?

—না।

—তাহ'লে?

—আমি চাই এই তাহ'লের কথাটাই তোমরা সবাই মিলে ভাবো।

রতীন বললে, সে মিথ্যে ভাবা হবে বড়দা। তার চেয়ে একটা গোল গর্তের মধ্যে চৌকো কিছু মিল ক'রে বসিয়ে দেওয়া সহজ।

বিনয় আর সাধন চুপ ক'রে রইলো।

রতীন বলতে লাগলো:

—এই একটু আগে, বৌদির সঙ্গে এই রকমের আলোচনাই চলছিলো। সমস্ত মুসলমান শাসনকালে বাঙ্গলার সমাজ-জীবনে পরিবর্তন বেশি আসেনি। হাওয়া নিস্তরঙ্গ ছিল বললেই হয়। মাঝে মাঝে এক-আধটা কালাপাহাড় ক্ষণিকের জন্যে ঝড় তুলেছিল। কিন্তু তা থামতেও দেরি হয়নি। তরঙ্গ উঠলো ভালো ক'রে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এবং সংঘাতে। যত দিন যাচ্ছে, তরঙ্গের গতি তত দ্রুততর হচ্ছে। বাবা আজ যে কষ্ট পাচ্ছেন, সে তো সামান্য। আমাদের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে আমরা এর চেয়েও কষ্ট পাব। বাবার কথা ছেড়ে দিয়ে তারই জন্যে প্রস্তুত হোন।

বিনয় বিস্মিতভাবে বললে, তুমি কী বলছ রতীন? আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এমন কী বিস্ময় জমছে, আমি তো টের পাইনি।

রতীন উত্তর দিলে, টের পাবেন কি ক'রে বড়দা? ওদের কি আপনি কোনোদিন চেনবার চেষ্টা করেছেন। আমি কলেজে ছেলে পড়াই। বছরের পর বছর তরঙ্গের পর তরঙ্গে নতুন ছেলেদের দল আসে। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তাদের মধ্যে কী দ্রুত পরিবর্তন যে হচ্ছে, দেখে আমার বিস্ময়ের আর শেষ থাকে না।

বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, এর কারণ কিছু অনুমান করতে পারো?

রতীন উত্তর দিলে, এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের দূরত্ব অত্যন্ত দ্রুতবেগে কমে আসছে। পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে। যাদের কথা স্বপ্নেও ভাবিনি, তাদের সঙ্গে সকালে-বিকেলে চায়ের দোকানে দেখা হচ্ছে। আমার মনে, হয়, এত দ্রুত পরিবর্তনের সে একটা বড় কারণ।

বংশী এসে দাঁড়ালো। ভাবলেশহীনকণ্ঠে বললে, খাবার দেওয়া হয়েছে।

বংশী চলে গেল। তার পিছনে-পিছনে ওরা তিন ভাইও নিঃশব্দে চিন্তিত মুখে ভিতরে গেল।

বহুদিন পরে দাদার সঙ্গে দেখা। পল্লীগ্রামের উপর অনুরাগ না থাকলেও দাদার উপর রতীনের অনুরাগ অত্যন্ত প্রবল। বিশেষ ক'রে তার সমবয়সী, তার বাল্যকালের খেলার সাথী বৌদিদির সঙ্গ অনেকদিন পরে পেয়ে তার ক'লকাতায় ফিরে যেতে মন সরছিলো না। যে ক'দিন এরা আছে, একসঙ্গে কাটাবার জন্যে সে কলেজ থেকে ছুটি নিলে।

কিন্তু দেখতে দেখতে সে ছুটিও ফুরিয়ে এল।

বেলা বারোটায় ওদের ট্রেন।

বিনয়ের ছেলেমেয়েগুলি সকাল থেকেই দাদুর আঙুল ধ'রে ধ'রে ঘুরছে। বামাচরণবাবু ওদের নিয়ে কী যে দেখাচ্ছেন, কোথায়-কোথায় যে ঘুরছেন আর কী যে বলছেন, তার স্থিরতা নেই।

—দাদু ভাই, এলাহাবাদ ভালো না কুসুমপুর ভালো?

ছোট বালক নিঃসঙ্কোচে বললে, কুসুমপুর। এলাহাবাদ আমার মোটে ভালো লাগে না দাদু।

আনন্দে বামাচরণবাবুর সমস্ত মন আপ্লুত হয়ে উঠলো।

সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? কেন?

কেন তা সে জানে না। মাথা নেড়ে শুধু বললে, না। কিছু ভালো লাগে না।

—কেন? সেখানে কত বড় বড় বাড়ী, থিয়েটার-সিনেমা, কত ভালো ভালো খাবার।

তা হোক তবু তাদের এলাহাবাদ ভাল লাগে না। এলাহাবাদ যেতে তাদের ইচ্ছা করছে না। তারা দাদুর কাছে থেকে যেতে চায়।

বামাচরণবাবুর চোখে জল এল।

কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে বললেন, তাই কি হয় ভাই? এখন যাও বাবা মার সঙ্গে। তারপর যখন বড় হবে, অনেক লেখাপড়া শিখবে, তখন এইখানে ফিরে আসবে—তোমার দাদুর বাড়ীতে। তোমার বাড়ী, তোমার রাধাবল্লভের মন্দির, তোমার জমিদারী দেখবে।

—সন্ধ্যেবেলায় কাঁসর বাজিয়ে আরতি হবে না?

—হবে বই কি? নাটমন্দিরে আমি যেখানটিতে দাঁড়িয়ে থাকি, ঐখানটিতে তুমিও এসে হাত জোড় ক'রে দাঁড়াবে।

—প্রসাদ দেবে কে?

—তুমিই দেবে।

—শোব কোথায়?

—আমার ঘরে। আমার খাটখানিতে।

—আর তুমি?

—আমি তো তখন থাকবো না ভাই।

—কোথায় যাবে? এলাহাবাদ?

—কোথায় তা কি জানি? তবে এলাহাবাদে নয়। তোমার মতন আমিও এলাহাবাদ ভালোবাসি না। এলাহাবাদ সম্বন্ধে দাদুর সঙ্গে শিশুর কোন মতদ্বৈধ নেই। কিন্তু দাদুর কোথাও চলে যাওয়া চলবে না। বললে, না। তুমি কোথাও চলে যেতে পাবে না।

—চিরকাল এইখানে থাকব?

—হাঁ।

বামাচরণবাবু হো হো ক'রে হেসে উঠলেন।

বললো, তাই হবে ভাই। আমি চিরকাল এখানেই থাকবো। তোমরা হয়তো দেখতে পাবে না কিন্তু থাকবো মিলিয়ে রাধাবল্লভের মন্দিরের রজ'র সঙ্গে। কিন্তু তুমি যেন এসো ভাই। আমার খাে এসে শুয়ো, আমার মতো ক'রে জমিদারী চালিও, রাধাবল্লভের ভোগারতির সময় হাজির থেকো। বেশ?

বামাচরণবাবু আর কথা বলতে পারলেন না। অশ্রুতে তাঁর কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে উঠলো।

ওঘরে টুকিটাকি গোছাচ্চেন গৃহিণী।

কিছু সরু চিঁড়া, টাটকা আখের গুড়, খেজুর গুড়ের পাটালি। এসব জিনিস কোথায় পা এলাহাবাদে? একখানা কাপড়ে বেঁধে দিলেন কতকগুলো।

বৌমা বললে, কী হবে ওসব মা? ওরা কি ওসব কিছু ছোঁবে ভেবেছেন?

—তোমার ছেলেমেয়ে কি খেতে ভালবাসে সে তোমার চেয়ে আমি ভালো জানি মা। বিকে আমার ঘরে বসে কি খেয়েছে ওরা জানো?

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। খেজুর গুড়ের পাটালী খেয়েছে মুঠো-মুঠো। বলে চকোলেটের চেয়ে ঢের ভালো। দ দিয়ে, কলা দিয়ে, গুড় দিয়ে চিঁড়ে মাখিয়ে দিয়েছি—চেঁচেপুঁছে খেয়েছে। দেখনি তো?

—তাই নাকি?—বৌমা আনন্দে হেসে উঠলো—এমন সুবুদ্ধি ওদের হয়েছে?

ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতিনীদের বিদায়দুঃখে গৃহিণীর চোখ ছলছল করছিলো। বাঁ হাতে চোখে জল মুছে হেসে তিনি বললেন, যতখানি ভাবো তোমার ছেলেমেয়ে তেমনি সাহেব মেম হয়নি। ওই দেখ আমস্বত্তটুকু দিতে ভুলে গিয়েছিলাম।

একখানি পরিষ্কার ন্যাকড়ায় আমস্বত্বগুলি জড়িয়ে বেঁধে বললেন, আর এক হাঁড়ি কুলের আচার দোব বৌমা। দোহাই তোমার ট্রেনে যেন ফেলে যেও না, যত্ন ক'রে নিয়ে যেও।

—কিন্তু সব আমস্বত্বটাই যে দিয়ে দিলেন মা। বাবার জন্যে খানিকটা রেখে দিন।

জলভরা চোখেই গৃহিণী আর একবার হাসলেন।

বললেন, হায়রে কপাল! ছেলেমেয়েরা চলে যাচ্ছে, ভালো-মন্দ জিনিস ও কি আর মুখে দেবে ভেবেছ? এই শূন্যবাড়ীতে আমরা যে ক'রে দিন কাটাই সে আর বলবার নয়।

—সে কি আর বুঝিনে মা। আপনারা একলা থাকেন, আমাদের কত ভয় করে। কি করব? উপায় তো নেই। চাকরী ছেড়ে বাড়ীতে ব'সে থাকা তো চলে না।

—সেই ভেবেই আমরাও পাষাণে বুক বেঁধে চুপ ক'রে থাকি। কি করব। উপায় তো নেই। কিন্তু এবারে যেন বড্ড মনটা ছটফট করছে বৌমা। কিছুতে ধৈর্য ধরতে পারছিনে।

গৃহিণী চোখে আঁচল চাপা দিয়ে উদ্গত অশ্রু রোধ করবার জন্যে বাইরে চলে গেলেন।

যাত্রার সময় নিকট হয়ে এলো।

দু'খানি গরুর গাড়ী যথাসময়ে এসে উপস্থিত। বিনয়ের নিজের বাক্স বিছানা, জিনিসপত্র তো আছে, তার উপর টুকিটাকি ক'রে এখান থেকেও জিনিস কম যাচ্ছে না। নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর জিনিস: বামাচরণবাবুর নিজের হাতে লাগানো গাছের গোটাকতক বেগুন, সিম, লাউ; ঘরের গাছের ডুমুর, দুটো পাকা কুমড়া, ক্ষেতের আলু সের দশেক;—নিতান্তই তুচ্ছ জিনিস। তবু এই সব বয়ে নিয়ে যেতে হবে।

রতীন হ'লে খামোখা এই বোঝা বয়ে নিয়ে যেতে কিছুতেই রাজি হোত না। কিন্তু বিনয়ের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। সে জানে এর একটি জিনিস নিয়ে যাব না বললে মায়ের চোখ ছলছল ক'রে উঠবে। আজকালকার দিনে ট্রেনের ভিড় সামান্য নয়। মানুষেরই ওঠা দায়। তার উপর এই লাগেজ। কিন্তু কি করবে? ফেলে দিতে হয়, নিতান্তই না নিয়ে যেতে পারে, রাস্তায় ফেলে দেবে। কিন্তু এখানে নয়।

বিনয় খুব উৎসাহের সঙ্গে সমস্ত জিনিস গুণতে লাগলো।

গাড়োয়ান হাঁকলে, আর দেরী করবেন না বাবু, তাহ'লে ট্রেন পাওয়া যাবে না।

ছেলেমেয়েরা ছুটতে ছুটতে এসে গরুর গাড়ীতে চেপে বসলো। কী উৎসাহ তাদের! কুসুমপুর তাদের ভালো লাগে। দাদুকে ঠাকমাকে তারা অসম্ভব ভালোবাসে। তবুও কোথাও যে তারা চললো, সেই আনন্দেই চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

সব শেষে এলো বিনয়ের স্ত্রী, পিছনে বিনয়ের মা।

নাটমন্দিরে প্রণাম ক'রে বিনয়ের স্ত্রীও অবশেষে গাড়ীতে গিয়ে উঠলো। কান্নায় তার বুক ফুলে-ফুলে উঠছে।

গাড়ী ছেড়ে দিলে।

ঘোমটার ফাঁক দিয়ে জলভরা চোখে বিনয়ের স্ত্রী দেখলে, বৃদ্ধ বামাচরণবাবু পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে।

ছেলেমেয়েরা হাত নেড়ে কলকণ্ঠে ব'লে উঠলো: দাদু, চললাম। চিঠি দিও।

বামাচরণবাবু হাসলেন। কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর ফুটলো না।

আশ্চর্য এই যুগ!

মানুষ যেন ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। পুত্রপৌত্র নিয়ে কিছুতেই নিশ্চিন্তে ঘর বাঁধবার উপায় নেই। আশ্চর্য!

সাধন গিয়েছিল গরুর গাড়ীর সঙ্গে ষ্টেশন পর্যন্ত।

সকালেই ভদ্রপুর থেকে খুব উদ্বেগজনক খবর এসেছিল। তখনই তার সেখানে যাওয়া উচিত ছিল। রোগী-সেবায় সাধারণতঃ সে কালবিলম্ব করে না। কিন্তু এদিনটা যেন একটা বিশেষ দিন। এই একটি দিন সে কর্তব্যে অবহেলা করলে। মাত্র ঘণ্টাকয়েকের জন্যে। ষ্টেশনে বিনয়দের উঠিয়ে দিয়েই সে ছুটবে ভদ্রপুর।

মুচিপাড়ায় দুটো কলেরা কেসের খবর এসেছে। কে জানে সে দুজন বেঁচে আছে কি না, কে জানে রোগ আরও ছড়ালো কি না।

আজ রাত্রে হয়তো সে বাড়ী ফিরতেই পারবে না।

সন্ধ্যার আরতি হবে আজও। প্রতিদিনের মতো আজও বামাচরণবাবু এসে দাঁড়াবেন নাটমন্দিরে তাঁর প্রতিদিনকার জায়গাটিতে। পাড়ার ছেলেরা এসে বাজাবে কাঁসর। প্রসাদ বিতরণ করবেন বামাচরণ-বাবুর গৃহিণী।

তারপরে?

আতাগাছের দিকে অন্ধকার যেন আলকাতরার মতো জমাট বাঁধবে। কে জানে আজ কি তিথি। চাটুয্যেদের নারিকেল গাছের আড়ালে একফালি বাঁকা চাঁদ উঠবে কি না। ওঠে যদি, বনস্পতির দুঃখ সে হয়তো বুঝবে।

দীর্ঘ, শীর্ণ বনস্পতি···মাটিতে যার শিকড়ের বাঁধন শিথিল হয়ে এসেছে···যে গাছে আর ফুলও ফোটে না, ফলও ধরে না···পোকায় কেটে ভিতরটা যার ফাঁপা করে দিয়েছে···তবু দাঁড়িয়ে থাকে, যেন সুদীর্ঘকালের অভ্যাসে···আর কৃষ্ণপক্ষের বাঁকা চাঁদের দিকে চেয়ে সর্বহারার মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিরল পাতায়-পাতায়···

ওঠে যদি আজ বাঁকা চাঁদ, বনস্পতির দুঃখ সে হয়তো বুঝবে···সে হয়তো বুঝবে।

তুলির লিখন

শ্রীসীতা দেবী

কাশীশ্বরীর জন্ম হইয়াছিল পল্লীগ্রামে, যাহাকে বলে "অজপাড়াগাঁ।" তাহার ঠাকুরমা তীর্থশ্রেষ্ঠ বারাণসী ঘুরিয়া আসিয়া দেখিলেন সংসারে আর একটি মানবিকা বাড়িয়াছে। মুখখানা বাঁকাইলেন বটে, কারণ মেয়েছেলের জন্মে খুসি আর কে হয় ? তবে মনের ভিতর একটু খুসির ভাব হয়ত ছিল, তাই নামটা তিনিই রাখিলেন "কাশীশ্বরী।"

পাড়াগাঁয়ের অতি সাধারণ গৃহস্থঘর, কাজেই মেয়ের শিক্ষা-দীক্ষা খুব বেশী কিছু হইল না। ঘরকরণার কাজ চলনসই মত শিখিল, পাড়ার এক শহর হইতে আগতা বউ-এর কাছে দ্বিতীয়ভাগ পর্য্যন্ত পড়িয়া ফেলিল। তাহার পরেই শহরের মানুষ শহরে চলিয়া গেল, ছাত্রীর বিদ্যাও আর অগ্রসর হইল না।

মেয়ের শ্যামবর্ণ, কচি কচি আঙুলগুলিতে কিন্তু যাদুমন্ত্রের ছোঁয়াচ মাখান ছিল। দশ-বারো বৎসরের মেয়ে, কিন্তু তাহার সহিত পাল্লা দিয়া গ্রামের কোনো প্রৌঢ়া গৃহিণীও আলপনা দেওয়া, পিঁড়াচিত্র করা বা নক্সাকাটা কাঁথা-শেলাই করার কাজে জিতিতে পারিতেন না। তাহার হাতের কাজ যেই দেখিত সেই ধন্য ধন্য করিত।

কাশীশ্বরীর বড় ভাই গ্রামের স্কুলে পড়ে, তাহাদের ড্রয়িংও শেখান হয়। বিশুর অত ছবি আঁকাটাকা ভাল লাগে না, ততক্ষণ আম বা কাঁঠাল গাছে চড়িয়া অন্যরকম রস উপভোগ করিতে সে ব্যস্ত থাকে। ড্রয়িংএর খাতায় কিন্তু দিব্য ছবি আঁকা হইয়া যায়। মাষ্টার উপরি উপরি কয়েকদিন ছবিগুলি দেখিয়া একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বিশে, ছবি কাকে দিয়ে আঁকিয়ে আনিস্ রে ?"

চিত্রবিদ্যায় খ্যাতি অর্জ্জন করার ইচ্ছা বিশুর কিছুমাত্র ছিল না, সে বলিল, "আমি আঁকতে যাব কেন ? ছোটপুঁটী মোটে কথা শোনে না, আমি খেলতে বেরলেই আমার বই খাতা যা পায়, তাতেই ছবি এঁকে রাখে। এই দেখুন না আমার ইংরিজী বইটায় কি রকম আঁক-জোঁক কেটেছে।"

মাষ্টার অল্পবয়স্ক, মন দিয়া সব ছবি, নক্সা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলেন। বলিলেন, "তোমার বোনের হাত খুব ভাল ত! কল্‌কাতার মেয়ে হলে একে মাষ্টার রেখে শেখাত, নয়ত আর্টস্কুলে ভর্ত্তি করে দিত। ভাল করে শেখালে এ মেয়ে বেশ ভাল চিত্রকর হতে পারে।"

বিশু ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল হুঁঃ।

বাড়ী আসিয়া মাকে বলিল, "আমাদের ড্রয়িংমাষ্টার বলেছে, ছোটপুঁটীকে শেখালে সে খুব ভাল চিত্রকর হতে পারবে। তাকে কলকাতার আর্টস্কুলে ভর্ত্তি করে দিতে বল্লে।

মা মাছের ঝোলের কড়াটা দুম্ করিয়া নামাইয়া রাখিয়া ঝাঁঝিয়া বলিলেন, হ্যাঁ লাট সাহেবের নাত্নী কিনা, ইস্কুলে ভর্ত্তি হবে। মাষ্টার ছোঁড়াত কম অসভ্য নয় গা, অপর লোকের মেয়েছেলে নিয়ে কথা কওয়া কেন? "তুই বাঁদর বুঝি কেলাসে বোনদের গল্প করিস্?"

তাড়া খাইয়া চটিয়া গিয়া বিশু বলিল, "হুঁঃ, বয়ে গেছে আমার ঐ সব পেত্নী বোনের গল্প করতে। ছোটপুঁটী আমার বই খাতায় ছবি আঁকে কেন, তাইত মাষ্টার দেখতে পেল।"

ছোটপুঁটীর অদৃষ্টে সেদিন কিছু বকুনি জুটিল, মাছের ঝোল মাখান হাতাখানাও পিঠে একবার পড়িবার উপক্রম করিয়াছিল, তবে সময়মত পলায়ন করাতে সেটা আর ঘটিয়া উঠিল না। কিন্তু যাহার প্রাণে শিল্পলক্ষ্মী একবার নিজের কমলহস্তের স্পর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, সে কি আর এ সবের কাছে হার মানে? ভাইয়ের বইখাতা ছাড়িয়া সে এখন নিজের একখানি খাতা জোগাড় করিল, এবং তাহাতে মনের সাধ মিটাইয়া ছবি আঁকিতে লাগিল।

মাসখানেকের মধ্যে বিশুর ড্রয়িং-এর খাতায় কোনরকম আঁকজোখ না দেখিয়া ড্রয়িংমাষ্টার যোগেশ কিছু বিস্মিত হইল। বিশুকে একদিন জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ হে, খাতাতে আর ত ছবিটবি দেখিনা।"

বিশু বলিল, "না ছোটপুঁটীকে দু-ঘা দিয়েছি বেশ ক'রে, সে আর আমার বইখাতা নষ্ট করেনা।

যোগেশের ইচ্ছা করিল "দু-ঘা"টা বিশুকে সুদ শুদ্ধ ফিরাইয়া দেয়। বলিল, "মহাবুদ্ধিমান্ দেখি তুমি, বোন অত ভাল আঁকে, কোথায় তাকে সাহায্য করবে না বীরত্ব দেখিয়ে তাকে মারতে গেলে!"

বিশু বলিল, "মারিনি ঠিক, বকে দিয়েছি আচ্ছা করে আর কি!"

ড্রয়িংমাষ্টার বলিল, "আচ্ছা বিশু—"

বিশু বলিল, "কি বল্‌ছেন স্যার?"

যোগেশ বলিল, "আমি ত তোমাদের সকলেরই বড় ভাইয়ের মত, তোমার বাবার সঙ্গে আমার আলাপও আছে, তিনিও আমাকে ছেলের মতই দেখেন। আমি যদি ছোটপুটীকে একবাক্স রং আর একখানা ভাল খাতা দিই, তাহলে তোমার মা বাবা কি রাগ করবেন?

বিশুর সে বিষয়ে সন্দেহ বিশেষ ছিল না। মা ত রাগ নিশ্চয়ই করিবেন, তবে বাবার কথা অবশ্য সে বলিতে পারে না, কারণ এ বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে কোনো কথা তাহার হয় নাই। সে একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলিল, "লুকিয়ে নিয়ে যাব স্যার?

যোগেশ বলিল, "না, না, লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে কি হবে? তুমি বরং তোমার মা কি বাবাকে জিগ্গেস করে দেখো।"

বিশু বলিল, "আচ্ছা স্যার।" সেদিন বাড়ী গিয়া কথাটা বলি বলি করিয়াও মায়ের সামনে তুলিতে সাহস হইল না। তাহার পর নানা ভাবনায় কথাটা একেবারে ভুলিয়াই গেল।

দিন দুই তিন পরে জ্যামিতির রেখাচিত্র আঁকিবার জন্ম পেন্‌সিলের সন্ধান করিতে গিয়া আবার কথাটা মনে পড়িল। পেন্‌সিল নিশ্চয় ছোটপুঁটী গাপ্ দিয়াছে। ইহাকে লইয়া আর পারা যায় না। আগে আগে কাশীশ্বরীকে বেশ ইচ্ছামত পিটান যাইত, মা তাহাতে কিছু বিশেষ বলিতেন না। পিঠোপিঠি ভাইবোন, ঝগড়া, খুনসুটি হইবেই, এবং তাহা হইলে বোনকে দু-চার ঘা খাইতে হইবে এত জানা কথা। কিন্তু বাবা একদিন দেখিয়া ফেলাতে বিশুর কিছু মুস্কিল ঘটিয়া গিয়াছে। বাবা যদিও পাড়াগাঁয়েরই মানুষ, তবু শহুরে ধরণ-ধারণ আছে কিছু কিছু, যৌবনে কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়াশুনা করিয়া ছিলেন বলিয়াই বোধহয়। বিশু ছোটপুঁটীকে মারিতেছে দেখিয়া তিনি ছেলেকে খুব ধমক দিয়াছেন। বোন বড় হইয়াছে, বারো পার হইয়া তেরোয় পড়িয়াছে, সে যেন আর কখনও ছোটপুঁটীর গায়ে হাত না তোলে। বিশু চটিল, অবাকও হইল, নিজের বোন তাহাকে যদি না পিটাইবে ও কি ওপাড়ার ছিদাম গোয়ালার বোন মাতঙ্গিনীকে পিটাইবে? ছোটপুঁটীও কিছু অবাক হইল, তবে অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিশুকে জিভ ভেঙ্গাইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিল।

সেই হইতে মেয়েটাকে ইচ্ছামত চড়চাপড় বা কানমলা কিছুই দেওয়া যায় না। কিন্তু হাত নিস্‌পিস্ করে। বিশু খুঁজিয়া হায়রাণ হইল, মেয়েটাকে কোথাও পাওয়া যায় না। বাড়ীর কোনো ঘরেই সে নাই। অবশেষে বাড়ীর পিছনে ঝোপ-ঝাড়ের ধারে এক কাঁঠাল গাছের তলায় তাহাকে পাওয়া গেল। ছেঁড়া খাতায় সে মহা মনোযোগ দিয়া পাখী আঁকিতেছে, নীলকণ্ঠ পাখী। বিশুর পেন্‌সিল্ অবশ্য তাহারই হাতে।

বিশু ফস্ করিয়া সেটা তাহার হাত হইতে টানিয়া লইল, পাখীর ছবির উপর মস্ত বড় একটা আঁচড় পড়িয়া গেল। ছোটপুঁটী অত্যন্ত চটিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, ভারি আহ্লাদ পেয়েছ না? দিলে আমার অমন ছবিটা নষ্ট করে!

বিশু বলিল, "ইঃ, নিজে আমার পেন্‌সিল্ চুরি করে আবার তেজ দেখান হচ্ছে! দিতে হয় বিনুনি ধরে একেবারে গাছের ডালে টাঙ্গিয়ে—"

এমন সময় বাড়ীর দাওয়া হইতে ডাক আসিল, "বিশু, ছোটপুঁটি।

বিশু বলিল, "এই নাও, বাবা আবার এ সময় কোথা থেকে এসে হাজির হলেন? চল তোমারই জিৎ, পাঁচখানা মিথ্যে করে লাগিও এখন আমার নামে।

ছোটপুঁটী বলিল, "কিচ্ছু বল্‌বনা বাবাকে, তুই আমাকে পেন্‌সিল্‌টা দে।"

বিশু বলিল, "পেন্‌সিল দিলে আমি জিওমেট্রি কষব কি করে বাঁদরি? তার চেয়ে আমাদের যোগেশ মাষ্টার তোকে ভাল ড্রয়িং-এর খাতা, পেন্‌সিল্ রংয়ের বাক্স সব দিতে চেয়েছে, তুই নে না। তাহলে আর আমার জিনিষ চুরি করতে হবে না।"

ছোটপুঁটী নাক মুখ সিঁটকাইয়া বলিল, "হ্যাঁ একটা পেন্‌সিল নিলে নাকি চুরি হয়। টাকাকড়ি নিলে তবে ত চুরি হয়। তুই এনে দে না খাতা পেন্‌সিল।

বিশু বলিল, হ্যাঁ, তারপর মা আমাকে ধরে ঝাঁটাপেটা করুক আর কি? তুই ছবি আঁকতে পারিস সেকথা স্যারকে বলেছিলাম বলে কত বকুনি খেতে হল।"

ভাই বোন কথা বলিতে বলিতে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল। বোন বলিল, "বাবাকে জিগ্‌গেস করি, বাবা যদি বলে "হ্যাঁ" তা হলে মা আর কিছুতেই না করতে পারবে না।"

কৃষ্ণবিহারী ছেলেমেয়ের দেরি দেখিয়া নিজেই তাহাদের দিকে আসিতেছিলেন। দুজনের মুখই গরমে ও উত্তেজনায় লাল হইয়া উঠিয়াছে, কি একটা আলোচনায় দুজনে মহাব্যস্ত। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি নিয়ে আবার ঝগড়া লাগিয়েছ?"

ছোটপুঁটী মোটা বিনুনী সহ মাথাটা সবেগে নাড়িয়া বলিল, "না, ঝগড়া না বাবা। ছোড়দা বল্‌লে যে ইস্কুলের ড্রয়িংমাষ্টার আমাকে খাতা পেন্‌সিল প্রাইজ দিতে চেয়েছে কিন্তু নিলে মা যে রাগ করবে। বেশ হত কিন্তু নিতে পারলে, ছোড়দার খাতা পিন্‌সিল কিচ্ছু নিতে হত না, ঝগড়াও হত না তা হলে।

মেয়ের মৌলিক গবেষণায় কর্ণপাত না করিয়া কৃষ্ণবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন "তোকে হঠাৎ ড্রয়িংমাষ্টার প্রাইজ দিতে চাইল কেন? ড্রয়িংমাষ্টার মানে যোগেশ ত?"

বিশু বলিল, "হ্যাঁ বাবা, ছোটপুঁটীর আঁকা ছবি আমার খাতায় ছিল কিনা, তাই দেখে স্যার্ বলেছেন যে স্কুলের সব ছেলেদের চেয়ে সে ভাল আঁকতে পারে। তাই তাকে খাতা পেন্‌সিল, রং সব প্রাইজ দিতে চেয়েছেন।

ছেলেমেয়ের বিদ্যা বা কৃতিত্ব সম্বন্ধে অধিকাংশ পিতার মত কৃষ্ণবিহারীও সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। তিনি বলিলেন, "ছোটপুঁটী ছবি আঁকে নাকি? কই কখনও ত দেখিনি?"

বিশু বোনের হাত হইতে তাহার ছেঁড়া খাতাখানা টানিয়া লইয়া বলিল, "হ্যাঁ, বেশ আঁকে। এই দেখনা!

কৃষ্ণবিহারী খাতা লইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিলেন, "বাঃ বেশ এঁকেছে। দিতে বলিস্ প্রাইজ" বলিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে অন্যদিকে চলিয়া গেলেন।

বিশু ত স্কুলে গেল; কিন্তু প্রাইজ পাইবার উত্তেজনা ও আগ্রহে কাশীশ্বরীর প্রায় আহার নিদ্রা ঘুচিয়া গেল। স্নান করিতে গিয়া তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিল, খাইতে বসিয়া অর্দ্ধেক ভাত ফেলিয়া উঠিয়া গেল। বৃদ্ধা ঠাকুরমা দুপুরবেলা নাতনীকে দিয়া খানিক পাকাচুল তুলাইতেন, আজ হাজার ডাকিয়াও তাহার সাড়া পাইলেন না। পথের ধারে যেখানে একটা ঝাঁকড়া তেঁতুলগাছ মাটির কাছ অবধি নামিয়া আসিয়া একটা ছায়াকুঞ্জ রচনা করিয়াছে, ছোটপুঁটী দুপুর রোদে সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এক-আধদিন বিশু টিফিনের ছুটির ঘণ্টায় বাড়ী আসে, মুড়ি খায়, পাটালি খায়, জল খায়। আজ যদি সে আসে! আর পুঁটীর প্রাইজের জিনিষগুলি যদি সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে! ভাবিতেই অধীর আনন্দে তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হইল।

কিন্তু হায়, হৃদয়হীন বিশু তখন বোনের কথা ভুলিয়াই গিয়াছে, সে তখন নিজেরই মত একদল বুদ্ধিমান ও উদ্যমশীল বন্ধু লইয়া পণ্ডিত মশায়কে কি ভাবে জব্দ করা যায়, তাহার ফন্দি আঁটিতে ব্যস্ত।

কাশীশ্বরী ঘণ্টাদুয়েক রোদে দাঁড়াইয়া মাথা ধরাইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। বিকালবেলা বিশু ফিরিতেই সে ছুটিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার প্রাইজ এনেছ ছোড়দা?"

বিশু একটু লজ্জিত হইল, বলিল, "আজ এত পড়া ছিল যে স্যারের সঙ্গে কথা বলবার সময়ই পেলাম না। কাল আগেই বলে রাখব, ক্লাস বসবার আগেই।

পরদিন সত্য সত্যই স্কুলে গিয়াই যোগেশকে খুঁজিয়া বাহির করিল। বলিল, "ছোটপুঁটীকে যদি ড্রয়িং-এর খাতা পেন্‌সিল্ দিতে চান স্যার, তা'হলে দিয়ে দেবেন, সে চেয়েছে।"

যোগেশ জিনিষগুলি সংগ্রহ করিয়া বাড়ীতেই রাখিয়াছিল। বলিল, "তোমার বাবা মাকে জিগ্‌গেস করেছিলে?"

বিশু বলিল, বাবাকে জিগ্‌গেস করেছি, তিনি দিতে বলেছেন।"

যোগেশ বলিল, "আচ্ছা ছুটির পরে আমার সঙ্গে আমার বাসায় এস। ওগুলো আমি কিনেই রেখেছি, তোমার হাতে দিয়ে দেব।"

ছুটির পর যোগেশের সঙ্গে গিয়া বিশু কাগজে বাঁধা একটা বাণ্ডিল সংগ্রহ করিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। যোগেশও কি ভাবিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীর বাহির হইয়া আসিল, বলিল, "আমাকেও একবার হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ী যেতে হবে।"

সেই ঝাঁকড়া তেঁতুলগাছের তলায় সেদিনও ছোটপুঁটী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দূর হইতে বিশুকে দেখিতে পাইয়া সে আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না, ছোট একটা ঘূর্ণীবায়ুর মত গিয়া ভাইয়ের উপর আছ্‌ড়াইয়া পড়িল। কাগজে জড়ান বাণ্ডিলটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, "আমার জন্যে এনেছ ত?"

বিশু বিরক্তভাবে বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তোর জন্যে আনিনি ত কি ঠাকুরমার জন্যে এনেছি?"

কাশীশ্বরী পথের মাঝে উবু হইয়া বসিয়া বাণ্ডিল খুলিয়া খাতা, পেন্‌সিল, রঙীন পেন্‌সিল, তুলি রংএর বাক্স সব বাহির করিল। আনন্দে ঔৎসুক্যে তাহার চোখ মুখ জ্বল্ জ্বল্ করিতে লাগিল। বলিল, "কি রকম সুন্দর ছোড়দা! অনে—ক টাকা দাম না?"

বিশু বলিল, "কে জানে? বাড়ী চল এখন। বোকার মত মাটিতে বসে থাকতে হবে না," বলিয়া সে হন্ হন্ করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। ছোটপুঁটীও অগত্যা নিজের ঐশ্বর্য্য সম্ভার গুটাইয়া লইয়া তাহার অনুসরণ করিল।

কিছু দূরে দাঁড়াইয়া যোগেশ দৃশ্যটা দেখিতেছিল। ছোটপুঁটীর আনন্দের একটুখানি ছোঁয়াচ যেন তাহারও মনে আসিয়া লাগিল। একটুখানি জিনিষ পাইয়াই কি খুসি! যোগেশ নিজে স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন

ঘরের ছেলে। চাকরী করার তাহার কিছু প্রয়োজন ছিল না, শুধু বাবা ওকালতি পড়িতে বলাতে সে রাগ করিয়া বাড়ী ছাড়িয়া পাড়াগাঁয়ে ড্রয়িংমাষ্টারি করিতে আসিয়াছিল। তাহার কয়েকজন ছোট ভাইবোন আছে বাড়ীতে। তাহারা নিত্যনূতন কত ধরণের কত জিনিষ পাইতেছে। দুমিনিট নাড়ে চাড়ে, তাহার পর ভাঙিয়াচুরিয়া ফেলিয়া রাখে, নয় চাকরবাকরে চুরি করিয়া লয়। আয়োজনের আতিশয্যে তাহাদের আনন্দ পুরাপুরি প্রকাশই পায় না, দেখা দিতে না দিতে মিলাইয়া যায়। আজ ছোটপুঁটীর আনন্দ দেখিয়া বুঝিল যে আনন্দ জিনিষটা সত্যই আয়োজনের অপেক্ষা রাখে না।

কালীশ্বরীর ছবি আঁকার উৎপাতে মা ও ঠাকুরমা বড় চটিয়া গেলেন। মেয়েকে কোনো কাজেই পাওয়া যায় না। তরকারি কুটিতে বলিলে সে বেগুন ও কুমড়ার ছবি আঁকিতে বসে। বাট্‌না বাঁটিতে বলিলে হলুদবাটা জলে গুলিয়া রং বানাইতে ব্যস্ত থাকে। পায়রা, চড়াই, কাকে দাওয়ায় বসিয়া বড়ি আচার সব খাইয়া গেলেও তাদের না তাড়াইয়া সে খাতা পেন্‌সিল্ লইয়া সে-গুলির ছবি আঁকিতে বসে। ঠাকুরমা বিদ্রূপ করিয়া বলেন, "কালীঘাটের পটুয়ার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিও গো। অন্য কোন সংসারে এ মেয়েকে মানাবেনা, তারা সদর দরজা দিয়ে ঢোকাবে আর খিড়কির দোর দিয়ে বিদেয় করে দেবে।" মা আরো চটেন, ছোটপুঁটী বকুনি ত সারাদিনই খায়, মাঝে মাঝে কিল্‌টা চড়টাও উপহার পায়, কিন্তু তাহাতে তাহার স্বভাবের সংশোধন হয় না। দেখিতে দেখিতে যোগেশের দেওয়া খাতাখানিও শেষ হইয়া গেল। যোগেশের কাছে আর ত চাওয়া যায় না! মায়ের কাছে এ কথা ত তুলিবারই জো নাই, তিনি ঝাঁটা লইয়া মারিতে আসিবেন। বাবাকে এক বলা যায়, তবে তিনি সংসারের কোনো কথাতেই বিশেষ থাকেন না।

পূজা আসিয়া পড়িল এই সময়। ছোটপুঁটী সাহস সঞ্চয় করিয়া মায়ের কাছে গিয়া বলিল, "মা, এবারে আমাকে ভাল শাড়ী দিও না, মিলের শাড়ী দিও।"

মেয়ের এ হেন বৈরাগ্যে বিষম বিস্মিত হইয়া মা বলিলেন, "কেন লা? অন্য অন্যবারে ত ছিঁড়ে খাস, ঢাকাই শাড়ী নেব, মান্দ্রাজী শাড়ী নেব করে, এবারে এত সুবুদ্ধি কেন?"

ছোটপুঁটী বলিল, "মিলের শাড়ী একটা দিও, আর দু-বাক্স রং আর দুটো ভাল খাতা দিও।"

মা চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, "মা, মা, মা, কোথায় যাব! এ মেয়ে একেবারে সংসারের বার হয়ে গেছে। একে কে ঘরে নেবে বাপু, কে জানে? বুদ্ধিশুদ্ধি একফোঁটা হল না, এত বড় ধেড়ে মেয়ে!" বলা বাহুল্য ছোটপুঁটীর আবেদন মঞ্জুর হইল না।

যোগেশের মা অনেক কান্নাকাটি করিয়া চিঠি লেখাতে সে ছুটিতে কলিকাতা যাইবার ব্যবস্থা করিতেছিল। বিশুকে একদিন জিজ্ঞাসা করিল, "ছোটপুঁটী নূতন খাতায় ছবিটবি আঁকছে ত?"

বিশু বলিল, "তা আবার আঁকছে না? আপনার সে খাতাটা ত ভরে গেছে। এখন রোজ মাকে জ্বালায় নূতন খাতার জন্যে আর বকুনি খায়।"

যাইবার আগে যোগেশ আরো গোটা দুই নূতনখাতা আর ছবি আঁকার কিছু সাজসরঞ্জাম বিশুর হাতে দিয়া ছোটপুঁটীকে পাঠাইয়া দিল। স্বামী এসবের প্রশ্রয় দেন কাজেই বিশু বা ছোটপুঁটীকে প্রহার করিয়া লাভ নাই; গৃহিণী সোজাসুজি গিয়া স্বামীর দরবারে হাজির হইলেন। বলিলেন, "হ্যাঁ গা, ওরা না হয় ছেলেমানুষ জ্ঞানগাম্য নেই, তুমি কি বলে ঐ সব জিনিষ ঘরে আনতে দিচ্ছ? তারপর একটা কথা উঠে যাক্ আর কি! যা বজ্জাত সব জ্ঞাতি চারদিকে!"

কৃষ্ণবিহারী কাগজ পড়িতে পড়িতে বলিলেন, "কিসের কথা?"

গৃহিণী বলিলেন, "কিসের আবার? ঐ যে ছোটপুঁটী খালি খাতা পেন্‌সিল্ নিচ্ছে মাষ্টার ছোঁড়ার কাছে, এতে লোকে কথা বল্‌বে না?"

কৃষ্ণবিহারী হাসিয়া বলিলেন, "কি যে বল! ঐ ত একফোঁটা মেয়ে, ওকে দুটো খাতা দিয়েছে ত কি হয়েছে? ও কলকাতার উকীলের ছেলে, ওর কত বড় লোকের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে, ও কি খাতা উপহার দিয়ে তোমার মেয়ের মন ভোলাচ্ছে? তুমিও যেমন! হলে ত ভালই ছিল, বেশ ছেলেটা।"

সত্তর বৎসর বয়স পার না হওয়া সত্ত্বেও যে স্বামীর ভীমরতি ধরিয়াছে এই কথা ঘোষণা করিতে করিতে গৃহিণী প্রস্থান করিলেন।

যোগেশ কলিকাতায় ফিরিয়া রাজধানীর পুজার উৎসবে মাতিয়া গেল। বাবা এবারে আর বকাঝকা কিছু করিলেন না, তবে মুখ ভার করিয়া রহিলেন। মা বলিলেন, "ঐ অজপাড়াগাঁয়ে তোকে আর যেতে দিচ্ছি না বাবা, যেমন সাপখোপের উৎপাত, তেমনি রোগের ঘটা। রোজ চিঠি আসবার সময় হয় আর আমার বুক টিপ্‌টিপ্ করে। ছবি আঁকার মাষ্টারের কাজ ত কলকাতাতেও আছে, তুই না হয় এখানেই কাজ নে। আর এরপর একটা বিয়ে থাওয়া কর্ বাছা। বুড়োও হলাম, মেয়েগুলোও সব শ্বশুরবাড়ী চলে যাচ্ছে, আমারও ত একটা সাহায্য দরকার? কত খাটব আর বুড়ো হাড়ে?"

যোগেশ বলিল, "হ্যাঁ বুড়ো ত তুমি কত। মেমদের দেখ দেখি, তোমার বয়সে হাঁটুর উপর ফ্রক পরে, চুল ছেঁটে ঘোড়ার মত লাফিয়ে বেড়াচ্ছে।"

মা বলিলেন, "সে মেমদের কথা মেমরা বুঝবে, আমাদের সংসারে 'কুড়ি পেরলেই বুড়ী।' তুই বিয়ের মত দে বাপু, বেশ সুন্দর একটি মেয়ে দেখেছি।"

যোগেশ বলিল, "আরো দু-চার বছর যাক না মা! এত তাড়া কিসের? এমনি কি আমি অরক্ষণীয় হয়ে উঠেছি?"

মা বলিলেন, "কথার ধুকড়ি। তা বিয়ে না হয় নাই করলি, ঘরে ফিরে আসতেও কি দোষ?"

যোগেশ বলিল, "কাজ যে ছাড়ব, তা তাদের নোটিশ দিতে হবে ত? আমি ত তাদের কিছু বলে আসিনি। সামনে তাদের ইয়ার্লি-পরীক্ষা, এমন সময় কখনও কাজ ছেড়ে দেওয়া চলে?"

মা বলিলেন, "তোর শুধু ওজর আপত্তি। বেশ এবারে গিয়ে নোটিশ দে, জানুয়ারী মাসে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবি। আমি আর কোনো কথা শুন্‌ছি না, ওখানে তোকে আর আমি যেতে দিচ্ছি না।"

পাড়ার ভিতরেই গোটা কুড়ি সার্ব্বজনীন পূজা, কাজেই মায়ের সঙ্গে বেশী কথা কাটাকাটি করিবার সময়ই বা কোথায়? যোগেশ সারাদিন বাহিরেই ঘোরে, অনেকদিন খাইতেও বাড়ী আসে না। এই অতিকায় দানবীয় নগরীর উন্মত্ত কোলাহল, আমোদ-উৎসবের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া তাহার মানসনেত্রে একটি ছোট শান্তপল্লীগ্রামের ছবি ভাসিয়া ওঠে, শ্যামবর্ণ কচি মুখ একখানা, আনন্দোজ্জ্বল চোখে তাহার দিকে তাকাইয়া যায়।

ছুটি দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। যোগেশ বাক্স বিছানা বাঁধিয়া আবার কর্ম্মস্থানে ফিরিবার জোগাড় দেখিতে লাগিল। মা আবার খানিক ঝুলাঝুলি করিলেন সুন্দরী মেয়েটিকে দেখিয়া যাইতে, কিন্তু যোগেশ কিছুতেই ঘাড় নোয়াইল না। একদিন সকালের ট্রেনে কলিকাতা ছাড়িয়া "অজপাড়াগাঁ"টাতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

স্কুল খোলা, ক্লাস আরম্ভ করার গোলমালে দিন দুই তিন বিশুর সঙ্গে দেখাই হইল না, তাহার পর আবার আগের মত কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল মাঝে মাঝে।

সন্ধ্যাবেলা একদিন যোগেশ সবে চা খাওয়া সারিয়া, একটুখানি গড়াইয়া লইতেছে এমন সময় বাহির হইতে গলা খাঁকারি দিয়া কে একজন ডাকিল, "যোগেশ বাড়ী আছ?"

যোগেশ তাড়াতাড়ি বাড়ীর বাহিরে আসিয়া দেখিল কৃষ্ণবিহারী দাঁড়াইয়া আছেন। ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আসুন, বসুন। আপনি এলেন কেন কষ্ট করে? বিশুকে দিয়ে বলে পাঠালেই আমি যেতাম।"

কৃষ্ণবিহারী বলিলেন, "হঠাৎ এক টেলিগ্রাম এসে হাজির, আমার শ্বশুর মশায় সাংঘাতিক পীড়িত, বাঁচবার আশা নেই। আমাদের ত এখনি যেতে হয়, কিন্তু ঘর সংসার ফেলে হট্ করে যাই কি করে বল ত বাবা?"

এ বিষয়ে সে যে কি সদুপদেশ দিতে পারে তাহা যোগেশ ভাবিয়াই পাইল না। বিপন্নমুখে বলিল, "তাইত।"

কৃষ্ণবিহারী বলিয়া চলিলেন, "আর না গেলেই বা চলে কোথায় বল? তাঁর পুত্র সন্তান নেই, দুটি মাত্র মেয়ে, আমিই হলাম বড় জামাই। না গেলে চলেই না, তার উপর শাশুড়ী ঠাকরুণও গত হয়েছেন কয়েক বছর আগে। বিশুর মা ত মহা কান্নাকাটি লাগিয়েছে, তাকে নিয়ে ভোরের গাড়ীতে আমাকে যেতেই হচ্ছে। মেয়েটাকে আর কোথায় ফেলে যাব, সঙ্গেই নিয়ে যাচ্ছি, বিশুটাকে তুমি একটু দেখতে পারবে বাবা? আর আমার বুড়ো মা ঠাকরুণ রয়েছেন ঘরে, অথর্ব্ব হয়ে পড়েছেন, তাঁকেও একটু দেখতে শুনতে হবে, একেবারে একলা ফেলে যাওয়া যায় না।"

যোগেশ একটু হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, "বিশুকে ত খুব সহজেই আমার ঘরে এনে রাখতে পারি, ছোটঘর হলেও কিছু অসুবিধা হবে না। তবে আপনার মা ঠাকুরুণের কথা যা বলছেন, সেটা কিরকম—"

কৃষ্ণবিহারী বাধা দিয়া বলিলেন, "না, না, বিশুকে এখানে আনার কি দরকার? আমার বৈঠকখানা ঘরখানা বেশ ভাল, এ ঘরখানার চেয়ে ভালই হবে, তুমি যদি দিন কয়েক সেখানে গিয়ে থাক একটু কষ্ট করে। বেশী অসুবিধা হবে না, আমার মা ঠাকরুণ দিনের বেলা চোখে ভালই দেখেন রান্নাবান্না করে দেবেন সব, সন্ধ্যার জলখাবার চা-ও হয়ে যাবে, রাত্রের খাওয়াটার যদি একটু ব্যবস্থা করে নাও।"

যোগেশ বলিল, "সে হয়ে যাবে ঠিক। স্কুলের দরোয়ানজীর রান্নাই আমি খাই কিনা, আলাদা সংসার পাতার হাঙ্গাম আর করিনি। দিনকতক মাছের ঝোল ভাত একবেলাও অন্ততঃ খেয়ে বাঁচব। বিশু রাত্রে আমার সঙ্গে দিনকতক ডালরুটি খাবে আর কি?"

কৃষ্ণবিহারী বলিলেন, "বাঁচালে বাবা, আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। আমি ত চোখে অন্ধকার দেখছিলাম। জ্ঞাতিগুষ্ঠি এখানে আমার অনেক আছে বটে বাবা, কিন্তু সব চোর, একটা ভদ্রলোক নেই। যাকে রেখে যাব, সেই জিনিষপত্তর অর্দ্ধেক লোপাট করে দেবে। আমার ভয় ছিল পাছে তুমি রাজী না হও। ভরসাই বা কি বল? কোন দাবী ত নেই তোমার উপর, স্বচ্ছন্দে 'না' বলতে পার।"

যোগেশ অপ্রতিভ ভাবে বলিল, "না, না, এইটুকু সামান্য কাজ, এতে না বলবই বা কেন? এত পাড়া-প্রতিবেশীর করাই কর্ত্তব্য।"

"আজকাল কি আর কর্ত্তব্যজ্ঞান কারু আছে বাবা, সেসব আমাদের সাবেককালে ছিল বটে," বলিয়া কৃষ্ণবিহারী প্রস্থান করিলেন। যোগেশ মাথার চুলের ভিতর আঙ্গুল চালাইতে চালাইতে ঘরের সামনে পায়চারি করিতে লাগিল।

পরদিন ভোরের গাড়ীতে কৃষ্ণবিহারী স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া রওনা হইয়া গেলেন। যোগেশ নিজের বাক্স ও বিছানাটা স্কুলের বেয়ারার ঘাড়ে চাপাইয়া বিশুদের বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইল। তাহার অন্য জিনিষপত্র আর বিশেষ কিছু ছিলনা, খানকয়েক বই খাতা, ছবি আঁকার জিনিষপত্র ও একটা টেবিল ও চেয়ার। সেগুলা ঘরে তালাবন্ধ করিয়া দরোয়ানের জিম্মায় রাখিয়া আসিল। তক্তপোষখানাও সেইখানেই পড়িয়া রহিল।

বিশুদের বাড়ীতে পাতা সংসার, ঠাকুরমাও বাড়ীতেই আছেন। তাহা ছাড়া ঝি হারাণী আছে, গরু চরাইবার একটা রাখাল ছোঁড়াও আছে। যোগেশ বেশ আরাম বোধ করিল। এতদিন জৌনপুরী দরোয়ান রামখিলাওনের গৃহিণীপণায় বাস করিয়া তাহার হাড় প্রায় ভাজাভাজা হইয়া উঠিয়াছিল। নিতান্ত জেদী ছেলে বলিয়া সে কাজ ছাড়িয়া পলায়ন করে নাই।

সকালে খাওয়া-দাওয়া বেশ ভালই হইল। স্কুলের পথে বিশু জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি টিফিন্ খান স্যার?"

যোগেশ বলিল, "টিফিন আবার কি খাব? একেবারে বিকেলে বাড়ী ফিরে গিয়ে চা বিস্কুট খাই।"

বিশু বলিল, "টিফিন আমি নিয়ে আসতে পারি স্যার, মা দুই হাঁড়ি ভর্ত্তি করে খই-এর মোওয়া আর আমসত্ত্ব রেখে গিয়েছেন।"

যোগেশ একটু ইতস্ততঃ করিয়া লোভটা দমন করিয়া বলিল, "থাক, এইত কসে খেয়ে বেরিয়েছি, অত তাড়াতাড়ি আর ক্ষিদে পাবে না। বিকেলে এসে খুব ভাল করে জলযোগ করা যাবে আর কি?"

বিকালের চা খাওয়াটাও ভালই হইল। হারাণী ঘর ঝাঁটপাট দেওয়া, ঝুল ঝাড়ার কাজে সিদ্ধহস্ত। সে সকাল সন্ধ্যা সারাক্ষণ ন্যাতা ও বাল্‌তি হাতে ঘোরে এবং ঘরের লোককে ঘরে পা না পাতিতে দিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। কলিকাতার বাবু আসার কল্যাণে সে আজ বৈঠকখানা ঘরখানা চারবার মুছিল এবং যোগেশের জামা কাপড় যাহা কিছু হাতের কাছে পাইল, তাহা নির্ব্বিচারে কাচিয়া দিল। কোন্‌টি ব্যবহৃত ও কোনটি অব্যবহৃত তাহা বিচার করিয়া দেখা বিন্দুমাত্র প্রয়োজন বোধ করিল না। ভাল একটা তসরের পাঞ্জাবীর অবস্থা দেখিয়া যোগেশের বড়ই কষ্ট হইল, কিন্তু হারাণীকে কিছু বলিতে তাহার মন সরিল না, স্থির করিল নিতান্ত দরকারী জিনিষপত্র ছাড়া আর সব বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিবে।

রাত্রে রামখিলাওনের তৈয়ারি রুটি ও তরকারি খাইয়া বিশুর প্রায় চোখ ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া আসার উপক্রম! জিজ্ঞাসা করিল, "রোজ আপনি এইরকম রান্না দুবেলা খেতেন স্যার?"

যোগেশ বলিল, "উপায় কি বল? আমার ত এখানে তোমার মত মা ঠাকুরমা নেই, যে দুবেলা ভাল ভাল রান্না করে খাওয়াবেন?"

পরের দিনটা রবিবার। সকালে বিশু ও যোগেশ দুজনেই খানিক বেলা করিয়া উঠিল। চা খাইবার পর বিশু বলিল, "আপনি এখন কি করবেন স্যার?"

যোগেশ বলিল, "আমি ত ভেবেছিলাম যে তোমার পড়াশুনোগুলো একটু দেখব। ইয়ার্লি ত এসে পড়ল। তা তোমার নিজের কি প্ল্যান?"

বিশু বলিল, "পড়াটা দুপুরে করলে হয় না স্যার? তখন ত রোদের ঝাঁঝে বেরতে পারব না, ঘরে বসে পড়া যাবে। এখন একটু পাড়ায় ঘুরে আসি?"

যোগেশ নিজের বাল্যকাল স্মরণ করিয়া বলিল, "তা বেশ দুপুরেই পড়ান যাবে। তুমি ঘুরে এস, কিন্তু খুব বেশি দেরি কোরো না, ঠাকুরমাকে যেন বসে থাকতে না হয়।"

বিশু ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। আবার মিনিটখানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আপনি একলা একলা ঘরে বসে কি করবেন স্যার?"

যোগেশ বলিল, "কি আর করব? বইটই থাকে কি মাসিক পত্র থাকে ত দু'একখানা দিয়ে যাও, বসে বসে পড়ি।"

বিশুদের বাড়ী বইটইয়ের উৎপাত বিশেষ নাই। ঠাকুরমার একখানা মহাভারত আছে এবং কৃষ্ণবিহারীর

গোটাকয়েক হোমিওপ্যাথিক বই আছে। মা পড়াশুনার ধার ধারেন না। বিশুর নিজের পাঠ্যপুস্তকগুলি আছে বটে, কিন্তু সেগুলি স্যারের কিছুই ভাল লাগিবে না।

বাড়ীর ভিতর ঘুরিয়া মিনিট দশ পরে সে বাহির হইয়া আসিল, হাতে তাহার একটা ভাঙা তোবড়ানো টিনের অ্যাটাসে কেস্। সেইটা দুম করিয়া যোগেশের তক্তপোষের উপর নামাইয়া দিয়া সে বলিল, "বই ভাল কিছু আমাদের বাড়ীতে নেই স্যার। তবে এই বাক্সটায় ছোটপুঁটী তার সব খাতা বই রাখে। ছবি আঁকা খাতাই ত ওর পাঁচ ছ'খানা। আপনি দিয়েছেন চারখানা, নিজের একটা ছিল, আমারও গোটা দুই গ্যাঁড়া দিয়েছে। এইগুলো দেখতেই অনেক সময় কেটে যাবে। গল্পের বইও আছে একখানা ওর মধ্যে।"

বিশু প্রস্থান করিল। নিতান্ত মেয়ের দাদা স্বয়ং তাহাকে বই খাতা দেখিবার অধিকার দিয়া গেল তাই, না হইলে যোগেশ নিজে কিশোরী মহিলার বাক্স খোলা অভব্যতাই মনে করিত। দেখিবার উৎসাহ তাহার যে কিছু কম ছিল, তাহা অবশ্য নয়। এক একখানা খাতা বাহির করিয়া সে আগাগোড়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। বাঃ দিব্য আঁকিয়াছে! ক্রমেই হাত খুলিতেছে। এ মেয়েকে ভাল করিয়া না শেখান, নিতান্ত বিধিদত্ত গুণের অপমান করা। কত বোকা হাঁদা ছেলের পিছনে লোকে অজস্র অর্থব্যয় করে আর এই বালিকাটির এমন স্বভাবজাত প্রতিভা ছাইয়ের তলায় চাপা আগুনের মত শেষে নিভিয়াই যাইবে নাকি? ছোটপুঁটী যদি তাহার কোনো আত্মীয়া হইত তাহা হইলে সে জোর করিয়া তাহাকে ভাল করিয়া ছবি আঁকা শিখাইত।

দেখিতে দেখিতে খাতা ছ'খানাই শেষ হইয়া গেল। বিশুকথিত গল্পের বইখানিও দেখা দিল। বইখানি "ঠাকুরমার ঝুলি," যোগেশের খুব বেশী উপভোগ্য বোধ হইল না। তাহার তলায় খবরের কাগজে মোড়া কি একটা। ছবিই হইবে বুঝিয়া যোগেশ সেটা টানিয়া বাহির করিল। উপরের খবরের কাগজের অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টিতে নিজেরই চিত্রিত মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া রহিল।

মন হইতে আঁকা, কিন্তু দিব্য আঁকিয়াছে। পেশাদার চিত্রকর এতটা ভাল আঁকিতে পারিত কিনা সন্দেহ। কিন্তু সব চেয়ে বিস্ময়ের খোরাক জোগাইল চিত্রের তলদেশে অঙ্কিত দুইটি কথা। হল্‌দে পেন্‌সিলে বড় বড় করিয়া লেখা, "আমার বর।"

কথাটা লিখিয়া বোধ হয় চিত্রাঙ্কনকারিণীর লজ্জা হইয়া থাকিবে, একটা 'ইরেসার' দিয়া ঘষিয়া লেখাটাকে অস্পষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু উৎসাহ খুব বেশী ছিল না বোধ হয়। একটু ধ্যাব্‌ড়াইয়া গেলেও লেখাটা পড়িতে কিছুই কষ্ট হয় না।

খানিকক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া যোগেশ আবার ছবি, বই, খাতা প্রভৃতি যেমন ছিল তেমনি করিয়া গুছাইয়া রাখিয়া দিল। বিশু আসিলে পরে বাক্সটা যথাস্থানে রাখিয়া আসিতে উপদেশ দিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল।

দুপুরে আহারান্তে বিশুকে পড়াইবার একটা চেষ্টা হইল বটে, কিন্তু খুব সফল চেষ্টা নয়।

কৃষ্ণবিহারী ফিরিয়া আসিলেন দিন সাতেক পরে। ছোটপুঁটী তাঁহার সঙ্গেই ফিরিল। গৃহিণী দিনকতক রুগ্ন পিতার সেবার জন্য তাঁহার কাছে রহিয়া গেলেন। ছোট বোন আসিলে তবে তিনি ঘরে ফিরিবেন।

যোগেশ নিজের একলার ঘরে ফিরিয়া গেল। কৃষ্ণবিহারী যত্রতত্র দশমুখে তাহার প্রশংসা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

দিন পনেরো পরে, ছোটপুঁটি যখন গোয়ালঘরে বসিয়া নবজাত বাছুরটার ছবি আঁকিতেছে, এমন সময় বিশু আসিয়া পিছন দিক হইতে তাহার মোটা বিনুনি ধরিয়া একটান দিল। ছোটপুঁটি চিৎকার করিয়া উঠিল, "আঃ" ছোড়দা কি করিস্।"

বিশু বলিল, "এই পেত্নী, বৈঠকখানা ঘরে বসে আমাদের খোঁড়াপণ্ডিত বাবাকে কি বলছে জানিস ?"

ছোটপুঁটী বলিল, "তুই সংস্কৃতে গোল্লা পেয়েছিস্ বুঝি ?"

বিশু বলিল, "সাধে তোকে পেত্নী বলি ? বলছে যে যোগেশ মাষ্টার তোকে বিয়ে করতে চেয়েছে। আরে আমাদের সেই স্যার রে, যে তোকে খাতা পেন্‌সিল্ দিয়েছিল।"

"যাঃ বাঁদর কোথাকার, তুই ভারি অসভ্য, দেব মাকে বলে," বলিয়া ঝম্ ঝম্ করিয়া মল বাজাইয়া ছোটপুঁটী একছুটে পলায়ন করিল।

এক কাপ কফি

সবরমতী আশ্রমে কফি বারণ।

একটী মাদ্রাজী তরুণ আশ্রম-বাসী সব সহ্য করতে পেরেছিল, শুধু পারেনি সেই কফি না-খাওয়াটাকে।

হঠাৎ তার অসুখ হয়ে গেল। মহাত্মাজীর চিকিৎসায় ও সেবায় সে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলো।

আশ্রমের নিয়ম অনুযায়ী মহাত্মাজী প্রত্যেক রুগীর সেবা নিজে দেখেন।

প্রত্যহ তিনি সেই তরুণ মাদ্রাজীর শয্যাপার্শ্বে যান।

একদিন তাকে সুস্থ দেখে হেসে বলে উঠলেন, এবার তুমি সেরে উঠেছ ? আচ্ছা, কি খেতে ইচ্ছে করছে বল দেখি ?

মাদ্রাজীটি সুযোগ বুঝে বলে ফেল্ল, এক কাপ কফি !

মহাত্মাজী হেসে উঠলেন, বল্লেন, দেখেছ, এখনো কফি ভোলোনি ! আচ্ছা, আজ তুমি এক কাপ কফি পাবে। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। তার সঙ্গে গরম টোষ্ট !

ছেলেটী অবাক।

মহাত্মাজী রান্নাঘরে গিয়ে দেখলেন, পাচক কাজ সেরে বিশ্রাম করছেন। তাঁকে আর বিরক্ত না করে, নিজে ষ্টোভ জ্বাললেন, জল গরম করলেন, টোষ্ট আর কফি তৈরী করে, একটা ট্রের ওপর রেখে, নিজেই সেই মাদ্রাজী তরুণের সামনে এনে ধরলেন !

তরুণটীর জীবনে সেই শেষ কফি…কিন্তু এত দামী কফি ভারতে আর কেউ খায়নি !

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাশী থেকে মোগলসরাই এলাম একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায়।

এর ছ'মাস আগে আমি মুঙ্গেরের পিসিমার বাড়ি থেকে কাশী আসি এমনি নিঃসম্বলে। মুঙ্গেরে পিসিমার বাড়িও এসেছিলাম নিঃসম্বলে নিজের দেশ যশোর জেলার এক অজ পাড়াগাঁ থেকে। উদ্দেশ্য, চাকুরী খোঁজা। মুঙ্গেরে পিসেমশায় ও পিসতুতো ভাইয়েরা আশা দিয়েছিল চাকুরী জুটিয়ে দেবে। তারা তা পারেনি কিংবা করেনি। পিসিমা কেবলই স্তোকবাক্য দিতেন, "থাকো না বাপু দুদিন। দেশ থেকে এয়েচ, জলে তো আর পড়ে নেই তুমি। এমন কিছু নয় যে ঘরে তোমার ছেলেমেয়ে কাঁদচে। বলে আপনি আর কপ্‌নী। কিসের ভয় তোমার, একটা পেটের জন্যে? না চাকরী জোটে, পিসিমার কুঁড়েতে দুদিন রইলেই বা।"

একথা আমার ভাল লাগলো না। কেনই বা আমি পরের বাড়িতে বরাবর থাকতে আর খেতে যাবো? তা হবে না। চাকরী না পাই, চলে যাবো এখান থেকে। চাকুরী যদি না করবো, তবে দেশে কাকার সংসারে থাকলেই তো হোত। কিছুতেই যখন কিছু হোল না, তখন একদিন কাউকে না বলে মুঙ্গের থেকে রওনা দিলাম। কাশী এসে অবিশ্যি পত্র দিয়েছিলাম পিসিমাকে, আমি কাশী চলে এসেচি এবং ভালই আছি, তিনি না ভাবেন।

কাশীতে এই ছ'মাস থেকেও কিছু জোটাতে পারিনি। ছত্রে ছত্রে খেয়ে বেরিয়েচি, যাত্রীদের মুটেগিরি করেচি, কখনো বা হোটেলে বাসন মাজার কাজ করেচি—কিন্তু স্থায়ী চাকুরী কিছুই জোটাতে পারিনি। এখন এমন দশায় এসে পড়েচি যে আর কাশী থেকে কোনো লাভ নেই, খেতে পাবো না।

আজ সকালে কাশী থেকে হেঁটে এসেচি মোগলসরাই।

বাংলাদেশেই ফিরবো। সকালে একমুঠো ছাতুর দলা খেয়ে পেটভরে জল খেয়েছিলাম। সন্দের সময় ডাউন পার্সেল এক্সপ্রেসে উঠবো ঠিক করে বসে আছি—অনেকে বল্লে ও ট্রেনে নাকি ভিড় কম হয়। এর আগে চার পাঁচখানা ট্রেনে ভিড়ের জন্যে উঠতে পারিনি। ভুল করে একখানা মিলিটারি স্পেশ্যালে উঠে বসেছিলাম, হাত ধরে জোর করে নামিয়ে দিয়েচে। তখন বেলা আড়াইটে।

বেজায় খিদে পেয়েচে। সন্দের বেশি দেরি নেই। আমি প্ল্যাটফর্ম্মের একপ্রান্তে বসে আছি। আমার কাছেই প্ল্যাটফর্ম্মের নিচে কয়েকজন পশ্চিমা লোক আটা মাখচে ও ডাল বাছচে।

ওদের মধ্যে একজন আধবুড়ো লোক, রোগা, কালো, মাথায় একটা ময়লা নেকড়ার পাগড়ি জড়ানো—হিন্দিতে আমায় জিগ্যেস করলে, "কোথায় যাবে?"

"বাংলাদেশে"।

"মকান ?"

"ওই বাংলাদেশেই।"

"কোথায় এসেছিলে ?"

আমি সংক্ষেপে ওদের কাছে আমার কাহিনী সব বললুম।

ওদের মধ্যে আর একজন ছোকরামত লোক বল্লে? "কিছু খাওনি সারাদিন ?"

"ছাতু খেয়েছি ওবেলা"।

"এবেলা কি খাবে ? হাতে পয়সা আছে কিছু ?"

"না।"

ওদের মধ্যে কি কথার বিনিময় হোল। একজন দল ছেড়ে উঠে কোথায় যেন গেল, মিনিট পনেরো পরে ফিরে এসে বল্লে, "বন্ হো গৈল বা"

ওরা সকলে মিলে আমার মুখের দিকে চাইলে। কি বন্ধ হয়ে গেল, কি ব্যাপার, ওদের জিগ্যেস করলাম। যে লোকটি উঠে গিয়েছিল সে বল্লে, "এখানে ছত্র আছে, মুসাফিরদের জন্তে আধসের আটা আর আধপোয়া ডাল সেখান থেকে দেয়। তোমার জন্তে আনতে গিয়েছিলাম। তা বন্ধ হয়ে গিয়েচে।" সেই পাগড়ি বাঁধা প্রৌঢ় লোকটি বল্লে, "গিয়েচে গিয়েচে। তুমি আমাদের এই খাবার থেকেই খেয়ো এখন।"

আমি বল্লাম, "না না, তা হয় না। তোমরা খাও, তোমাদের খাবারে আমি ভাগ বসাবো কেন ?"

ওরা সকলে একযোগে আপত্তি করলে। রামজীর লীলা, তিনিই আমাকে ওদের সঙ্গে পরিচিত করিয়েচেন। তারা যদি আমাকে না দিয়ে খায়, তবে ধর্ম্ম থাকবে কোথায় ?

আমার আপত্তির পেছনে যে খুব জোর ছিল, তাও নয়। ওরা হাতে চাপড়ে মোটা মোটা চাপাটি তৈরি করলে এবং একটা মাটির ভাঁড়ে কাঠ কয়লার ঢিমে আঁচে অড়লের ডাল চাপিয়ে দিলে। আধ-ঘণ্টা পরে রান্না নামিয়ে আমায় দুখানা চাপাটি এবং যেন চাপাটিরই ওপর খানিকটা অড়লের ডাল ঢেলে দিয়ে বল্লে, "খা লিজিয়ে।"

ওদের মধ্যে একজন বল্লে, "ঝুঠা মাৎ কিজিয়ে, ঠাহরিয়ে থোড়া। এক গো নিম্‌কি লিজিয়ে।

নিম্‌কি অর্থাৎ একখণ্ড লেবুর আচার আমার চাপাটির এককোণে ফেলে দিলে ওপর থেকে, পাছে এঁটো করে থাকি এই ভয়ে।

সবাই একসঙ্গে ভোজন আরম্ভ করা গেল। ওদের ভদ্রতায় মুগ্ধ হোলাম। কোথাকার কে তার ঠিক নেই, জাত নয়, জ্ঞাতি নয়, আমাদের জন্তে ওদের কি মাথাব্যথা ? মানুষের মধ্যেই দেবতা বাস করেন, এ সেদিনও বুঝলাম, এর আগে কাশীতে নিঃসম্বল অবস্থাতেও কয়েকবার বুঝেছিলাম।

খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে ওদের মধ্যে একজন বল্লে, "বাবুজি, আপ যায়গা হামলোককো সাথ ?"

"কোথায় যাবো ?"

"জিলা চম্পারণ, থানা রামনগর, গাঁও মনিয়ারি।"

"সেখানে গিয়ে কি করবো ?"

"তোমাকে আমরা থাকতে দেবো, খেতে দেবো, তুমি বাঙালী বাবু, আমাদের ছেলেদের ইংরিজি পড়াবে।"

বেশ যাবো। মনে ভাবলুম আমার আবার কি, যেখানে ভাত জোটে সেখানেই আমার বাড়ীঘর।

ওদের গাড়ি এল, আবার কাশীর দিকে যেতে হোল। কাশী থেকে গোরখপুর, সেখান থেকে খেয়ায় গণ্ডক নদী পার হয়ে ও, টি, রেলওয়ের গাড়ীতে উঠে পরদিন রাত ন'টায় নামলাম নারকাটিয়াগঞ্জ। সেখান থেকে আবার ব্রাঞ্চ লাইন গেল রামনগর। রামনগর থেকে হাঁটা পথে ওদের গ্রাম মনিয়ারি প্রায় বারো মাইল, মধ্যে সেচ বিভাগের খাল পার হতে হয় দুবার।

দিন তিনেক লাগলো সবশুদ্ধ। কিন্তু এখানে এসে বেশ লাগলো। বড় সুন্দর যায়গা। আমি যখন ওদের গ্রামে পৌছেছি, তখন বেলা তিনটে। দূরে একটা শাদামত জিনিস পাহাড়ের মাথায় দেখা যাচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকে। আমি মনিয়ারি ক্যানাল পার হবার সময় থেকে পর্য্যন্ত চেয়ে চেয়ে দেখছি।

বল্লাম, "কি ওটা ?"

ওরা বল্লে, "বর্ফ। ও হিমালয় গিরি না ভায় ? হিমালয়মে যো বর্ফ গিরতা হ্যায়—"

ঐ বরফাবৃত হিমালয়ের দৃশ্য ! কখনো দেখিনি। অমন দেখায় নাকি ? কি অদ্ভুত ! কি সুন্দর ! এদেশে আমি না খেয়েও পড়ে থাকবো।

দিন দুই কাটলো। ওদের মধ্যে পাগড়ীপরা আধাবয়সী লোকটির নাম মাধোলাল। অতি ভদ্রলোক, অবস্থাও বেশ ভালো। পাড়াগাঁ অঞ্চলের বড় চাষী গৃহস্থ। পঁচিশ ছাব্বিশটা দুগ্ধবতী গরু বাড়িতে, দুধ দেয় প্রায় একমণ। ধান ও গম যথেষ্ট।

মাধোলালের বাড়িতে ওর মেয়ে রাখনি আমাকে বড় যত্ন করে। কেমন সুন্দর মেয়ে, ওর কি শান্ত মুখশ্রী। এদেশের সকলের মুখেই সারল্য ও নিষ্কলুষতার ছাপ। স্থানটি সভ্যজগৎ থেকে অনেক দূরে, হিমালয়ের পাদপ্রান্তে অরণ্যভূমির প্রান্তদেশে। মাছ মাংস ডিম খুব মেলে। তবে এখানে মাছ বা মাংস সাধারণ লোকে খায় না। দুধ ঘি প্রচুর—আগের চেয়ে এখানে এখন আক্রা হয়ে গেলেও অন্যদেশের তুলনায় যথেষ্ট সস্তা।

এখানে এসে যেন একটা অদ্ভুত মায়ারাজ্যে এসেছি বলে মনে হোল। যেমন সকালের রোদে তেমনি বিকেলের রাঙা সূর্য্যালোকে দূরের তুষারাবৃত হিমালয় কি অদ্ভুত দেখায়। আমি গ্রাম থেকে বেরিয়ে বেড়াতে বেড়াতে বনের ধারে পাহাড়ী নদী কুসমাইয়ের ধারে শিলাখণ্ডে বসে থাকি। নদীটার ভাল নাম

কি কুসুমবতী? এ যদি হয়, তবে ওর নাম সার্থক বটে। কত কি পুষ্পিত বন্যলতা ও গাছ যে ঝুঁকে পড়েছে কাঁচ কাঁচ জলের ওপর। যেখানে সেখানে শিলাখণ্ড ছড়ানো, যেখানে খুসী বসে থাকো। খুব বড় শিলাখণ্ড আছে, যার ওপরে আট দশ জন লোক স্বচ্ছন্দে বসে থাকতে পারে। সেখানে ছায়ায় বসতাম আপন মনে। ঘন জঙ্গল ও দূরের তুষারাবৃত শৈলশৃঙ্গের দিকে চেয়ে কত কি ভাবতাম নির্জ্জনে।

খেতে পেতাম না কাশীতে। তার আগেও কাকার সংসারে কি হেনস্থা, কি লাঞ্ছনা না গিয়েচে। হাতে পয়সা না থাকলে সবাই নিচুচোখে দেখে। এখানে এসে আনন্দ পেয়েচি, শান্তি পেয়েচি। মাধোলাল আমায় ছেলের মত যত্ন করে, আমি ওকে কাকা বলে ডাকি। এ কাকা আর আপন কাকায় কি তফাৎ তাই ভাবি। দু চারটি ছেলে মেয়েকে ইংরিজি পড়াই, সারা গ্রামে মুন্সী চমনলাল আর আমি, এই দুটি মহাজ্ঞানী পণ্ডিতব্যক্তি বিদ্যমান। বাকী যারা, তারা কায়ক্লেশে নাম সই করতে পারে।

রাখ্নি সন্ধ্যায় বলে, "বাঙালী বাবু, আমি আজ তোমার জন্যে ভাওরা পাকাবো। খাবে তো?"

"সে কি?"

"ভাওরার নাম শোনো নি?"

রাখ্নি খুব অবাক হয়ে যায়। এ আবার কোন দেশের লোক, যে ভাওরার নাম শোনে নি। সে হাত নেড়ে দেখিয়ে বল্লে, "আটার হয়, এমনি গোল গোল। ঘুঁটের আগুনে পোড়াতে হয়। ঘি জবজবে, আলুর চোখা দিয়ে খেতে হয়।"

"আলু ভাতে দিয়ে ভাল লাগে?"

"খুব। খেয়ে দেখো। আর বাঙালী বাবু—"

"কি?"

"তুমি বাপজীকে বলো, তোমার কাছে আমি আংরেজি পড়বো।"

"আজই বলবো।"

তারপর রাখ্নি আমার সঙ্গে বসে গল্প করে। বাঙালী বাবু এখানে থাকো, কোথাও যেতে দেবো না। মাঠা খাওয়াবো, ছাতুর লাড্ডু খাওয়াবো, মালাই-মিঠা খাওয়াবো।

"তা না হয় খেলাম, কিন্তু মাছ? মাছ না খেলে বাঙালীর শরীর টিকবে কতদিন?"

রাখনি খিল খিল করে হেসে ওঠে। ঝক্ ঝক্ করে ওর মুক্তোর মত দাঁতগুলি—চোদ্দ পনেরো বছরের সুশ্রী মেয়ের মুখের প্রাণখোলা হাসি।

বলে, "মছলি কত আছে কুসমাইয়ে, পাটনডণ্ডীর নহরে। পাটনডণ্ডীর নহরে মাছ ধরতে যাবে?"

সে গবর্ণমেণ্টের খাল। সেখানে ওদের লোক বসে আছে। মাছ ধরতে দেবে কেন?"

"আমি ধরবো। তোমাকে ধরে দেবো। মেয়ে মানুষকে নহরের চৌকীদার কিছু বলবে না।"

এবার আমি হেসে ফেলি। বল্লাম, "গবর্ণমেন্টের চৌকিদার মেয়ে পুরুষ বাছবে না রাখ্নি। চুরি যে করে তার আবার মেয়ে পুরুষ।" দুজনেই খুব হাসি। আমোদ লেগেচে দুজনেরই।

রাখ্নি এত ভালো মেয়ে, তার আপন পর জ্ঞান ছিল না। আমি ওদের বাড়িতে কেউনা, অন্নদাস বলা যেতে পারে, রাখ্নি কিন্তু আমাকে বড় আপনার জন ভাবতো। তার সর্ব্বদা চেষ্টা ছিল যাতে আমি অভুক্ত না থাকি, খেয়ে আমার পেট ভরে। এজন্যে তার কত যত্ন, কত অসম্ভব হাস্যকর প্রয়াস।

আমি বলতাম, "রাখনি, আমি বিদেশী লোক। আজ এয়েচি কাল চলে যাবো। তুমি আমাকে অত ভালবাসো কেন? আমি চলে গেলে কষ্ট পাবে। রাখ্নি বলতো, "ইস্! চলে যাবে বইকি?"

"তবে কি?"

"বিয়ে করবো তোমাকে। দুজনে বাস করবো আমাদের বাড়ির পাশে।"

"চলবে কিসে?"

"বাবার কাছ থেকে জমি চেয়ে নেবো। তুমি জমি চাষ করবে।"

ওইটুকু মেয়ের কি বুদ্ধি। আমার এমনি হাসি পেত। এর মধ্যে সব ঠিকঠাক করে বসেচে। রাখনিকে আমারও বড্ড ভাল লাগতো। ওর স্নেহ-যত্ন ভুলবার নয়। অবিশ্যি ওর বাবাও খুব ভালো, একদিনের জন্যেও আমার প্রতি তাঁর অযত্ন দেখিনি।

আমি ওখানে মাস ছয়েক থাকবার পরেই এক ঘটনা ঘটলো।

একদিন সন্ধ্যার সময় বেড়িয়ে এসে দেখি বাড়ির সকলের ব্যস্ত, চঞ্চলভাব, মুখ গম্ভীর। শোনা গেল মাধোলালের স্ত্রীর প্লেগ হয়েচে। প্লেগকে ওখানকার লোক বড্ড ভয় করে। বাড়িতে লোকজন আসা বন্ধ হয়ে গেল। গ্রামের চৌকিদার এগারো মাইল দূরবর্ত্তী থানায় খবর দিতে ছুটলো। পরদিন সন্ধ্যায় মাধোলালের স্ত্রী মারা গেল, মাধোলালকে ধরলো প্লেগে। তৃতীয় দিনে মাধোলালও মারা গেল। একই সঙ্গে মাধোলালের এক বৃদ্ধা পিসিও দেহ রাখলেন। ছ'সাত দিনের মধ্যে মাধোলালের বাড়ির সকলেই কাবার হোল—রাখ্নি বাদে। প্লেগ তখন আশেপাশের দুএকটি বাড়িতেও ধরেছে। ইতিমধ্যে একদিন ডাক্তার এসে সকলকে প্লেগের টিকেও দিয়ে গেল।

বেঁচে গেলাম আমি ও রাখ্নি। আধমরা অবস্থায় বাঁচা। আমার তখন কোনো জ্ঞানচৈতন্য নেই এমন অবস্থা। এমন দুর্দ্দিনের মুখ কখনও দেখিনি, প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েচি। মৃত্যুর সে কি করুণ দৃশ্য দেখেছি চোখের সামনে! রাখ্নিকে নিয়ে আরও মুস্কিল—তাকে সান্ত্বনা দেব কি, নিজের চোখের জল থামে না।

যখন সব মিটে শেষ হয়ে গেল, প্লেগ থামলো, তখন ওদের বাড়িতে আমি আর রাখ্নি আর ভক্তদাস বলে ওদের এক পুরনো চাকর এই তিনজনে টিম্‌টিম্ করচি।

কয়েকদিন কেটে গেল। সরকারি লোকেরা এসে ঘর দোর ধুয়ে ধোঁয়া দিয়ে ওষুধ ছড়িয়ে দিয়ে পুরনো কাপড় চোপড় পুড়িয়ে দিয়ে গেল। আমার আর ভালো লাগচে না, এখান থেকে বেরিয়ে পড়তাম কিন্তু রাখনিকে কার কাছে ফেলে দিয়ে যাই—এই হয়েচে মহাসমস্যা।

এ আবার কি বিষম বন্ধনে ভগবান আমায় জড়ালেন তাই ভাবি। বেশ ছিলাম স্বাধীন, খাই না খাই কোনো বন্ধন বা দায়িত্ব ছিল না।

গ্রামের লোক বলে, তুমি রাখনিকে বিয়ে করে ওদের বাড়ি থাকো। অবস্থা ওদের সত্যিই ভালো। যথেষ্ট জমিজমা, গরু বাছুর, গোলাভরা ধান, গম, যব, সর্ষে। এ সবের মালিক হয়ে থাকা বড় কম কথা নয়। ভেবে ভ্যাখো বাংগালী বাবু, এ বড় চাট্টিখানি কথা নয় আজকার দিনে।

রাখনি? তার কথা কি বলবো। সে তো আমাকে বেশ ভালোবাসে। দিনরাত কান্নাকাটি করে, আমি তাকে বোঝাই সান্ত্বনা দিই।

একদিন রাত্রে হোলো কি, সেই কুসুমবতী নদীর ধারে বসে আছি, রাত বেশী নয়—সবে সন্ধ্যা উৎরেছে, ঘুলি ঘুলি অন্ধকার ঘন গাছের তলায়, এমন সময় রাখনি সেখানে এসে পেছন থেকে কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়ালো।

চমকে উঠে বল্লাম "কে রে? ও! তুমি! এমন করে আসতে হয়? ভয় করে না আমার?"

—"ভয় কিসের?"

—"ভূতের।"

—"তুমি তো ভুত মানো না বাবুজি—"

—"মানি নে, আবার ভূত না মানলেও ভয় করে এই অন্ধকার রাত্রে। বোসো রাখ্নি, একটা কথা।" ও বসলো আমারই পাশে। বসে বল্লে, কি?

—"আমি ভাবচি, এখান থেকে চলে যাবো। অনেকদিন হোল এসেচি।"

—"যাবে? আর আমি? আমাদের বাড়িঘর?"

—"ভক্তদাস তো রইল। ও তোমার দেখাশুনো করবে। আমিও মাঝে মাঝে সময় পেলে এসে দেখে যাবো।"

—"আমিও যাবো তোমার সঙ্গে—"

—"কোথায় যাবে? তা ছাড়া; ঘর বাড়ি, গরু বাছুর, গোলা, জমিজমা এসব কি হবে?"

—ওসব ভক্তদাস নিক্। আমার ওতে দরকার নেই। সত্যি বলচি বাবুজি। কি হবে গরু বাছুর আর ঘর দোরে? তুমি যাকে হয় বিলিয়ে দিয়ে যাও। আমি এখানে থাকবো না—আমার ভাল লাগবে না—"

কথা শেষ করে ও মিনতির সুরে আমার হাত দুটি ধরে বল্লে—আমায় ফেলে কোথায় যেও না বাবুজি? বলো যাবে না? আর যদি যাও আমায় নিয়ে যাবে? এখানে থাকবো কার কাছে তা বলো?"

—"কেন ভক্তদাস?"

—না, আমি থাকবো না। ভক্তদাস মরে গেলে তখন কার কাছে থাকবো?

—"সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে তখন।"

—"না ব্যবস্থাতে দরকার নেই বাবুজি! আমি তোমার সঙ্গে যাবোই।"

আমি পড়ে গেলাম মহা ফাঁপরে ওর কথা শুনে। এতক্ষণ নির্জ্জনে বসে এই কথাই কিন্তু আমি ভাবছিলাম। রাখনিকে নিয়ে কি করি এই হয়েচে আজকাল আমার বড় ভাবনার কথা। আমি চুপ করে আছি দেখে রাখনি বল্লে "শুনবে বাবুজি আমার একটা কথা?"

—"কি?"

—"আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো। আমাকে সাদি করতে হবে না তোমাকে। চলো তুমি আর আমি কোথাও গিয়ে ভগবানের নাম করি। কি হবে এখানে থেকে? ভালো লাগে না।"

আমি ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে চাইলাম। পনেরো বছরের মেয়ের মুখে এ কথা সত্যিই আশ্চর্য্য। রাখনি এই বয়েসে সংসার বিরাগিণী হয়ে উঠলো কি ভাবে।

আমি বল্লাম—"সত্যি? যাবে?"

ও জোর করে বল্লে—"নিশ্চয়ই যাবো। নিয়ে চলো আমাকে। এখানকার বিষয়আশয় বিলিয়ে দেও কাউকে, নয়তো ভক্তদাসকে দেও, ও থাকুক এ বাড়িতে। ভগবানের নাম করি গে চলো।"

গেলাম একদিন সত্যিই ওকে নিয়ে চলে। এলাম গণ্ডক নদী পার হয়ে, গোরখপুর হয়ে কাশী। সঙ্গে ছিল প্রায় চার পাঁচশো টাকা আর রাখনির মায়ের অনেক সোনার গহনা। কাশী থেকে গেলাম হরিদ্বার। এদিকে তখন আমার মনে ভয় হয়েচে নাবালিকা মেয়েকে নিয়ে চলে এসেচি—পুলিশে হয়তো উৎপাত করতে পারে।

এক ধর্ম্মশালায় উঠে দিন তিনেক থেকেই রাখনিকে নিয়ে কনখলে গেলাম। এক পাণ্ডার বাড়ি ওকে রাখলাম। রাখনি বলে, "তোমার কাছে থাকবো, এখানে কেন? তুমি জায়গা ঠিক কর। আমরা দুজনে সেখানে থেকে ভগবানের নাম করবো।"

দিন দিন একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষ্য করতে লাগলুম। হরিদ্বারে এসে পর্য্যন্ত ভগবানের পথে যাবার জন্যে ওর প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠতে লাগলো।

এক বাঙালী সাধুর সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গেল গঙ্গার ধারের ঘাটে। তাঁর নাম স্বামী বাসুদেবানন্দ। তাঁর আশ্রমেও আমরা গেলাম। কনখলে গঙ্গার ধারে একটা পুরনো দোতলা বাড়িতে তিনি থাকেন। স্থানটি নির্জ্জন, বাঁধানো ঘাট পুরনো বাড়ির নিচেই, পুরনো মন্দির ঘাটের ওপরেই। কিভাবে আলাপ হোল তা বলি।

আমরা সেই পুরনো ভাঙা ঘাটে গিয়ে বসেছিলাম। সন্ধ্যাবেলা। ওপারে কি একটা পাহাড়, পরে নাম শুনেছিলাম মনসার পাহাড়। রাখনির বেশ গলা, ও গুণগুণ করে ওর বাবার মুখে শেখা একটা রামজীর ভজন ধরলে। দেখি ওর চোখ ছল ছল করচে।

বল্লাম—"রাখনি, আর একটু জোরে গাও, বেশ লাগচে—"

"না গাইবো না।"

"মার খাবে জোরে না গাইলে।"

দুজনেই হেসে উঠি।

সত্যি, কি সুন্দর কেটেচে এই হরিদ্বারের গঙ্গার ধারের দিনগুলি। মনে মনে তাই ভাবি। কি সুন্দর সন্ধ্যা, কি চমৎকার জ্যোৎস্নার আলো গঙ্গার নীলধারার ওপর।

আমরা বসে আছি, এমন সময়ে ঘাটের ওপরের মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বেজে উঠলো। আমরা ঘাট থেকে উঠে আরতি দেখতে গেলুম। সুন্দর কৃষ্ণমূর্ত্তি। আরতির পরে বৃদ্ধ পূজারী আমাদের হাতে প্রসাদের বাতাসা বিতরণ করলেন। স্বজাতীয় চেহারা দেখে মনে হোল তিনি বাঙালী। দেখলেই ভক্তি হয়। রাখনি বল্লে, "জিগ্যেস করো না উনি কি এ মন্দিরে থাকেন?"

আমি বিনীত ভাবে বল্লাম—"আচ্ছা, আপনি বাঙালী, না কি?"

তিনি হেসে বল্লেন, "হ্যাঁ। তুমিও তো বাঙালী।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কোথায় উঠেচ এখানে?"

"এক পাণ্ডার বাড়ি।"

আমি তাঁকে রাখনির বিবরণ সব খুলে বল্লাম। রাখনিও ছল ছল চোখে দেহাতি-হিন্দিতে তার মনের কথা খুলে বল্লে। আমরা তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করলাম। তাঁর আশ্রমে আমাদের স্থান দিলেন।

রাখনি কি খুসি! সাতদিনের মধ্যে সে সাধিকা সন্ন্যাসিনী বনে গেল, পনেরো বছরের মেয়ে!

কি তার ভজন গানে নিষ্ঠা, মন্দির মার্জ্জনা করতে লাগলো যেন প্রাণ ঢেলে দিয়ে। বিগ্রহের পূজোর সমস্ত আয়োজন, ফুল তোলা, পূজোর বাসন ধোয়া মাজা, ধূপধুনো দেওয়া—সব ও করবে কি একাগ্র মনে, কি ভক্তির সঙ্গে। এখানে এসে ও ভাবতে লাগলো যেন নিজের স্থানটিতে এসে পৌছেচে এতদিনে।

বাসুদেবানন্দ সন্ধ্যাবেলা ওর মুখে হিন্দি ভজন শুনে বড় খুসি। একটি না দুটি মাত্র ভজন সে জানে তার বাবার মুখে শোনা। তার মধ্যে একটা হোল তুলসীদাসের :—

"পঙ্গু চঢ়ে গিরিবর গহন মূক করে বাচাল"

বাসুদেবানন্দ ওর পিঠ সস্নেহে চাপড়ে বলতেন—"পাগলি, আর জন্মে তুই ব্রজের গোপী ছিলি এই বয়সে এত কৃষ্ণ ভক্তি এল কোথা থেকে তাই ভাবি।"

তার ফুলের মত পবিত্র বালিকামনটি সর্ব্বদা উন্মুখ হয়ে থাকে এতটুকু ভক্তির আলো পাবার জন্যে মন্দিরের বিগ্রহের অমন প্রাণ ঢালা সেবা দেখে স্বামিজী নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। রাখ্‌নির চেহারা দিনে দিনে বদলাচ্চে। সে যেন ওই মন্দিরের চিহ্নিত দেবদাসী কতকাল থেকে।

রাখনি আর আমার কথা বলে না। দিন দিন সে মন্দিরের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্চে। ও দূরে সরে যাচ্চে ক্রমশঃই আমার কাছ থেকে।

একদিন ওকে বলি, "রাখনি, আমি ভাবচি এখান থেকে চলে যাবো।"

ভেবেছিলুম, ও বোধ হয় বলবে, আমাকেও নিয়ে চলো।"

কিন্তু ও নির্ব্বিকার ভাবে বল্লে—"কবে?"

"দু একদিনের মধ্যেই।"

"আবার কবে আসবে?"

"দেখি।"

এতেও ও কিছু বল্লে না। রাখনির মন অন্যদিকে চলে গিয়েচে। আমায় আর ও চায় না। বড় দুঃখ হোল মনে। মনে পড়লো কুসুমবতীর তীরে সেই সব সন্ধ্যার কথা। কি মধুর হয়েই আছে সেগুলির স্মৃতি মনের কোনে। কতদূরে চলে গিয়েচে সে সব দিন। আর কোনোদিন ফিরবে না। বেশ বুঝতে পারি আর ফিরবে না।

এক এক সময় ভাবি, ভুল আমিই করেচি। রাখনিকে বিয়ে করে ওদের গ্রামেই বাস করতে পারতাম। সকলেই বলেছিল, রাখনিও বলেছিল। কারো কথা শুনিনি।

একদিন কাউকে কিছু না বলে কনখল থেকে রওনা হোলাম। আজ সাত আট মাস হয়ে গেল, আর যাইনি, চিঠিপত্রও দিই নি।

যাবোও না।

আশা করি রাখনি সুখী হয়েছে।

তবুও ভুলতে পারিনে কুসমাইয়ের ধারের সেই অপূর্ব্ব সন্ধ্যাগুলি। রাখনি আমার হাত ধরে বলেছিল, "কোথায় চলে যাবে বাবুজি? যাও তো আমায় নিয়ে যেও।"

পেছনের দিন পেছনেই পড়ে থাকে, আর কোনোদিনই সামনে এসে এগিয়ে দাঁড়ায় না।

আমি এসে আবার কাকার বাড়ি ঢুকেচি। কাকার গরু বাছুর বাঁধি, হাট বাজার করি, খুড়ীমার মুখনাড়া খাই, সঙ্গে সঙ্গে দুটো ভাতও। নয়তো এ বাজারে ভাত পাচ্চি কোথায়?

নদীর জল ঘৃণায় নর্দ্দমার জলকে বলে, এই নোংরা জল নিয়ে, তুই আমার জল পর্য্যন্ত নষ্ট করচিস্, এ সাহস তোকে দিল কে?

নর্দ্দমা বলে, মহাসাগর!

কমিউনিষ্ট্ প্রিয়া

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বালীগঞ্জের এক নিভৃত বাসিন্দা-পল্লীতে সুকুমার রায়ের বৃহৎ অট্টালিকা। সুদৃশ্য লৌহদ্বার ঠেলে কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করলে চাঁপাফুলের রঙের ঘুটিং-ঢালা একটা প্রশস্ত পথ গাড়িবারান্দার পূর্বপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। গাড়িবারান্দার পশ্চিমপ্রান্ত দিয়ে সেই পথটা নির্গত হয়ে সমস্ত অট্টালিকাটা পরিবেষ্টিত করে পুনরায় গাড়িবারান্দার পূর্বপ্রান্তে এসে মিলিত হয়েছে।

সুরম্য সৌধের বামপ্রান্তের কোণে সু-উচ্চ মিনার। তদুপরি একটা বৃহৎ গুরুভার জাতীয়পতাকা অলস মন্থরভঙ্গিতে বায়ুভরে ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হচ্ছে।

ছুটির দিন, বেলা তখন নয়টা। গাড়িবারান্দার মধ্যস্থলে এসে বাইসিকেল থেকে অবতরণ ক'রে বিজয়েশ নিকটবর্তী একজন চাপরাশীকে জিজ্ঞাসা করলে, "মিষ্টার রায় বাড়ি আছেন? সুকুমার রায়?"

চাপরাশী বল্‌লে, "আছেন, কিন্তু একটু ব্যস্ত আছেন, ঘরে চার পাঁচজন বাবুর সঙ্গে কথা কইছেন। আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে।" তারপর পকেট থেকে পেন্সিল এবং শ্লিপ-ব্লক বার ক'রে বিজয়েশের হাতে দিয়ে বললে, "আপনার নামটা লিখে দিন।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পদার্থবিজ্ঞানে এম্-এস্‌সি পাশ ক'রে সুকুমার বিলাত গমন করে। তথায় পাঁচ বৎসর কাল অধ্যয়ন এবং শিক্ষার পর সে যখন একটা বড়-রকম এঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রি অধিকার করলে, তখন ইয়োরোপীয় যুদ্ধের অবস্থা এরূপ সঙ্গীন যে, জল স্থল অথবা অন্তরীক্ষপথে এক-পা অগ্রসর হবার উপায় নেই। অগত্যা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা তখনকার মতো স্থগিত রেখে ইংলণ্ডে একটা বৃহৎ যুদ্ধ-কারখানায় সে চাকরি গ্রহণ করে। কিছুকাল পরে ইয়োরোপীয় যুদ্ধের অবস্থা কতকটা মন্দীভূত হলে, অতিকষ্টে কোনোপ্রকারে ব্যবস্থা ক'রে সে দেশে ফিরে আসে। ডিগ্রি পাবার পরেই বিলাতে অবস্থান কালে সুকুমার অযাচিত ভাবে কলিকাতার এক নামজাদা ইংলিশ এঞ্জিনীয়ারিং ফার্মে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট্ এঞ্জিনীয়ারের চাকরি লাভ করে। মাসিক বারশত টাকা বেতন, তদুপরি কার-অ্যালাউয়েন্স্ এবং সালিয়ানা একটা মোটা অঙ্কের কমিশনের ব্যবস্থা। কলিকাতায় এসে চীফ্ ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করবার পরদিন হতে সে চাকরিতে নিযুক্ত হয়েছে। পূর্বোক্ত চাপরাশী সুকুমারের অফিসের খাস আরদালী। ছুটির দিনে তাকে সুকুমারের গৃহে হাজিরা দিতে হয়।

চাপরাশীর হাত থেকে শ্লিপ্-ব্লক নিয়ে বিজয়েশ নিজের নাম লিখছে দেখতে পেয়ে, সতীশ নামে সুকুমারদের একজন কর্মচারী ছুটে এসে বল্‌লে, "চেনোনা রামচরিত্তর, এঁকে? এর শ্লিপ্ লাগবে না।"

তারপর বিজয়েশের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বিনীত কণ্ঠে বল্‌লে, "মিস্টার রায় ঐ পূবদিকের কোণের ঘরে আছেন। আপনি যান, স্যার। নাম আপনাকে পাঠাতে হবে না।"

একটু দ্বিধা সহকারে বিজয়েশ বল্‌লে, "কিন্তু শুনছি, ওঁর ঘরে লোক আছে?"

"তা থাক্, তার জন্যে আপনার আটকাবে না, আপনি যান।"

এ কথার পর আর কোনো প্রশ্ন না তুলে বিজয়েশ সতীশের নির্দেশিত ঘরের দিকে প্রস্থান করলে।

বিজয়েশ কিয়দ্দূর অগ্রসর হ'লে রামচরিত্র সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলে, "কে ইনি সতীশ বাবু?"

সতীশ বল্‌লে, "চৌঠা বৈশেখ যে মেয়েটির সঙ্গে তোমার সাহেবের বিয়ে হবে, ইনি তাঁর দাদা, বিজয়েশ চৌধুরী। মস্ত পণ্ডিত লোক,—কলেজের প্রোফেসার।

সুকুমারের কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে বিজয়েশ দেখলে দ্বার আধখানা খোলা। তারই মধ্য দিয়ে দেখতে পেলে দ্বারের দিকে মুখ ক'রে টেবিলের সামনে বসে সুকুমার কয়েকজন যুবকের সহিত কথোপকথন করছে।

অবিলম্বেই চোখোচোখি হ'য়ে গেল। ব্যস্ত হ'য়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে সাগ্রহকণ্ঠে সুকুমার বললে, "আসুন, আসুন, বড়দা, আসুন!"

কক্ষে প্রবেশ ক'রে ঈষৎ দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বিজয়েশ বল্‌লে, "তুমি ব্যস্ত রয়েছ, আমি না-হয় বাইরে একটু অপেক্ষা করি।"

ব্যগ্রস্বরে সুকুমার বল্‌লে, "না, না, বাইরে অপেক্ষা করতে হবে না।

এঁদের সঙ্গে আমার কাজ শেষ হ'য়ে এসেছে। মিনিট দুচ্চার অপেক্ষা করতে যদি অসুবিধে না হয়, তা হ'লে ঐ চেয়ারটায় বসুন।" ব'লে ঘরের এককোণে রাখা একটা ইজিচেয়ার দেখিয়ে দিলে।

"না, আমার একটুও অসুবিধে হবে না।" ব'লে বিজয়েশ ইজিচেয়ারে উপবেশন করলে।

সুকুমার ছাড়া ঘরে পাঁচজন যুবাপুরুষ ছিল। প্রত্যেকের অঙ্গে ধপধপে খদ্দরের পোষাক, মাথায় খদ্দরের টুপি এবং জামার বাম দিকে বুক-পকেটের কাছে আঁটা কংগ্রেস ব্যাজ।

সুকুমারের টেবিলের উপর একরাশ কংগ্রেস-ব্যাজ এবং চার পাঁচটা জাতীয়পতাকা।

যুবকদের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, "নূতন পোস্টার ছাপান হয়েছে?"

একটি যুবক বল্‌লে, "হয়েছে স্যার।"

"এবার ঠিক হয়েছে ত?"

"ভালই হয়েছে। দেখবেন স্যার? বাইরে আমার ব্যাগে খানদুয়েক আছে।"

সুকুমার বল্‌লে, "নিয়ে এস, দেখি।"

যুবকটি দ্রুতপদে বাইরে গিয়ে একখানা পোস্টার এনে সুকুমারের সম্মুখে মেলে ধরলে। উজ্জ্বল লাল কালিতে বড় বড় বলিষ্ঠ অক্ষরে ছাপা—কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত হরিনাথ বসুকে ভোট দিয়ে দেশকে স্বাধীনতার পথে অগ্রগামী করুন।

ক্ষণকাল স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে প্রসন্নভাবে সুকুমার বললে, "বেশ হয়েছে ; ঠিক হয়েছে এবার। কত ছাপিয়েছ ?"

"চার হাজার।"

"আচ্ছা, আজ থেকে মারতে আরম্ভ কর। বেশ সদর জায়গা দেখে দেখে মারবে, কিন্তু লীগ কিম্বা কমিউনিস্ট্ পোস্টারের ওপর মেরো না।"

যুবকদের মধ্যে একজন ঈষৎ উষ্মার সহিত বল্‌লে, "কিন্তু ওরা যে আমাদের পোস্টারের ওপর মারে স্যার !"

মৃদু হাসিয়া সুকুমার বল্‌লে, "ওরা মারে ব'লে আমরাও মারব, এ ত' আমাদের নীতি নয় প্রভাত।"

'মারা' শব্দের দ্ব্যর্থের কৌতুকে সকলে হেসে উঠ্‌ল।

সুকুমার বললে, "তা ছাড়া, একথা সব সময়ে মনে রেখো যে, চাপা দিয়ে বিশেষ কিছু ফললাভ করা যায় না ; তা পোষ্টার চাপা দিয়েই বল, আর মানুষ চাপা দিয়েই বল।"

পুনরায় একটা হাস্যধ্বনি উত্থিত হ'ল।

প্রভাত বল্‌লে, "ওদের কিন্তু মতলব ভাল মনে হচ্ছে না স্যার। শুনছি, মণ দরে ওরা লাঠি কিনতে আরম্ভ করেছে। শেষপর্যন্ত মারামারি না ক'রে ছাড়বে না দেখছি ওরা।"

সুকুমার বললে, "যত ইচ্ছে লাঠি ওরা কিনুক, কিন্তু মারামারি কিছুতেই করা হবে না প্রভাত। ওদের মারার উত্তরে আমরাও যদি মারি, তা হ'লে কিছুতেই ওদের বিশ্বাস করানো যাবে না যে, সত্যিসত্যিই আমরা অহিংস।"

সুকুমারের কথা শুনে পুনরায় সকলে হেসে উঠল।

সুকুমার বললে, "তোমাদের সঙ্গে আজকের মতো সব কথাই শেষ হয়েছে।" বিজয়েশকে দেখিয়ে বল্‌লে, "এঁকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি, এবার তোমরা কাজে বেরিয়ে পড়। বন্দেমাতরম্ !"

সমস্বরে 'বন্দেমাতরম্' ব'লে যুবকের দল ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল।

নিজের খাস আসন পরিত্যাগ ক'রে বিজয়েশের কাছে উঠে এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে সুকুমার বল্‌লে, "এবার হুকুম করুন বড়দা। বাড়ির খবর সব ভাল ত ? কমলা ভাল আছে ?"

সুকুমারের ভাবী বধূর নাম কমলা।

স্মিতমুখে বিজয়েশ বললে, "হাঁ, কমলা ভাল আছে। আমি আসছি তার কাছ থেকে একটা অনুরোধ নিয়ে।"

বিজয়েশের কথা শুনে সুকুমারের মনে কৌতূহল জাগ্রত হ'ল ; ঈষৎ বিস্মিতকণ্ঠে সে বল্‌লে, "অনুরোধ নিয়ে ? কি অনুরোধ নিয়ে ?"

পকেট থেকে একখানা খামে-মোড়া চিঠি বার ক'রে সুকুমারের হাতে দিয়ে বিজয়েশ বললে, "চিঠিখানা প'ড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে।"

"কমলার চিঠি?"

"হ্যাঁ।"

"কমলার চিঠি নিয়ে স্বয়ং বাড়ির কর্তাকে আসতে হ'ল? চাকর দিয়ে পাঠিয়ে দিলে চল্‌ত না?"

একটু ইতস্তত ক'রে মনে মনে একটুখানি কি ভেবে নিয়ে বিজয়েশ বল্‌লে, "চিঠির মধ্যে যে অনুরোধ আছে তা শুধু কমলার অনুরোধই নয়, আমরাও সে অনুরোধে deeply interested, তাই আমি নিজেই এসেছি।"

"ব্যাপার কি বলুন ত!" বলে খাম খুলে সুকুমার চিঠিটা পড়তে আরম্ভ করলে। চিঠি পড়তে পড়তে তার মুখমণ্ডলে একটা ঘনছায়া দেখা দিলে। সে ছায়া চিন্তার, না বিরক্তির, না চিন্তা ও বিরক্তি জড়িত কোনো মিশ্রিত-মনোভাবের, তা ঠিক বোঝা গেল না। অদীর্ঘ চিঠি অবিলম্বে শেষ ক'রে ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টিতে সে বল্‌লে, "কিন্তু দেবেশ্বর সান্যাল যে কমিউনিস্ট্।"

বিজয়েশ বল্‌লে, "সেইজন্যেই ত' তোমার প্রতি আমাদের এই অনুরোধ। দেবেশ্বর সান্যাল কংগ্রেসীয় হ'লে তুমি ত' এম্‌নিই তাকে ভোট দিতে।"

"কিন্তু আমি যে নিজে একজন কংগ্রেসীয়! তায় আবার একেবারে নির্লিপ্ত কংগ্রেসীয়ই নই, একজন কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থীকে একটু প্রবল ভাবেই সাহায্য করছি।"

"সেইজন্যেই ত' তোমার প্রতি আমাদের এত লোভ! তুমি আমাদের দলে যোগদান করলে একজন প্রবল শত্রু প্রবল মিত্রে পরিণত হবে; —একেবারে ডবল লাভ! আসল কথা কি, জানো সুকুমার? তুমি আমাদের এমনই এক পরমাত্মীয় হ'তে চলেছ যে, ষোল আনা তোমাকে না পেলে আমাদের পরিতৃপ্তি নেই।"

একমুহূর্ত্ত চুপ ক'রে থেকে ঈষৎ হাসিমুখে সুকুমার বল্‌লে, "কিন্তু এমন ক'রে আমার রাজনৈতিক মত বদলে নিয়ে পাওয়াকে আপনি কি ষোল আনা পাওয়া বলেন? আমার ত' মনে হয় তা হ'লেই আমাকে ষোল আনা পাওয়া হবেনা। আমার মাথায় পিছন দিকের চেয়ে সামনের দিকে বড় বড় চুল আছে। ধরুন, আমাকে পাবার এই সর্ত যদি আপনারা করেন যে, সামনের মাথার চুল ক্লিপ্ ক'রে আমাকে পিছনের চুলের সমান ক'রে নিতে হবে, আর আমি যদি আপনাদের সেই সর্ত পালন করি, তা হ'লে কি মনে করেন আমাকে ষোল-আনা পাওয়া হবে? আর, মাথা ক্লিপ্ করলে মানুষের যে-পরিমাণ পরিবর্তন হয়, মত ক্লিপ করলে তার চেয়ে বেশি হয়, এ কথা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।"

অতঃপর প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে চল্‌ল তর্ক এবং বিতর্ক; তারমধ্যে এসে পড়ল কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ এবং নীতিগত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম আলোচনা, এসে পড়ল মুসলীম লীগ এবং মুসলীম

লীগের পাকিস্থানী দাবীর কথা, জাগ্রত হ'ল নানাপ্রকার অভিযোগ এবং অভিযোগ খণ্ডনের কূট বাদানুবাদ, কিন্তু সেই দুস্তর বিভেদ-সাগরের অসীম জলরাশির মধ্যে এমন একটিও ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখা গেল না যার উপর আশ্রয় লাভ ক'রে একটা সুমীমাংসার সম্ভাবনা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

বিজয়েশ বল্‌লে, "তর্ক যথেষ্ট হয়েছে; আর তর্ক করে কোনো লাভ নেই। মোট কথা এই যে, রাজনৈতিক মতভেদ এমন একটা জিনিস, বিশেষ ক'রে আজকালকার দিনে, যা কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। সুতরাং আমাদের সঙ্গে তোমার মতের ঐক্য আমরা একান্ত ভাবে কামনা করি।"

সহাস্যমুখে সুকুমার বল্‌লে, "আমিও ত' আমার দিক থেকে ঠিক আপনাদেরই মতো আমার সঙ্গে আপনাদের মতের ঐক্য কামনা করতে পারি।"

বিজয়েশ বল্‌লে, "নিশ্চয় পার, কিন্তু এতক্ষণ পর্য্যন্ত করোনি। প্রয়োজনটা আমরাই প্রথমে অনুভব করেছি; আর তার প্রমাণ স্বরূপ আমরাই প্রথমে তোমার কাছে এসেছি। সুতরাং—"

কথাটা বিজয়েশকে শেষ কর্‌তে না দিয়ে সুকুমার বল্‌লে, "সুতরাং first come, first have?"

সহাস্যমুখে বিজয়েশ বল্‌লে, "হ্যাঁ, first come, first have!"

"কিন্তু আমি যদি আপনাদের এ যুক্তি স্বীকার না করি তা হ'লে?"

একমুহূর্ত্ত স্তব্ধ হ'য়ে থেকে বিজয়েশ বল্‌লে, "তা হ'লেই ত বিপদ! তা হ'লে হয় ত' গভীর দুঃখের কারণ উপস্থিত হবে।"

"গভীর দুঃখের কারণ উপস্থিত হবে শুধু আপনাদের দিকেই? না, আমার দিকেও?"

"তার মানে?"

"তার মানে, যে-পথে আমি আপনাদের সম্পর্কে অগ্রসর হচ্ছি, সে পথে Road Closed-এর বেড়া পড়বে না ত'?"

যথাস্থানে আঘাত ক'রে সুকুমারকে একটু সন্ত্রস্ত করতে সমর্থ হয়েছে মনে ভেবে বিজয়েশ মনে মনে ঈষৎ উল্লসিত হ'ল। আর একটু চড়া মাত্রায় সুবিধাটা কাজে লাগাবার অভিপ্রায়ে মুখ গভীর ক'রে সে বল্‌লে, "একান্তই যদি বেড়া পড়ে, তা হ'লে সেজন্যে তোমাকেই দায়ী করব। সুতরাং আমাদের যদি পেতে চাও, তা হ'লে—"

এবারও বিজয়েশকে তার কথা শেষ করবার অবসর না দিয়ে সুকুমার বল্‌লে, "তা হ'লে আমাকে কি করতে হবে, তার পুনরুক্তির দরকার নেই বড়দা। দয়া ক'রে যদি ক্ষমা করেন, তা হ'লে একটু স্পষ্ট ক'রে একটা সত্যি কথা বলি।"

ঔৎসুক্যভরে বিজয়েশ বললে, "কি সত্যি কথা?"

"আপনাদের পাবার জন্যে আমি ঠিক ততটা ব্যস্ত নই, যতটা ব্যস্ত কমলাকে পাবার জন্যে। কমলা হচ্ছে আসল বস্তু, আর আপনারা হচ্ছেন আনুষঙ্গিক; ঠিক যেমন একটা বোঁটার মধ্যে ফুল হচ্ছে

আসল বস্তু, আর তার আশপাশের পাতা হচ্ছে আনুষঙ্গিক। সুতরাং এ কথার চূড়ান্ত মীমাংসার জন্যে কমলার সঙ্গে কথা হওয়া দরকার।"

সুকুমারের কথা শুনে বিজয়েশের মুখখানা কালো হ'য়ে উঠল। ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে সে বল্‌লে, "তা হ'লে কমলার সঙ্গেই কথা কোয়ো। আপাতত কাঁটা না ব'লে আমাদের যে পাতা বলেছ, সেজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ দিয়ে যাচ্ছি।"

সুকুমারও আসন ত্যাগ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠেছিল; মনে মনে বল্‌লে, নিতান্ত নিজের বাড়ি তাই পাতা বলেছি, অন্য জায়গা হ'লে কাঁটাই বলতাম। প্রকাশ্যে বললে, "ঠিক চারটের সময়ে কমলার সঙ্গে কথা কইতে যাব, আর সেই সময়ে চা খাব।"

"নিশ্চয় খাবে।" ব'লে বিজয়েশ নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল।

বেলা চারটার সময়ে কমলাদের গৃহে উপস্থিত হ'য়ে সুকুমার দেখলে বাহিরের বারান্দায় বিজয়েশ তার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে ব'সে আছে। সুকুমারকে দেখে বিজয়েশ বল্‌লে, যাও, ভেতরে যাও। কমলারা চায়ের আয়োজন ক'রে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। দেখলেই জল চড়িয়ে দেবে।"

সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি চা খাবেন না বড়দা ?"

বিজয়েশ বল্‌লে, "না, এখন আমি খাবনা। সাড়ে পাঁচটার সময়ে আমার বন্ধুকে চা খেতে বলেছি, তার সঙ্গে খাব।"

আর কোনো কথা না ব'লে সুকুমার ভিতরে প্রবেশ করলে, এবং আধঘণ্টাটাক পরে ফিরে এসে দেখ্‌লে, ঠিক একই স্থানে বিজয়েশ ব'সে আছে।

বিজয়েশ জিজ্ঞাসা করলে, "চা খেলে সুকুমার ?"

সহাস্যমুখে সুকুমার বল্‌লে, "খেলাম।"

"কমলার সঙ্গে কথা হ'ল ?"

"হল।"

"ফল কি হল জান্‌তে পারি কি ?"

হাসিমুখে সুকুমার বল্‌লে, "ফল যা হ'ল তা'তে উভয়পক্ষের প্রত্যেকের আট-আনা ক'রে হার, আর আট-আনা ক'রে জিত।"

"অর্থাৎ ?"

"অর্থাৎ, ইলেকশন্ ব্যাপারে আমি ব্যাকরণের নঞ্ অব্যয় হ'য়ে থাকব; অর্থাৎ, হরিনাথ বসুকেও ভোট দোবোনা, দেবেশ্বর সান্যালকেও দোবোনা।

একমুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বিজয়েশ বল্‌লে, "এ ব্যবস্থায় তোমার হয়ত' জাত যাবে, কিন্তু অপর পক্ষের পেট ভরবেনা।"

"তা যদি না ভরে তাহ'লে পেটের দোষও বলা যেতে পারে। অক্ষুধা যেমন পেটের একটা পীড়া, অতিক্ষুধাও তেমনি পেটের পীড়া।" ব'লে সুকুমার প্রস্থানোদ্যত হ'ল।

বিজয়েশ বললে, "এরই মধ্যে চললে কেন? একটু বোসোনা। একটু পরেই আমার বন্ধু সুরেশ রায় আসবে,—আলাপ ক'রে খুসি হবে।"

"একটু তাড়া আছে বড়দা। পাঁচটার সময়ে একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা ক'রে আবার ছটার সময়ে আর একটি ভদ্রলোককে দেখা দেবার জন্যে বাড়িতে আমাকে হাজির থাকতে হবে। চলি।" ব'লে সুকুমার তাড়াতাড়ি তার গাড়িতে গিয়ে বসল।

সন্ধ্যা সাতটার সময়ে কমলার ছোট ভাই অনিমেষ সুকুমারের কাছে এসে উপস্থিত হ'ল। ছটার সময়ে যে ভদ্রলোক সুকুমারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তখনো তার কাজ শেষ হয়নি।

অনিমেষকে দেখে সুকুমার বললে, "কি অনিমেষ? কি খবর?"

অনিমেষ বললে, "সেজদিদির একখানা চিঠি আছে।"

হাত বাড়িয়ে সুকুমার বললে, "কই, দাও।"

চিঠি নিয়ে প'ড়ে দেখে সুকুমার বললে, "আচ্ছা, আধঘণ্টাটাক পরে তোমাদের বাড়ি উপস্থিত হব। একটু অপেক্ষা ক'রে তুমি আমার সঙ্গেও যেতে পার।"

অনিমেষ বললে, "না, আমার সাইকেল আছে।"

"আচ্ছা, তা হ'লে এস।" ব'লে সুকুমার পূর্বোক্ত ভদ্রলোকের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হ'ল।

সাড়ে সাতটার সময়ে সুকুমার কমলাদের গৃহে উপস্থিত হ'ল। বিজয়েশ তার পড়বার ঘরে ব'সে কি একটা লিখছিল, সুকুমারকে দেখে বললে, "এস সুকুমার, এদিকে এস।"

ঘরে প্রবেশ ক'রে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে সুকুমার বললে, "আবার কি হুকুম বড়দা?"

মৃদু হেসে বিজয়েশ বললে, "মনে হচ্ছে এ পক্ষ আধপেটা থাকতে রাজি নয়, ষোলআনা উদর পূর্তিরই মতলব। আর-খানিকটা আগে এলে সুরেশ রায়ের সঙ্গে দেখা হ'ত। সুরেশও বলছিল, এস্-পার কি ওস্-পারই ভাল, মধ্যপথ ভাল নয়! মধ্যপথ অবলম্বন করলে অনেক সময়ে ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্টঃ হ'তে হয়।"

"সুরেশ রায়টি কে বড়দা?"

"সুরেশ রায় আমার বিশেষ বন্ধু, একজন আই-সি-এস, সম্প্রতি একমাসের ছুটি নিয়ে কলকাতায় রয়েছে।"

"বিবাহিত?"

"না, অবিবাহিত।"

"তবে এমন পাত্রের সঙ্গে কমলার বিয়ের প্রস্তাব করেন নি কেন?"

"প্রস্তাব করবার সুযোগ পাইনি সুকুমার।"

সকৌতূহলে সুকুমার জিজ্ঞাসা করল, "কেন বলুন ত!"

"কারণ, আমাদের পক্ষথেকে প্রস্তাব করবার আগেই সুরেশ নিজেই প্রস্তাব করেছিল।"

"তারপর?"

"তারপর আর কি! তিন বৎসর সুরেশের আর্জি শূন্যে ঝুলে রইল। তারপর হঠাৎ একদিন সুকুমার রায়ের আবির্ভাব, তার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী কমলা কর্তৃক সুরেশ রায়ের নাম খারিজ, আর সুকুমার রায়ের নাম দাখিল।"

বিস্মিতকণ্ঠে সুকুমার বললে, "কেন?"

কেন, সে কথা শ্রীমতী কমলাই বলতে পারেন।"

ক্ষণকাল মনে মনে কি চিন্তা করে সুকুমার বল্‌লে, "আচ্ছা বড়দা, আমি যদি আমার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার ক'রে নিয়ে আবার ওস্-পারে গিয়ে হরিনাথ বসুকে সাহায্য করতে উদ্যত হই, তা হ'লে কি এস্-পার আবার সুরেশ রায়ের নাম দাখিল করতে পারেনা?"

বিজয়েশ বল্‌লে, "এ কথাও শ্রীমতী কমলাই বলতে পারেন।"

তারপর একমুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বললে, "তবে আমিও একথা নিশ্চয় বল্‌তে পারি যে, কমলা যদি একবার শুধু ইঙ্গিত মাত্র করে তা হ'লে সুরেশ রায় এস্-পারের ঘাটে তার নৌকো ভেড়াতে এক মিনিটও বিলম্ব করবেনা।"

সুকুমার বল্‌লে, "আমি আজ কমলাকে সে ইঙ্গিত করবার জন্যে অনুরোধ করব।"

ঠিক এই সময়ে অন্দরের দিকে যাবার একটা দরজার পর্দা নড়ে উঠল, এবং সেটা এক পাশে সরে গেলে দেখা গেল শ্রীমতী কমলার কমনীয় মূর্তি।

বিজয়েশ বল্‌লে, "আয় কমলা, আয়।" তারপর চেয়ার ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "তোরা দুজনে এই ঘরে ব'সেই না-হয় কথাবার্তা ক'—আমি একটু গেটের কাছে গিয়ে টহল মারি।"

সুকুমার বল্‌লে, "আপনিও বসুন না বড়দা, কোনো অসুবিধে হবে না তাতে।"

বিজয়েশ বল্‌লে, "ক্ষেপেছ ভাই, তুমি! আসল বস্তু ফুল যখন হাজির, তখন পাতা-বেচারার ঝ'রে পড়াই উচিত।"

বিজয়েশের মন্তব্য শুনে কমলার মুখ টক্‌টকে হ'য়ে উঠল; আর, সুকুমার হো হো ক'রে হেসে উঠে বল্‌লে, "কথাটা বড়দা এখনও ভুলতে পারেন নি দেখছি!"

"এমন চমৎকার একটি উপমার কথা, সে কি সহজে ভোলা যায়?" ব'লে বিজয়েশ ঘর থেকে বারান্দায় নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল।

সুকুমারের নিকটে একটা চেয়ার অধিকার ক'রে ব'সে কমলা বল্‌লে, "সুরেশ রায়ের কথা তোমাকে কে বল্‌লে?"

স্মিতমুখে সুকুমার বল্‌লে, "কে বল্‌লে, সেটা অবান্তর প্রশ্ন; কিন্তু সুরেশ রায়ের সত্তা তুমি কি অস্বীকার করতে পার কমলা?"

চক্ষু ঈষৎ কুঞ্চিত ক'রে কমলা বললে, "সর্বনাশ! সুরেশ রায়ের সত্তা কখনো অস্বীকার করতে ...র! তোমার সত্তা বরং অস্বীকার করতে পারি, তবু সুরেশ রায়ের পারিনে। সুরেশ রায়কে কি ...ত করবার জন্যে আমাকে অনুরোধ করবে বলছিলে, কর না?"

স্মিমুতখে সুকুমার বললে, "লুকিয়ে লুকিয়ে সব কথা শোনা হয়েছে দেখছি!"

কমলা বললে, "তা হয়েছে। কি অনুরোধ করবে বলছিলে?"

সুকুমার বললে, "তুমি হয়ত রাগ করছ কমলা, কিন্তু সুরেশ রায়কে না মঞ্জুর ক'রে আমাকে ...ুর করায় তোমার কত বড় অপরাধ হয়েছে তা জান?"

"কত বড় অপরাধ হয়েছে?"

"কাঞ্চন ফেলে কাঁচকে আঁচলে বাঁধার অপরাধ। আমি হচ্ছি অতি সামান্য একজন নিরীহ এঞ্জিনীয়ার, ...র সুরেশ রায় একজন দুর্দান্ত আই—সি—এস্! কল-কারখানায় আমরা মজুর মিস্ত্রী খাটাই, আর ...রেশ রায়রা সময়ে-সময়ে আমাদের জেল খাটায়।"

সুকুমারের কথা শুনে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠে কমলা বললে, "তোমার ওপর সুরেশ রায়ের ...য় রকম রাগ, বাগে পেলে তোমাকে জেল না খাটিয়ে ছাড়বে না।"

কপট দুশ্চিন্তার উদ্বেগমিশ্রিত কণ্ঠে সুকুমার বল্‌লে, "তা হ'লেই দেখ, তুমি যদি সুরেশ-জায়া হও ...া হ'লে বাগে পেলেও তোমার সুপারিশে সুরেশ রায় আমাকে রেহাই দিতেও পারে!"

সুকুমারের প্রতি একবার চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে কমলা বল্‌লে, "তেমন রেহাই পাওয়ার চেয়ে তোমার ...জল হওয়ার দুঃখ আমাকে অনেক বেশি সুখী করবে।"

কমলার কথা শুনে সুকুমারের দুই চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল! সাগ্রহকণ্ঠে সে বল্‌লে, "সত্যি ...লছ কমলা? এ কথা সত্যি বলছ তুমি?"

প্রণয়বিগলিত মৃদুকণ্ঠে কমলা বললে, "হ্যাঁ, সত্যি বলছি।"

উৎসাহপ্রদীপ্ত স্বরে সুকুমার বল্‌লে, "তা হ'লে, আর তোমাকে অদেয় কিছুই রইল না আমার। কি চাই তোমার বল?"

বিস্মিতকণ্ঠে কমলা বল্‌লে, "কিছুই অদেয় রইলনা?"

"না, কিছুই রইলনা।"

একমুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা ক'রে ঈষৎ ভীতিকুণ্ঠিত স্বরে কমলা বললে, "তা হ'লে আমার দ্বিতীয় চিঠিতে আমি যা চেয়েছি তাই আমাকে দাও।"

"দেবেশ্বর সান্যালকে ভোট দেবার প্রতিশ্রুতি?"

"হ্যাঁ।"

"দিলাম। কিন্তু এতে সুখী হবে ত' কমলা?"

"হব।"

"চারটের সময়ে যে লোকের আট আনা সত্তা অধিকার করেছ, আটটার সময়ে তার বাকী আট আনা অধিকার করার পর তার ওপর শ্রদ্ধা থাকবে ত' তোমার? এত সহজে আত্মসমর্পণকারী দুর্বল প্রতিপক্ষের ওপর ভক্তি থাকবে?"

এবার কিন্তু কমলা অত সহজে বলতে পারলে না, থাকবে; মনে যেন কেমন একটা খটকা বাধ্‌ল। একটু চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে, আচ্ছা, কেন তুমি এমন ক'রে আত্মসমর্পণ করলে?"

"তোমাকে পাবার জন্যে। না দিলে কি পাওয়া যায়?"

"পেয়েছিলে ত' আমাকে।"

"অনেক বাকি ছিল—এবার হয়ত' সব পাব।"

"তার মানে?"

"তার মানে, এখন যখন তোমার কাছে ষোল আনা আত্মসমর্পণ করছি, তখন তোমাকেও হয়ত' ষোল আনা পেতে পারি।"

"তার মানে, আমিও তোমার মতের কাছে ষোল আনা আত্মসমর্পণ করতে পারি, সেই কথা বলতে চাও না-কি তুমি?"

একমুহূর্ত চিন্তা ক'রে সুকুমার বললে, "যদি আত্মসমর্পণ কর ত' বিস্মিত হব না।"

সুকুমারের উত্তর শুনে সহসা কমলার মেজাজ বিগড়ে উঠল। ক্ষণকাল নির্বাক থেকে ঈষৎ কঠোর স্বরে সে বল্‌লে, "দেখ, কিছু মনে কোরোনা, কিন্তু এতটা প্রত্যাশা তোমার উচিত হয় না। তুমি হয়ত, জান না, আমি একজন অতি উগ্র আর গোঁড়া প্রকৃতির কমিউনিস্ট।"

সহজ সুরে সুকুমার বল্‌লে, "জানি। আর, জানি ব'লেই তোমার প্রতি এত মোহ আমার। কিছু মনে কোরোনা কমলা, তোমার যেমন সুরেশ রায় আছে, আমারও তেমনি বিনতা, মাধুরী, নলিনী আছে;—কিন্তু কেউ তাদের তোমার মতো কমিউনিস্ট্‌ নয়।"

এ কথার উত্তরে কমলা কিছু বললে না। ক্ষণকাল উভয়ে নির্বাক হ'য়ে ব'সে রইল। মৌন ভঙ্গ করলে কমলা; বল্‌লে, "তুমি যে দেবেশ্বর সান্যালকে ভোট দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছ, সে কথা বড়দাকে বল্‌তে পারি?"

সুকুমার বল্‌লে, "নিশ্চয় পার। শুধু বড়দাকে কেন, যে-কোনো লোককে ইচ্ছে বলতে পার। বড়দাকে ত' আমি নিজেই ব'লে যাব; বাড়ি গিয়েও সকলকে বল্‌ব।"

ঔৎসুক্য সহকারে কমলা বল্‌লে, "সকলকে বলবে? বলতে মনে কুণ্ঠা হবেনা?"

সহজ সুরে সুকুমার বললে, "তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, সে কথা ব'লতে কুণ্ঠা কেন হবে। আত্মসমর্পণ করা ত' আমাদের গুরু-নির্দিষ্ট প্রণালী। ভুলে গেছ কমলা, এক সময়ে মহাত্মা গান্ধী সমস্ত হিন্দু-সম্প্রদায়ের ভাগ্য জিন্না সাহেবের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। জিন্না সাহেব কিন্তু সে দায়িত্ব নিতে সাহস করেন নি—পেছিয়ে গেছলেন।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্বকুমার বল্‌লে, "আর দেরি করব না, চল্‌লাম। আবার, বাড়ি গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানা-পত্র নিয়ে তোমাদের বাড়ি আস্‌তে হবে।"

বিস্মিত হ'য়ে কমলা ব'ল্‌লে, "কেন?"

স্বকুমার বল্‌লে, "ইলেকশন পর্যন্ত বাড়িতে থাকবনা স্থির করেছি। একটা বাসা, কিম্বা কোনো হোটেলে ঘর খুঁজে নিতে হবে। কিন্তু যে কয়েক দিন তার ব্যবস্থা না করতে পারি, তোমাদের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নেই।"

"কেন, বাড়িতে থাকবেনা কেন?"

একমুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা ক'রে স্বকুমার বল্‌লে, "সেটা উচিত হবেনা কমলা। আমাদের বাড়ির যা মন্ত্র, যা আমাদের বাড়ির প্রাণধারা, ষোল আনা তার বৈরী হ'য়ে সেই বাড়িতে বাস ক'রে অপর সকলকে বিব্রত ক'রে রাখা সত্যিই আমার পক্ষে অবিবেচনার কাজ হবে। তোমরা যেমন গোঁড়া কমিউনিস্ট, আমাদের বাড়িও তেম্‌নি নিষ্ঠাবান কংগ্রেসধর্ম্মী; আমার ছোট ভাইরা আমাকে গুরুর মত মান্য করে; কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান ক'রেও আমি যদি তাদের মধ্যেই বাস করতে থাকি, তা হ'লে তারা, এই অত্যন্ত কর্ম্মতৎপরতার সময়ে, কাজ করবার জুত পাবেনা। হয়ত তারা মনে করবে, সমস্ত আবহাওয়াটা বিষাক্ত ক'রে দিয়ে আমি তাদের ক্রিয়াশীলতার হানি করেছি।"

বিস্মিত-বিরক্ত কণ্ঠে কমলা বল্‌লে, "বিষাক্ত ক'রে দিয়ে!"

"তারা হয়ত' তাদের মনের মধ্যে সেই রকম মনে করবে। আমার মনের ওপর যতটা পরিবর্তন তুমি দাবি করতে পার, তাদের মনের ওপর নিশ্চয়ই ততটা পারনা।"

"আমাদের বাড়ি তুমি বাস করতে এলে আমি কিন্তু ভারি লজ্জা পাব।"

"তুমি লজ্জা পাবে, কিন্তু আমি পাব আশ্রয়। লজ্জা না পাওয়ার চেয়ে আশ্রয় পাওয়া অনেক প্রয়োজনীয় ব্যাপার।"

"কিন্তু তুমি কি এ ছাড়া আর অন্য কোনো রকম ব্যবস্থা করতে পার না?"

কমলার কথা শুনে স্বকুমার হেসে ফেল্‌লে; বললে, "গোঁড়া কমিউনিষ্ট হ'য়ে তোমার মনে এত কিন্তু কেন কমলা? এত অবলীলাক্রমে একজন কংগ্রেসপন্থীর মন অধিকার ক'রে দু-চার দিনের জন্যে তার দেহ অধিকারে রাখতে যদি ভয় পাও, তা হ'লে তোমার গোঁড়ামীতে আমি সন্দেহ করব।" ব'লে সে ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে গেল।

বিজয়েশ তখনো গেটের কাছে টহল মারছিল। তার কাছে উপস্থিত হ'য়ে স্বকুমার বল্‌লে, "লাল ঝণ্ডেকী জয়! দেবেশ্বর সান্যালকে ভোট দিতে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি বড়দা।"

উৎফুল্ল স্বরে বিজয়েশ বল্‌লে, "Good! I congratulate you, Lucky Dog! এখন আর তোমাকে বলতে আপত্তি নেই, স্বরেশ রায় তোমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু সে ভয় আর রইল না তোমার।"

হাসিমুখে সুকুমার বললে, "না, আর রইলনা। এখন আমি বাড়ি চল্লাম বড়দা—খাওয়া দাওয়া সেরে কিছুক্ষণ পরে জিনিষপত্র নিয়ে আসছি, বাইরের কোনো ঘরের এক কোণে আমার জন্তে একটু জায়গা ক'রে রাখবেন।"

কমলারই মতো বিস্মিত গভীর কণ্ঠে বিজয়েশ বললে, "কেন?"

"দু-চার দিন আপনাদের বাড়িতে বাস করব।"

"কারণ?"

কমলাকে সুকুমার যে কারণ এবং যুক্তি দেখিয়েছিল, বিজয়েশকেও তাই দেখালে।

সমস্ত শুনে গম্ভীর মুখে বিজয়েশ বললে, "তুমি কিন্তু রাগ করছ সুকুমার!

সহাস্যমুখে সুকুমার বললে, "প্রথমত, রাগ করছিনে। আর দ্বিতীয়ত, যদিই বা একটু করে থাকি তাতে আপনার রাগ করা উচিত নয়। মনটা শুধু আপনাদের পছন্দ মতো ছাঁটাই করে নিলেই হবে না, আবার প্রসন্ন হ'য়ে হাসিমুখে সে কার্য করতে হবে, এতটা প্রত্যাশা করা আমার প্রতি অবিচার হবে বড়দা।"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বিজয়েশ বললে, "তা হ'লে তুমি পরিহাস করছ!"

"ঘণ্টাখানেক পরে বুঝতে পারবেন, পরিহাসও করছিনে।" ব'লে সুকুমার প্রস্থান করলে।

পরিহাস সুকুমার করছিল না, রাগও হয় ত বা করছিল না; কিন্তু তাই ব'লে যে সত্যসত্যই সে জিনিসপত্র নিয়ে তাদের বাড়িতে বাস করতে আসবে, এ কথাও বিজয়েশ কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। কিন্তু রাত্রি সাড়ে নয়টার সময়ে বিছানাপত্র সহ সুকুমারের গাড়ি যখন গেটের সম্মুখে এসে দাঁড়াল, তখনই যথার্থ ভাবে বিজয়েশের মনে বিস্ময় দেখা দিলে। কিন্তু বিস্ময় যত বেশি পরিমাণেই দেখা দিক না কেন, অপ্রত্যাশিত আতিথ্যের জন্য তখন আর ব্যস্ত না হ'য়ে উপায় ছিলনা।

একে একে সকলেই এসে জুটতে লাগল। কেউ করলে আনন্দ প্রকাশ, কেউ করলে পরিহাস, কেউ বা শুধু হর্ষবিস্ময়োৎফুল্ল মুখের নির্বাক হাস্যের দ্বারা সম্মানার্হ অতিথির অভ্যর্থনা করলে। একমাত্র যে-ব্যক্তি না এসে সকলের অলক্ষিতে শয্যাগ্রহণ করলে, এবং সমস্ত গৃহ সুষুপ্ত হ'য়ে যাবারও বহুক্ষণ পর পর্যন্ত বিনিদ্র হ'য়ে কাটালে, সে কমলা।

বিজয়েশের পড়বার ঘরের পাশের কক্ষের এক কোণে একটা ক্ষুদ্র পালঙ্ক ছিল। চতুর্দিক দেখে শুনে তারই উপর সুকুমার তার আস্তানা গাড়বার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে। গৃহনিবাসী এবং গৃহনিবাসিনীদের পক্ষ থেকে এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুতীব্র প্রতিবাদ উত্থিত হ'ল। বিজয়েশের স্ত্রী উর্মিলা তার দ্বিতলের দক্ষিণামুখ শয়নকক্ষ সুকুমারের ব্যবহারে অর্পিত করবার জন্তে পুনঃপুনঃ অনুরোধ জানালে। অনিমেষ তার ত্রিতলের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ সুকুমারকে ছেড়ে দেবার জন্তে আগ্রহ প্রকাশ করলে, আরও অনেকের দিক থেকে অনেক প্রকার প্রস্তাব-প্রসঙ্গ উপস্থিত হ'ল, সুকুমার কিন্তু সকলের অনুরোধ কাটিয়ে নিজের ব্যবস্থাই কায়েম করলে।

পরদিন সকাল সাতটার সময়ে চা-পান ক'রে সুকুমার তার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। চা-পানের সময়ে গৃহের অনেকেই উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে দেখা যায় নি কমলাকে।

অফিসের পর সিনেমা দেখে হোটেলে ডিনার খেয়ে সুকুমার যখন কমলাদের গৃহে উপস্থিত হ'ল তখন রাত্রি দশটা। বিজয়েশ তার পড়বার ঘরে ব'সে লেখাপড়ায় রত ছিল, সুকুমারকে দেখে বল্লে, "সকালে খেতে এলে না সুকুমার?"

সুকুমার বললে, "অফিসে খেয়েছিলাম বড়দা।"

"চা-খেতে বিকেলে এলে না কেন?"

"চা-ও অফিসে খেয়েছিলাম।"

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বিজয়েশ বল্লে, "চল, এবার খেতে যাওয়া যাক্। অনেক রাত্রি হয়েছে, আর দেরি ক'রে কাজ নেই।"

বিস্মিতকণ্ঠে সুকুমার বল্লে, "আপনি এখনো খান নি না-কি!"

"তোমাকে ফেলে রেঁখে খেতে পারি কখনো?"

"কি সর্বনাশ! আমি যে খেয়ে এসেছি বড়দা।"

অবাক হ'য়ে সুকুমারের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বিজয়েশ বল্লে, "খেয়ে এসেছ! কেন, আমাদের বাড়ি খাবেনা না-কি তুমি?"

ব্যগ্রকণ্ঠে সুকুমার বললে, "সে কি কথা বলছেন! আজ সকালেও ত' আপনাদের বাড়ি চা খেয়েছি।"

"আচ্ছা, তা হ'লে শুয়ে পড়, আমি একাই খেতে চলি।" ব'লে বিজয়েশ অন্দরের দিকে অগ্রসর হ'ল।

পরদিন অতি প্রত্যূষে চা খাবার পূর্বেই সুকুমার প্রস্থান করলে। যাবার আগে একটা শ্লিপ লিখে একজন চাকরের হাতে দিয়ে গেল:—অনিমেষ, বউদিদিকে জানিয়ো আজও আমি রাত্রে খেয়ে ফিরব।

সেদিন কমলা এবং সুকুমারের পরস্পরের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ হ'লনা; পরদিনও না।

পঞ্চম দিনের প্রত্যূষেও সুকুমার সকলের অগোচরে স'রে পড়বার মতলবে ছিল, কিন্তু হঠাৎ কমলা এসে উপস্থিত হ'ল।

কমলাকে দেখে সুকুমারের মুখে হাসি দেখা দিলে; বললে, "কি কমলা? খবর কি?"

একটা চেয়ারে উপবেশন ক'রে কমলা বল্লে, "খবর ভাল।"

"এত সকালে উঠে আমার ঘরে এসেছ, লোকে দেখলে বলবে কি? পালাও শীগ্‌গির।"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে কমলা বল্লে, "তিন দিন খেলে কোথায়? বাড়িতে?"

"সর্বনাশ! বাড়ি থেকে যে বেচারা নির্বাসিত হ'য়ে আছে, বাড়িতে সে খাবে কোন্ মুখে?"

"তবে কোথায় খেলে?"

"কেন, কলকাতায় খাওয়ার জায়গার অভাব আছে কিছু?"

"স্নান করলে কোথায়?"

"কেন, অফিসে। অফিসে আমার নিজস্ব বাথরুম আছে।"

"রাত কাটাবার একটু জায়গা হয় না অফিসে? কোনোরকম ক'রে, কষ্টেস্বষ্টে?"

কি ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হ'য়ে সুকুমার বললে, "অফিসে কি ক'রে রাত কাটাবার জায়গা হবে?" তারপর হঠাৎ সচেতন হ'য়ে উঠে উল্লসিত মুখে বললে, হয়, হয়! নিশ্চয় হয়, চমৎকার হয়! আমার খাস কামরায় একটা সিঙ্গল-বেড্ খাট পেতে নিলে রাত কাটাবার আর কোনো অসুবিধেই থাকে না। Thank you কমলা! ভারি খেয়াল করিয়ে দিয়েছ তুমি! আজই ম্যানেজারকে জানিয়ে একটা খাট কিনে পাতিয়ে নোবো। অফিসে ব্যবস্থা হ'য়ে গেলে, ন-মাসই বা কি আর ছ-মাসই বা কি, বাড়ি ছেড়ে থাকার কোনো অসুবিধেই আর থাকবে না।

মুখ টিপে অল্প একটু হেসে কমলা বললে, "ন মাসের কথা আপাতত না-হয় ছেড়েই দিই—ছ মাস যদি অফিসে থাক, তাহ'লে চৌঠা বৈশাখ বরযাত্র কি অফিস থেকেই আসবে? আর, ফুলশয্যে অফিস ঘরেই হবে?"

কমলার কথা শুনে সুকুমারের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হ'য়ে উঠল। "ওহো—হো—হো—হো; তাও ত' বটে! তবে, অবশ্য, শেষপর্যন্ত তার জন্যে কিছু আটকাতো না। যেখানেই থাকিনা কেন, চৌঠা বৈশাখের আগে বউদিদি টিকি ধ'রে বাড়ি নিয়ে যাবেনই। অফিসে রাত কাটাবার ব্যবস্থা আজই কিন্তু ঠিক ক'রে ফেলব। যে-কটা দিন গৃহহীন হ'য়ে থাকতে হয়, অফিসেই না-হয় থাকা যাবে। আচ্ছা, চলি এবার।"

"চা খাবেনা?"

"সন্ধ্যাবেলা বিছানাপত্র নিতে এসে খাব। সে সময়ে চায়ের টেবিলে তুমি উপস্থিত থেকো কমলা।"

কমলা বললে, "উপস্থিত থাকব কি-না বলতে পারিনে, তবে তোমার চা খাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চয় করব।"

"আচ্ছা, চলি তা হ'লে।"

"এস।"

কিছুদিনের জন্য সুকুমারের অফিসে বাস করার প্রস্তাবে সম্মত হ'তে ম্যানেজারের একমুহূর্ত বিলম্ব হ'ল না। মুখে বললে, "তাতে যদি কোনো দিক দিয়ে তোমার সুবিধে হয়, আমি খুসিই হব সুকুমার। "মনে মনে বললে, "যদি অফিসের তাতে কিছু সুবিধে হয়, তা হলে আরও খুসি হব।"

সন্ধ্যা ছ'টার সময়ে সুকুমার কথা মতো কমলাদের গৃহে উপস্থিত হ'ল।

বিজয়েশ বাইরে বারান্দায় ব'সে ছিল; সুকুমারকে দেখে বললে, "এস সুকুমার, বস। তোমার জন্তে একটা বিচিত্র খবর আছে।"

সকৌতূহলে সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, "কি খবর বড়দা?"

ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে বিজয়েশ বললে, "কমলা বাড়ি ছেড়ে চ'লে গেছে।"

গভীর বিস্ময়ের উৎকণ্ঠিত স্বরে সুকুমার বললে, "বাড়ি ছেড়ে চ'লে গেছে? কোথায় গেছে সে?"

"তোমাদের বাড়ি।"

"আমাদের বাড়ি? ঠিক জানেন ত', আমাদের বাড়ি?"

"হ্যাঁ গো, হ্যাঁ! অনিমেষ তাকে পৌঁছে দিয়ে এসেছে।"

সুকুমারের দুই চক্ষু উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল।

বিজয়েশ বললে, "একটু অন্যায় রকম জেদ ক'রে গেছে, সেইটেই আমাকে দুঃখ দিয়েছে বেশী। অন্ততঃ তোমার আসা পর্যন্ত তার অপেক্ষা করা উচিত ছিল।"

সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, "কিছু লিখে রেখে গেছে আমার জন্তে?"

"একটি লাইনও না।"

"কিছু ব'লে গেছে আমাকে বলতে?"

"এক বর্ণও নয়। শুধু ব'লে গেছে, তোমাকে যেন ভাল ক'রে চা খাওয়ানো হয়।"

স্মিতমুখে সুকুমার মনে মনে বললে, "এই হচ্ছ তুমি কমলা! এই হচ্ছে তোমার অদ্ভুত প্রকৃতি! আর, হে আমার কমিউনিস্ট্ প্রিয়া, এই জন্তেই তোমার ওপর এত আমার মোহ!" তারপর অনুচ্চকণ্ঠে কতকটা স্বগত উক্তির মতো বলতে লাগ্ল, "এম্‌নি-একটা কিছু হবে, তা আমি জানতাম; কিন্তু এত শীঘ্র হবে, তা অবশ্য ভাবিনি।"

কথাটা বিজয়েশের কানে গেল;—মৃদুস্বরে সে বল্‌লে, "তোমার জয় হয়েছে সুকুমার—লাল পতাকার আজ পরাজয়!"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে তেমনি অনুচ্চকণ্ঠে সুকুমার বললে, "দুর্গতির বুকের রক্তে যে পতাকা লাল, সে লাল পতাকার পরাজয় নেই।"

১৯৪২...অগাষ্ট...আসাম...

লক্ষ্মীরাম হাজারিকা পুলিশের গুলিতে শয্যাশায়ী...

ধীরে ধীরে তাঁর চোখ শেষবারের মত বন্ধ হয়ে আসছে।

একজন আত্মীয় জিজ্ঞাসা করলো, বলুন, আপনার শেষ কি ইচ্ছা?

লক্ষ্মীরাম পকেট থেকে কোন রকমে ছ'টা পয়সা বার করে দিয়ে বল্লেন, দেশের কাজে দিও

তারপর ঘুমিয়ে পড়লেন।

আত্মরক্ষা

'সম্বুদ্ধ'

মশারা মরিয়া যাইতেছে।

শুনিয়া নগরীর লোক আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। একই রাজ্যের সকলে অধিবাসী, মানুষ গরু মাছি মশা সকলেই রাজার প্রজা। ইহাদের যে-কেহ মরিলেই রাজ্যের প্রজাহানি। কাহার কোন্ পাপে এই অভিশাপ নগরীর উপর আসিয়া পড়িল?

রাজা কহিলেন, মন্ত্রী!

মন্ত্রী কহিলেন, নগরপাল!

নগরপাল কহিলেন, সংবাদ সত্য, মহারাজ। মশারা দলে দলে আত্মহত্যা করিতেছে।

আত্মহত্যা! নগরীর লোক আবার আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। জীবন ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু স্বেচ্ছায় মৃত্যু-বরণ কেহ সহজে করে না। রাজ্যের প্রজা দলে দলে আত্মহত্যা করিতেছে, ইহা রাজ্যের পক্ষে কলঙ্কের কথা।

রাজা কহিলেন, কারণ?

নগরপাল কহিলেন, কারণ জানিতে পারি নাই, মহারাজ।

মন্ত্রী কহিলেন, চেষ্টা করিয়াছ?

নগরপাল কহিলেন, নানাবিধ চেষ্টা করিয়াছি। রহস্য কেহই প্রকাশ করিতে চাহে না।

রাজা কহিলেন, কারণ প্রকাশ করিবে না, আত্মহত্যা করিতে থাকিবে, খেলা পাইয়াছে? রাজ্যের সুনাম লইয়া ইয়ারকি?

নগরপাল সভায় নীরব হইয়া রহিলেন।

রাজা কহিলেন, ডাক তাহাদের।

অচিরাৎ মশককুলপতি রাজার সম্মুখে আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা কহিলেন, মশকেশ্বর!

মশকেশ্বর কহিলেন, আদেশ করুন মহারাজ!

রাজা কহিলেন, এ কি শুনিতেছি? রাজ্যের মশারা দলে দলে আত্মহত্যা করিতেছে; অথচ কোন্ দুঃখে, তাহা প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হয় নাই, নগরপাল স্বয়ং চেষ্টা করিয়াও কারণ জানিতে পারেন নাই—একথা সত্য?

মশকেশ্বর বিনম্র বচনে কহিলেন, সত্য, মহারাজ।

রাজা কহিলেন, কেন তোমরা কারণ প্রকাশ কর নাই?

—নগরপাল নগরীর শুভাশুভ সমস্ত ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক, নগরীতে অন্যায় কিছু কোথাও ঘটিলে সে দায়িত্ব স্বভাবতই তাঁহার উপরে পড়ে। দিবসে বিশ্রাম ও নিশীথে নিদ্রাবিরহিত হইয়া তিনি নগরীর মঙ্গলাচরণ করেন; তাঁহার কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করা প্রত্যেক প্রজার কর্ত্তব্য। কেন তোমরা সে কর্ত্তব্য পালন কর নাই? তোমাদের জীবনে বিতৃষ্ণার কি কারণ, তাহা ব্যক্ত করিয়া কেন সে কারণ দূর করিতে তাঁহাকে উৎসাহিত কর নাই?

মশকেশ্বর কহিলেন, অপরাধ লইবেন না মহারাজ, নগরপালের প্রতি আমরা বৈরভাব পোষণ করি না। তাঁহাকে বলিয়া প্রতিকার হইবে না, জানিয়াই তাঁহাকে বলি নাই। বলিয়াছি, যদি বলিতে হয়, স্বয়ং মহারাজের নিকটেই বলিব।

রাজা কহিলেন, ভাল, আমিই প্রশ্ন করিতেছি। উত্তর দাও। রাজ্যের প্রতি, রাজার শাসন-ব্যবস্থার প্রতি, কিসে তোমাদের এখন অনাস্থা জন্মিল যে এই রাজ্যে কুশলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে এমন ভরসা আর তোমরা পাইতেছনা, আত্মহত্যা করিয়া ইহার প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছ?

মশকেশ্বর সসম্ভ্রমে কহিলেন, এমন কথা বলিবেন না মহারাজ, কানে শুনিলেও আমাদের পাপ হয়। রাজার প্রতি, রাজ্যের প্রতি, আমাদের অচলা ভক্তি আছে।

রাজা কহিলেন, তবে?

মশকেশ্বর কহিলেন, তথাপি জীবনে সুখ পাইতেছি না।

সভাকবি কহিলেন, রাজ্যের মশকীরা কি সকলেই কলহপ্রিয়া?

মশকেশ্বর কহিলেন, কবিবর, ইহা আমাদের পরম দুঃখের কাহিনী, ইহা লইয়া রহস্য করিবেন না।

রাজা কহিলেন, কিসের দুঃখ তোমাদের, তাহাই বল। আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম, সে দুঃখ নিরাকরণের জন্য আমার সমস্ত শক্তি আমি প্রয়োগ করিব। আমার আশা আছে, রাজ্যের প্রজাবৃন্দও সে চেষ্টায় আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।

সভাস্থ জনগণ একবাক্যে কহিল, অবশ্য।

রাজা কহিলেন, শোন মশকেশ্বর। তোমরা আমার প্রজা, আমার রাজ্যের অগণিত অধিবাসীর তোমরাও একটি অংশ। রাজ্যের কোন প্রজা কোনরূপে কষ্ট না পায়। তাহার ব্যবস্থা করিতে আমি সততই উদ্‌গ্রীব আছি তোমরা জান। তোমরা গগনবিহারী মশক, জলে বা স্থলে নামিয়া আহারান্বেষণ করা তোমাদের পক্ষে সহজ নহে জানিয়াই আমি বিধান করিয়া দিয়াছি, রাজ্যের মনুষ্যাদি সমস্ত জীবের দেহে বসিয়া তোমরা যথেচ্ছ রক্তপান করিতে পারিবে। আমি রাজা, আমাকেও স্বীয় আহার্য্য রন্ধনান্তে খাইতে হয়। তোমরা অন্যের সঞ্চিত রক্ত শুষিয়া লইতে পার; বিনাশ্রমে অপরের উপরে পুষ্ট হওয়ার এমন দুর্লভ সুযোগ আমার রাজ্যে আর কাহারও ভাগ্যে জুটে নাই। তথাপি তোমাদের মন প্রসন্ন নহে, ইহাতে আমি ক্ষুণ্ণ হইব না কেন বলিতে পার?

মশকেশ্বর অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিলেন, মহারাজ, এমন করিয়া বলিলে লজ্জা পাই। আপনার রাজ্যে রম শান্তিতে বাস করিতেছিলাম, আপনার শাসননীতির প্রশংসা আমরা সততই করিয়া থাকি। আমাদের হর্নিশ গুনগুন্ ধ্বনি, আপনার অবিরাম গুণকীর্ত্তন ব্যতীত আর কিছুই নহে।

তবু মহারাজ, আমাদের মনে গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে! কিন্তু বিশ্বাস করুন, সে গ্লানি আপনার া রাজ্যের কোন ত্রুটিসঞ্জাত নহে।

রাজা কহিলেন, তবে?

মশকেশ্বর কহিলেন, মহারাজ, আমরা প্রাচীন যুগের জীব। আধুনিক কলিযুগের কলকারখানা আমরা ভাল বুঝিতে পারি না। তবু অনুমানে এটুকু বুঝি, এই সর্ব্বনাশা যুগের প্রভাবে আমাদের প্রাচীনকালীয়দের মানমর্য্যাদা সমস্তই নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

সম্প্রতি একপ্রকার কলের মশা সৃষ্ট হইয়াছে। ইহারা বৃহদাকৃতি, কেহ দ্বিপক্ষ, কেহ চতুষ্পক্ষ। বিকট গর্জ্জনে গগন মুখরিত করিয়া ইহারা ব্যোমপথে গতায়াত করে। শুনিতে পাই, একবারে সহস্র যোজন অতিক্রম করিয়াও ক্লান্ত হয় না। আমাদের একটি ডিম্ব হইতে একটিমাত্র শাবক উৎপন্ন হয়, তাহার একটি দংশনে একটিমাত্র জীব একবার মাত্র উহু বলিয়া আর্ত্তনাদ করে। আর এই দানব-মশকেরা আকাশপথে উড়িতে উড়িতে অগণিত ডিম্ব প্রসব করিতে পারে; এক একটি ডিম্বের তেজে বহুসংখ্যক জীবজন্তু এককালীন মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

দেখিয়া শুনিয়া, মহারাজ, আমাদের মনে ধিক্কার আসিতেছে। এই কলের মশাকে দেখিয়া, আমরা কী নিদারুণ-রকম ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ, সে সম্বন্ধে ক্রমে সচেতন হইয়া উঠিতেছি। চেতনা হইতে অবমাননা-বোধ, অবমাননা হইতে আত্মবিলোপের প্রবৃত্তি। সেই ক্ষোভেই মশারা স্থির করিয়াছে এ প্রাণ আর রাখিব না। স্বীয় ক্ষুদ্রতার লজ্জায় প্রতিনিয়ত ম্রিয়মান হইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়, সেই জন্যেই তাহারা দলেদলে মৃত্যুবরণ করিতেছে। এই মৃত্যুতে লজ্জা নাই, ইহা বীরোচিত। জাপানদেশে এইরূপে মৃত্যুদ্বারা লজ্জাকে প্রতিহত করিবার প্রথা প্রচলিত আছে, তাহারা ইহাকে হারাকিরি বলে।

রাজা কহিলেন, বুঝিলাম। কিন্তু দানবী-মশা বিজাতীয় বস্তু। যন্ত্রমাত্র। তাহাকে দেখিয়া তোমরা নিজ জীবনে বীতশ্রদ্ধ হইবে, ইহার যৌক্তিকতা কোথায়? স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ। তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া তো আমি আত্মহত্যা করি না।

মশকেশ্বর কহিলেন, মহারাজ মহানুভব। আমরা ক্ষুদ্র প্রাণী। অমেরুদণ্ডী জীব, স্বভাবতই চিত্তবলের অধিকারী নহি।

রাজা কহিলেন, আমাদের রাজ্যের ইহাতে দুর্নামহানি ঘটিতেছে। তাহা মনে করিয়াও কি তোমরা বিরত হইতে পার না? আত্মহত্যা ভীরুত্বের পরিচায়ক। পরিবেশ যেখানে প্রতিকূল, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া বাঁচিয়া থাকাই তো বীরোচিত।

রাজবৈদ্য কহিলেন, মহারাজ, অনুমতি পাইলে কিঞ্চিৎ বক্তব্য নিবেদন করি।

রাজা কহিলেন, বলুন।

রাজবৈদ্য কহিলেন, মহারাজ বলিলেন, মশককুলের আত্মহত্যায় রাজ্যের সুনামহানি। আমি বলি কেবল সুনাম নহে, প্রজাসাধারণের স্বার্থহানিই ইহাতে হইতেছে। সেদিক হইতেও ইহাদিগকে নিবৃত্ত করা আশু প্রয়োজন।

রাজা কহিলেন, কিরূপে স্বার্থহানি বুঝাইয়া বলুন।

রাজবৈদ্য কহিলেন, প্রভু, জগৎ ও জাগতিক জীবন জলস্রোতের মত, অবিরাম বহিয়া চলে। প্রতি-মুহূর্ত্তে নদীর পুরাতন জলকণা সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইয়া যায়, উৎস হইতে আগত নবীন জলকণা তাহার স্থান অধিকার করে। এইরূপে জলকণার পরিবর্ত্তন হয় বলিয়াই নদীর জল সর্ব্বদা বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ থাকে, পঙ্কিল হইয়া উঠিতে পারে না।

জাতির জীবনও সেইরূপ। প্রতিমুহূর্ত্তে জরাজীর্ণ দুর্ব্বল প্রজা মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, নবজাত যৌবনদৃপ্ত প্রজা তাহার স্থানে আসিয়া দাঁড়াইতেছে—এই স্রোতপ্রবাহের জন্যই জাতির যৌবন ও স্বাস্থ্য অটুট থাকে। প্রজাপতি নবীন-জীবন সৃষ্টি করেন, মহাকাল জীর্ণদেহকে ধ্বংস করেন, উভয়ের মিলিত চেষ্টায় জীবনপ্রবাহ বহিয়া চলে। পার্থিব জগতে আমরা বৈদ্যজাতি মহাকালের অনুচর, জরাদি রোগ-নিচয় ও সর্প-ব্যাঘ্র-মশকাদি জীব আমাদের সহায়ক। মশারা আত্মহত্যা করিতেছে—রাজ্য যদি নির্মশক হয় তবে জরাদি রোগের ব্যাপ্তি সম্যক বাধাপ্রাপ্ত হইবে, অচিরাৎ জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ও পঙ্গু জনতার দ্বারা রাজ্যের জীবন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিবে। ইহাদের কর্ম্মের ফলে এই পরম অশুভ আমি আশঙ্কা করিতেছি।

সভামূর্খ একান্তে নীরবে বসিয়া শুনিতেছিল। কহিল, গোপন কথাটাও বলুন না, দেশে জ্বরজ্বারি না থাকিলে বৈদ্যকুল না খাইয়া মারা যায়, অতএব মশারা বাঁচিয়া থাকা প্রয়োজন।

রাজবৈদ্য রোষারুণ নেত্রে কহিলেন, বাচালতা করিও না। গুরুতর রাজকার্য্য, তুমি ইহার কি বোঝ?

মূর্খ কহিল, রাজকার্য্য বুঝি না বটে, নিজ কার্য্য কিছু কিছু বুঝি। টানাটানির সংসার, গৃহিণী সর্ব্বক্ষণ প্রসন্ন থাকেন না। যেদিন কলহ হয়, শয্যায় স্থান পাই না। বহু পরিমাণ বস্ত্রাবরণ ক্রয় করিব এমন অর্থ নাই, অগত্যা উন্মুক্তদেহে মৃত্তিকাশয়নে পড়িয়া থাকি আর মশার কামড় খাই। সম্প্রতি কয়েক-দিন যাবৎ মশারা দংশনে উদাসীন, একটু স্বস্তিতে কলহ করিতে ভরসা পাইতেছি, গৃহিণীও অগত্যা কিছুটা শান্ত থাকিতেছেন। মশা না থাকিলে আমরা দরিদ্ররা বাঁচিয়া যাই, এই তো দেখিতেছি। যাঁহাদের অজস্র মশারি কিনিবার সামর্থ্য আছে বা যাঁহাদের গৃহিণীরা কলহ করেন না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

মন্ত্রী কহিলেন, তুমি চুপ কর।

রাজা কহিলেন, মূর্খের কথা ছাড়িয়া দিন। মশককুলকে কিরূপে রক্ষা করা যায়, তাহাই সকলে চিন্তা করুন। মশকেশ্বর, তোমরা কি কিছুতেই এই আত্মঘাতী সংকল্প হইতে বিরত হইতে পার না?

মশকেশ্বর কহিলেন, তরুণ মশকেরা উত্তেজিত, নিবৃত্ত করার চেষ্টা এখনও নিষ্ফল। রাজ্যের উপর দিয়া প্রতিনিয়ত যন্ত্র-মশা উড়িয়া যাইতেছে, প্রতিনিয়ত ইহাদের বিক্ষোভ-বহ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িতেছে। যন্ত্রমশা ইহাদের দৃষ্টিপথে না পড়ে, এমন ব্যবস্থা করিতে পারেন?

মন্ত্রী কহিলেন অসম্ভব। যন্ত্র-মশা বিদেশীয়, মিত্ররাজ্যের সম্পত্তি। তাহাদের গতিপথ বন্ধ করিতে গেলে সন্ধির সর্ত্ত ভগ্ন হইবে, ফলে যুদ্ধের সম্ভাবনা।

মশকেশ্বর কহিলেন, তাহা হইলে মহারাজ, আমিও নিরুপায়। এ কালের তরুণ, ইহারা ক্ষেপিয়া উঠার যুক্তি যত সহজে বুঝে, নিবৃত্ত হইবার যুক্তি তত সহজে বুঝিবে না।

রাজা কহিলেন, তবে উপায়? রাজবৈদ্যের আশঙ্কা মিথ্যা নহে। আমাদের এই পতিত পাবনা নগরী জগতের পাপী-তাপী চিরকাল এখানে আসিবামাত্র জানিয়াছে, স্বর্গের পথ অর্দ্ধেক উত্তীর্ণ হইল। আজ যদি মশারা মরিয়া স্বর্গারোহণের পথ দুর্গম করিয়া দেয় তবে রাজ্যের প্রতিপত্তি নষ্ট হইবে, ইহার সার্থক পতিতপাবনা নাম উপহাসমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে। মশারা যদি যুক্তি না শুনে, বলপ্রকাশেও ইহাদের বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। আপনারা উপায় নির্দ্ধারণ করুন।

রাজজ্যোতিষী কহিলেন, মহারাজ, আমি একটি উপায়ের কথা বলিতে পারি।

রাজা কহিলেন, বলুন।

জ্যোতিষী কহিলেন, জনতার হ্রাস ও বৃদ্ধি, সমস্তই সংখ্যা ও রাশির হ্রাসবৃদ্ধির ফল। মশারা যাহারা মরিতে চাহে মরুক, তাহার অপেক্ষা অধিকসংখ্যক মশা যদি সঙ্গে সঙ্গে জন্মিতে থাকে, তবে দেশ নির্মশক হইবে না। মহারাজ সংখ্যাবৃদ্ধির ব্যবস্থা করুন।

রাজা কহিলেন, কেন, মশক তরুণ-তরুণীরা কি বিবাহ পরাঙ্মুখ হইয়াছে?

মশকেশ্বর কহিলেন, তবে নিবেদন করি মহারাজ। মশককুলে জন্ম সংখ্যার সত্যই হ্রাস হইয়াছে।

রাজা কহিলেন, হেতু?

মশকেশ্বর কহিলেন, হেতু, স্থানাভাব। নগরপাল নিয়তই নগরীতে নূতন নূতন প্রজাস্থাপন করিতেছেন, নূতন নূতন রঙ্গালয় ও ক্রীড়াভূমি নির্ম্মাণ করাইতেছেন। একদা নগরীতে বহুসংখ্যক প্রাচীন পুষ্করণী লক্ষিত হইত, নগরীর সর্ব্বত্র অগণিত পঙ্কপল্বল আকীর্ণ ছিল। সে সমস্তই ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইতেছে। মশা জন্মিবে কোথায়?

অকস্মাৎ রাজা মুখ তুলিয়া চাহিলেন, ভীষণ মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, নালা কাট।

ভয়ত্রস্ত জনতা বিহ্বলনেত্রে পরস্পরের দিকে তাকাইল। আতঙ্কের কুহেলিকা ভেদ করিয়া রাজ-বাক্যের প্রথমাংশ কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই—কাহার গলা কাটিবার আদেশ?

নগরপাল নিজেরও অজ্ঞাতসারে গলায় একবার হাত বুলাইলেন।

মহামন্ত্রী এক মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তারপর ক্ষীণস্বরে কহিলেন, মহারাজের বাণী শিরোধার্য্য, রাজাদেশ অবিলম্বে প্রতিপালিত হইবে। কিন্তু আমি বৃদ্ধ, ভাল শুনিতে পাই নাই। কাহার প্রতি এই নির্দ্দেশ?

রাজা মন্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, কহিলেন, কি নির্দ্দেশ?

মন্ত্রী কহিলেন, শিরশ্ছেদের?

রাজা কহিলেন, তুমি মূর্খ। গলা কাটিতে বলি নাই, নালা কাটিতে বলিয়াছি। আমার ঘোষণাবাক্য লিখিয়া লও।

রাজা উচ্চৈঃস্বরে আদেশ প্রচার করিলেন, মন্ত্রী সহর্ষ-কম্পিতহস্তে লিখিয়া লইলেন—

"নগরীর সর্ব্বত্র, রাজপথ ও বাসগৃহের সন্নিহিত স্থানে গভীর জলপ্রণালী খনিত হইবে। নগরপাল লক্ষ্য রাখিবেন যেন বর্ষার জলধারা এবং নগরীর প্রাত্যহিক অপরিচ্ছন্ন জলধারা এই সকল নালীতে আসিয়া সঞ্চিত হয়। যে ব্যক্তি কোনপ্রকারে এই নালীর জল নিষ্ক্রামণের ব্যবস্থা করিবে, বা ইহা মৃত্তিকাপূর্ণ করার চেষ্টা করিবে বা ঔষধাদি নিক্ষেপপূর্ব্বক নালীস্থ মশকডিম্ব ও মশকশাবক নষ্ট করার প্রয়াস পাইবে, তাহার শাস্তি মৃত্যু। প্রতিবৎসর শীতের প্রারম্ভে রাজকীয় ব্যয়ে এই সমস্ত নালী নূতন করিয়া খনন করা হইবে, যেন সংবৎসরের আবর্জ্জনা ইহার মধ্যে পচিয়া থাকিতে পারে এবং বর্ষার জলধারা পাইবামাত্র মশকডিম্বের স্ফুটনাগারে পরিণত করিতে পারে।

"নগরীর সর্ব্বত্র, মাঠে ও গৃহের প্রাঙ্গণে ক্ষুদ্র কর্চ্চুকার-বন সৃষ্টি করিতে হইবে, যেন তরুণ মশক ও মশকীরা অবাধে গৃহরচনা করিতে পারে। যাহার প্রাঙ্গণে যত কর্চ্চুকারবৃক্ষ, বুঝা যাইবে সে রাজ্যের ততই হিতৈষী প্রজা। প্রতি বৎসর, যাঁহার প্রাঙ্গণে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কর্চ্চুকারবন দেখা যাইবে, রাজা স্বয়ং তাঁহাকে সভার সমক্ষে পুরস্কারে ভূষিত করিবেন।

"রাজ্যের তন্তুবায়দিগের প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রচার করা যাইতেছে—তাহারা সমস্ত প্রকার বস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে পারিবে, কিন্তু মশকারির উপাদান নির্ম্মাণ করিলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইবে।"

ঘোষণা সমাপ্ত করিয়া রাজা রাজবৈদ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, কহিলেন, কি, হইল তো?

রাজবৈদ্য সানন্দে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, মহারাজের ব্যবস্থায় ত্রুটি আবিষ্কার করে কাহার সাধ্য। আর আমাদের ভাবনা নাই, এই যা ব্যবস্থা হইল, ইহাতে অদূরকালের মধ্যে নগরী কেবল জ্বর নহে, সান্নিপাতাদি রোগেরও লীলাস্থান বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে। মহারাজ আমার প্রণাম গ্রহণ করুন; আমাদের চিরখ্যাতা পাবনা নগরী চিরকালের মতই পতিতা হইয়া রহিল।

সাধু সাধু রবে সভাগৃহ মুখরিত হইল।

স্মৃতি-কথার জের

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

[গল্প-ভারতীর পরিবেশন-তালিকার মধ্যে একটা প্রধান বিষয় হলো, জীবনী-সাহিত্য। বাংলা-সাহিত্যের একটা মস্ত বড় গলদ্ হলো, প্রকৃত জীবনী-সাহিত্যের অভাব। যাঁরা মৃত, তাঁদের কথা বাদ দিয়েও, যাঁরা জীবিত, তাঁদের সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান একান্ত সীমাবদ্ধ, অনেকক্ষেত্রে ভ্রান্ত। শ্রীঅরবিন্দ জগতের চিন্তা-নায়কদের মধ্যে একজন প্রধান পুরুষ এবং তিনি জীবিত। অথচ তাঁর বিচিত্র জীবনের অধিকাংশ ঘটনাই আমাদের অজানা। যে-টুকু জানা যায়, তার মধ্যেও যদি ভ্রম-প্রমাদ থাকে, তাহলে সেটা একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলেই মনে হয়। সেইজন্যে শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে সুরেশবাবুর এই স্মৃতি-কথা প্রকাশ করতে আমার বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা দেয় এবং তারই ফলে এখানে তা প্রকাশিতও হলো। কোন দল বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ অবলম্বন করা, সম্পাদকের উদ্দেশ্য নয়। তবে এই ধরণের তর্ক-মূলক আলোচনায় যদি "দলীয় ভাব" এসে পড়ে, তার জন্যে দায়ী একমাত্র লেখকই। গল্প-ভারতীর দিক থেকে, সম্পাদক বিশ্বাস করেন, সাহিত্য-জগতে লেখনী-সংগ্রামের স্থান আছে এবং সম-সাময়িক সাহিত্যে এই ধরণের মসী-দ্বন্দ্ব, তবু খানিকটা সজীবতা আনে। সজীবতা মানেই সংগ্রাম…আর সংগ্রাম, তার রীতি-নীতি একটু আলাদা হবেই।

সম্পাদক]

বঙ্গাব্দের তের শ' বাহান্নর বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের "প্রবাসী"তে "অপ্রকাশিত ইতিহাসের একপৃষ্ঠা, স্মৃতিকথা" এই নাম দিয়ে আমার একটা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধের বৈশাখ সংখ্যার অংশপাঠ ক'রে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মজুমদার মহাশয় "অপ্রকাশিত ইতিহাসের আর এক পৃষ্ঠা" নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন এবং সেটি শ্রাবণের "প্রবাসী"তে ছাপা হয়েছে।

রামবাবুর এই প্রবন্ধ পাঠ ক'রে আমার কিছু কৌতুক বোধ হয়েছে। কেন, তা পরে যথাস্থানে বলব।

কিন্তু একপক্ষের উকিল যেমন আপনার যুক্তিকে জোরালো করবার জন্যে (বিশেষ ক'রে আপন যুক্তির সারবত্তা সম্বন্ধে যদি বিশেষ সন্দেহ থাকে) অপর পক্ষের উকিলকে প্রথমেই ঘোরালো ভাষায় গালাগালি দিয়ে আপনার বক্তব্য আরম্ভ করেন, রামবাবুও তেমনি তাঁর প্রবন্ধের গোড়াতেই আমা- বালক ব'লে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। রামবাবু লিখেছেন—"সুরেশ ওরফে মণি ...

এ। সে ইহা উল্লেখ করে নাই, পাছে বালক বলিয়া তাহার কথা সকলে উড়াইয়া দেয়।" সুতরাং রবাবু তা উল্লেখ করেছেন, সম্ভবতঃ এই আশায় যে আমি যা-কিছু লিখেছি তা অতঃপর পাঠকরা কালের তরে উড়িয়ে দেবেন এবং রামবাবুরাও জন্মের মতো নিশ্চিন্ত হবেন। আমি কলিকাতায় প্রথম র্পণ করি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে, ঠিক কালীপুজোর দিন, তারিখটা বোধহয় বাইশে। তখন মার বয়েস সতেরো বছর এগারো মাস দশ দিন। আর ১৯১০ এর ফেব্রুয়ারি মাসে আমার বয়েস ঠারো বছর দুই মাস। এখন, অরবিন্দ যখন চন্দননগর যান তখন আমার বয়েস আঠারো বছর দুই মাস, মার বয়েসের এই অঙ্কটা উল্লেখ করলেই আমি ও সম্পর্কে যা-কিছু লিখেছি তা প'ড়ে সবাই হো হো 'রে হেসে উঠতেন এবং মনে মনে বলতেন "সব বাজে" "সব বাজে"—বাংলাদেশের পাঠক-সমাজকে মবাবু এমন পাগল বা নির্বোধ ঠাওরালেন কোন্ দিব্য দৃষ্টির বলে? আর প্রাচ্যের, বিশেষ ক'রে গ্রীষ্মমণ্ডল এ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের দেশগুলির মানুষদের আঠারো বছর অতিক্রান্ত হলে বালক ভাবা, নৃতত্ব বিষয়ক জ্ঞানের অভাবের পরিচয়ই ঘোষণা করে। আঠারো বছরের বাঙালীর ছেলেকে বালক ব'লে চালানো, টি বছরের বুড়োকে যুবক ব'লে চালানোর চাইতে কিছুমাত্র কম আশ্চর্য ব্যাপার নয়। রামবাবু এই আশ্চর্য ব্যাপারের যে আশ্রয় নিয়েছেন সেইটে আমার কাছে আর এক আশ্চর্য ব্যাপার। আসলে আঠারো ছরের বাঙালীর ছেলেকে বালক ভেবে অবজ্ঞা করা আর ষাট বছরের বাঙালী-বৃদ্ধকে বর ভেবে আহ্লাদ রা, এ-দুটোই একই রকম দৃষ্টিবানের কাজ।

কিন্তু ছেলেমানুষের এই তত্ত্ব আমদানি করা যে রামবাবুর পক্ষেও অসুবিধাজনক হ'তে পারে তা বোধহয় তিনি ভাবতে পারেননি। কেননা ১৯১০ এ রামবাবু যদি আমাকে ছেলেমানুষ ব'লে উড়িয়ে দেন, তা হ'লে ১৯৪৫ এ তাঁকে বুড়ো মানুষ ব'লে আরও বেশি যুক্তির সঙ্গে সরিয়ে দেবার আমার অধিকার জন্মে। সাম্প্রতিক জ্ঞানে জ্ঞানবান যে কোনো ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলেই আজ জানা যায় যে বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্ল্যাণ্ডের রসক্ষরণ ক'মে যাওয়াতে মানুষের শক্তি সামর্থ্যগুলিও নিস্তেজ ও শিথিল হ'য়ে আসতে থাকে। আমাদের ভাষাতেও "বাহাত্তুরে" "ভীমরতি" শব্দদুটিও বহুদিন থেকেই আছে—এবং তা নিতান্ত অর্থহীন নয়। সুতরাং আমাকে ছেলেমানুষ ব'লে উড়িয়ে দেওয়া রামবাবুর পক্ষে কতকটা কাঁচের ঘরে বাস ক'রে অন্যের প্রতি ঢিল ছোঁড়ার সামিল।

কিন্তু আসলে তরুণ বয়সেই, যখন সংসারের চাপ বা দায়িত্ব সিন্ধুবাদ নাবিকের বৃদ্ধের মতো কাঁধে চেপে বসেনি, তখন স্মৃতির ফলকটি এমনি স্বচ্ছ ও পরিষ্কার থাকে যে তাতে বিশিষ্ট ঘটনাবলীর যে ছাপ পড়ে তা ছাপার কালির মতো স্পষ্ট ও পাকা। অপর পক্ষে অপেক্ষাকৃত বেশি বয়েসে, যখন সংসার ঘাড়ে এসে চেপেছে, যখন আজ ছেলের পৈতে কাল মেয়ের বিয়ে পরশু নাতির এরোপ্লেনে চড়বার বায়না তরশু মিউনিসিপ্যাল ট্যাকস্ ইত্যাদি ব্যাপারগুলো মনে ভিড় ক'রে জড়ো হয়েছে তখন মনের পাতা হ'য়ে ওঠে ইম্‌প্রেসেনিস্ট্ ও সিউররিয়ালিস্ট স্কুলের আর্টিস্টদের আঁকা ছবির তুল্য। তখন এর লেজ ওর গলায়, ওর মুণ্ডু তার কাঁধে, তাঁর স্কন্ধদেশ অন্যজনের কুক্ষিতে ইত্যাদি রকমের এক অদ্ভুত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে।

এই রকমের পরিস্থিতি থেকে প্রকৃত সত্যগুলিকে উদ্ধার করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। রামবাবুর লেখায় এই ধরণের ছবিরই কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

রামবাবু তাঁর প্রবন্ধে একাধিকবার বলেছেন যে, তাঁর মতিভ্রম হয়নি, তাঁর স্মৃতিবিভ্রম ঘটেনি। রামবাবুর এ-কথা প'ড়ে protesting too much কথাটা ম'নে পড়ে যায়।

কিন্তু রামবাবুর স্মৃতিবিভ্রম যে সত্যি সত্যিই ঘটেছে তার অবিসম্বাদিত জাজ্জ্বল্যমান এক প্রমাণ আমি দিচ্ছি। রামবাবু লিখেছেন—"মণি ও নলিনী পণ্ডিচারী হইতে বছর বছর কলিকাতা আসিত এবং আমার সহিত সাক্ষাৎ করিত।" এখন, আমার বাংলাভাষায় যেমন জ্ঞান তাতে এই জানি যে "বছর বছর" মানে প্রতি বছর। সুতরাং ঐ কথাটা একেবারেই সত্য নয়। আমরা সবাই পণ্ডিচারী আসি ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। আমি আসি ৩১ শে মার্চ, শ্রীঅরবিন্দ ও বিজয় আসেন ৪ঠা এপ্রিল (ষ্টীমারে) সৌরীন আসেন সেপ্টেম্বরের শেষে এবং নলিনী আসেন নভেম্বরে। এর বছর চারেক পরে ১৯১৪ র ফেব্রুয়ারি মাসে নলিনী সৌরীন ও আমি একবার কলিকাতায় ফিরি এবং সেবার আমরা রামবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই। এই সময়ে বাংলাদেশে আমরা থাকতে থাকতেই আগষ্টের প্রথম সপ্তাহে (বোধহয় ৪ঠা আগষ্ট) প্রথম ইয়োরোপীয় মহাসমর জ্ব'লে ওঠে। আমরা তিনজন একসঙ্গে পরবর্তী সেপ্টেম্বরে পণ্ডিচারীতে ফিরি—বৃষ্টিতে, রেললাইন ভেঙ্গে যাওয়াতে পথে বেশ কিছু দুর্গতি ভোগ করে, চতুর্থ দিনের বদলে আমরা সপ্তম কি অষ্টম দিনে এসে পণ্ডিচারীতে পৌঁছিলাম। এবং সঙ্গে যে সের দশেক আমসন্দেশ নিয়ে আসা গিয়েছিল তাও এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল যে তা আর আরাম ক'রে খাওয়া চলেনা। তারপর বছর পাঁচেকের মধ্যে এক বিজয় ছাড়া আমরা কেউ বাংলাদেশে ফিরিনি। আর বিজয়ও বাংলাদেশেই ফিরতে চেয়েছিলেন বটে কিন্তু গিয়ে পড়েছিলেন তাঁর অতীত-জীবন-মুগ্ধ রাজ-সরকারের হেপাজতে। রাজ-সরকারের দক্ষিণ হস্ত পুলিসের প্রেম-সতর্ক দৃষ্টি বিজয়কে পথে থেকেই লুফে নিয়ে বছর পাঁচেক আপনাদের নিরাপদ আতিথ্যে রেখেছিল। এরপর ১৯২০।২১ ও ১৯২৫ এ নলিনী ও আমি কলিকাতায় যাই। কিন্তু এর মধ্যে একবারমাত্র রামবাবুর সঙ্গে দৈবাৎ সাক্ষাৎ ঘটে গিয়েছিল। নলিনী ও আমি মানিকতলা স্পার দিয়ে যেন কোথায় যাচ্ছিলাম। সেই পথ দিয়ে রামবাবুও যেন কোথায় যাচ্ছিলেন মোটরকারে। আমাদের দেখে তিনি মোটর থামান এবং আমাদের ডাকেন। আমরা মোটরের পাশে দাঁড়িয়ে শর্ট ও শার্ট শোভিত রামবাবুর সঙ্গে পাঁচ সাত মিনিট কথাবার্তা বলি। তারপর মোটর হাঁকিয়ে তিনি চলে যান, আমরাও আপন গন্তব্যস্থানে প্রস্থান করি। পণ্ডিচারী যাবার পর এই পঁয়ত্রিশ বছরে এই দু'বার ছাড়া রামবাবুর সঙ্গে অন্ততঃ আমার কোনো সাক্ষাৎ ঘটেনি। অথচ রামবাবু অম্লান বদনে লিখেছেন—"মণি ও নলিনী বছর বছর কলিকাতা আসিত ও আমার সহিত সাক্ষাৎ করিত।" এ-থেকেই আজ স্পষ্ট বোঝা যেতে পারে যে রামবাবুর স্মৃতি নামক বস্তুটি আজ ঠিক কোন্ জায়গায় এসে পৌঁছেচে।

এইখানে একটা ছোট খাট ব্যাপারের কথা বলি। ১৯১৪ ফেব্রুয়ারিতে নলিনী সৌরীন ও আমি কলিকাতায় পৌঁছে রামবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই। তখনও আমার নাম সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায়

াপায় হরফে ওঠে নি। কিন্তু সেই সময়ে "নারী কাব্য" নাম দিয়ে একখানি ছোট কবিতার বইয়ের পাণ্ডু-লিপি আমি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। এবং সেই পাণ্ডুলিপি রামবাবুকে দেখিয়েছিলাম। তখন হ্যারিসান রোডে ওভারটুনহলের কাছে শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রমজীবী সমবায় নাম দিয়ে এক কাপড়ের দোকান খুলেছিলেন। রামবাবু জানালেন যে এই দোকানে প্রায় রোজ বিকেলের দিকে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় এসে থাকেন, এবং বললেন—চলো, তোমার কবিতা সমাজপতি মহাশয়কে দেখানো যাক, শোনা যাবে তিনি কি বলেন।

আরও খানিকক্ষণ গল্প সল্প ক'রে আমরা চারজন হ্যারিসান রোডে শ্রমজীবী সমবায়ে গেলাম। সৌভাগ্য-ক্রমে সেখানে সমাজপতি মহাশয়কেও পাওয়া গেল। রামবাবু তাঁকে আমার কবিতার কথা বললেন এবং তিনি অর্থাৎ সমাজপতি মহাশয় আমাকে দু'একটা কবিতা পড়তে বললেন। ভাবভঙ্গিতে বোঝা গেল যে এ-রকম অত্যাচার সহ্য করতে তিনি অভ্যস্ত। নারীকাব্যের প্রথমেই "আবাহন" শীর্ষক একটি কবিতা ছিল—চারটি কলির একটি কবিতা। আমি সেইটি পড়লাম। কবিতাটি হচ্ছে এই—

আমার সোনার মন্দিরে তব
রাজীব চরণ চঞ্চল
উঠিছে পড়িছে ভঙ্গিমে নব
উড়িছে শেফালি-অঞ্চল,
তোমার চরণ-শিঞ্জিনী
মধুর শ্রবণ-রঞ্জিনী
রিণি রিণি রিণি ঝিণি ঝিণি ঝিণি
বাজিতেছে সুর মঙ্গল—
আমার হৃদয়-মন্দিরে নাচে
তোমার চরণ চঞ্চল!

তোমার চরণ-আঘাতে আমার
হৃদয় উঠিছে কাঁপিয়া,
তোমার ধবল অঞ্চলে মোর
আঁখি দুটি আছে পড়িয়া,
তোমার নূপুর-নিক্কণে
মধুর আরাব সুস্বনে
রিণি রিণি রিণি ঝিণি ঝিণি ঝিণি
ধ্বনিছে শ্রবণ ভরিয়া—

তোমার চরণ-আঘাতে আমার
হৃদয় উঠিছে কাঁপিয়া !

হৃদয়ে জাগিয়া তুমি যে আমায়
শুনালে প্রেমের কাহিনী
আমার মানস-কুঞ্জে তুমি যে
গাহিলে প্রীতির রাগিণী,
রজত-নূপুরে শিঞ্জিত
মধু অলিদল গুঞ্জিত
রিণি রিণি রিণি ঝিণি ঝিণি ঝিণি
বাজে আবাহন-রাগিণী—
হৃদয়ে থাকিয়া তুমি যে আমায়
শুনালে প্রেমের কাহিনী !

আজিকে উজল পুলক-পাগল
আলোক গগনে গগনে,
সরসিজদল খুলিল হৃদয়ে
পরশন ভাব-পবনে,
নূপুরে বাজিল রাগিণী
মোহিত, ভুবনমোহিনি !
রিণি রিণি রিণি ঝিণি ঝিণি ঝিণি
গুঞ্জন শুনি স্বপনে—
আজি আবাহন বাজিছে রাগিণী
মিলেছে মরম মরমে !

কবিতা পড়া হ'য়ে গেল। কিন্তু তারপর যা ঘটল তার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। এবং সম্ভবতঃ রামবাবুও ছিলেন না। ইংরাজীতে যাকে বলে the effect was electric যেন ঠিক তাই। অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের ভাষায় বলা যায় যে সমাজপতি মহাশয় যেন একেবারে খেঁকিয়ে উঠলেন, বললেন—আপনারা সব young men, আপনারা কি কবিতা লিখবার আর কোনো বিষয় পান না ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। আর কি সব কথা বলেছিলেন তার কিছুই মনে নেই—শ্রবণেন্দ্রিয় তখন ঠিক সক্রিয় অবস্থায় ছিল কি না সেইটেই সন্দেহের বিষয়। কিন্তু সব কথা মনে না থাক, তাতে কিছু আসে যায় না। ভাব প্রকাশ করবার জন্যেই

ভাষা। সুতরাং ভাবটাই যদি গোড়াতেই প্রচণ্ডভাবে অন্তরে গ্রথিত হ'য়ে যায় তবে ভাষা কর্ণকুহরে প্রবেশ করল, কি করল না তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। শাস্ত্রেও বলে—ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ—ক্ষেত্র বিশেষে মানুষও। বলাবাহুল্য কাব্যপাঠ ঐখানেই শেষ হ'য়ে গেল। এই "নারীকাব্য"র যে শেষাশেষি কি হ'ল তা আজ আর মনে নেই। এটা বই আকারে ছাপা হয় নি এবং এর পাণ্ডুলিপিও আমি পণ্ডিচারীতে ফিরিয়ে আনিনি। দোকান ত্যাগ করবার সময় আমাদের তিন জনকে অমরবাবু তিনখানি পশমী গায়ের কাপড় উপহার দিয়েছিলেন। আমার খানির রঙ ছিল গাঢ় সবুজ। দুই প্রান্তে এক বিঘৎ পরিমাণ বাদে একটু হাতের কাজ।

যাক, এখন আমি রামবাবুর লিখিত "অপ্রকাশিত ইতিহাসের আর এক পৃষ্ঠা"র কয়েকটি ব্যাপার সম্বন্ধে আমার মতামত প্রকাশ করছি। রামবাবু লিখেছেন—"কর্মযোগিন অফিসে নলিনী ফরাসী পড়িত এবং আমিও পড়িতাম।" আমি কিন্তু নলিনীকে ফরাসী পড়তে দেখেছি কিন্তু রামবাবুকে দেখি নি। অরবিন্দ নলিনীকে ফরাসী পড়াতেন। মোলিয়্যার (Moliere) এর একখানি নাটক ছিল পাঠ্যগ্রন্থ—বোধ হয় লাভার (L'Avare)। কিন্তু রামবাবু কোনোদিন সে-পাঠ গ্রহণ করেছেন ব'লে আমি মনে করতে পারছিনে। তবে আমি পূর্বেই বলেছি যে আমি কলিকাতায় আসি ১৯০৯ এর নভেম্বরে। রামবাবু যদি এই তারিখের আগেই ফরাসী শিখে ফেলে থাকেন সে আলাদা কথা। কিন্তু আমি যতদিন "কর্মযোগিন" অফিসে ছিলাম ততদিন রামবাবুর মুখে একবারও c'est ca টুকুও (That's it) শুনি নি। এইখানে একটা কথা মনে পড়ছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের কথা। আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত কৃশ হ'য়ে যাওয়াতে এই বছরের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর এই ছয় মাস আমরা ইণ্ডিয়ান্ কোয়ার্টারে অর্থাৎ Ville noir এ ৫৯নং র‍্যু দে মিস্‌সিয়োঁ এএঁ্যাজ্যার (59, Rue des Missions Etrangeres) এর বাড়িতে ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে দুটি বাঙালী যুবক আমেরিকাতে তাঁদের শিক্ষা-সমাপ্ত ক'রে কলিকাতায় ফিরছিলেন বোধ হয় ফরাসী কোম্পানির জাহাজে। সেই জাহাজ পণ্ডিচারীতে থামলে এঁরা অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। বাজার থেকে দু'কাঁদি কলা (সব পেকে যায় নি এমন) সের তিন চার মটন কিনে অরবিন্দকে উপহার দিয়েছিলেন। এঁদের এক জনের নাম বোধ হয় রজনী দাস, অন্যজনের নাম মনে নেই। এঁদের একজন ছিলেন মধ্যমাকৃতি পুষ্টদেহ ময়লা রঙের শান্ত গম্ভীর প্রকৃতির আর অন্যজন ছিলেন দীর্ঘাকৃতি রোগা ফরসা রঙের কিছু ছটফটে। এই দীর্ঘাকৃতি যুবকটি, যতক্ষণ এঁরা ছিলেন, কথার মধ্যে কারণে অকারণে মাঝে মাঝেই বলছিলেন "c'est ca" "cest c'a"। বোঝা গেল যে এঁরা দেশে ফিরবার সময় অন্ততঃপক্ষে মার্সেই (Marseille) র মাটি ছুঁয়ে এসেছেন। ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ কৌতুককর বলে মনে হয়েছিল। সে যা হোক্, হয় তো এও হ'তে পারে যে রামবাবুর ফরাসী শিখবেন ব'লে সাধ হয়েছিল এবং সেইটেই কালক্রমে তাঁর বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে গেছে যে তিনিও ফরাসী শিখছিলেন। মানবীয় মনস্তত্ত্বের এ রকম প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমার বাল্মীকির রামায়ণ নিয়ে গবেষণা এবং সেই সঙ্গে কার্লাইলের ফ্রেঞ্চ রিভলিউশনে ও গ্রীনের ব্রিটিশ ইতিহাসের কথা বিস্মৃত হবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু বীরেন ("প্রবাসী"তে ছাপা হয়েছে

ধীরেন—বোধ হয় মুদ্রাকর-প্রমাদ) ও সৌরীনের ইটালিয়ান ভাষা শেখার কথা আমি কোনোদিন শুনি নি। অরবিন্দকে তাঁদের কোনোদিন ইটালিয়ান পড়াতেও দেখি নি, যেমন দেখেছি নলিনীকে ফরাসী পড়াতে। বীরেনের কথা বলতে পারি নে। কিন্তু সৌরীন যে ইটালিয়ান ভাষা শিখছিলেন এটা আমার বিশ্বাস নয়। কেন নয়, তার কারণ বল্‌ছি।

জ্যৈষ্ঠ মাসের "প্রবাসী"তে আমি উল্লেখ করেছি যে পণ্ডিচারীতে এসে যাঁর হাতে আমার পরিচয়-পত্র দিয়েছিলাম তাঁর নাম হচ্ছে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আচারী। ইনি পণ্ডিচারীর এক ধনী ব্যক্তি শ্রীযুক্ত শঙ্কর চেট্টিয়ারের বাস-গৃহের ত্রিতলটি অরবিন্দের বাসের জন্য ঠিক করেছিলেন। তখন পণ্ডিচারীতে এই একমাত্র তিনতলা বাড়ি ছিল। এখন শুনি আর একটি নাকি নির্মিত হয়েছে। চেট্টিয়ার মহাশয়ের বাড়ির ত্রিতল অংশটি প্রশস্ত ব্যাপার কিছু নয়। কিন্তু সেই জন্যেই গোপনে বাস করবার পক্ষে খুব প্রশস্ত। বোধ হয় আট কি নয় বর্গহাত পরিমিত ছোট ছোট দুখানা ঘর। এবং লাইট-রেলওয়ের গাড়ির কামরার মতো একটি কামরা। সামনে উত্তর দিকে (বাড়িটি উত্তরমুখী) রেলিং-ঘেরা খানিকটা খোলা ছাদ। পিছনে দক্ষিণ দিকে কথঞ্চিৎ লম্বা এক ঢাকা বারান্দা। এই বারান্দা থেকে দুতিন ধাপ সিঁড়ি দিয়ে নেমে একটি রান্নাঘর। এই হচ্ছে ত্রিতল। এই ত্রিতলে আমরা প্রায় ছয় মাস ছিলাম। এবং তার মধ্যে প্রায় তিন মাস কাল বিজয় ও আমি অরবিন্দের মতোই বাক্সবন্দী অবস্থায়। দিনে বা রাতে আমরাও কোথাও বেরুতাম না। প্রায় তিন মাস পরে অরবিন্দ আমাদের বাইরে যাবার অনুমতি দেন। রাস্তায় বেরিয়ে সেদিন বাইরের আকাশ বাতাসের যে স্বাদ (সত্যি সত্যিই যেন স্বাদ) দেহ ও মন দিয়ে গ্রহণ করেছিলাম সেই স্বাদ যেন আজ এতকাল পরেও তাই লিখবার কালে কতকটা পাচ্ছি।

কিন্তু এই তিন মাস বাক্সবন্দী অবস্থা আমার পক্ষে একটা মহাগুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই অবস্থাতেই আমার লিখতে চেষ্টা করার কথা মনে জাগে। এর পূর্বে মনের কোণে কোথাও কোনোদিন লেখক হ'য়ে উঠবার কোনো রকমের বাসনা কামনা সাধ আশা আকাঙ্ক্ষা স্পৃহা অভীপ্সার ছিটে ফোঁটাও অনুভব করি নি। সেই বাক্সবন্দী অবস্থায় কাল কাটাবার কৌশলরূপে যার আবির্ভাব ঘটল তাই-ই অবশেষে জীবন ব্যাপারে কায়েমী হ'য়ে গেল। দুর্জ্ঞেয় জীবনের রহস্য!

যাহোক্, চেট্টিয়ার মহাশয়ের বাড়িতে প্রায় ছ'মাস (সাড়ে তিনদিন কম) কাটিয়ে আমরা ইউরোপীয় কোয়ার্টার ভিল ব্লাঁশে (Ville Blanche—অর্থাৎ শ্বেতশহর) একটি বাড়ি ভাড়া ক'রে উঠে গেলাম—বাড়ির মালিকের নাম শ্রীযুক্ত সুন্দর চেট্টিয়ার। শঙ্কর চেট্টিয়ার মহাশয়ের বাড়ি ছিল ইণ্ডিয়ান্ কোয়ার্টার ভিল্‌নোয়ার (Villenoir অর্থাৎ কৃষ্ণনগর) এ। আমাদের এই প্রথম ভাড়া বাড়িটা ছিল র‍্যু দ্যু পাভিয়োঁতে (Rue du Pavillon)। এই রাস্তার নাম বদলে এখন হয়েছে র‍্যু স্যুফ্রাঁ (Rue Suffren)। এ বাড়ীতে উঠে যাবার মুখে মুখে সৌরীন পণ্ডিচারীতে আসেন—শঙ্কর চেট্টিয়ার মহাশয়ের বাড়িতে অবস্থানের শেষদিনে। এইখানেও আমরা ছ'মাস ছিলাম। এই বাড়িতে সৌরীন ও আমি কিছুকাল একধা ছিলাম। এই বাড়িতে থাকতে থাকতে নলিনীও পণ্ডিচারীতে এসে পড়েন।

সভা ক'রে সৌরীনকে গায়ক হিসেবে অভিনন্দন দেওয়া চলত না। কিন্তু আনন্দ ও আবেগ আমাদের সবারই হয় এবং সে-অবস্থায় কখনও কখনও আমরা সবাই গানও ধ'রে দিয়ে থাকি। সৌরীনও মাঝে মাঝে গান ধ'রে দিতেন। এবং সর্বসাকল্যে, অনুমান করি, তাঁর গানের পুঁজি ছিল দুইটি। একটি হচ্ছে—

মধুর সে মুখখানি কখনও কি ভোলা যায়,
জমায়ে চাঁদেরি সুধা বিধি গড়েছিল তায়!

আর অন্যটি হচ্ছে,

দেখো, ভুল ক'রে ভালবেসো না!
আমি ভালবাসি ব'লে কাছে এসো না।

গানদুটির বাকি অংশ আজ আর আমার ঠিক ঠিক মনে নেই। এই দুটি ছাড়া কোনো তৃতীয় গান সৌরীনের মুখে শুনেছি ব'লে মনে পড়ে না। অবশ্য প্রথম প্রথম পণ্ডিচারীতে বাসকালে যখন আমাদের চারজনের (নলিনী সৌরীন বিজয় ও আমি) অবস্থা মাঝে মাঝে কতকটা The flesh is willing but the spirit is weak গোছের দাঁড়াত, আত্মিক চেতনা অত্যন্ত নীচু পরদায় নেমে যেত এবং আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে সমুদ্রের ধারে গিয়ে প্যারাপেটের উপরে পা ঝুলিয়ে ব'সে কল কল ছল ছল-ভাষ তরঙ্গ-আকুল বঙ্গোপসাগরের গাঢ় নীলবারিরাশির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে আমাদের ক্লিষ্ট আত্মারাম চতুষ্টয়কে কতকটা চাঙা ক'রে তুলবার জন্য প্রাণপণে গান ধ'রে দিতাম আত্মাদের বেশ সমৃঝিয়ে সমৃঝিয়ে—

তোমারো পতা—কা—যারে দাও তা—রে—
বহিবারে দা—ও শ—ক—তি—

তখন অবশ্য সৌরীনও তাতে যোগ দিতেন। কিন্তু একক হিসেবে—Solo—তাঁকে ঐ দুটি গান ছাড়া আর কোনো গান গাইতে শুনেছি ব'লে মনে পড়ে না। এইখানে আর একটা কথা মনে পড়ছে। কথাটা এখন মনে হ'লে হাসি পায়। কিন্তু সেই বয়েসে বোধহয় সকল আতিশয্যই মানিয়ে যায়।

থ্রি মাস্‌কেটিয়ার্স এর চারটি হিরোকে আমরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি ক'রে নিয়েছিলাম। সৌরীন ছিলেন আথস্ (Athos), বিজয় পোরথস্ (Porthos) নলিনী আরামিস্ (Aramis), এবং সর্বকনিষ্ঠ আমার ভাগে পড়েছিল ডারটাঞা (D'Artagnan,)

সে যা হোক্, এখন, এমন যে সৌরীন যিনি বাংলাভাষায় হাজার হাজার গানের মধ্যে ঐ দুটিকে পছন্দ ক'রে আপনার কণ্ঠাভরণ করেছিলেন এবং কভু বা আনন্দ-পুলকিত কভু বা বিরহ-ব্যাকুল কণ্ঠে গাইতেন, আমার বিশ্বাস, যে তেমন সৌরীন যদি ইটালিয়ান ভাষার আট দশটি শব্দও শিখে থাকতেন তবে তাঁর কাছ থেকে এক আধ বারও দান্তে ও বেয়াত্রিচের নাম শুনতে পেতাম। কিন্তু দান্তে ও বেয়াত্রিচে তো দূরের কথা, ইটালি ব'লে যে এক দেশ আছে, ইটালিয়ান ব'লে যে একটা জাতি একটা ভাষা আছে, সেই একঘরে বাস করবার কালে, তার আভাস মাত্র সৌরীনের কাছ থেকে কোনদিন পাই নি। তাই আমি বলছিলাম যে সৌরীন ইটালিয়ান শিখছিলেন, এ-বিশ্বাস আমার নয়।

অরবিন্দ তামিলে কবিতা রচনা করেছিলেন—রামবাবু লিখেছেন। কিন্তু এ-কথাও আমি কোনোদিন শুনি নি। অরবিন্দ পণ্ডিচারীতে এসেও তামিল ভাষার চর্চা করতেন। এবং অগণিত সন্ধ্যা কথায় বার্তায় আলাপ আলোচনায় হাস্য পরিহাসে অরবিন্দের সঙ্গে আমাদের কেটেছে। কখনো-সখনো তিনি আমাদের তাঁর রচিত ইংরাজী-কবিতাও প'ড়ে শুনিয়েছেন। একবার তিনি "কালী" নাম দিয়ে একটা ফরাসী কবিতা রচনা করেছিলেন। সেটাও আমরা দেখেছিলাম। কিন্তু তিনি তামিলে কবিতা রচনা করেছিলেন এমন কথা তাঁর কাছ থেকে কোনোদিন শুনি নি। সুতরাং এর সত্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

অরবিন্দের ফরাসী কবিতাটি আমি সেই সময়ে বাংলায় অনুবাদ করেছিলাম। কোনো কোনো সম্ভাব্য কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকাদের জন্য আমি অনুবাদটি এখানে তুলে দিলাম।

কালী

ব্রহ্মাণ্ডের অসীম-প্রান্তে পথহারা ভ্রষ্ট মহীতল
ভয়ঙ্করী কে তুমি রূপসি! শ্বাসে তব কাঁপে টলমল,—
মূর্তি হেরি' জাগে বিভীষিকা, বাঞ্ছা তবু করালবদনি!
হৃদে ধরি ওই পদাম্বুজে, পূজি তোমা ভীষণা পাষাণী!
রক্তমাখা বক্ত্র দিয়া তব উদ্গারিছ হলাহল বিষ
তবু ছুটি ওই রাঙাপায় কুড়াইতে তব শুভাশিস্!

ক্ষিপ্ত হ'য়ে ধ্বংস সাথে ছোটে প্রভঞ্জন ইঙ্গিতে তোমার,
অন্তরালে তার শুনি বাজে মঙ্গলের মোহন ঝঙ্কার,
মরণের অন্ধবিভীষিকা গ্রাসে যবে সুখের স্বপন
অন্তরালে দেখি দীপ্ততর স্বপ্নখানি রেখেছ গোপন,
অমঙ্গলে ঢাকি' বীরবপু কে তুমি গো মঙ্গলদায়িনি!
পিশাচীর সাজে সাজিয়াছ ত্রিভুবনে ফেলি' ছায়াখানি!

নিঠুর-বিরহ-মধু-গীতি প্রণয়ের বিরতি-বিহীন,
দুঃখানন পাষানিয়া হৃদি করে আঁখি শুষ্ক বারিহীন,
অমঙ্গল মঙ্গল-প্রসূতি, প্রলয়ের সৃজন-বারতা,
নিয়তির চিত্রপটখানি বক্ষে তব সবি দেখি গাঁথা!
মদমত্ত মূঢ় ভ্রান্ত জীব অসহায় জলবিম্ব প্রায়
তব হুহুঙ্কারে ভাসি' পুনঃ কটাক্ষের ইঙ্গিতে মিলায়!

রামবাবু লিখেছেন যে বোমার মামলায় খালাস হ'য়ে অরবিন্দ বেরুলে জেলের কয়েকটি সিপাহীও কাজ ছেড়ে দিয়ে অরবিন্দের আশ্রয় নেয়। এবং এদের মধ্যে একজনকে অরবিন্দ "কর্মযোগিন্" আফিসের দ্বারবান নিযুক্ত করেন,। কিন্তু এই দারোয়ান ধরমসিংএর সম্বন্ধে শুনেছিলাম যে, সে আলিপুর জেলের ওয়ার্ডার ছিল। নরেন গোঁসাইয়ের হত্যা ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের এর উপর সন্দেহ জন্মে। এবং সেই জন্য তাকে বরখাস্ত করা হয়। এবং পরে "কর্মযোগিন্" আফিসে সে নিযুক্ত হয়। জানি নে আমি তখন যা শুনেছিলাম সেটাই সত্য, না রামবাবু এখন যা লিখছেন তাই ঠিক। তারপর এই ধরমসিংকে গাড়ির ছাদে বসিয়ে রামবাবু "কর্মযোগিন্" আফিস থেকে অরবিন্দের সঙ্গী হ'য়ে রোজ তাঁকে কৃষ্ণকুমারবাবুর বাড়িতে পৌঁছে দিতেন—এমন কথা রামবাবু লিখেছেন। কিন্তু আমি "কর্মযোগিন্" আফিসে আসবার পর যে এ-রকমের কিছু দেখিনি, এ-সম্বন্ধে আমি একেবারেই নিঃসংশয়। তবে আমার আসবার আগে যদি ঐ ব্যাপার ঘটে থাকেত, তা অবশ্য আমি বলতে পারি নে। আমি দেখেছি যেদিন যেদিন সৌরীন আসতেন সেদিন সৌরীনই অরবিন্দের সঙ্গী হতেন—শরীর-রক্ষী হিসেবে নয়, তাঁরও ঐ একদিকেই গন্তব্যস্থান ব'লে। নইলে অরবিন্দ ট্রামে বা কচিৎ কদাচিৎ গাড়িতে একলাই চ'লে যেতেন।

এ-সম্পর্কে রামবাবু যে ইঙ্গিত করেছেন তাতে আমি এই বুঝেছি যে, মধ্যযুগে যেমন শয়তান-প্রকৃতির ও পাষণ্ড-প্রবৃত্তির রাজারা গুপ্ত ঘাতক লাগিয়ে তাঁদের অনভিপ্রেত ব্যক্তিকে সাবাড় ক'রে ফেলতেন, তেমনি এই বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ পুলিস বা গভর্ণমেণ্ট অরবিন্দ সম্পর্কেও সেই পন্থা অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু এই রকমের ধারণা সারা স্বদেশী-যুগে আর কোথাও প্রকাশ হ'তে শুনি নি। বিপ্লবীদের কাছ থেকেই পুলিসের বা গভর্ণমেণ্টের কর্মচারীর বিপদের কথা শুনেছি এবং তার প্রমাণও দেখা গিয়েছে। কিন্তু পুলিসের কাছ থেকে বিপ্লবী বা দেশ-সেবকদের ঠিক এই ধরণের বিপদ ঘটতে পারে, এই আইডিয়াটাই রামবাবুর এই লেখা প'ড়ে প্রথম জানলাম। কিন্তু যে গভর্ণমেণ্টের আইনেরই সুদীর্ঘ বাহু রয়েছে, নানা স্বৈরাচারী অ্যাক্ট্ অরডিন্যান্স্ ইত্যাদি রয়েছে, সে গভর্ণমেণ্ট যে কেন এই সভ্যযুগে মধ্যযুগীয় সেই বর্বর-উপায়ের আশ্রয় নিয়ে সভ্য জগতে খামকা নিজের নাম খারাপ করবে তার যুক্তি বোঝা যায় না। আর ইংরাজ জাতি-হিসেবে এ-বিষয়ে কতকটা সুশীলই বলো বা ভদ্রই বলো বা লাজুকই বলো—সে সম্বন্ধে কোনো ভুল নেই। আর ও-রকম বিপদ যদি অরবিন্দের ঘটবার সম্ভাবনাই থাকত তবে সে-বিপদ কি কেবল "কর্মযোগিন" আফিস থেকে ফিরবার সময়েই মাত্র ঘটতে পারত, অন্য সময় নয়? অরবিন্দ নিশ্চয়ই অন্য সময় অন্যত্রও চলা-ফেরা করতেন। আমি আমার রাস্তার উপরের ঘরের জানালা দিয়ে একদিন তাঁকে শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের দিক থেকে একলা হেঁটে আসতে দেখেছিলাম। বালক (?) হ'লেও তখন আমার অনুমান করতে কষ্ট হয় নি যে তিনি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের ট্রাম থেকে শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের মোড়ে নেমে সেখান থেকে হেঁটে আসছেন। সম্প্রতি শ্রীঅরবিন্দের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে তিনি কখনও কখনও কলেজ স্কোয়ার থেকেই একলা বরাবর হেঁটে শ্যামপুকুর লেনের আফিসে আসতেন। এই সব সময় রামবাবু কোথায় থাকতেন? ধরমসিংই বা কোথায় খৈনি টিপ্‌তে টিপতে ভজন গান গাইত? রামবাবুর লেখার এই অংশটুকু পড়ে একটা মহা

কৌতূহলের সঙ্গে এই সব প্রশ্নই আমার মনে উদয় হচ্ছে। রোম্যান্‌টিসিজ্‌ম্ করতে হ'লেও তার সঙ্গে কিছুটা যুক্তি যুক্ত থাকা দরকার।

যা হোক্, এ-সব কথা ছেড়ে দিয়ে এখন মূল ব্যাপারে আসা যাক্।

এই লেখার গোড়াতে আমি বলেছি যে রামবাবুর প্রবন্ধ প'ড়ে আমার কিছু কৌতুক বোধ হয়েছে কেন, এখন সেই কথাটা বলছি।

"উদ্বোধন" এর পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরীর মাধ্যমে শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে তি সংবাদ প্রচার করা হয়েছিল। এ-তিনটি সংবাদ হচ্ছে এই—

১। শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগর যাবার পথে বাগবাজার মঠে গিয়ে শ্রীসারদেশ্বরীকে প্রণাম করেছিলেন।

২। চন্দননগরে যাবার সময় নিবেদিতা ও গণেন মহারাজ অরবিন্দকে ঘাটে নৌকায় তুলে দিতে যান।

৩। সুকুমার মিত্র সেদিন পুলিস-ঘেরা "কর্মযোগিন" আফিসে প্রবেশ ক'রে (বোধ হয় তিনি লাটসাহে কাছ থেকে প্রবেশের ছাড়-পত্র নিয়ে এসেছিলেন) অরবিন্দকে "দেয়াল টপকাইয়া" পাশের বাড়িতে ফেলে দেন

গিরিজাবাবুর নামের মধ্যে হর পার্বতীর মিলন ঘটেছে। তাঁর কলমের সাথেও যদি ওই দুই না কিছু স্পর্শ থাকত তবে ইতিহাস বেচারা কিছু পরিমাণ সোয়াস্তি বোধ করতে পারত ব'লে মনে হয়।

গিরিজাবাবু যখন প্রচারক, তখন সারদেশ্বরীর স্পর্শে অরবিন্দের মূহ্যমান হওয়া এবং গৌরী অরবিন্দের চিবুক ধ'রে বিবেকানন্দের কবিতা আউড়িয়ে সেকেলে গ্রাম্য রসিকতার পরিচয় প্রদান— দুটি কাহিনী উহ্য ছিল। পরে রামবাবু ও বেদান্ত চিন্তামণি কৃষ্ণবাবু তা যোগ করেছেন। অর্থাৎ রাম ও যুক্ত হ'য়ে শ্রীরামকৃষ্ণের গৌরব-প্রচারে সন্দেহ-জনক পন্থায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

সে যা হোক, এখন, ঘটনাক্রমে অরবিন্দের চন্দননগর যাবার ব্যাপারে সুরু থেকে সঙ্গে বরাবর আমি সশরীরে উপস্থিত থাকাতে অতীব সহজ ও স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই আমি জানতাম অরবিন্দ সম্পর্কে ওই তিনটি সংবাদই ঘোরতর মিথ্যা। এবং আমি অতি স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ভাষায় আ স্মৃতিকথায় তাই লিখেছিলাম।

রামবাবু বর্ধমানের সুদূর এক পল্লীতে ব'সে ("উদ্বোধন" আফিসে ব'সে নয়) আমার সেই স্মৃতি পাঠ ক'রে কোমর বেঁধে আমাকে বালক ব'লে উড়িয়ে দেবার পর তেড়ে মেড়ে এসে—এসে ঠিক আ কথারই সমর্থন করেছেন। অর্থাৎ তিনি যা লিখেছেন তারও অর্থ হয় এই যে, অরবিন্দ চন্দননগর যা মুখে বাগবাজার মঠে যান নি, নিবেদিতা ও গণেন মহারাজ তাঁর সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে যান নি এবং গিরি বাবুর বিশেষভাবে আহরিত সংবাদ, সুকুমার মিত্র অরবিন্দকে "দেয়াল টপকাইয়া" পাশের বাড়িতে দেন নি। এবং এই হচ্ছে আমার কৌতুকবোধের কারণ। সম্ভবতঃ আক্রমণ করাটাই রামবাবুর কা এমন জরুরী হ'য়ে উঠেছিল যে যুক্তির দিকটায় তিনি তেমন মনঃসংযোগ করতে পারেন নি। বোঝা সত্য আবিষ্কারের জন্ম যে-রকম ঠাণ্ডা মাথার দরকার রামবাবুর ঐ সময়ে তার অভাব ছিল।

তবে অবশ্য চন্দননগর যাবার সময় অরবিন্দ বাগবাজার মঠে যান নি এই কথার সঙ্গে আমি ব্র্যাকে

রামবাবু লিখেছেন যে বোমার মামলায় খালাস হ'য়ে অরবিন্দ বেরুলে জেলের কয়েকটি সিপাহীও কাজ ছেড়ে দিয়ে অরবিন্দের আশ্রয় নেয়। এবং এদের মধ্যে একজনকে অরবিন্দ "কর্মযোগিন্" আফিসের দ্বারবান নিযুক্ত করেন। কিন্তু এই দারোয়ান ধরমসিংএর সম্বন্ধে শুনেছিলাম যে, সে আলিপুর জেলের ওয়ার্ডার ছিল। নরেন গোঁসাইয়ের হত্যা ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের এর উপর সন্দেহ জন্মে। এবং সেই জন্য তাকে বরখাস্ত করা হয়। এবং পরে "কর্মযোগিন্" আফিসে সে নিযুক্ত হয়। জানি নে আমি তখন যা শুনেছিলাম সেটাই সত্য, না রামবাবু এখন যা লিখছেন তাই ঠিক। তারপর এই ধরমসিংকে গাড়ির ছাদে বসিয়ে রামবাবু "কর্মযোগিন্" আফিস থেকে অরবিন্দের সঙ্গী হ'য়ে রোজ তাঁকে কৃষ্ণকুমারবাবুর বাড়িতে পৌঁছে দিতেন—এমন কথা রামবাবু লিখেছেন। কিন্তু আমি "কর্মযোগিন্" আফিসে আসবার পর যে এ-রকমের কিছু দেখিনি, এ-সম্বন্ধে আমি একেবারেই নিঃসংশয়। তবে আমার আসবার আগে যদি ঐ ব্যাপার ঘটে থাকেত, তা অবশ্য আমি বলতে পারি নে। আমি দেখেছি যেদিন যেদিন সৌরীন আসতেন সেদিন সৌরীনই অরবিন্দের সঙ্গী হ'তেন—শরীর-রক্ষী হিসেবে নয়, তাঁরও ঐ একদিকেই গন্তব্যস্থান ব'লে। নইলে অরবিন্দ ট্রামে বা ক্বচিৎ কদাচিৎ গাড়িতে একলাই চ'লে যেতেন।

এ-সম্পর্কে রামবাবু যে ইঙ্গিত করেছেন তাতে আমি এই বুঝেছি যে, মধ্যযুগে যেমন শয়তান-প্রকৃতির ও পাষণ্ড-প্রবৃত্তির রাজারা গুপ্ত ঘাতক লাগিয়ে তাঁদের অনভিপ্রেত ব্যক্তিকে সাবাড় ক'রে ফেলতেন, তেমনি এই বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ পুলিস বা গভর্ণমেণ্ট অরবিন্দ সম্পর্কেও সেই পন্থা অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু এই রকমের ধারণা সারা স্বদেশী-যুগে আর কোথাও প্রকাশ হ'তে শুনি নি। বিপ্লবীদের কাছ থেকেই পুলিসের বা গভর্ণমেণ্টের কর্মচারীর বিপদের কথা শুনেছি এবং তার প্রমাণও দেখা গিয়েছে। কিন্তু পুলিসের কাছ থেকে বিপ্লবী বা দেশ-সেবকদের ঠিক এই ধরণের বিপদ ঘটতে পারে, এই আইডিয়াটাই রামবাবুর এই লেখা প'ড়ে প্রথম জানলাম। কিন্তু যে গভর্ণমেণ্টের আইনেরই সুদীর্ঘ বাহু রয়েছে, নানা স্বৈরাচারী অ্যাক্ট্ অরডিন্যান্স্ ইত্যাদি রয়েছে, সে গভর্ণমেণ্ট যে কেন এই সভ্যযুগে মধ্যযুগীয় সেই বর্বর-উপায়ের আশ্রয় নিয়ে সভ্য জগতে খামকা নিজের নাম খারাপ করবে তার যুক্তি বোঝা যায় না। আর ইংরাজ জাতি-হিসেবে এ-বিষয়ে কতকটা সুশীলই বলো বা ভদ্রই বলো বা লাজুকই বলো—সে সম্বন্ধে কোনো ভুল নেই। আর ও-রকম বিপদ যদি অরবিন্দের ঘটবার সম্ভাবনাই থাকত তবে সে-বিপদ কি কেবল "কর্মযোগিন" আফিস থেকে ফিরবার সময়েই মাত্র ঘটতে পারত, অন্য সময় নয়? অরবিন্দ নিশ্চয়ই অন্য সময় অন্যত্রও চলা-ফেরা করতেন। আমি আমার রাস্তার উপরের ঘরের জানালা দিয়ে একদিন তাঁকে শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের দিক থেকে একলা হেঁটে আসতে দেখেছিলাম। বালক (?) হ'লেও তখন আমার অনুমান করতে কষ্ট হয় নি যে তিনি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের ট্রাম থেকে শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের মোড়ে নেমে সেখান থেকে হেঁটে আসছেন। সম্প্রতি শ্রীঅরবিন্দের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে তিনি কখনও কখনও কলেজ স্কোয়ার থেকেই একলা বরাবর হেঁটে শ্যামপুকুর লেনের আফিসে আসতেন। এই সব সময় রামবাবু কোথায় থাকতেন? ধরমসিংই বা কোথায় খৈনি টিপ্‌তে টিপতে ভজন গান গাইত? রামবাবুর লেখার এই অংশটুকু পড়ে একটা মহা

কৌতূহলের সঙ্গে এই সব প্রশ্নই আমার মনে উদয় হচ্ছে। রোম্যান্‌টিসিজ্‌ম্‌ করতে হ'লেও তার সঙ্গেও কিছুটা যুক্তি যুক্ত থাকা দরকার।

যা হোক্‌, এ-সব কথা ছেড়ে দিয়ে এখন মূল ব্যাপারে আসা যাক্‌।

এই লেখার গোড়াতে আমি বলেছি যে রামবাবুর প্রবন্ধ প'ড়ে আমার কিছু কৌতুক বোধ হয়েছে। কেন, এখন সেই কথাটা বলছি।

"উদ্বোধন" এর পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরীর মাধ্যমে শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে তিনটি সংবাদ প্রচার করা হয়েছিল। এ-তিনটি সংবাদ হচ্ছে এই—

১। শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগর যাবার পথে বাগবাজার মঠে গিয়ে শ্রীসারদেশ্বরীকে প্রণাম করেছিলেন।

২। চন্দননগরে যাবার সময় নিবেদিতা ও গণেন মহারাজ অরবিন্দকে ঘাটে নৌকায় তুলে দিতে যান।

৩। স্নুকুমার মিত্র সেদিন পুলিস-ঘেরা "কর্মযোগিন" আফিসে প্রবেশ ক'রে (বোধ হয় তিনি লাটসাহেবের কাছ থেকে প্রবেশের ছাড়-পত্র নিয়ে এসেছিলেন) অরবিন্দকে "দেয়াল টপকাইয়া" পাশের বাড়িতে ফেলে দেন।

গিরিজাবাবুর নামের মধ্যে হর পার্বতীর মিলন ঘটেছে। তাঁর কলমের সাথেও যদি ওই দুই নামের কিছু স্পর্শ থাকত তবে ইতিহাস বেচারা কিছু পরিমাণ সোয়াস্তি বোধ করতে পারত ব'লে মনে হয়।

গিরিজাবাবু যখন প্রচারক, তখন সারদেশ্বরীর স্পর্শে অরবিন্দের মুহ্যমান হওয়া এবং গৌরীমার অরবিন্দের চিবুক ধ'রে বিবেকানন্দের কবিতা আউড়িয়ে সেকেলে গ্রাম্য রসিকতার পরিচয় প্রদান—এ দুটি কাহিনী উহ্য ছিল। পরে রামবাবু ও বেদান্ত চিন্তামণি কৃষ্ণবাবু তা যোগ করেছেন। অর্থাৎ রাম ও কৃষ্ণ যুক্ত হ'য়ে শ্রীরামকৃষ্ণের গৌরব-প্রচারে সন্দেহ-জনক পন্থায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

সে যা হোক, এখন, ঘটনাক্রমে অরবিন্দের চন্দননগর যাবার ব্যাপারে সুরু থেকে সঙ্গে পর্যন্ত বরাবর আমি সশরীরে উপস্থিত থাকাতে অতীব সহজ ও স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই আমি জানতাম যে অরবিন্দ সম্পর্কে ওই তিনটি সংবাদই ঘোরতর মিথ্যা। এবং আমি অতি স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ভাষায় আমার স্মৃতিকথায় তাই লিখেছিলাম।

রামবাবু বর্ধমানের সুদূর এক পল্লীতে ব'সে ("উদ্বোধন" আফিসে ব'সে নয়) আমার সেই স্মৃতিকথা পাঠ ক'রে কোমর বেঁধে আমাকে বালক ব'লে উড়িয়ে দেবার পর তেড়ে মেড়ে এসে—এসে ঠিক আমার কথারই সমর্থন করেছেন। অর্থাৎ তিনি যা লিখেছেন তারও অর্থ হয় এই যে, অরবিন্দ চন্দননগর যাবার মুখে বাগবাজার মঠে যান নি, নিবেদিতা ও গণেন মহারাজ তাঁর সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে যান নি এবং গিরিজা বাবুর বিশেষভাবে আহরিত সংবাদ, স্নুকুমার মিত্র অরবিন্দকে "দেয়াল টপকাইয়া" পাশের বাড়িতে ফেলে দেন নি। এবং এই হচ্ছে আমার কৌতুকবোধের কারণ। সম্ভবতঃ আক্রমণ করাটাই রামবাবুর কাছে এমন জরুরী হ'য়ে উঠেছিল যে যুক্তির দিকটায় তিনি তেমন মনঃসংযোগ করতে পারেন নি। বোঝা যায় সত্য আবিষ্কারের জন্য যে-রকম ঠাণ্ডা মাথার দরকার রামবাবুর ঐ সময়ে তার অভাব ছিল।

তবে অবশ্য চন্দননগর যাবার সময় অরবিন্দ বাগবাজার মঠে যান নি এই কথার সঙ্গে আমি ব্র্যাকেটে

এমন কথা জুড়ে দিয়েছিলাম যে সারদামণি দেবীর সহিত অরবিন্দের কোনোদিনই সাক্ষাৎ ঘটে নি। এবং আমার বিশ্বাস যে এক রামবাবু ছাড়া আর সবাই এ-কথা অনুমান ক'রে নিয়েছেন যে, ও-কথা আমি শ্রীঅরবিন্দের কাছ থেকে পেয়েই লিখেছি। নইলে ও-কথা আমার দিক থেকে বলার কোনো মানেই হয় না। এটা অতি সহজ বোধ্য। কিন্তু আমি না হয় শ্রীঅরবিন্দের নাম উল্লেখ করি নি। কিন্তু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত মহাশয় শ্রীঅরবিন্দের নাম উল্লেখ করেই উদ্বোধনের পৃষ্ঠা মারফত ও-কথা জানিয়েছেন। তথাপি রামবাবুর সে-কথা বিশ্বাস হয় নি। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে আবার ও-কথা জিজ্ঞাসা করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। নিশ্চিত-রূপে দোষী প্রমাণিত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি আকুল অন্তরে কেবলি আশা করতে থাকে যে হাইকোর্টে আপীল করলেই তার খালাস হবে। রামবাবুরও অবস্থা যেন দাঁড়িয়েছে কতকটা সেই রকম।

সুতরাং শ্রীঅরবিন্দ কোনোদিন বাগবাজার মঠে গিয়ে সারদেশ্বরীকে প্রণাম করেছিলেন কিনা এবং গৌরীমা অরবিন্দের চিবুক গ্রহণান্তর ছড়া কেটেছিলেন কি না, এ-তর্ক রামবাবুর আমার সঙ্গে বা চারুবাবুর সঙ্গে নয়, এ তর্ক তাঁর শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে। সুতরাং রামবাবুর যদি কোমর বেঁধে তেড়ে মেড়ে কারো প্রতি ধাবিত হ'তে হয় তবে সে শ্রীঅরবিন্দের প্রতি—আর কারো প্রতি নয়।

রামবাবুর যে কিরূপ স্মৃতি-বৈকল্য ঘটেছে তার প্রমাণ আমি রামবাবু লিখিত "মণি ও নলিনী পণ্ডিচারী হইতে বছর বছর কলিকাতায় আসিত এবং আমার সহিত সাক্ষাৎ করিত" এই কথা সম্পর্কে পুর্বেই দেখিয়েছি। রামমাবুর এই স্মৃতি-বৈকল্যের জন্যই তিনি অরবিন্দের চন্দননগর যাবার বৃত্তান্তে এক মহা তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। তা সংশোধিত হ'য়ে থাকা দরকার। নইলে ইতিহাসে কয়েকটি ভুল সংবাদ থেকে যাবার সম্ভাবনা।

রামবাবু লিখেছেন যে, অরবিন্দ শীঘ্রই গ্রেপ্তার হবেন এই খবর পেয়ে তিনি কৃষ্ণকুমারবাবুর বাড়িতে ছোটেন এবং সেইখানে অরবিন্দকে সে সংবাদ দেন এবং পরে দু'জনে গাড়িতে ক'রে "কর্মযোগিন্" আফিসে আসেন। রামবাবুর এই বৃত্তান্ত একেবারেই ভুল—absolutely untrue। স্বয়ং ত্রেতাযুগের রামচন্দ্র এসে বললেও এ-কথা সত্য হবে না। রামবাবু এই খবর অরবিন্দকে "কর্মযোগিন" আফিসে যখন তিনি বাড়ির ভিতরের দিককার বিজয়ের ঘরে তক্তপোষের উপর ব'সে অটোম্যাটিক রাইটিং করছিলেন তখন জাজ্বল্যমান আমাদের সান্নিধ্যে জানান। এ-সম্বন্ধে এক অণু এক পরমাণু এক ইলেকট্রন মাত্রও সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

আসলে রামবাবু ঐ খবর পেয়ে "কর্মযোগিন্" আফিসেই ছুটে আসেন—আর সেইটেই স্বাভাবিক। কেননা তিনি জানতেন যে, অরবিন্দ প্রতিদিন বিকেল চারটা পাঁচটা থেকে রাত ন'টা দশটা পর্যন্ত "কর্মযোগিন" আফিসেই উপস্থিত থাকেন। 'তবে অবশ্য এটা ঘটা অসম্ভব নয় যে রামবাবু যখন পুলিসের কাছ থেকে ঐ সংবাদ পান তখন তিনি কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে বা ঐ দিকেই কোথাও ছিলেন। তবে তখন তাঁর মনে হওয়া স্বাভাবিক—একবার কৃষ্ণকুমার বাবুর বাড়ি দেখে যাই। কিন্তু সেখানে অরবিন্দকে না পেয়ে পরে "কর্মযোগিন্" আফিসে আসেন এবং সেইখানেই অরবিন্দকে ঐ সংবাদ দেন। এবং এর পর পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই রামবাবুর নেতৃত্বে গঙ্গার ঘাটে যাবার জন্যে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে

পড়ি। রামবাবু বর্ণিত, অরবিন্দের তাঁকে নিবেদিতার কাছে পাঠানো এবং সেখান থেকে ফিরে এনে অরবিন্দের "all right, arrange" বলা ইত্যাদি সবই রামবাবুর স্মৃতি-বিভ্রম-প্রসূত ঘটে—যাবার পথেও অরবিন্দ নিবেদিতার বাসায় যাননি অন্যত্রও তাঁর সঙ্গে অরবিন্দের সাক্ষাৎ ঘটেনি। এবং আমার এ-কথা না লিখবার একমাত্র কারণ হচ্ছে ঐ। দেখা যাচ্ছে এ-ক্ষেত্রে রামবাবু বাগবাজার মঠ ও সারদেশ্বরীর মায়া কাটিয়েছেন কিন্তু নিবেদিতার মায়া কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। ঘাটে যাবার পথে অরবিন্দ বাগবাজার মঠে গেলে আমার যেমন তা বিস্মৃত হওয়া সহজ হ'ত না, নিবেদিতার বাড়ি গেলেও তাই। এই ব্যাপারে রামবাবুর একটি সত্য তথ্যমাত্র ঠিক ঠিক স্মরণ আছে। এটি হচ্ছে যখন তিনি বলেছেন—"এই কথাবার্তার (অরবিন্দ ও নিবেদিতার মধ্যে) সময় আমরা উপস্থিত ছিলাম না।" কিন্তু তার কারণ সম্বন্ধে রামবাবুর ভ্রান্তি ঘটেছে। এর কারণ এ নয় যে আমরা "নীচের রোয়াকে বসিয়াছিলাম।" এর আসল কারণ হচ্ছে, অরবিন্দ ও নিবেদিতার মধ্যে কোনো কথাবার্তা ঐ সময়ে ঘটেই নি। রামবাবু যে এ-সম্পর্কে ভ্রান্ত কথা বলেছেন এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো রকম সংশয়ের কণামাত্রও নেই। স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষায় সেটাও এইখানে লিপিবদ্ধ ক'রে রাখলাম।

জ্যৈষ্ঠ মাসের "প্রবাসী"তে আমি উল্লেখ ক'রেছি, কিভাবে মতিবাবু আমাদের আহার্যের সাথে খিচুড়ি জুড়ে দিয়েছিলেন। আমি নিশ্চিত জানি যে খিচুড়ির ব্যাপারটা সত্য নয়। কিন্তু সম্ভবতঃ মতিবাবুর অবচেতন মনে এই রকমের একটা চিন্তার ক্রিয়া হয়ে থাকতে পারে যে, এঁরা যখন বাঙালী তখন মাঝে মাঝে খিচুড়ি নিশ্চয়ই খেয়েছেন। কিন্তু কোন্ কোন্ তারিখে খেয়েছেন তা আর কে মনে ক'রে রাখে! সুতরাং এইখানে খিচুড়ি লাগিয়ে দি, তবে ব্যাপারটা বেশ রসবানও হবে এবং একটু সত্য সত্য রূপ ব'লেও মালুম হ'তে থাকবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই খিচুড়ি-যোগ মতিবাবুর পক্ষে হ'য়ে উঠেছে ভগবানের মার গোছের ব্যাপার। আসল ঘটনা ভুলে গিয়ে রামবাবুও সম্ভবতঃ এই রকমের একটা যুক্তি মনে মনে খাড়া করেছেন যে, অরবিন্দ চন্দননগরে যাবার পর নিবেদিতা যখন "কর্মযোগিন্" চালিয়েছিলেন তখন চন্দননগর যাবার মুখে অরবিন্দ নিশ্চয়ই নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে সে বন্দোবস্ত করেছিলেন। রামবাবুর পক্ষে এটা যাকে ইংরাজীতে বলে clever guess। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই clever guess অনুসারেই ঘটনা ঘটে যায় না। এবং রামবাবুর দুর্ভাগ্যক্রমে এ-ক্ষেত্রেও ঘটেনি।

সর্বশেষে গঙ্গার ঘাটে পৌঁছে রামবাবুর স্মৃতি (সম্ভবতঃ ঘাটের পিচ্ছিল সিঁড়িতে) শেষবারের মতো আর একবার স্খলিত হয়েছে। রামবাবু অরবিন্দকে কোন্ ঘাটে নিয়ে গিয়েছিলেন তার নাম আমি জানি নে। রামবাবু "বাগবাজার গঙ্গার ঘাটে"র উল্লেখ করেছেন। কিন্তু লোক মুখে শুনতে পাচ্ছি যে "বাগবাজার ঘাট" বলে কোনো ঘাটের নাম নেই। সে যা হোক্, আমরা যে-ঘাটে পৌঁছেছিলাম সেই ঘাট থেকেই নৌকা সংগৃহীত হয়েছিল। আমাকে সঙ্গী ক'রে রামবাবুর অন্যত্র নৌকা খুঁজতে যেতে হয়নি, এবং অন্যঘাট থেকে সেই নৌকাতেও আমাদের পূর্বোক্ত ঘাটে আসতে হয়নি।

অর্থাৎ আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর কয়েক মাস পূর্বে মোটামুটি আধঘণ্টার মধ্যে ঘটে-যাওয়া একটা

ঘটনায় রামবাবু আজ চার চারটে ভুল তথ্য গুঁজে দিয়েছেন। এবং রামবাবুর সত্যি সত্যিই বিশ্বাস যে তাঁর স্মৃতি-শক্তি কিছুমাত্র মলিন হয়নি। এই সরল বিশ্বাসের বশেই তিনি লিখতে পেরেছেন এমন কথা—"সুরেশ লক্ষ্য করিলে দেখিবে যে এত দীর্ঘ বৎসর পরেও আমার সকল কথা বেশ মনে আছে, আমার স্মৃতিবিভ্রম এতটুকুও হয় নাই।" কী ট্র্যাজিক!

ঠিক যেন লেখাপড়ায় কাঁচা ছেলেটা পরীক্ষা দিয়ে এসে আপনার জ্ঞান-মতো মনে করতে থাকে যে, সে প্রশ্নপত্রগুলির ঠিক ঠিকই উত্তর লিখে এসেছে। কিন্তু পরীক্ষার ফল যখন বেরোয় তখন দেখা যায় যে, সে এক এক বিষয়ে নম্বর পেয়েছে হয় পাঁচ নয় সাত। তখন সে হয় যেমন দুঃখিত তেমনি বিস্মিত! রামবাবুর অবস্থাও যেন ঠিক এই রকম।

তবে রামবাবু নানা তালের মানুষ, জীবনে নানা ধান্ধা তাঁর। আজ বয়েসও বোধ হয় তাঁর ষাট বছর পেরিয়ে গিয়ে থাকবে। সুতরাং এখন তাঁর স্মৃতিশক্তি তেমন উজ্জ্বল না থাকা অনেকটা স্বাভাবিক, এবং মার্জনীয়ও বটে।

কিন্তু গৌরীমা অরবিন্দের চিবুক ধ'রে কবিতা আউড়িয়ে রসলোক সৃষ্টি করেছিলেন—এমন গল্প যাঁরা রচনা করতে পারেন তাঁদের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। "প্রবর্তক" সংঘের মতিবাবু যেমন তাঁর নিজের মন প্রাণ জ্ঞানের সংকীর্ণ ও দৃঢ়ীভূত গণ্ডির মধ্যে থেকে "জীবন সঙ্গিনী" গ্রন্থে অরবিন্দের এক ছবি এঁকেছিলেন, কিন্তু আসলে যা অরবিন্দের প্রতিকৃতি হ'য়ে ওঠেনি, হয়ে উঠেছিল মতিবাবুরই এক প্রতিলিপি, তেমনি "উদ্বোধন" সম্পর্কিত লোকেরা আপনাদের সৃষ্ট এক জগতে থেকে আপনাদেরই অভ্যস্ত ভাব ভাষা ও ভঙ্গিতে গল্প রচনা ক'রে অরবিন্দকে টেনে এনে তার মধ্যে বসিয়ে দিয়েছেন। অরবিন্দ মানুষটির স্বকীয় স্বভাব ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতা তাঁদের অভ্যস্ত সেই গ্রাম্য ভাব ভাষা ভঙ্গির মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সুস্থভাবে সত্যভাবে খাপখেয়ে বসতে পারে কি না—এ-চিন্তাটা মাত্র তাঁদের মস্তিষ্কে কোনো কম্পন জাগায়নি। এঁরা আপনাদের গণ্ডিঘেরা জগতে বাস ক'রে নিজেদের বুঝবার ক্ষমতাটাকে এমন একটা অবস্থায় নিয়ে এসেছেন যে বাইরের বৃহত্তর বিশ্বের কোনো সত্যজ্ঞান বা যথাযথ মূল্যবোধের ধারণা করা এঁদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। শরীরে এঁরা স্বাস্থ্যবান কি না জানি নে, কিন্তু মন বুদ্ধি এঁদের ক্যানসারের বীজাণু-আক্রান্ত। যত শীঘ্র এঁরা মনোজগতে Solarium বা সূর্যচিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করেন ততই সমাজদেহের মঙ্গল। এঁরাই হচ্ছেন সর্বদেশের সর্বকালের ফিলিস্‌টাইনের জাত।

রামবাবুর কতকটা উচ্চকণ্ঠে বলেছেন যে অরবিন্দ শ্রীশ্রীসারদেশ্বরীকে প্রণাম করলে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরীর গৌরব কিছু বাড়বে না। রামবাবু কি সত্য সত্যই মনে করেন, বাড়বে না? তবে এই যে আমাদের মধ্যে একটা কথা আছে, ছাত্রের কৃতিত্বে শিক্ষকের গৌরব, পুত্রের নাম যশে পিতার গৌরব, শিষ্যের জয়লাভে গুরুর গৌরব, রামবাবুর মতে, এ-সব কথার কোনো অর্থ নেই?

প্রতিযোগ

শ্রীপরিমল গোস্বামী

পৃথিবী একদিন অগ্নিপিণ্ডবৎ ছিল, তারপর ধীরে ধীরে আগুন নিবে এল, ধোঁয়াটে জিনিস জমাট বাঁধল, জল এবং স্থল দেখা দিল, তারপর একক সেলদেহী প্রথম প্রাণীর আবির্ভাব ঘটল, তারপর সেই প্রাণী অভিব্যক্তির ধারাপথে মানুষরূপে দেখা দিল, তারপর সে মানুষ ভাষা শিখল, দেশবিদেশের পরিচয় সংগ্রহ করল এবং পৃথিবীর ভূভাগের একটি ক্ষুদ্রতম অংশের নাম দিল পাবনা জেলা। সেই পাবনা জেলার একটি ছোট্ট গ্রামে পদ্মানদীর ধারে হরেন দাস তার সঙ্গীদের নিয়ে বসে আলাপ করছে।

সে বলছে "দূর দূর, গাঁয়ে আবার মানুষ থাকে? না আছে রেলগাড়ি, না আছে থিয়েটার বায়োস্কোপ, না আছে সাহেবমেম, যত সব মুখখু চাষার আড্ডা।—আর, কাজের মধ্যে কি? না, মাঠে লাঙ্গল নিয়ে তাতা কর, না হয় জাল নিয়ে গাঙে মাছ ধর, না হয় কুড়ুল দিয়ে গাছ কাট। এমন গ্রামের মুখে লাথি মারি।"

উপস্থিত শ্রোতাদের কাছে গ্রামের হীনতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারা বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকে হরেনের দিকে। হরেন চেয়ে থাকে পদ্মার স্রোতের দিকে। সেই স্রোত বেয়ে হরেনের মন গ্রাম ছেড়ে কোন্ সুদূরে চলে যায়। তারপর হঠাৎ বলতে থাকে, "আমি তো বাবা, এ গাঁয়ে বেশি দিন থাকতে পারব না, সে তোরা যাই বলিস। ঘেন্না ধ'রে যায় না রোজ রোজ একপাল রোগা মুখখু চাষার মুখ দেখে দেখে? দম বন্ধ হয়ে আসে না এই জেলখানায়? পেটে চর পড়ে যায় না মুড়িচিঁড়ে খেয়ে খেয়ে?"

কথাগুলো হরেন এমন চালের সঙ্গে উচ্চারণ করে যাতে এই প্রশস্ত উদার নদীর কলগান মুখরিত, সহস্র সুখস্মৃতিবিজড়িত ছোট্ট গ্রামখানি সঙ্গীদের চোখে অতি কুৎসিত কালিমালিপ্ত হয়ে দেখা দেয়। তাদের মনে হয় এই বিপুল স্নেহবর্ষী গ্রামখানির মধ্যে কোথায় যেন একটি মস্ত ফাঁকি আছে, কিন্তু কোথায় তা তারা বুঝতে পারে না।

হরেন খুব গম্ভীর ভাবে বলে, "দেখে নিস তোরা, হরেন দাস কবে সট্‌কেছে গাঁ থেকে।"

হরেন ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়ে। গ্রামেই এক ভাঙা স্কুল আছে। কিন্তু স্কুলকে সে বড় গ্রাহ্য করে না। সে সাধারণ চাষী গৃহস্থের ছেলে হ'য়েও ঔদ্ধত্যে এবং অহঙ্কারে গ্রামের সবার মনে ঘৃণা জাগিয়ে তুলেছে। ওর জামাকাপড় পরার ভঙ্গিতে, ওর চালচলনে, ওর কথার উচ্চারণে যতদূর সম্ভব গ্রাম্যতা বর্জনের চেষ্টা আছে। শিক্ষকেরা বিরক্ত হয়ে বলেন, ছোকরা মহা ওস্তাদ। গ্রামের লোকেরা বলে, ও একটি কুলাঙ্গার। কিন্তু সে অন্য কারণে।

হরেনের বাবা বিশ্বম্ভর দাসের অবস্থা গ্রামের অনেকের চেয়েই ভাল। গৃহস্থ হ'লেও সুখী পরিবার। সবার মনে ঈর্ষা জাগানোর পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু এ ছাড়াও কারণ আছে। বাবা ছেলেকে আস্কারা দেয়, প্রশ্রয় দেয়, এমন দুর্নীতির দৃষ্টান্তে গ্রামের ছেলেদের মাথা খাওয়ার চেষ্টা করাতেও ছেলেকে কিছুই বলে না। ছেলে জেলা-শহরে গিয়ে মাঝে মাঝে চুল ছাঁটিয়ে আসে, আর কি বাহার তার! এক কান থেকে আর এক কান পর্যন্ত পিছনে ক্ষুর দিয়ে চাঁছা! এই দুষ্কার্যের পয়সা দেয় তার বাবা—অথচ দরকার মতো দায়ে-ঘায়ে ঠেকলে দুটো টাকা হাওলাত পাওয়া যায় না।

বিশ্বম্ভর দাস অবশ্য মাঝে মাঝে বিরক্তির ভান ক'রে বলে, "তোর চোদ্দ পুরুষে যা করেনি, তা করতে তোর লজ্জা হয় না? হরেন জবাব দেয়, "আমার চোদ্দ পুরুষে কেউ ম্যাট্রিকুলেশন পড়েছে?" এর পর আর বিশ্বম্ভরের বলবার কিছু থাকে না।

গ্রাম যে তার জন্যে নয়—এ ধারণা হরেনের মাথায় কোত্থেকে ঢুকল তা কেউ জানে না। কিন্তু সে এই আশাতেই অন্তরে বাহিরে প্রস্তুত হচ্ছে অনেক দিন ধ'রে। এর জন্যেই সে গ্রাম্য ভাষার সঙ্গে কলকাতার উচ্চারণ মিশিয়ে কথা বলে। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে ইংরেজী শব্দেরও মিশেল আছে। সে জানে কথার সঙ্গে ইংরেজী না মেশালে ভদ্রলোকের ভাষাই হয় না।

গ্রামের হিতৈষী লোকেরা বিশ্বম্ভরকে বলে, "হরেনকে গাঁয়ে আটকে রাখতে পারবে না দাসের পো। সময় থাকতে বিয়েটি দিয়ে ফেল, নইলে অনুতাপে কাটবে সারাটা জীবন।"

কিন্তু হরেন বিয়ের প্রস্তাবে ক্ষেপে যায়। মাকে বলে, "গাঁয়ের মুখ্খু মেয়ের জন্যে নগেন আছে।"

নগেন ওদের শরীকের ঘরের ছেলে। দুই শরীকে বিবাদ, যেমন হয়ে থাকে। বিশ্বম্ভর নকুলেশ্বর দুই ভাই, কিন্তু এখন ওদের সবই আলাদা। বিশ্বম্ভর চতুর, নকুলেশ্বর সাদাসিদে। সুতরাং একই জমিজমার উত্তরাধিকারী হওয়া সত্বেও নকুলেশ্বরের অবস্থা খারাপ। নকুলেশ্বর ছোট থাকাতেই বিশ্বম্ভর বাকী খাজনায় সম্পত্তির অনেকখানি অংশ নিলামে চড়িয়ে বেনামীতে আত্মসাৎ করেছে। তাই ওদের দেমাক একটু বেশি। ছেলেদের মধ্যেও এই বিষ ছড়িয়েছে। হরেন নগেনকে ছোট নজরে দেখে। ওকে তাচ্ছিল্য করে। সে জন্যে নগেন দাস ওর মুণ্ডপাত করে, কিন্তু বাইরে কিছু করতে পারে না। পড়াশোনার দিক দিয়েও ও হরেনকে নীচে ফেলতে পারে না, সেইজন্যে মনে মনে জ্বলতে থাকে, হিংসা জেগে ওঠে ওর মনে, কিন্তু সে অসহায়ের হিংসা। সুতরাং সে যতই চেষ্টা করে হরেনকে ছাড়িয়ে উঠতে ততই সে আরও যেন নীচে পড়ে যায়। হরেন দেখতে দেখতে ইংরেজীতে অনেক উন্নতি করে ফেলল, নগেনের সেই কারণেই ইংরেজী ভাষার উপর ঘৃণা জন্মাল। হরেন প্রাণপণে শহুরে হয়ে উঠল, নগেন আরও বেশি ক'রে গ্রাম্য ভাব ফুটিয়ে তুলল তার চালচলনে।

ইতিমধ্যে সামান্য একটি ঘটনায় হরেন গ্রামের মধ্যে রীতিমতো একটি উত্তেজনার সৃষ্টি ক'রে বসল। ঘটনাটি এমনই অপ্রত্যাশিত এবং অতর্কিত যে মুহূর্তকালের জন্যে হরেনের শত্রু মিত্র সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল।

হরেন ষ্টীমারের এক সাহেবের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলে এসেছে! বাপ্‌রে কি কাণ্ড! স্বয়ং হেডমাষ্টার পর্যন্ত ভয় পায় সাহেবের সামনে যেতে! পথ চলতে সবাই সবিস্ময়ে হরেনের দিকে চেয়ে থাকে! সাহেব আর হরেন মুখোমুখি, সেই অকল্পিত দৃশ্যটি কল্পনায় ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে।

অন্য ছেলেদের আর মাথা উঁচু ক'রে চলবার উপায় রইল না। সবাই বলে, বিশ্বম্ভর দাসের ছাওয়াল ছাওয়াল নয়, হীরের টুকরো। আর তোরা হতভাগারা সব অকালকুষ্মাণ্ড।

চক্রবর্তীর সঙ্গে দত্তের দেখা।

"ওহে শুনেছ?"

"আজ্ঞে দাঠাকুর, কে না শুনেছে?"

একদল ছেলে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, চক্রবর্তী তাদের ডেকে বলল, "মুখে একেবারে কালি মাখিয়ে দিয়েছে না? একই গাঁয়ের ছেলে, ছোটলোকের ছেলে, আর তার কাছে কি না তোদের মাথা হেঁট হ'ল?"

ছেলের দল কোনো রকমে মাথা নীচু ক'রে সরে পড়ল।

চক্রবর্তী দত্তের চোখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল, তারপর চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে চাপা স্বরে বলল, "হারামজাদা ছেলে খিরিষ্টান হবে, গাঁ ডোবাবে বলে দিচ্ছি।"

দত্ত সোৎসাহে বলল, "তাতে আর সন্দ আছে?"

হরেনের বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ ষ্টীমারের মারফৎ বেড়েই চলল। কেউ তা রোধ করতে পারল না। এবং একদিন সবাই স্তম্ভিত হয়ে শুনল হরেন ষ্টীমারে উঠে কোথায় চলে গেছে।

চক্রবর্তী বলল, "শালা ছেলে গেছে না বাঁচা গেছে।"

দত্ত বলল, "আগেই বলেছি দাঠাকুর, অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে ভেঙে যাবে।"

সরকার বলল, "এখনও বিশ্বাস নেই বাবা, ফিরে এসে আরও কি কেলেঙ্কারি ক'রে বসে, দুদিন সবুর ক'রে দেখ।"

চক্রবর্তী প্রস্তাব করল বিশ্বম্ভরকে কিছু সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। বিশ্বম্ভর গুম হয়ে হুঁকা টানছিল। তার স্ত্রী একটু দূরে বসে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে। চক্রবর্তী তাকে শুনিয়ে বিশ্বম্ভরকে বলতে লাগল, "ভাবনার কি আছে এতে? ও ছেলে তোমার ঠিক ফিরে আসবে।"

দত্ত বলল, "তবে ছেলে সাহেব হবে—"

সরকার বলল, "তাতে আর হয়েছে কি? হাতে না খেলেই হ'ল।"

চক্রবর্তী বলল, "তাই বা খাওয়া যাবে না কেন? প্রাচিত্তির ক'রে নিলেই হবে।"

ঘটনাটি বিশ্বম্ভর পরিবারের পক্ষে যতই মর্মান্তিক হোক, গ্রামের সবাই বেশ একটা উত্তেজনাপূর্ণ আরাম অনুভব করতে লাগল। নগেনের পক্ষেও ঘটনাটি এক রকম ভালই হ'ল। হরেনকে সে শত্রু মনে করত, সে শত্রু স'রে গেল। তদুপরি গ্রামের সবাই এখন তার দিকে মনোযোগ দিল। তারা ওকে বোঝাতে লাগল হরেনের মতো ছেলে গ্রামে ছিল বলেই নগেনের উন্নতি হয়নি। বলা বাহুল্য নগেনও তাই মনে করে।

হরেনের পদমর্যাদা পাবার জন্যে নগেনও ভাষার সঙ্গে ইংরেজী মেশাল; লোকে বলল, এই তো উন্নতি হচ্ছে। নগেন ঘাড় কামিয়ে ফেলল; লোকে বলল, হরেনের চেয়ে নগেন কিসে কম? নগেন উগ্র রঙচঙা জামা পরল; লোকে বলল, চমৎকার। কেবল এই অস্বাভাবিক বর্ণবাহুল্যে গ্রামের শুকনো কুকুরগুলো ভয় পেয়ে নগেনের পিছনে পিছনে তাড়া ক'রে ফিরতে লাগল।

কিছুকাল বেশ ভালই কাটল। নগেনের ভাগ্যতরীখানা বেশ উজিয়ে আসছিল, এমন সময় এক দমকা বাতাসে তার পাল ছিঁড়ে তরী মাঝপথে ঘুরপাক খেতে লাগল, সম্পূর্ণ যে ডুবে গেল না সে কেবল নগেনকে নিয়ে আরও একটু খেলাবে বলে।

মাস তিনেক পরে বিশ্বম্ভরের নামে চিঠি এল—লিখেছে হরেন। এতদিনের নিরুদ্দিষ্ট ছেলের উদ্দেশ পাওয়া গেল সত্যি সত্যি।

এই চিঠি সকলের আগে পড়ল পোষ্টমাষ্টার, তারপরে পোষ্টম্যান, তারপরে ডাকঘরে উপস্থিত সবাই। চিঠি বিশ্বম্ভরের হাতে পৌছনর আগেই তার কাছে খবর পৌছে গেল, হরেন কলকাতা আছে, এবং এক সদাগরি আপিসে চাকরি করছে। আরও লিখেছে আপিসের সাহেবরা তার কাজে খুব খুশি সুতরাং ভবিষ্যতে খুব উন্নতির আশা আছে।

একটা বোমা এসে যেন ফেটে পড়ল।

"দাসের বেটা যে তাক লাগিয়ে দিলে হে?"

"তখনই সন্দেহ হয়েছে মনে মনে, ও ছেলে একটা কিছু করবেই।"

চক্রবর্তী দ্রুত পায়ে বিশ্বম্ভরের বাড়িতে গিয়ে বলল, "যা ভেবেছি ঠিক তাই হ'ল কি না?"

দত্ত গিয়ে ফলাও ক'রে বলতে লাগল, "আমি কিন্তু অবাক হইনি দাস মশায়। বুঝলেন না? এ যে হতেই হবে। সূর্য পূব দিকে ওঠে এতে কি কেউ অবাক হয়? তুমিই বল না?"

একবার চক্রবর্তী বলে, একবার দত্ত বলে। কেউ সহজে উঠতে চায় না। চক্রবর্তী মনে মনে অধীর হয়ে বলল, "দত্ত, চল এবারে উঠি।"

দত্ত বলল, "আপনি এগোন, আমি একটু পরেই যাচ্ছি।"

চক্রবর্তী উঠে যাবার পর ক'দিন আগের প্রস্তাবিত হাওলাতটা আজ চেয়ে বসল। গোটা দশেক টাকা আজ তাকে দিতেই হবে।

বিশ্বম্ভর খুশি ভাবেই টাকাটা তাকে দিয়ে দিল। পূর্বেকার অনাদায়ী পাঁচটা টাকার কথা আর তার তুলতে ইচ্ছে হ'ল না।

নিখিল সাধনার কলালক্ষ্মীর
কমলাসন পাতা
এই সাত নম্বর বাড়ীতেই-

আজ যন্ত্র যুগের লুব্ধ বৃত্তি
সেই রসলোক হইতে
চাহিতেছে তাঁহার নির্ব্বাসন—

সুন্দর ও অসুন্দরের
বিচিত্র এই দ্বন্দ্বে রূপায়িত

এম,পি, প্রোডাকসন্সের নবনির্ম্মিত—

ভূমিকায়ঃ
মলিনা * সন্ধ্যা * সাবিত্রী
ছবি * জহর * মিহির

একযোগে
প্রদর্শিত হইতেছে-

উত্তর

পূর্ণ

পরিচালনায় :—সুকুমার দাশগুপ্ত
সঙ্গীতে :—রবীন চট্টোপাধ্যায়
রচনায় :—প্রণব রায়

পরিবেশক—
ডিলুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটর্স

সুর-সজ্জায় অনন্যতর !

দত্ত চলে যেতে না যেতে চক্রবর্তী এসে তারও কিছু নিবেদন পেশ ক'রে রাখল।

হরেনই যে ভবিষ্যতে গ্রামের একমাত্র ভরসা এ বিষয়ে কারো আর সন্দেহ নেই, তাই তারা অতি নিষ্ঠার সঙ্গে হরেনকে উপলক্ষ ক'রে তাদের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন গড়ে তুলতে লাগল। এবং অবসর পেলেই নগেনের বাড়ি গিয়ে নকুলেশ্বরকে বলতে লাগল, "ছেলেকে আর গাধার মতো পড়িয়ে লাভ কি? ও সব ছাড়িয়ে চাষের কাজে লাগিয়ে দাও।"

বলা বাহুল্য বিশ্বম্ভরের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশের এ এক নিষ্ঠুর গ্রাম্যপন্থা ছাড়া আর কিছুই নয়।

নগেন অত্যন্ত আহত হয়, তার পড়া এগোয় না, মনে হয় গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু কোথায় সে যাবে? বাইরে যাবার পথ তার বন্ধ, বাইরের সহানুভূতি সে পায় না, এমন অবস্থায় বাধ্য হয়েই সে ঘরের দরজা বন্ধ করে পড়াশোনার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিল, এবং খারাপ ছাত্র হওয়া সত্বেও যথাসময়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করল। এ ঘটনাও দাস-পরিবারের পক্ষে স্মরণীয়, কিন্তু তবু কোনো উৎসাহ সে পেল না একমাত্র বাপমায়ের কাছ ছাড়া। নকুলেশ্বর ওকে বুঝিয়ে বলল, "ভাগ্য যখন এই দিকেই ফিরেছে তখন চালিয়ে যা যতদূর পারিস।"

নগেনও বুঝে দেখল, এ ছাড়া বড় হবার আর পথ নেই। কালক্রমে আইন পাস করতে পারলে গ্রামের মধ্যে কিছু খাতির পাওয়া যাবে—তার আগে কিছু হবে বলে বিশ্বাস হয় না। যুদ্ধের বাজারে কষ্ট করেও সে আই-এ পড়তে গেল জেলা-শহরে।

সুদীর্ঘ দুটি বছর গেল। বড়ই দুঃখের দুটি বছর। কিন্তু সে সকল দুঃখ ভুলে গেল যখন সে জানতে পারল আই-এ পরীক্ষায় সে পাস করেছে।

এই দুবছরে হরেনও বহুদূর এগিয়ে গেছে। সম্প্রতি তার চিঠি এসেছে, যুদ্ধের কাজে খুব বড় একটা কনট্রাক্টের কাজের ভার সে পেয়েছে। জানাতে ভোলেনি যে এই সৌভাগ্য সহজে কেউ পায় না, কিন্তু সাহেবরা তাকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করে না ব'লে তাকেই এত বড় দায়িত্বের কাজটি দিয়েছে। শুধু চিঠি নয়, হাজারখানেক টাকাও পাঠিয়েছে সে বাবার নামে। এই টাকায় বাড়িখানা নূতন করে ফেল, আরও টাকা যা দরকার জানালেই পাঠাব।

এতবড় খবর এ গ্রামে ইতিপূর্বে আর আসেনি। একহাজার টাকার ইনশিওর করা চিঠিও এ গ্রামের ডাকঘরে অভূতপূর্ব। ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ল এই ঘটনায়। এই উত্তেজনার ঘূর্ণিপাকে নগেনের আই-এ পাশের কৃতিত্ব কোথায় তলিয়ে গেল! এই উপলক্ষে নকুলেশ্বর সামান্য কিছু উৎসবের আয়োজন ক'রে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করেছিল, কিন্তু তারা খাওয়া উপলক্ষ ক'রে সর্বক্ষণ হরেনের গুণগানেই কাটিয়ে দিল। হরেন কন্ট্রাক্টের কাজ শেষ করলে কিভাবে গ্রামের চেহারা ফিরিয়ে দেবে, এবং কি কি করলে গ্রাম শহর হ'য়ে উঠবে তারও পরিকল্পনা তারা মুখে মুখে তৈরি করে ফেলল নকুলেশ্বরের বাড়িতে খেতে খেতে। বলা বাহুল্য নগেন সম্পর্কে তারা একটি কথাও বলল না।

২০

দাস-পরিবারে কেউ আই-এ পাস করেনি এটা মস্তবড় ঘটনা, কিন্তু দাসবংশে কেউ সাহেবের কৃপালাভ করেনি সেই ঘটনাই আজ সবচেয়ে বড় হয়ে উঠল। ব্যর্থ হ'ল নগেনের আই-এ পাস করা।

এই আঘাত প্রচণ্ড বেগে নগেনের মনে এক ধাক্কা মারল। সে হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল। শপথ করল মনে মনে ঐ অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে।······

দিনের পর দিন চলে যায়। যুদ্ধ থেমে গেছে, লোকে সাময়িকভাবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে, কিন্তু নগেনের মন ক্রমশ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছে। ভাগ্যদেবতা তাকে কোন্ পথে টানছে তা সে জানে না, কিন্তু এক অদৃশ্য প্রবল টান সে অনুভব করছে দিনের পর দিন।

ইতিমধ্যে হরেনের অলৌকিক সব কীর্তি কথা গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। হরেন নাকি লাখ-লাখ টাকা জমিয়ে ফেলেছে, মোটর গাড়ি কিনেছে, বাড়িও নাকি কিনেছে কলকাতা শহরে।

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। যুদ্ধের বাজারে টাকা লুটে নেবার যে সুযোগ পাওয়া গেছে তা এবারে কোনো চতুর লোকেরই হাত ছাড়া হয়নি। কত ফ'ড়ে এই সুযোগে বাড়ি-গাড়ির মালিক হয়েছে তার সীমাসংখ্যা নেই। ধূর্ত হরেনের পক্ষে লাখ-লাখ টাকা করা কিছুমাত্র অসম্ভব ঘটনা নয়।

বিশ্বম্ভরের কোঠাবাড়ি তৈরি হয়ে গেছে। তাকে কিছুই ভাবতে হয়নি; চক্রবর্তী, দত্ত, সরকার—সবাই মিলে বাড়ি তৈরির সমস্ত ঝঞ্ঝাট স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঘাড়ে নিয়ে বিশ্বম্ভরকে উদ্ধার ক'রে দিয়েছে। রাজপুত্রের বাবা হয়ে নিজে এসব তদারক করা শোভা পায় না, এ কথা ওরা বিশ্বম্ভরকে ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছে, এবং এই নিঃস্বার্থ পাঁচহাজার টাকার কাজে তিন মুরুব্বি মাত্র হাজারখানেক টাকা 'গায়েব' করতে পেরেছে, তার বেশি কিছু তারা লোভও করেনি, নেয়ওনি।

নগেনের বাড়িতেও কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। তার বাবা আর বেঁচে নাই। হঠাৎ কলেরার আক্রমণ হয়েছিল। নগেনকে দুএকজন সান্ত্বনা দিতে এসেছিল। চক্রবর্তী দুঃখ ক'রে বলেছিল, "হরেন যখন গাঁয়ের উন্নতির ভার নেবে তখন গাঁয়ে আর কলেরা হবে না। আহা, নকুলেশ্বর সে কটা দিন যদি বেঁচে যেত!"

বাড়ি তৈরির খবর পেয়ে হরেন আরও টাকা পাঠিয়ে আদেশ করেছে, ষ্টীমার ঘাট থেকে বাড়ি পর্যন্ত রাস্তাটা ভাল ক'রে তৈরি করিয়ে রাখতে, মাসখানেক পরেই সে একদিন দেশে যাবে।

রাজপুত্র দেশে আসবে, এ খবর গ্রামের মধ্যে একটা শিহরণ জাগিয়ে তুলল। চক্রবর্তী সবেগে এগিয়ে এল রাস্তা তৈরির জন্য। হাজার টাকার বরাদ্দ। চক্রবর্তী তার প্রাপ্য অর্ধেক অংশটা উজ্জ্বল ক'রে দেখতে লাগল কল্পনার চোখে। কিন্তু হ'ল না। দত্ত এবং সরকারকে বাদ দেওয়া গেল না, কাজেই রাস্তা যতটা ভাল হ'তে পারত, ততটা ভাল হ'ল না। যেটুকু হ'ল সেও ওদের পিতৃপুরুষের পরম সৌভাগ্যবশত ক'দিনের বৃষ্টিতে ধুয়ে পদ্মায় মিশে গেল।

হায় হায় করতে লাগল সবাই। চক্রবর্তী দত্ত দু-দফায় দুঃখ পেল। প্রথমত, রাস্তা ভেঙে গেল; দ্বিতীয়ত, গেলই যদি তা হ'লে সেই রাস্তার জন্যে সাড়ে তিন শ টাকা খরচ করল কেন? শ'খানেক টাকার উপর দিয়েই যেত। এদিকে হাতেও থাকত তিনভাগে তিনশ টাকা ক'রে।

গতস্য শোচনা নাস্তি—চক্রবর্তী পরবর্তী চালের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল। সে সংস্কৃত বই খুলে ভাল ভাল আশীর্বচন মুখস্থ করতে লাগল প্রাণপণে, হরেন এলেই সেগুলো তার মাথায় বর্ষণ করবে, এবং তারই জোরে নিজের একপাল অপদার্থ ছেলেকে মানুষ করবার জন্যে তার হাতে সমর্পণ করবে।

দত্তও বসে নেই। সে তোরণ তৈরির কাজে লাগল। সরকার শোভাযাত্রার বন্দোবস্ত করল। হরেনের মতো সুসন্তান যে স্কুলে মানুষ হয়েছে সে স্কুলও চুপ করে রইল না, তারাও হরেনকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা করবে বলে প্রস্তুত হল। পাবনা শহরে গিয়ে স্কুলের অভাব অভিযোগের তালিকা সহ রিপোর্ট এবং অভিনন্দনপত্র ছেপে আনল। আশা ক'রে রইল হাজার পাঁচেক টাকা আদায় করা যাবেই। স্কুলের নাম হরেন্দ্র হাই স্কুল দেওয়া হবে এই রকম একটা প্রস্তাব করবেন হেডমাষ্টার, কিন্তু সে কথা আর কাউকে জানালেন না।

কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল। কে জানত হরেন এক মোটর গাড়ি সঙ্গে নিয়ে আসবে? সে আগে পাবনা এসেছিল একটা জরুরি কাজে, অনেক ঘোরাঘুরি করতে হবে সেজন্যে ছোট একখানা গাড়ি সঙ্গেই রেখেছিল। তা ছাড়া গ্রামে এসে মোটরে ক'রেই বাড়িতে পৌছবে এ কল্পনাও ছিল। কিন্তু ষ্টীমার থেকে নেমে পথের অবস্থা দেখে সে তো আগুন। এত টাকা খরচ ক'রে এই পথ। থীফ্—সবাই থীফ্! চক্রবর্তী কাঁপতে লাগল, তার আশীর্বচন সব ভুল হয়ে গেল। সরকার এবং দত্ত কোনো রকমে বাকী অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত পাল্কী এনে হরেনকে বাড়িতে তুলল। হরেন হেঁটেই যাবে ব'লে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু তার পথরোধ ক'রে তাকে এত বড় হীন কাজ থেকে সবাই বাঁচিয়ে দিল।

হরেন রাজা হয়ে ফিরেছে এই খবরটাই গ্রামের পক্ষে যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তার মোটর গাড়ির খবরটা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকের গ্রামে। যুদ্ধের কৃপায় গাঁয়ের লোকেরা এয়ারোপ্লেন দেখেছে, কিন্তু মোটরকার আজ পর্যন্ত দেখেনি। হরেন গিয়ে বাড়িতে উঠল, কিন্তু হাজার হাজার নরনারী পদ্মানদীর ধারে এসে জমল মোটরগাড়ি কেমন দেখতে।

হরেন বাড়ি থেকে কোথাও বেরোল না। প্রথম থেকেই তার মেজাজ বিগড়ে গেছে। তারপর বাড়ির চেহারা দেখেই বুঝতে পারল বাড়ির কন্ট্রাক্টে কত টাকা চুরি হয়েছে। সে নিজেও কন্ট্রাক্টের কাজ করে, 'মাসতুতো ভাই'দের পরিচয় তার কাছে আর অজানা থাকবার কথা নয়। হরেন গুম্ হয়ে রইল। তার কাছে কেহ যেতে সাহস করল না, সবাই তার গাড়ি দেখতে ঝুঁকে পড়ল। আশেপাশের

সমস্ত গ্রামে একটা বিপ্লব বেধে গেল। দৈনন্দিন বাজার ঠিকমত বসল না, কারো বাড়িতেই যথাসময়ে উনুন জ্বলল না।

কিন্তু এই মহা উত্তেজনা আর হৈচৈ-এর ভিতর নগেনের স্থান কোথায়? হরেন তার কথা একবার জিজ্ঞাসাও করল না। এটা অবশ্য সে আশা করেনি—কিন্তু আজ তার মনটা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। যে দুএকজন বন্ধু লোক ছিল তারাও আজ সমস্ত দিন তার কাছে এল না, তারাও মোটর গাড়ির উত্তেজনায় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছে! এই দুঃখটা তার বড্ড বেশি বেজে উঠল মনে। মনে যেন বেদনার ঝড় বয়ে চলেছে। তার বাবার কথা মনে এল। তার নিচু মাথা নিচু হয়েই ছিল চিরদিন—তার মায়ের মূক বেদনারই বা কোন্ সান্ত্বনা দিতে পারল সে?

কোনো দিকেই তার কোনো জোর ছিল না, কিন্তু জেদ ছিল। এই জেদের বশেই সে আই-এ পাস ক'রে বি-এ পড়তে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু আজ তার মনে হ'ল তার জীবনের গতি চিরদিনের জন্যে শুদ্ধ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় সে পড়ে থাকবে না কোন মতেই। চারদিকের নির্মম ঘা খেয়ে খেয়ে তার কঠিন জেদ কঠিনতর হয়ে উঠতে লাগল।

মোটর গাড়ির জন্যে তার এই অপমান?...

আচ্ছা...তাই হোক...

নগেন অস্পষ্ট স্বরে আপন মনেই এক অভাবনীয় শপথ ক'রে বসল। গ্রাম্য আবহাওয়ায় ছোটলোকদের মধ্যে বর্ধিত নগেন এই সব তুচ্ছ মান অভিমানের উপর দিয়ে আজ আর উঠতে পারল না।

বিছানা থেকেও মাসখানেকের মধ্যে প্রায় আর উঠল না। মাসখানেক পরে তাকে দেখা গেল পাশের গ্রামের এক জোতদারের বাড়িতে যেতে।

ক'দিন ধ'রে পর পর সেখানে গেল। কিন্তু তার ফল যা হল তা আত্মহত্যারই নামান্তর।

গাঁয়ের লোকেরা যদিও হরেনের কাছ থেকে বিশেষ কিছু আর আশা করছে না, এবং তাকে ঘুঘু ছেলে ব'লে অভিহিত করেছে, তবু তারা আজও নগেনের প্রতি প্রসন্ন হ'তে পারল না। তারা তবু বলতে লাগল, "নগেনের মতো হিংসুটে তারা আর দেখেনি—এই হিংসেয় তার মাথা খারাপ হয়েছে।"

কিন্তু কথাটা তারা মিথ্যা বলেনি। নইলে এমন সম্পত্তি কেউ এত সস্তায় বিক্রি করে? এমন মাটি কেউ মাটির দরে বিক্রি করে? একশ বিঘে খামার জমি মাত্র সাড়ে তিন হাজার টাকায়? কেন, হরেনের কাছে চাইলে এই টাকাটা সে অমনি দিতে পারত না? হাজার হলেও ভাই তো?

নগেন বিষাক্ত হাসি হাসল এ সব শুনে।

চক্রবর্তী একদিন এসে বড়ই দরদের সঙ্গে বলল, "নির্বংশে হতচ্ছাড়া, আমাকে একবার জানালি নে?"

নগেন চক্রবর্তীর দিকে অগ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

চক্রবর্তীকে না জানানো তার নিতান্তই অপরাধ—জানালে সে নিজে কিনতে পারত। হাতে তার কিছু কাঁচা টাকা এসেছে সম্প্রতি।

কিন্তু নগেন একমুহূর্তে সকল বন্ধন ছিন্ন ক'রে জীবনে আজ এই প্রথম নির্ভীক ভাবে মাথা তুলে দাঁড়াল মুক্ত আকাশের দিকে। আজ কারো জন্যে তার কোন ভয় নেই, লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই; এতদিন সে পড়ে পড়ে বিনা প্রতিবাদে অসহায়ের মতো মার খেয়েছে, কিন্তু আজ সে মারবার জন্যে প্রস্তুত। তার মনের বন্ধন যে মুহূর্তে খুলে গেছে, সেই মুহূর্তে সে সম্পূর্ণ নতুন এক শক্তি অনুভব করেছে নিজের মধ্যে। এই শক্তি অদম্য, দুর্বার। এ তাকে কোন্ পথে টানবে তা সে জানে না। এরই অতি প্রবল আকর্ষণে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল অজানা অন্ধকার জগতে।

কলকাতা শহর। নগেন ছুটে চলেছে মোটরে। আজ সে গাড়ির মালিক! মোটর গাড়ি হলে কৌলিন্য হয়...না? তার মনে পৈশাচিক আনন্দ। এই গাড়ি নিয়ে সে গ্রামে ফিরবে। কিন্তু তার আগে হরেনের কাছে তার কৌলিন্য প্রমাণ করে যাবে। আজ এক মুহূর্তের জন্যেও সে হরেনের সমপদস্থ হবে এই কল্পনা তাকে উন্মাদ ক'রে তুলেছে। হরেন চমকে যাবে তাকে মোটরে দেখে! তাকে খাতির করতে এগিয়ে আসবে। মূর্খ, টাকার মর্যাদা ভিন্ন আর কোন মর্যাদা সে বোঝে না।

নগেনের মন ক্রমশ হিংস্র হয়ে ওঠে।

ড্রাইভারকে বলে, "আরও জোরে চালাও, আরও জোরে।" "কত দূর পথ? পথ যে ফুরোয় না?"

অধৈর্যে সে ছটফট করতে থাকে।

ঠিকানা সে ড্রাইভারকে দিয়ে দিয়েছে। সে ঠিক পথেই নিয়ে চলেছে গাড়ি।

বহু ছুটন্ত গাড়ির সংঘর্ষ বাঁচিয়ে বে-আইনী গতিতে ছুটে চলেছে সে। এরই জন্যে সে যে তার সমস্ত ভবিষ্যৎ বাজি রেখেছে!

আর কত দূর?...

গাড়ি চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে, কালীঘাট ছাড়িয়ে, টালিগঞ্জেই এসে পড়ল। গাড়ির বেগ কমল। ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট নম্বরের কাছে এল, আরও ধীরে প্রবেশ করল ফটকের মধ্যে।

ভিতরে প্রশস্ত মাঠ...ভুল হ'ল না তো?...এখানে এয়ারোপ্লেন কেন?—নগেনের ভ্রূকুঞ্চিত হ'ল।

গাড়ি দ্বিধাগ্রস্তভাবে এগিয়ে চলল।

এয়ারোপ্লেনখানা তখুনি রওনা হচ্ছে। কিন্তু এ যে ছুটে আসছে তাদেরই দিকে! মাটি থেকে একটু উঁচু হ'ল, আরও উপরে উঠল। প্রোপেলারের আওয়াজে কান ফেটে যাচ্ছে। মুহূর্তে এয়ারোপ্লেন-

খানা সোঁ— ক'রে তার গাড়ির প্রায় পনেরো হাত উপর দিয়ে কামানের গোলার মতো ছুটে উপরে উঠে গেল।

কোথায় এল সে?

গাড়িসুদ্ধ এগিয়ে গিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, হরেন কোথায়?

সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র জনতার মধ্যে থেকে একজন আকাশের দিকে চেয়েই বলল, "ঐ যে উপরে!"

আর একজন উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল, "দেখ দেখ এরই মধ্যে কত উপরে উঠে গেল, দেখ।

নগেন টলতে টলতে গাড়ি থেকে নেমে আকাশের দিকে চাইল। কিন্তু কোথায় এয়ারোপ্লেন?···সমস্ত আকাশ এত অন্ধকার কেন?···পায়ের নীচে থেকে পৃথিবী সরে যাচ্ছে কেন?···

সৃষ্টির পূর্বে সমস্ত পৃথিবী ধোঁয়াটে ছিল—পৃথিবী কি আবার সেই অবস্থায় ফিরে গেল?···

'কত উপরে উঠে গেল' এই শব্দটি শুধু সহস্র সূঁচের মতো তার মর্মে বিঁধতে লাগল—চারদিকে আর কোন শব্দ নেই, কোন দৃশ্য নেই।

—'ফিরে চল' কথাটি শুধু উচ্চারণ করবার মতো চেতনা তার তখনও অবশিষ্ট ছিল।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের গোড়ার দিকে। তখন প্রত্যেক ছাত্র আর অধ্যাপকের ওপর ভার ছিল, যে যার নিজের ঘর, বারাণ্ডা নিজের হাতে পরিষ্কার করে রাখবে।

মাঝে মাঝে তার ত্রুটী ঘটতো।

একদিন ভোরবেলা একজন ছাত্র ঘুম থেকে উঠে দেখে, তার ঘরের বারাণ্ডা ঝাঁটা নিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঝাঁট দিচ্ছেন।

আগের দিন ঝাঁট না দেওয়ার ফলে জায়গাটা অপরিষ্কার হয়েছিল।

বারাণ্ডা ঝাঁট দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকে ঝাঁট দিতে আরম্ভ করলেন। ছাত্রটী লজ্জায় তাঁর হাতের ঝাটা ধরে ক্ষমা চাইলো।

রবীন্দ্রনাথ হেসে বল্লেন, এতে লজ্জিত হবার কি আছে! রোজ তো তোমরা দাও, আজ না হয় আমিই দিলাম!

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

(১)

বিবাহে সমারোহ যেমন করিতে হয় স্যার অনুকূল কিছুরই প্রায় ত্রুটী করেন নাই। তাঁর সুপ্রশস্ত উদ্যানবেষ্টিত সুসমৃদ্ধ অট্টালিকার আদ্যোপান্ত রং বদলানো চুণ ফিরানো হইয়াছিল, এতবড় যুদ্ধের বাজারের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতাকে অগ্রাহ্য করিয়া দরজা জানালা মায় কড়িকাঠশুদ্ধ নূতন রংয়ের চকচকে পালিশে ঝক্‌ঝকে করিয়া তোলা হইয়াছে। আলোকাধারগুলি সুমার্জ্জিত কয়েকটা নূতন তার বসাইয়া তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং শক্তিমান ইলেকট্রিক বাল্‌ব সন্নিবিষ্ট হওয়াতে রাত্রিবেলা বাহিরের নিরালোক অন্ধকারের নিরানন্দকে উপেক্ষা করিয়া মোটা পর্দ্দা ও বন্ধ কপাটের ভিতর আলোকের দীপ্তি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিল। কাশ্মিরী কাজের টেবিলক্লথ ও সেটির আচ্ছাদনগুলার রংয়ের বাহার, ঐ দেশের ও আরও অনেক দেশের রূপার মীনার তারের ও পালিশের কাজগুলি ছায়ালোকে একটা স্বপ্নপুরীর মতই বৈচিত্র্য বিস্তার করিয়াছে। সমস্তই যেন বাহিরের দুঃখ দৈন্য-দুর্দ্দশাগ্রস্ত পৃথিবীর অনেকখানি উপরের ও বহু উর্দ্ধলোকের, এ দুয়ের ভিতর কোনই সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

এই প্রকাণ্ড বাড়ীটার চার তলায় খান দুই ঘর নূতন তৈরি হইয়াছে। দেওয়ালে তেলের রংয়ে খুব ফিকা সবুজের স্বপ্নমায়া জানালা দরওয়াজায় ও ঠিক সেই রংয়েরই মোটা মোটা পর্দ্দা, জানালার পর্দ্দায় সাদা লেশের একটুখানি সূক্ষ্মসমাবেশ, একটি ঘরের ঠিক মধ্যভাগে একখানি ফিকা সবুজে পাথরের গোল টেবিলের ঠিক মাঝখানে একটী সবুজ রংয়ের ঘষা কাঁচের বড় ফুলদানী, সেটীতে প্রত্যহ একটী গুচ্ছ সাদা পদ্ম অথবা শ্বেত চন্দ্রমল্লিকা, না হয়ত শুভ্র রজনীগন্ধা সাজাইয়া দেওয়া হয়। দেওয়ালের সমস্ত ইলেকট্রিক বাতি গুলির উপর সমান রংয়ে রং মিলাইয়া সাদা ও সবুজের সেড দেওয়া।

এছাড়া আর কোন ফার্ণিচার আর কোনখানে রাখা হয় নাই এই জন্য যে, এই দুটী ঘরের নূতন অধিকারিণী রূপে যিনি এ বাটীতে শীঘ্রই প্রবিষ্টা হইবেন, তিনিই তাঁর পিতৃদত্ত যৌতুকের হিসাবে সেই সমস্ত বিষয় বস্তু গুলি তাঁর সমভিব্যবহারে লইয়া আসিবেন। অবশ্য এই ঘরের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই সে সমস্ত তাঁদের বাড়িতে সংগৃহীত হইয়াছে—অ[illegible]া হইতেছে। এ বাড়ীর সঙ্গে সে বাড়ীর রুচির বিশেষ বিভিন্নতা নাই এবং এ বাজারে এত সব মূল্যবান বস্তু জাত সংগ্রহ করার মত অর্থ ও সামর্থ তাঁদের এতটা বেশী না থাকিলেও প্রেষ্টিজের খাতিরে সে সত্যকে স্বীকার করিয়া পিছু হটিবার মত দুষ্প্রবৃত্তিও তাঁদের মধ্যে ছিল না। আর স্যার অনুকূলের পুত্রের সহিত যাহারা কন্যার বিবাহ দিতে চায় ভগবান করুন তেমন ক্ষুদ্রদৃষ্টি তাদের যেন কোনদিনই না ঘটিতে পারে।

এ বাড়ীতে বাড়ীর সমস্ত জিনিষের সঙ্গে মিল খাওয়াইয়াই একজন বাড়ীর গৃহিণী আছেন এবং তিনিই বলিতে গেলে এবাড়ীর সর্ব্বাধিনায়িকা। স্যার অনুকূলের তিনি শুধুই গৃহিণী নহেন, গৃহিণী সচীব সখী ইত্যাদি যাহাকে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিয়াছিলেন, তিনি সেই রকমেরই একজন মহিলা। স্বামী বন-গমন করিলে তিনি তাঁর মেহগিনি পালঙ্ক ছাড়িয়া তাঁর অনুগমন করিতেন কি না, সেকথা কেমন করিয়া বলিব, যেহেতু তাঁর স্বামী কখন বনবাসে যান নাই। তবে তিনি যখন আমেরিকা ইউরোপ বা বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন, লেডি চন্দ্রলেখা তাঁর সঙ্গ ছাড়েন নাই। আজকালকার দ্বীপ নিবাসী পরস্বাপহরণকারী প্রবল প্রতাপ (ভূদেব) রাও" না কি জীবন্ত সীতাহরণ করেন না— তাঁরা নারী লুণ্ঠনের অপেক্ষা স্থায়ী ও সসার বস্তুর প্রতিই আগ্রহশীল, সেইজন্য তাঁকে স্বামীর আদেশে পরগৃহবাসের প্রায়শ্চিত্তে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয় নাই, এমন কি, কম বয়সে সুযোগ না থাকায় ও সে বয়সে ইউনিভারসিটি পরীক্ষা পর্য্যন্ত না উঠিয়াও তার ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে মিলাইয়া অশনে বসনে আচারে ব্যবহারে পুরাতন শিক্ষাকে পরিহার করিয়া আধুনিক হইতে তাঁর পক্ষ হইতে কোন আপত্তিই উঠে নাই। অবশ্য সে আধুনিকতা আজকার দিনে অতি আধুনিকতা নয়, আর তা' হওয়াও সম্ভব নহে, যেহেতু তখনকার দিনের পক্ষে যেটা আধুনিকতা ছিল, তিনি ত আর সেযুগকে অতিক্রম করিয়া তার বাহিরে যাইতে পারেন না। তখনও নারী পুরুষের সমান অধিকার বিঘোষিত হয় নাই, নারী পুরুষের 'ছায়েব অনুবর্ত্তিনী' থাকিয়াই তারই আকর্ষণ গ্রস্ত উপগ্রহের মত তাহার চারিপার্শ্বে আবর্ত্তিত হইত, পুরুষকে সে নিজের কেন্দ্র বলিয়াই ভুল করিত, বিশ্বাস করিত না যে সে স্বাধীন, সে স্বতন্ত্র, সে নিজেকে তখনও খুঁজিয়া পায় নাই! অমন বসন বদল করিলেও ধর্ম্মকে ও ঈশ্বরকে তারা সম্মান না দিয়া পারিত না।
চন্দ্রলেখা সত্যকার গৃহিণী, স্বামীকে তাঁর বাহিরের কাজে নিয়োজিত থাকিতে দিয়া নিজের উপরেই এই সংসার তরণীর পরিচালনার সমুদয় দায়ীত্ব ভার চাপাইয়া লইয়াছিল। নারী পুরুষের সতন্ত্র কর্ম্মক্ষেত্র সে মনের সঙ্গে বিশ্বাস করিত বলিয়া এঁদের মধ্যে সাংসারিক মনোবাদটা অল্পই ঘটিত, যেটা মানুষের, বিশেষ করিয়া আজকের দিনের মানুষের জীবন যাত্রায় পদে পদে ধাক্কা দিয়া তাদের উভয়তঃ জীবনকে অতিষ্ঠ করিয়া পরিত্রাহি ডাক ছাড়ায়।

চন্দ্রলেখার বড় ছোট দুটী মেয়ের মাঝখানে একটী মাত্র পুত্র পুরন্দর। বড় মেয়ের বিবাহ হইয়া সে এখন কন্যা পুত্রের জননী। ছোট আজকালের হাওয়ায় বাড়িতেছে, কাজেই চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত খাটো ফ্রক পরিয়া 'বব' করিয়া 'বেবি' হইয়াছিল। ইদানীং সাড়ী পরিয়া কলেজে যায়, তা' স্যার অনুকূলের কন্যার ত আর যুদ্ধের বাজারে সাড়ীর অভাব ঘটে নাই বা শস্তায় রং-চটা সাড়ী পরার কোন প্রয়োজনও ঘটে নাই। সে তার 'বব' করা চুলকে ততটাই বড় হইতে দিয়াছে, আজকালকার ঠিক আধুনিক মেয়েরা যতটা দেয়। মা চুল বাড়াইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে থাকিলে, সে তার খাটো চুলের ঝাপটা ঝাড়িয়া প্রবলকণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া ওঠে, "ওঃ নো, নো—সরি!, না মা সে হবে না, চুলে ওসব নোংরা তেল ফেল আমি মাখবোনা। তাহলে কিটি, নেলি, প্রিয়ম্বদারা আমায় ঠাট্টা করে খেয়ে ফেলবে। এমনিতেই ত কত কথাই না বলে।"

শ্রেয়োন্নতির পথে
১৯৪৪ সালে
২,১৩,৫২,৮২৫
১৯৪৩ সালে
১,৩২,২৫,৭৭৫
১৯৪২
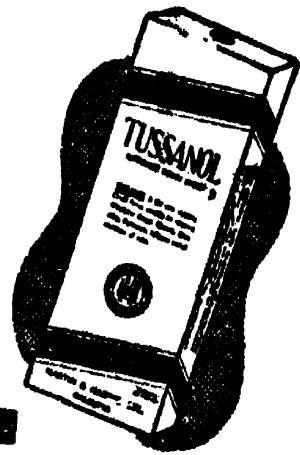
"কি, বলে কি? বলবারই বা এতে আছে কি? চিরকাল ধরে ঐ ঘোড়ার ঝালর ঝুলিয়ে বেড়াবি না কি? বিয়ে থাওয়া হবে না?"

"কি আর অন্যায় বলে! ঐ কথাই ত ওরাও বলে—বলে ঐ দেখ না কোন্‌দিন তোর মা তোর একটা বর ঠিক করে তোকে ছাঁদনা তলায় ঠেলে ছায়! সেদিন ফুলরেণু খোঁপা বেঁধে এসেছিল, তার দশা যা' করলে সব্বাই মিলে, সে যদি দেখতে! বেচারী শুদ্ধ কাঁদতে বাকি রেখে ফিরে গেল, পরদিন থেকে চুল কেটে খোঁপার দায় উদ্ধার হয়ে বাঁচে।"

মা মুখ ঝাম্‌টা দিয়া উঠিলেন,..."দিতে পারলে না তার মা মাথাটা শুদ্ধ মুড়িয়ে? আমি হ'লে দিতুম। যত সব!"

"হ্যাঁ দিতে বই কি! দাদাকে বলে দিতুম না!" বেলা ফোঁস করিয়া উঠিল, ছেলের সম্বন্ধে মায়ের যে একটুখানি দুর্ব্বলতা আছে, সেটুকু তার তীক্ষ্ণ মনের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। মার চোকে ঈষৎ হাস্য রেখা ফুটিলেও তীব্রকণ্ঠে কহিলেন, "দিস বলে, তোর দাদা আমায় ফাঁসি দেবে না কি? বড় যে যখন তখন দাদার ভয় দেখাতে শিখেছিস!"

মার স্বভাব যতই হোক মেয়ের অজ্ঞাত নয়, সে সহসা গরম সুর নরম করিয়া ফেলিল, আচ্ছা মা, তুমি বিলাত টিলাত ঘুরে এসেও এত সেকালে রৈলে কি করে বলোত? অথচ কত লোকে ভারতবর্ষ ছেড়ে—বাংলা দেশের বাইরে একটি পাও না নড়ে কিরকম আধুনিক হয়ে গ্যাছে! এই তো তিলোত্তমা তার মাকে 'মামি' বলে ডাকে, মা'তো তার কই সেজন্য রাগ করেন না? আর আমি যদি বলি, তুমি হয়ত আমায় এই বয়সে মেরেই বসবে!"

মা মনে মনে হাসি চাপিলেও বাহিরে দিব্য গম্ভীর থাকিয়া কল্পিত কোপনতার সহিত উত্তর করিলেন, "বলে একবার দেখনা মজা! মাকে মা' না বলে, বলবেন 'মামী'! কেন বাপকে 'পিসেমশাই' বলতে পারবি না?"

"তা' মেশোমশাইও তো বলতে পারা যায়! কি বলিস্‌ রে বেবি? জিজ্ঞেস করনা তোর মাকে, এ'তে তার কোন আপত্তি আছে কিনা।" গৃহস্বামী হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া এই কথাগুলি বলিয়াই বক্র কটাক্ষে বেবীর মায়ের গোপনহাস্য চকিত চোখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

চন্দ্রলেখা সচকিতে দৃষ্টি নত ও ঠোঁট দুটী ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া হাসিয়া ফেলা হইতে আত্মরক্ষা করিতে করিতে ঈষৎ ঝাঁজালো সুরে স্বামীকে অনুযোগ করিলেন, "সে হলে ত তুমি বর্ত্তে যেতে! এখন পর্য্যন্ত সে লোভ তোমার যায়নি, সে আমি জানি! তা যাগ্‌গে, তুমি ওকে কি চার কাল ধরেই 'বেবি' বলে বলে 'বেবি' করেই রাখবে? ওসব ফিরিঙ্গিপনা আমি দুচক্ষে পড়ে দেখতে পারিনে, কেন নাম ধরে ডাকলেই তো পার।"

স্যার অনুকূল একখানা সোফায় বসিতে বসিতে সহাস্যস্মিতমুখে মুখ তুলিয়া কহিলেন, "সে নামটি কি? যেটী ধরে ডাকবো? আমিত ভুলেই গেছি। কিরে বেব্‌, থুড়ি, কিরে মেয়েটী, তোর ভাল নাম তোর মা কি রেখেছিলেন সূতিকাগারের ষষ্ঠি পূজায়? বলে দে'তো।"

মেয়ের মন মায়ের প্রতি অসন্তোষে ভর্ত্তি হইয়া রহিয়াছিল। বাপের প্রশ্নোত্তরে তারই খানিকটা বহিঃপ্রকাশ করিয়া সে ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "ষষ্ঠি পূজায়!" মেয়েদের বুঝি আবার ষষ্ঠি পূজা হয়? সে সব তো হয়ে থাকে সৃষ্টিধর বংশধরদের বেলায়! কেন, ঠাকুমা বলতেন শোননি, 'মেয়ে মেয়ে মেয়ে ভুষ্ করলে খেয়ে, হরি ভক্তি উড়ে গেল মেয়ের পানে চেয়ে'।"

বাপ হাসিয়া হাত বাড়াইয়া স্নেহস্বরে ডাকিলেন, "আয় মা আমার কাছে আয়! নাই বা তোর সূতিকাপূজায় ভাল নাম রাখা হয়েছে, আমার তো তুই মা, এবার থেকে মা' বলেই তোকে ডাকবো খন।"

মেয়ে কাছে আসিলে বুকে টানিয়া মাথায় মুখে আদরের স্পর্শ দিতে দিতে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি নাম তোর একটা, এই ধর যে কেউ হোক, ধর্ তোর ইস্কুলের রেজিষ্ট্রারে লিখে দিয়েই এসেছিল, সেটা কি বল্‌তো?"...

মেয়ের মায়ের প্রতি অভিমান বাপের আদরে অনেকটাই প্রশমিত হইয়া আসিয়াছিল, সানন্দে বাপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া সস্মিত হাস্যে উত্তর করিল, "উত্তরা বাবা! তা এ নামটা কিন্তু খুব মন্দ না, না? আচ্ছা মা! ঠিক করে বল দেখি, এ নাম তুমি নিশ্চয় রাখোনি, তুমি হলে, তুমি হলে উত্তরা না রেখে হয়ত সৈরিন্ধ্রী রাখতে কি বল?"

মা তাঁর হাতের কার্পেটের আসনের খালি জমিটী দ্রুত হস্তে কালো উলে ভরাইতেছিলেন, পাকা দেখার দিনে কুটুম্ববাড়ীর লোকেদের খাইতে বসাইবার জন্য বারখানি আসন তিনি নিজের হাতে তৈরি করিয়াছেন, এইখানিই তার শেষ। সূচে পশম পরাইতে পরাইতে উত্তর করিলেন, "হ্যাঁরে হ্যাঁ, আমি যে তোর সৎ মা, তোকে দুচক্ষে পড়ে দেখতে পারি কি! তবে তোর খুব কপালের জোর, তাই তোর নাম রাখিনি জগদম্বা।"

সবাই হাসিলেন।

(২)

ভোরের আলো ফুটিতে না ফুটিতে কাকের কলরবের সীমা থাকে না, পথের ধারে ধারের গাছগুলায় তারা রাতের অতিথি। এখন রাজপথের অনির্দ্দেশ্য গতি বুভুক্ষিত ভিখারীগুলার মতই জীবিকান্বেষীরূপে দিক্‌বিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। সমস্ত সদ্যজাগ্রত বিশ্ববাসীর মতই তাদের কণ্ঠে সেই একই সুর, একই ধ্বনি :—

"আগে চল্ আগে চল্ ভাই,
পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই।"

কাকেদের বিজয় যাত্রার মার্চ্চিং সং বা জয়-সঙ্গীত সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই একদিক দিয়া ট্রামের ঘর্ঘর, রিক্সার টিং টিং, বাসের ঝকঝক্, মোটরের পোঁ পোঁ, এবং অপর দিক দিয়া বেতারের প্রভাত অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়া গেল :—

"ভোর ভইল মম মানস-বিহঙ্গ ডাকো নিজ রবে প্রাণেশে"

সঙ্গীতে ও কোলাহলে এমনি করিয়াই সামঞ্জস্য সাধিত হয়, তাই মানুষ জগতে তিষ্টিতে পারে।

সত্যব্রত নিয়োগীর বাড়ীখানা খুব বড়, খুব সেকালে, বনিয়াদী বাড়ীর বনিয়াদ নিশ্চয়ই খুব পাকা, শতাধিকবর্ষেও তাকে কিছুমাত্র কাবু করিতে পারে নাই, তা' তার বাহ্যিক চেহারাতেই প্রকাশ পাইতেছে। অবশ্য সম্প্রতি ভাল করিয়াই মেরামত করা হইয়াছে, নচেৎ উপরের খোলসটা কিছু কিছু জখম হইয়াছিল বই কি! যুদ্ধের বাজার বলিয়া কাঠের উপর রং লাগানো আর সম্ভবপর হয় নাই, সবাই ত আর স্যার অনুকূলের মত বড় লোক নয়, ছেঁড়া শালের কাঁথায় ফরসা পুরানো কাপড়ের ওয়াড় পরাইয়া শীত নিবারণ এদিনে অনেককেই করিতে হইতেছে, অবশ্য সৌভাগ্যক্রমে যাদের পিতৃপুরুষরা খাঁটি কাশ্মিরী শাল উত্তরপুরুষদের সেবার জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন তারাই, নহিলে ছেঁড়া কাপড়ের কাঁথা করিতেই ত কাপড় জুটিতেছে না।

বাড়ীখানি প্রকাণ্ড, কিন্তু হইলে কি হয় একান্ত পুরাতন ফ্যাসনের। সৌভাগ্যক্রমে মোটা থামের মাথায় চড়িয়া একটী লোহার রেলিং ঘেরা গাড়িবারান্দার পর একটী দিব্য লম্বা চৌড়া ড্রইংরুম ভারি ভারি ওজনের প্রথম ভিক্টোরিয়া যুগের কৌচ-কেদারা ঝাড় দেওয়ালগিরি সমেত সুসজ্জিত হইয়া আছে, তাই এ বাড়ীর গৃহবাসিনী আজ পর্য্যন্ত অপর্য্যাপ্ত লজ্জা আঘাতে মরিয়া যান নাই, তাঁদের বাড়ীর অত্যাধুনিক বন্ধু এবং বান্ধবীদের কাছে কিঞ্চিৎ খাটো হইয়া থাকিয়াও কোনমতে বাঁচিয়া আছেন! এই বাহিরবাটীর ওপাশে অন্দর-মহল ব্যাপারটী কিন্তু একান্ত অসহ্য বোঝার মতই তাঁর বুকে অহোরহঃ চাপিয়া থাকিয়া তাঁর জীবনকে একান্তরূপেই অতিষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছিল। সেই চক-মেলানো, রেলিং ঘেরা দালানওয়ালা ঘরগুলির দরজা জানলা ছোট ছোট, আয়তনে ঘরগুলি আটাশ ফিটের বেশী নয়, কাঠের কড়ি বেশ মোটামোটা এবং কয়েকটীতে মাত্র ছাড়া কাঁচের সার্শিশুদ্ধ নাই! এই পৈত্রিক বাড়ী বেচিয়া সাহেব পাড়ায় অন্ততঃ বালিগঞ্জে হালফ্যাসানের একখানি নূতন বাড়ীর জন্য কি তিনি স্বামীকে কম অনুরোধ ও অনুযোগ করিয়াছেন।

সত্যব্রতকে বহু অনুরোধেও অনুপমা রাজী করিতে পারেন নাই, অনেক মান অভিমানের বন্যা এ লইয়া তাঁদের মধ্যে বহিয়া গিয়াছে, এমন কি অসহযোগ, সত্যাগ্রহ, বৈপ্লবিক অভিযান যতকিছু উপায় বিধান শত্রুপক্ষকে লওয়াইবার জন্য জগতে বিহিত আছে, সত্যব্রত-গৃহিণী কিছুই বাদ দেন নাই, কিন্তু সত্যব্রত এদিকে শান্তশিষ্টটী দেখিতে হইলে কি হয়, বাপ মার দেওয়া নামের মর্য্যাদা খাটো করেন না। কখন হাসিয়া রসিকতা করিয়া, কখনও গম্ভীর হইয়া নীরব ঔদাস্যে পত্নীর সমস্ত যুক্তি তর্ককে ভাসিয়া যাইতে দিয়া এই শত-কেলে পৈত্রিক গৃহকেই কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিয়াছেন। প্রথম দিকে একবারমাত্র প্রতিবাদ জানাইয়া বলিয়াছিলেন, "এবাড়ীতে আমার ঠাকুরমা, মা, তুমি নিজেও বউ হয়ে এসে দুধ-আলতার পাথরে পা রেখে দাঁড়িয়েছিলে, আমার বাবার, আমার, পূর্ণ-নিতুর ষেঠেরা পুজো থেকে অন্নপ্রাশন উপনয়ন হয়েছে, ঠাকুরদা-মশাইএর, বাবার, মার মৃত্যুশয্যা এরই কোলেপাতা, তাঁদের শ্রাদ্ধের মন্ত্রোচ্চারণ এরই গায়ের বাতাসে মিলিয়ে রয়েছে, আমিও আমার এই মায়ের বুকে শুয়ে শেষ নিশ্বাস ফেলতে চাই। এ বাড়ী তুমি আমায় বেচতে বলোনা অনুপ!"

অনুপমা নিদারুণ বিরক্তিভরে মুখ ঘুরাইয়া জবাব দিয়াছিল, "মরবার জন্যে কেউ ঘর করেনা, বাঁচবার জন্যেই করে, মরণকালে না হয় এর কাছে আসা যাবে, এখন ভাড়া দিলেও ত চলে।"

সত্যব্রত ঈষৎ বিমনা হইয়া ক্ষণ পরে মৃদু হাস্যে, প্রশ্ন করেন "মরণের গ্যারান্টি দিতে পার? সে হয় না, যা' হয় না তা বলোনা, এর সমস্ত অণুতে পরমাণুতে আমার তিন পুরুষের সমুদয় জন্ম-মৃত্যুর দুঃখসুখের ইতিহাস নিবিড় হয়ে জড়িয়ে আছে, এরমধ্যে বাইরের লোকের বাস করার কল্পনা আমি করতেই পারিনে। আমায় এইখানেই তুমি থাকতে দাও, বেরিয়ে যেতে বলোনা।"

অনুপমা স্বামীর এই ভাব প্রবণতার অর্থই বুঝিতে পারেনা, কাজেই সে তার কোন মূল্যও দেয় না, ঘোর বিদ্বিষ্ট অভিমানে তখনকার মত নীরব থাকিলেও নিবৃত্ত সে আজও হয় নাই। এই পাতাল বাসিনীর চিত্ত, স্বর্গবাস অন্ততঃ মর্ত্ত নিবাসেরও দারুণ তৃষ্ণায় পুড়িতেছে।

কিন্ত কিছুতেই কিছু হয় নাই। তাই আজও একান্ত "নিরসঃ" "নিসেধো" এবং কতকটা নির্ব্বোধ-স্বামীর পৈত্রিক-প্রীতির প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণায় চিত্ত প্রাণ আদ্যোপান্তই পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, এ লইয়া কখনও ক্ষ্যান্ত-বর্ষণ মেঘের মত স্তব্ধ গম্ভীর, কখনও আসন্ন-বর্ষী জলদের মত বজ্রগর্ত্ত, কখনও মৃদুবর্ষণের কখন বর্ষার মত অশ্রান্ত ধারাপাতে তিনি স্বামীকে সন্ত্রস্ত দগ্ধ বা আর্দ্র করিয়া দিতে সমর্থ হন নাই। অগত্যা অনুপমা ঐ বাড়ীরই সবচেয়ে বড় ঘরখানাকে আগাগোড়া সংস্কার পূর্ব্বক অত্যাধুনিক ফ্যাসানে সজ্জিত করিয়া লইয়া কিঞ্চিৎ স্বস্তি লাভের প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। সেকেলে সিঁড়ির দেওয়ালে হালে আঁকা খানকতক ছবি টানাইয়া গাড়ী বারান্দায় পামের টব সাজাইয়া, ছেলেমেয়েদের পরিচ্ছদে, চুলের ফ্যাসনে, চায়ের টেবিলে, ভাতের পাতে কাঁটা চামচের ব্যবহারে সর্ব্বত্রই সজোর বিদ্রোহ জ্ঞাপন করিয়া স্বামীকে বিব্রত ও বিপন্ন করিতে চেষ্টার ত্রুটি তিনি করেন নাই। ফলে কতখানি সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন তাঁর স্বামীর নির্ব্বিকার নির্বিরোধিতায় তাহা বুঝিতে পারা যায় নাই, সেজন্য মনে মনে তিনি দুঃখিত। সত্যব্রত স্ত্রীকে কিছুতেই বাধা দেন না, তাকে নিজপথে চলিতে দিয়া নিজের পূর্ব্বাপর বাঁধাপথেই নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছেন। কাজেই এক তরফা আর কতই বিরোধ হইবে, ইদানীং এ বাড়ীতে এইটাই স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে, যে, অনুপমা ও তাঁর ছেলেমেয়েরা একধারায় চলিয়া থাকেন, আর সত্যব্রতর জীবনের ক্ষীণধারা তার পুরাতন খাতেই মৃদুপ্রবাহে বহিয়া চলে, পরস্পরের সঙ্গে কোনই বিরোধ ঘটেনা। সত্যব্রত ভোরে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যের পর ঘণ্টাদুই ধরিয়া আহ্নিক করেন, গীতা পাঠ করেন, অনুপমা পুত্রকন্যা পরিবৃতা হইয়া চায়ের মজলিস জমাইয়া তোলেন। কেহ কোন কথা বলিলে বলেন, কেন শুধু শুধু উপোস করে শুকিয়ে মরতে গেলুম, উনিত খুব চুটিয়ে ধর্ম্ম চর্চ্চা করেছেনই, আমার যখন তা'তে অর্দ্ধা-অর্দ্ধি ভাগ বরাদ্দ রয়েইছে, তখন ফাল্তু নিয়ে ওঁর ওপরে উঠে গিয়ে কি পাতিব্রত্য ধর্ম্মের হানি করবো নাকি!"

মায়ের এই অকাট্য যুক্তি শুনিয়া মেয়েরাও সমর্থন সূচক চাপাহাসি হাসিয়াছে। সমবয়সীরা কেহ কেহ অবশ্য অপ্রতিবাদে এই সুযুক্তি গ্রহণ করেন নাই, উপরন্ত তর্ক করিয়াছেন যে, সহধর্ম্মিণী শব্দের মানে এ নয় যে স্বামীই অর্থার্জ্জনের মত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ধর্ম্মার্জ্জন করিবেন, আর স্ত্রী ভিন্নপথে স্ফূর্ত্তি

করিয়া বেড়াইয়া যথাকালে তার অর্দ্ধেক ভাগ লইবে, আদালতের আইনের সেপারেসনের খোরাকীর মত দাবী জানাইয়া। অনুপমা তাহাতে ভয় অবশ্য পান নাই।

ইদানিং মাটিতে বসিয়া ভাত খাওয়া যায় না, ডিনার টেবিল কেনা হইয়াছে, ছোট্ট একটা ঘরে সেটা ঘর জুড়িয়া বসিয়াছে, বামুনঠাকুরই রাঁধে, তবে হাফ হাতার সার্ট পরিয়া পরিবেশন করিতে হয়। সত্যব্রত অন্যঘরে তাঁর পৈত্রিক বড় পিঁড়িতে বসিয়াই ভাত খান। মাটিতে জলের ছিটা দিয়া ভাতের থালার "ঠাঁই" করিয়া দিতে হয়। হাত মুখ ধুইতে তাঁর এক বালতি জল লাগে, সে জল তাঁর চাকর বালতি মাজিয়া কলে ধরিয়া চাপা দিয়া রাখে।

ছেলেরা আজকাল কে'ই বা আচার-নিয়মে চলিতে চায় মায়েদের ভয়েই যেটুকু করে। এবাড়ীর ছেলেরা তাই মায়ের কল্যাণে অনাচার করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতে না পারায় যৎপরোনাস্তি মাতৃভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। মেয়ে প্রিয়তমার ত কথাই নাই। নিকটস্থ স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পাশ করার পর বাপের ইচ্ছা ছিলনা তাকে কলেজে দিতে; কিন্তু পারিবারিক সকল ব্যাপারের মতই তাঁর এ অনিচ্ছাও কিছুমাত্র মূল্য পায় নাই। অনুপমা একান্ত জিদ করিয়া তাহাকে স্টটিশচার্চ কলেজে ভর্ত্তি করাইলেন। বেথুন কলেজেই যে মেয়েদের পড়িতে হইবে এমন কোন কথা আছে? কো-এডুকেশনে মেয়েদের মন প্রসারতা লাভ করে, দৃষ্টি খুলিয়া যায়। সত্যব্রত একবার ক্ষীণ প্রতিবাদে জানাইয়া ছিলেন যে, কোন ছেলে যখন মেয়েদের কলেজে পড়েনা, তখন মেয়েদেরই ছেলেদের কলেজে উপায় থাকতে যাওয়া কেন? ছেলেদের দৃষ্টির বা মনেরও এর জন্য কিছুমাত্র ক্ষতি হচ্ছে বলে তারা যখন প্রতিবিধান চাইছে না।

অনুপমা উন্নত নাসা আরও একটু উচ্চে তুলিয়া সবিদ্রূপে সহাস্যে ও সতাচ্ছিল্যে জবাব দিয়া বুঝাইলেন, "ক্ষতি হচ্চে নাই বা কে বল্লে? তুমি যদি আজকালকার মত শিক্ষা পেতে তা'হলে আমার হাড় মাস এমনকরে জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যেত না। মেয়েটিকে একটি গাড়ল করে গড়ে নিয়ে কোন্ ভদ্রসন্তানের মাথাটি খাবো?"

"ও:, আচ্ছা, তা'হলে সেটা করে কাজ নেই! কর্ত্রীর ইচ্ছায় কর্ম্মই হওয়া বিধেয়, আধুনিক ব্যাকরণে তাই লিখেছে!"

প্রিয়তমা বিএ পরীক্ষা দিয়াছে, দৃঢ় বিশ্বাস আছে পাশ করিবে, ইংলিসে অনারটা পাইবে কি না সে সম্বন্ধে মেয়ের মনে ঈষৎ সন্দেহ আছে, মায়ের মনে কিন্তু কোনই দ্বিধা নাই। তিনি সগর্ব্বে বলিয়া বেড়াইতেছেন, "আজকালত আর ডবল অনার নিতে দেয় না, দিলে প্রিয় প্রিয়র বাপের মত ফার্ষ্টক্লাশ ডবল অনার যে না পেত তা' নয়। ছেলেরা যা পারে, মেয়েরাই বা তা' না পার্ব্বে কেন? কোন্ বিষয়ে তারা কম যায়!"

ফলেন পরিচিয়তে, যথাকালেই জানা যাইবে। ইতিমধ্যে অনেক দেখিয়া শুনিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া তিনি মেয়ের জন্য এক বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। ইতিপুর্ব্বে তিনি অবশ্য অনেকের কাছেই বলিয়া আসিতেছিলেন, যে, পৃথিবীর সব ছেলেকে আর সব মেয়েকেই যে বিয়ে করতেই হবে তার কি মানে? বিশেষ

করে যে সব মেয়েদের মাথায় ব্রেন আছে, মনে সাহস আছে, উদ্যম আছে, তারা সাত সকালে বিয়ে করে, ছেলে কোলে করে ভাতের হাঁড়ির তদারক করতে যাবে কি দুঃখে! জীবনটাকে একটু এন্‌জয় করে নিক্‌না দুদিন, বিয়ে যদি করতেই হয়, সুবিধা মতন হবেই না হয় একদিন।"

অনুপমার মাসতুতো ননদ বিস্মিত হইয়া এই বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, "এমন কথা বলোনা বউ! মেয়ে মানুষ বয়স কালে বিয়ে না দিলে কোন পথে যায় না যায়, কার পাল্লায় পড়েই যদি গেল! ভদ্রঘরের মেয়ে বিয়ে করে ভদ্রভাবে ঘর সংসার করবে, এইত মা বাপের আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত ও তারই জন্য যত্ন নেওয়া কর্ত্তব্য।"

অনুপমা ঠোঁট বাঁকাইয়া বলেন, "না হয় সংসার পথে চলতে চলতে দুটো একটা হোঁচটই খেলে; তাতেই বা এত কি এলো গেল, ঠাকুরঝি! ছেলেদের যদি ছেড়ে রাখতে পার, মেয়েদের বেলায়ই কি যত অপরাধ!"

ঠাকুরঝি—"ছি ছি বউ, কি বল্‌ছো"! ছাড়া আর কিছুই বলিতে পারিলেন না, তাঁর মতন সঙ্কীর্ণ চিন্তার এর বেশী বলিবারই বা কি আছে? ছেলেমেয়েদের স্খলন-পতনকে যে মা ভয় করেনা, সেই গর্ভধারিণীকে এঁরা হয়ত মায়ের সম্মান দিতেই অপারগ! "শিবভূত্বা শিবমর্চ্চয়েৎ" স্বরূপ জ্ঞান না হইলে বোধগম্য কিরূপে হয়! সেকেলে-মায়েরা যাঁরা প্রবাদ বাক্য তৈরি করিয়াছেন;

'মরবে মেয়ে উড়বে ছাই,
তখন মেয়ের গুণ গাই।"

অর্থাৎ অকলঙ্ক চরিত্র লইয়া মেয়ের মৃত্যু হইলেও তার গুণকীর্ত্তন পূর্ব্বক ক্রন্দন করাতেও তাঁরা গৌরব অনুভব করিতেন। তা' করুন তাঁদের চাইতে এদিনের মায়েরা, অনেক উদার, মেয়েরা দুবার 'হুচোট' খাইলেও তাঁদের আপত্তি নাই, তাহাতে নাকি 'দুনিয়াকে জানা যায়, জীবনকে এন্‌জয় করা হয়।' অপূর্ব্ব!

অনুপমা কিন্তু মেয়ের বিয়ের জন্য ভিতরে ভিতরে চেষ্টা না করিতেছিলেন তা' নয়। প্রিয়তমাকে দেখিতে ভাল, বাপের পয়সার খ্যাতি আছে, বনিয়াদি ঘর, মেয়েও তার উপর শিক্ষিতা, বিবাহের সম্বন্ধ অনেকগুলোই পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু অনুপমার ধনুর্ভঙ্গ পণ, তিনি তাঁর মেয়েকে তাঁর বাপমার মত ঠকাইতে চাহেন না। বনেদী ঘর বা পাশ করা ছেলের খাতিরে তিনি তাঁর মেয়েকে একটা পচা বাড়ীওলা পাত্রের হাতে দিবেন না। চৌরঙ্গী বা বালিগঞ্জে হালফ্যাসনের বাড়ী, মোটর গাড়ি টেলিফোন যাদের নাই, প্রিয়র পা সেখানে পড়িবে না। কলিকাতার বাইরে তার যাওয়ার কথাই উঠে না। এমন করিয়া ছাঁটাই বাছাই হইতে হইতে অবশেষে মনের মত পাত্র জুটিয়াছে।

স্যর অনুকূলচন্দ্র রায়ের একমাত্র পুত্র পুরন্দর। পুরন্দর এর উপর বিলাতফেরৎ ব্যারিষ্টার এবং সুদর্শন। প্রিয়তমাকে পছন্দ হইয়াছে, কোষ্ঠির কথা উঠিয়াছিল, অনুপমা ওসব মানেন না, এদিকে চন্দ্রলেখার কুসংস্কারের সীমা নাই, তিনি ষষ্ঠীমার্কণ্ড মনসা শীতলা হইতে দৈব-দৈবজ্ঞ যত কিছু খুঁটিনাটী সমস্তই একাধারে মানিয়া বসিয়া আছেন। জ্বালাতন! এই লইয়া বিবাহ সম্বন্ধ বুঝি ভাঙ্গিয়াই বা যায়! যা হোক, সঙ্কীর্ণ-

চিত্ত শাশুড়ীটা না থাকিলেই ভাল ছিল, কিন্তু সে তো আর অমর নয়! আর স্যার অনুকূলের বাড়ীর মত একখানা বাড়ী সহজে কি কাহারও ভাগ্যে জোটে, যখন বিশেষতঃ ঐবাড়ীতে—দ্বিতীয় কোন ভাগীদার নাই। অনুপমা আন্দাজে আন্দাজে মেয়ের একটি জন্মপত্রিকা তৈরি করাইলেন, তাহাতে কন্যার রাক্ষসগণ হইল বলিয়া অপরকে দিয়া সময়টা ঘণ্টাকয়েক পিছাইয়া দিয়া একখানি কোষ্ঠিতে দেবগণ হইলেও সপ্তমে মঙ্গল দোষস্থ হওয়ায় প্রথমোক্তকেই বলিলেন, "ওর কোষ্ঠি হারিয়ে গেছে আমার বেশ মনে আছে যে, ওর দেবগণ ছিল আর সপ্তমে বৃহস্পতির পূর্ণদৃষ্টি লগ্নে যেন চন্দ্র না বুধ না রবি এইরকম কি গ্রহ ছিল, সময়টা আর তারিখটা কিন্তু গোল হয়ে গেছে।"

দৈবজ্ঞ সেইরূপ একখানি কোষ্ঠি তৈরি করিয়া দিলে সেখানি চালের জালায় কয়েকদিন রাখিয়া বেশ পুরাতন মূর্ত্তি ধরিলে স্যারের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। আরসুলাকেও দু'এক স্থানে একটু কাটাকুটি করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। বলা বাহুল্য এরকম কোষ্ঠির মিল না হওয়াই বিচিত্র!

পুরন্দর স্বচক্ষে মেয়ে দেখিতে আসিবে না জানিয়া অনুপমা ঘোর বিরক্তি অনুভব করিলেন। আজকালকার দিনে এ কি রকম অসভ্য ছেলে? বলিয়া পাঠাইলেন, 'বিয়ের আগে একটা চেনাশোনা হওয়া উচিত, ছেলের একটা পছন্দর দাম আছে ত!"

কথাটা শুনিয়া পুরন্দর এদিকে হাসিয়া ফেলিয়া তার মাকে গিয়া বলিল, "তোমার চোখে যদি ওরা মায়া-কাজলপরিয়ে দিয়ে থাকে ত, আমার চোখেই কি দেবে না ভেবেছ? তোমার চোখেই ত আমি দেখে নিইছি!"

মা বলিলেন, "তবু একবার—"

পুরন্দর বলিল, "রক্ষা কর!"

উত্তরা এবাড়ীর মধ্যে আধুনিকতার বিশেষ ভক্ত! সে দাদার ভীরু বশ্যতায় সন্তুষ্ট নয়, ওর দোষেই ত মা আরও তাকে দাবাইয়া রাখেন, কথায় কথায় ছেলের তুলনা দেন। সে তীব্র করিয়া বলিয়া উঠিল, "কেন দাদা! তুমি কনে দেখতে গেলেই কি কনে তোমার গলায় মালা পরিয়ে দেবে? মালা হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে নাকি ঘাপ্‌টী মেরে?"

পুরন্দর কহিল, "মালা! আধুনিকা কনেরা দড়ি হাতে করে করে দাঁড়িয়ে আছেন, সামনে গেলেই অ্যায়সা করে ফাঁস লাগিয়ে টেনে আনবেন না!"

ক্রুদ্ধকণ্ঠে উত্তরা চেঁচাইয়া উঠিল, "দাদা! খবরদার ওসব বলবে না।"

পুরন্দর নিরীহভাবে উত্তর করিল, "বেশ, বলবো না।"

তথাপি বিবাহের সমস্তই পাকা হইয়া গেল। এমন কি পাকাদেখা পর্য্যন্ত। হীরার মালা দিয়া প্রিয়কে এঁরা আশীর্বাদ করিলেন, পুরন্দরের হীরার বোতামটাও ভাল কমল হীরার। দেনা পাওনার কথা উঠে নাই, উঠিবার প্রয়োজন সব সময় হয় না। স্থলবিশেষে সেটা না ওঠাই ভাল, তা'তে মানও থাকে, মর্য্যাদাও নষ্ট হয় না। অনুপমা ভাবী বেহানের নিমন্ত্রণে মেয়ের ভাবী ঘরকরণা দেখিয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত প্রস্তাব পাশ করাইয়া আসিয়াছেন, মেয়ে জামাইএর গৃহসামগ্রীর সমস্ত উপকরণ তিনিই ঐ ঘরের সঙ্গে মিলাইয়া বিবাহ যৌতুকে

দান করিবেন। চন্দ্রলেখা দিবেন বউকে হীরার স্যুট সেকথা তিনিও বেহানকে জানাইতে ভুল করেন নাই। বেহানের ইচ্ছা ছিল, জিনিষগুলি পূর্ব্বাহ্নেই দেখিয়া একটু রদবদল করাইয়া নেন, কিন্তু পুরন্দরের মায়ের মাথা একটু মোটা, ইঙ্গিত বোঝেন না. অথবা তাঁর বুদ্ধি বেশীই সূক্ষ্ম, বুঝিয়াও অনভিপ্রেত ব্যাপারে না বোঝার ভাণ করেন, তিনিই জানেন। তা হোক, কথাবার্ত্তা ও নজর ভাল, মেয়ের অসুবিধা হইবে মনে হয় না। উত্তরাকেও তাঁর খুব ভালই লাগিল, ছেলে ত তাঁর ঘরেও আছে, দেখা যাক্।

(৩)

কলেজে প্রিয়ংবদাদের একটা দল ছিল তার ভিতর কয়েকটী ছেলেও এপাশ ওপাশ দিয়া একটু একটু মাথা ঢুকাইত। পরেশ ও ননী মল্লিকার দূর সম্পর্কের ভাই হয় তারাই ছিল ঠিক 'লেডিস্ ম্যান।' মেয়েদের জন্য অসাধ্য সাধন করিয়া বেড়াইতেই তাহারা অভ্যস্ত, চরিত্রের সুনাম ছিল বলিয়া প্রফেসার বা অভিভাবকরা এদের সঙ্গে মেলামেশায় বিশেষ আপত্তি করিতেন না।

পরেশরা তাদের বোনেদের সম্পর্কে সহপাঠিনীদের "দিদিমনি" বলিয়া সম্বোধন করিত। এ লইয়া কোন কোন মেয়ে আপত্তি জানাইয়াছে, বলিয়াছে, "আমরা কি মেয়ে স্কুলের টিচার?"

পরেশ যোড় হাতে জবাব দিয়াছে, "আজ্ঞে, না, তাঁরা ত দি, আপনারা হচ্ছেন, "দিদিমনি।"

অগত্যা সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া উপায় থাকে না।

মেয়েদের সভাসমিতি করার আয়োজন, এক্জিবিসনে সূচীশিল্প চিত্রকলা যার যা আছে দেওয়া নেওয়ার সুব্যবস্থা, সঙ্গে গিয়া ফেরৎ আনা এ সব তা'তেই তারা দুজন ছিল স্বেচ্ছাসেবক। রক্ষণশীল অভিভাবকরাও তাদের সঙ্গে মেয়ে পাঠাইতে আপত্তি করিতেন না, তাঁরা জানিতেন এরা কংগ্রেসী জেলখাটা কলেজে রাস্টিকেট হওয়া ভাল ছেলে। পরেশ পাঁচবৎসর পূর্ব্বে আর বি এস্ সি পরীক্ষার ঠিক একমাস আগেই কোন বিশিষ্ট কারণে দুই বৎসরের জন্য রাস্টিকেট হয়, এবং দুই বৎসর পূর্ণ হইবার দিনকয়েকমাত্র পূর্ব্বে পিকেটিং করার সময় পুলিসের সঙ্গে বিরোধ করিয়া এক বৎসরের জন্য একবার এবং বাহির হইয়াই পুনশ্চ ন্যাসনাল ডে'তে ফ্ল্যাগ লইয়া ধ্বস্তাধ্বস্তি করার সময় একটা সামান্য রকমের দাঙ্গা পরিচালনার দলপতিরূপে আর এক দফায় দুইবৎসর জেল খাটিয়া সদ্য মাসকয়েক মাত্র বাহিরে আসিয়াছে, এবার সে নিজের কাছেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া জেল দরজার বাহিরে পা রাখিয়াছিল এই বলিয়া যে, এবার সে যেমন করিয়াই হোক বি এস্ সি পরীক্ষাটা দিবেই দিবে, নহিলে আর ছোকরাদলের কাছে ইজ্জত থাকে না। বাহির হইবার সময় জেলারকে সবিনয়ে বলিয়াছিল, 'মশাই, যদি এতটাই করলেন, আরও একটু উপকার করতেও পারতেন, আরও মাসখানেক যদি আমার ভারটা বইতেন।"

জেলার সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "সেকি, কেন?" ভাবিলেন হয়ত লোকটা জেল বার্ড বনিয়া গিয়াছে। খাঁচার পাখী খাঁচায় থাকিতেই অভ্যস্ত হইয়াছে, খাটিয়া খাওয়ার অভ্যাস নাই, বাহির হইতে ভয় পায়।

পরেশ কহিল, "যেসব উড়ো উড়ো খবর শুনছিলুম, হাত দুটো নিস্ পিস্ করছে কিনা, হঠাৎ আবার কি'না কি করেই ফেলি, তাই বলছিলুম, একেবারে সদ্য সদ্য বার হয়েই পরীক্ষাটা দিতে পারতুম। এই আর কি!"

যা হোক, ভাল অভিভাবকের চেষ্টায় প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হইলেও পূর্ব্বেকার পুরা প্র্যাকটিক্যাল করা থাকার জন্য এবং স্পেশাল বন্দোবস্তে তাকে পুরোনো বিদ্যা ঝালাইয়া লইতে দেওয়া হইয়াছিল, ইতিমধ্যে ছেলে-মেয়ে মহলে সে স্বনামধন্য হইয়াছে এবং পরীক্ষাও দিয়া ফেলিয়াছে, দিয়া পর্য্যন্ত অনেকের কাছেই বলিয়া বেড়াইতেছে, "এই একটা লাভ হবে যে, অন্তত বি এস্ সি ফেল বলতে পারা যাবে, এখন কোন ডিগ্রিইতো নেই।"

সায়েন্সের একজন প্রফেসর কথাটা শুনিয়া মৃদু হাসিয়াছিলেন, কয়েকজনের সামনেই বলিয়াছিলেন "বি এস্ সি ফেল! বি এস সি ফার্ষ্ট ক্লাশ অনার তো ওর ধরাই আছে, মেডালিষ্টও হওয়া বিচিত্র নয়! ওসব ছেলে ক্ষণজন্মাদের ভিতরকার একজন।"

পরীক্ষাটা এবার যাই হোক ভালয় ভালয় চুকিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ভাল নাকি তার গ্রহ সংস্থানই নয়! শনি রাহু কেতু এবং মঙ্গল অর্থাৎ পাপ গ্রহমাত্রই সুযোগ মাত্রে রবি বুধ বৃহস্পতি ও তার প্রধান সহায় গ্রহ শুক্রকে অভিভব করিয়া এপাশ ওপাশ দিয়া কুদৃষ্টি হানিতে ছাড়ে না, হঠাৎ একটা ঐ রকমই কোন গ্রহের ফেরে সে আবার একবার পুলিশের কোপ দৃষ্টিতে পড়িয়া গেল। ১৯৪২এর ঝঞ্ঝা বহুল দিন চলিতেছে, ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌শের ব্যর্থতার পর শাসকের রক্ত-চক্ষু আরক্তিম হইয়া উঠিতেছিল, শাসিতেরও চক্ষে তার চির সংশয় শঙ্কিত দৃষ্টির পরিবর্ত্তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার কাঠিন্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ এ যুগের দুর্য্যোধন যখন দূতবাক্য অগ্রাহ্য করিয়া প্রচার করিলেন,

"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।"

তখন অগত্যাই একটা আগুনে ঝড় উঠিবার সম্ভাবনা স্তব্ধ আকাশে ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল। বিজ্ঞজনেরা ঘরের চালা সামলাইতে ব্যস্ত থাকিলে কি হয়, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রতিনিয়তই সুদূর-পৃথিবী হইতে বাতাস ঠেলিয়া আনিতে লাগিল। নির্য্যাতিত মেদিনীপুর বাসীদের অসমাপ্ত সেবা করিতে গিয়া দুটী নির্য্যাতিতা নারীকে বাঁচাইতে পরেশ মাথায় পিঠে লাঠি খাইয়াও ক্ষান্ত হয় নাই, শেষে বন্দুকের গুলিতে তাহাকে আয়ত্বে আনা হইয়াছে। অচৈতন্য অবস্থায় সে তখন একটা অর্দ্ধদগ্ধ কুটীরে, হাঁসপাতালে তার মত লোককে ভর্ত্তি করা সম্ভবপর হয় নাই।

ননী যেদিন এই খবর লইয়া তাদের বন্ধু এবং বান্ধবীদের মধ্যে প্রচার করিয়া দিল সেদিন সহসা এই সৌখীন কলিকাতা নিবাসিনী মেয়েদের মধ্যে যেন একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। ইতিমধ্যে তাদের ডিবেটীং ক্লাবের সম্মিলনীতে অবসরের আলোচনায় পার্টির হাস্যালাপে বহুবারই দেশের দশার জন্য নানামত প্রচারিত হইয়াছে, কেহ কেহ আধুনিক কার্য্যাবলীর সপক্ষে কেহ কেহ আবার বিপক্ষেও তর্ক করিয়াছে, হাতে হাতিয়ারে কেহই কোন দিন কার্য্যক্ষেত্রে নামিবার কল্পনাও করে নাই, আজ এই নারী

মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যে মহাপ্রাণ যুবক সহীদ হইতে চলিয়াছে, তার প্রতি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ সহানুভূতিতে নারী চিত্তগুলি একেবারে যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখনি তখনি পরিকল্পনা স্থির হইয়া গেল, স্বেচ্ছাসেবিকার দল গঠিত হইল, সাতজন ছেলে এবং তিনজন মেয়ে আহতদের সেবার জন্য ননীর সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত। প্রিয়তমা তাদের মধ্যে একজন।

মা শুনিয়া আহতা ফণিনীর মতই গজ্জিয়া উঠিলেন, "মাথা খারাপ হয়ে গ্যাছে! মাসখানেকও নেই বিয়ে হবে, এই সময় তুমি চল্লে কতকগুলো ছোঁড়া-ছুঁড়ির সঙ্গে দেশ উদ্ধার করতে! বল্‌তে একটু মুখে বাধলো না?"

প্রিয়র হাতে যত রকম অস্ত্র ছিল সে একে একে সমস্তই প্রয়োগ করিল, কিছুই ফল হইল না। তখন সে তার দাদাকে গিয়া ধরিল যে, ওদের সঙ্গে নাই হোক, অন্ততঃ সে তাকে সঙ্গে লইয়া একদিনেরও জন্য আহত পরেশকে যেন দেখাইয়া আনে।

অতীশ তার মাকে লুকাইয়া অনেক কিছু করিয়া বেড়ায়, এ সব কাজে তার হাতযশ আছে, বোনের সুমতি দেখিয়া সে খুসী হইয়া হাত পাতিল, "কি দিবি?"

প্রিয় বলিল, "পঁচিশটা টাকা, ঐটেই মাত্র আছে, আর কিছু নেই হাতে।"

অতীশ গম্ভীর হইয়া বলিল, "আমার হাতে নবডঙ্কা, ঐতেই রাহা খরচ করতে হবে, ওটা সঙ্গে নিবি। তা' আমি না হয় ধারে কারবার করতে রাজী আছি, ব্যারিষ্টারের গিন্নি হয়ে ওর কাছে যখন মুঠো মুঠো মোহর পাবি, তখন দুএক মুঠো এদিক দিয়ে ছড়িয়ে দিস্, তাহলেই হবে খন'।"

বিস্মিত হইয়া প্রিয় প্রশ্ন করিল, মোহর?"

অতীশ কহিল, "নয় তো কি? এঃ তুই এমন বোকা! ব্যারিষ্টাররা যে ফি পায়, তাকে বলে মোহর। পাওয়া অবশ্য টাকা বা ছাপের কাগজেই সেটা পেয়ে থাকে, ওটা একটা পুরোনো ট্রাডিসন। এককালে মোহর চলিত ছিল, আজও বিলাতে পাউণ্ড চলে।"

প্রিয়র বিস্ফারিতচক্ষু সহজ হইয়া আসিল, মোহরের বাগানের কল্পনা হইতে স্বভাবে ফিরিয়া সে বলিল, "তা'হলে কবে যাবে?"

"দাঁড়া দেখি!" বলিয়া অতীশ উঠিতে উঠিতে ফিরিয়া দাঁড়াইল, "তৈরি হয়ে থাকিস্ আমি একটা প্ল্যান তৈরি করি একটু ভেবে চিন্তে ততক্ষণ।"

প্রিয় টাকাগুলি বাহির করিয়া ছোট্ট একটী মনিব্যাগে ভরিল, কি ভাবিয়া একটী সোনার আংটী ও কানের দুটী দুল ঐ সঙ্গে ভরিল। একটা ছোট স্যুটকেসে যতটা সাদাসিধা কাপড় তার ছিল, বাছিয়া বাছিয়া ভরিল এবং নিতান্ত আবশ্যকীয় জিনিষপত্র যা নেহাৎ না লইলে নয় তাহা ভিন্ন আর কিছুই লইল না। আগ্রহে আশঙ্কায় তার চিত্ত এমনই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, হৃদ্‌স্পন্দন এতই দ্রুত হইয়া উঠিতেছে যে, ভাল করিয়া যেন সে চলিতে ফিরিতেও পারিতেছিলনা। নিজের এই একান্ত অপরিচিত মনোভাবের কোন

অর্থগ্রহণও সে যেন করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। এমন করিয়া ত কই আর কখনও আর কাহারও জন্য সে আকুলতা অনুভব করে নাই!

মা তাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, সেকরা পান্না-মতির সেটটা আনিয়াছে, চুড়ি ব্রেসলেটের মাপটা ঠিক আছে কিনা হাতে পরাইয়া দেখিয়া লইবে, তারপর "ফিনিসিংটাচ" দিবে। মা বলিলেন, "হাতে পর দেখি, মাপটা যেন একটু বেশী বড় হয়েছে মনে হচ্চে, না?"

প্রিয় নিস্পৃহকণ্ঠে কহিল, "কই না, ওঠিকই আছে।" সে প্রস্থানোদ্যত হইল।

"না না, পরেই দেখনা, কি এমন মহা ভার বইতে বলা হচ্চে, জড়োয়া জিনিষ সোনার মত হাতে ঝন মন করলে ঠিক মানায়না, বেশ কাপে-কাপ্ বসে থাকবে, তবেই না ওর বাহার।"

নিরুৎসাহভাবেই প্রিয় আদেশ পালন করিল, মা বলিলেন, "নাঃ ঠিকই হয়েছে! আচ্ছা দে' খুলে দে'।"

অতীশ অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ঘরে ঢুকিয়াই দ্রুতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "শিগগির তৈরি হয়ে নাও মা, বোলপুর যেতে হবে, কাল ওখানে একজন অদ্ভুত শক্তিমান রাসিয়ান ডান্সার আসছেন, যুদ্ধের জন্য উনি নৃত্য করে টাকা তুলছেন, এমন নাচ নাকি কেউ কখনও দেখেনি, তোমায় দেখাবো।"

মা অবাক্ হইয়া গিয়া কহিলেন, "ওমা! ছেলের একবার কথা শোন! আমার নাকি এখন সেই সময়, আমি এখুণি ঘর সংসার ফেলে হুড়মুড় করে সেই তোমার বোলপুরের নৃত্যশালায় ছুটি! পাগল ত হইনি।"

অতীশ একান্ত অসহিষ্ণুতার সহিত কহিয়া উঠিল, "পাগল হওনি বলেই ত বলছি এ যদি হাতে পেয়ে না দেখ, তা হলেই কিন্তু সভ্য সমাজের লোকেরা তোমায় পাগলই বল্‌বে। নাও ওঠো, ওঠো, শিগ্‌গির তৈরি হয়ে নাও, বেশী দেরি করলে ট্রেন ধরতে পার্ব্বোনা, তোমারও মাটি হবে, আমারও মাটি হবে।" অতীশ অনিচ্ছুক মায়ের হাত ধরিয়া টানিয়া উঠাইতে গেল। মার কিন্তু নাচ দেখিবার ইচ্ছা নাই, তিনি আল্‌গাভাবে ধরা হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া ছেলেকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন, "কি ক্ষেপামি করিস্ বলতো? বিয়ের মাত্তর মাসখানেক আছে, চারিদিকে কত কাজ, কত ঝঞ্ঝাট, এই কি বুড়ো বয়েসে খুকিপনা করে আমার নাচ দেখতে বাড়ী ছেড়ে ছোটবার সময়? এইতো দেখছিস্ জহুরী বসে রয়েছেন, সেকরা দরজী কে'না আসছে! যেতে হয় তুই নিজে যা'না বাপু।"

প্রিয়তমা ব্যাপারটা বুঝিয়া লইতে এতক্ষণ নীরব ছিল, এইবার অগ্রসর হইয়া আসিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া আবদারেসুরে মায়ের অসমাপ্ত কথার পাদপূরণ করিয়া দিল, "আর ঐ প্রিয়টাকে নিয়ে যা'। আহা ছেলে মানুষ ওদেরই ত এখন দেখবার শোনবার সময়।"

মা কিছু বলিবার আগেই অতীশ ধমকধামক করিয়া উঠিল, "তোকে নিয়ে যাবো! কিছুতেই না। মা শুনচো, তোমার আহ্লাদী মেয়ের আব্দারটা? একমাস পরে ব্যারিষ্টারের সঙ্গে বিয়ে, হীরের নেকলেশ আগাম বায়না নিয়ে বসে আছেন, আমি যাবো ওঁকে নিয়ে নাচ দেখাতে! না বাপু, তোমার মত চড়াদরের মালের দায়িত্ব আমি নিতে পার্ব্বোনা। দরকার নেই ওসব ঝঞ্ঝাটে পড়বার, বেশ...তাহলে আমি একলাই চল্লুম।"

অতীশ চলিয়া যায়, প্রিয় আবদারের কান্নায় গলা ধরাইয়া মাকে বলিল, "শুনলে তুমি, তোমার ছেলের কথা? বাব্বা! তোমার হাতে যে মেয়ে পড়বে, তার কি দশাই যে, তুমি করবে! মেয়ে বলে আমি হলুম খদ্দেরের মাল'! কেন আমার বাপ মা কি টাকা নিয়ে আমায় কারু কাছে বিক্রি করছেন? আমার একটা আত্মমর্য্যাদা নেই? বিয়ে না হতেই আমি ঐ হীরের নেকলেশের দায়ে ওদের কাছে বিক্রি হয়ে গেছি? অতবড় একটা সুযোগ, একদুদিনের জন্য অমন একটা জায়গায় যাওয়া সে আমার হবেনা? কবে কা'দের বাড়ী আমায় যেতে হবে বলে দিন গুণে গুণে বসে থাকতে হবে? এ সব তোমার উনবিংশ শতাব্দির পচা আইডিয়া তুমি শিকেয় তুলে রেখে দাওগে' দাদা!"

অতীশ দরজায় পা দিয়া উত্তর করিল, "কতকগুলো নীতি আছে যা' সনাতন! যেমন "পথে নারী বিবর্জ্জিতা।"

প্রিয় ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "চাইনে যেতে তোমার সঙ্গে! মা আবার লোককে বড়াই করে বলেন! মার ছেলেটিত সেই পঞ্চদশ শতাব্দির আবহাওয়া সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াচ্চে! পুরুৎমশাইএর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের ঠিক করছি দাঁড়াও না। বাবা ঠিক মত দেবেন, মাও দেখ, তখন না বলতে পার্ব্বেন না।"

অনুপমা ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন, "নিয়ে যা'না ওকে, দেখেই আসুক। না যেতে পেলে ঘরে বসে বসে কথার ঘায়ে আমায় ত পুড়িয়ে পুড়িয়ে মারবে।"

অতীশ দিব্য গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, "আহ্লাদী মেয়ে যা হুকুম কর্ব্বেন তাই শুনতে হবে? পুরন্দরের জীবন তা'হলে যে অতিষ্ঠ করে তুলবে, অত প্রশ্রয় ওকে তুমি কি করে দিচ্চো, মা!"

মা তাঁর কথার প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারেন না, নিজের বিশেষ ইচ্ছা না থাকিলেও আত্মমর্য্যাদার খাতিরে ভারি গলায় জবাব দিলেন, "তা' যা' ওর বরাতে আছে হবে, ছেলেমানুষ একটা আবদার ধরেছে শোনই না, এর পরে ত আর তোকে বলতে যাবে না।"

অতীশ বক্রকটাক্ষে বোনের হর্ষোৎফুল্ল মুখখানা দেখিয়া লইয়া নিজের মর্য্যাদা বজায় রাখিয়াই কহিল, "নাও, চট করে উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি তৈরি হও, মনে রেখ, নাচ দেখতে যাচ্চো, নাচতে যাচ্চো না! বেনারসী জর্জ্জেট, ক্রেপডিসিন ঢাকাই জংলা ফংলা পরোনা, ভদ্রলোকের মতন খুব সাদাসিধে সেজো এবং সঙ্গেও নিও, ওখানের তাই চাল। লীপ্‌ষ্টিক যদি লীপে মাখো তো হাওড়া ষ্টেশন থেকেই ফেরৎ পাঠাবো, তা' বলে দিচ্চি।"

প্রিয় আনন্দস্মিত মুখে উঠিয়া উৎফুল্লকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁগো হ্যাঁ, আমি যেন চব্বিশঘণ্টা লীপষ্টীক্ লাগিয়েই বসে রয়েছি, দোব তোমার এমন বউ এনে, দেখবে তখন লীপষ্টীক লাগানো কা'কে বলে, দুটী ঠোঁট দেখলে মনে হবে, এক জোড়া টুকটুকে পাকা তেলা কুচো।"

(৪)

আধপোড়া ও ভস্মীভূত কুটীরের শ্রেণী, গৃহহীন নিরাশ্রয় অভুক্ত কঙ্কালসার নরনারী, সদ্যশোকার্ত্ত মাতার আর্ত্ত বিলাপ ডুবাইয়া ক্ষুধার্ত্ত শিশুদলের করুণ আর্ত্তনাদ—

প্রিয়তমা স্তম্ভিত হইয়া রহিল! ঐ কলিকাতার প্রাসাদমণ্ডিত নগরীর বাহিরে, অতগুলো সিনেমা হাউসের নাট্যালয়ের অসংখ্য ভিড়ের, সহস্র সহস্র বিলাসবৈভব প্রসাধিত বিপণী শ্রেণীর অন্তরালে এতবড় নিষ্ঠুর অকরুণ অবস্থা মানুষের জন্য রক্ষিত আছে?

পরেশের সংজ্ঞা ফিরিয়াছিল, সহর হইতে একজন ভাল ডাক্তার আসিয়াছিলেন, তাঁর বিশেষ চেষ্টায় তাকে হাঁসপাতালে নেওয়া হইয়াছিল। দেহবিদ্ধ গুলি বাহির করার পর তৃতীয়দিনে তার জীবনের আশা করা হইতেছে। গ্রামে আসিয়া এসব সংবাদ পাইতেই অতীশ ও প্রিয়তমা হাঁসপাতালে গিয়া তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল।

পরেশ প্রিয়কে চিনিতে পারিয়া অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, কথা কহিতে রীতিমত কষ্ট হয়, তথাপি কোনমতে বলিয়া উঠিল, "একি অসম্ভব কাণ্ড! আপনি এখানে? এ কেমন করে হ'ল?"

প্রিয় কাছে বসিয়া তার মুখের কাছে মুখ নত করিয়া অতি মৃদু বচনে কহিল, "আমিও জানিনা, কিন্তু হ'ল তো! তুমি কথা কয়ো না, শুধু আমি কি করতে পারি এইটুকু বলো"

অতীশও কাছে সরিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, "আমাকেও?"

পরেশের ক্লান্ত করুণ নিরক্ত মুখে একটা তীব্র রশ্মিছটা অকস্মাৎ বিচ্ছুরিত হইয়া উঠিল, সে তার শক্তির অতীত ঈষৎ একটু জোরের সঙ্গেই দুজনকার দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "তবে গ্রামে যাও, ওদের বাঁচাবার বন্দোবস্ত কর, আর শুধু ঐ একটী গ্রামই নয়, বাংলার লক্ষ লক্ষ গ্রামের এটী ত একটী প্রতীক মাত্র!"

প্রিয় পরেশকে স্পর্শ করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "আজ থেকে আমার এই জীবনের ব্রত হ'ল।"

অতীশও সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র সম্মোহিতের মত সম কণ্ঠেই উচ্চারণ করিল, "আমারও।"

ছেলে মেয়েদের নাচ দেখিতে যাওয়ার তৃতীয় দিনে অনুপমা দুজনের নিকট হইতেই দুখানি পত্র পাইলেন, অবশ্য একখানি খামের মধ্যেই সে পত্র দুখানি আসিয়াছিল। বাজে খাতা ছেঁড়া কাগজে পেনসিল দিয়া লেখা, প্রিয়র পত্রখানি এই প্রকার;—

শ্রীচরণ কমলেষু

মাগো, তুমি বোধ হয় এ জন্মে আর কখন তোমার মেয়েকে ক্ষমা করতে পারবে না! পার্ব্বে কি? কিন্তু কেন পার্ব্বে না মা?—তুমিই তো আমায় চিরদিন ধরে শিখিয়েছ, নারী পুরুষের মধ্যে কোন ভেদ নেই, পুরুষ যা পারে, নারীও তার অধিকারী। তবে আজ যদি আমি স্যার অনুকূল রায়ের বিপুল ঐশ্বর্য্য ও তাঁর ব্যারিষ্টার ছেলেকে ছেড়ে আমার জীবনের গতি ভিন্নপথে পরিচালিত করতে চাই, কেন পাবো না? দাদা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে, সে এখানে অত্যাচার-বিধ্বস্ত পল্লীবাসীদের জন্য অনেকের সঙ্গে মিলে কাজ

আরম্ভ করেছে, আমিও তাকে অনুসরণ করেছি। মেয়ে আমাদের দলে বেশী নেই, আমরা দুজন মাত্র, কিন্তু আমার দৃষ্টান্ত নাকি শীঘ্রই খুব কার্য্যকরী হয়ে উঠবে! আচ্ছা, বড় লোকের বউ হলে কি আমাকে কেউ অনুসরণ করতো? বড় জোর আমার গহনা কাপড়েরই করতো। বাবাকে চিঠি আমি পরে লিখবো, এ চিঠি তাঁকে তুমি দেখিও এবং বলো, স্যার-রায়কেও দেখাতে। তিনি বুদ্ধিমান ও ভাল লোক, তিনি বুঝবেন বুঝে আমায় হয়ত ক্ষমা করলেও করতে পারেন। না যদি করেন, অন্ততঃ এমন একটা বেয়াড়া মেয়ে যে তাঁর পুত্রবধূ হয়নি, এতে সুখীই হবেন।

"আমার জন্য কোন ভয় করো না মা! দাদা আমার সহায় আছে, সে আমায় সকল অকল্যাণ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। আমি সতীর মেয়ে সতী, আমার আবার ভয় কি? শত কোটী প্রণাম নিও। পরেশদার জীবনের আশা খুবই কম।

তোমার অবাধ্য মেয়ে—প্রিয়।

একহপ্তা পরে দুই হাজার টাকা ও স্যার অনুকূলের পত্র আসিল।

মা আমার! তোমার বাবার ফেরৎ দেওয়া হীরের নেকলেশ বিক্রী করে এই টাকা তোমার কাজের জন্য পাঠালাম। আমরা তিনজনেই তোমার প্রতীক্ষা করে রইলুম। তোমার অবসর হ'লে আমাদের মধ্যে একদিন তুমি ফিরে এস।

তোমার—ছেলে।

লালু তার নাম। একেবারে যাকে বলে রাস্তার কুকুর।

কিন্তু রাস্তার কুকুরের মত তার স্বভাব ছিল না। রবীন্দ্রনাথের খাবার সময় সে রোজ চুপটী করে নীচে পেছন ফিরে বসে থাকতো, ভাবটা যেন, সে এমনি বসে আছে। কেউ হ্যাংলা বলে গালাগাল দিলে চুপটী করে চলে যেতো।

খাওয়া হয়ে গেলে রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর পাত থেকে তাকে খেতে দিতেন। বিশ্বকবির প্রসাদ পেয়ে সন্তুষ্টচিত্তে সে চলে যেতো।

তখন উত্তরায়ণে রবীন্দ্রনাথ শেষ রোগ-শয্যায় শায়িত। জ্বরের মধ্যে মনে পড়লো, লালুর কথা। সকলকে ডেকে বলে দিলেন, লালু যদি তাঁর ঘরে আসে তাকে যেন কেউ বাধা না দেয়।

রোজ একবার করে লালু ওপরে উঠে এসে তাঁকে দেখে আবার চলে যেতো…

বিশ্ব-কবি তাতে পরম তৃপ্তি বোধ করতেন…

জঙ্গলের অভিজ্ঞতা
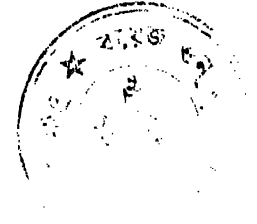
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

গল্পটা শোনা, নিজের মত করেই বলি। পোড়ো বাড়ী, বাতিল ফরেষ্ট বাংলো। সামনে বারান্দার মত খানিকটা জায়গা, এখন তার সমতল রূপ অদৃশ্য। বেশীর ভাগ স্থানেই ভাঙ্গা পাথরের চাঁই স্তুপিকৃত হয়ে আছে। যেটুকু জায়গা ব্যবহারোপযোগী সেটুকুও ভীতিপূর্ণ ছোট-বড় গহ্বরে ভরা। গর্ত্তগুলি দেখলেই মন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে। আসে পাশে, বিষধরের বিক্ষিপ্ত খোলস। দেওয়ালে চুণ বালির বালাই নেই। খিলানের জায়গাটা ইটের গাঁথুনী নোনায় জরে গিয়েছে। এই খানেই শিকারের আড্ডা গাড়া গিয়েছিল।

জায়গাটা লেগেছিল ভাল, উঁচু টিলার উপর থেকে সব দিক দেখা যায়। চারধারে মাইলের পর মাইল পাহাড় এবং গভীর জঙ্গল। বাংলোর পাশেই গভীর খাদ কতশত ফিট খাড়াই ভাবে তলায় নেমে গিয়েছে বোঝবার উপায় নেই। নিকটে গিয়ে নিচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। খাদের পাদ-মূলে বিস্তৃত সমতলভূমি কতকটা উপত্যকার মত, নূতন বর্ষার আগমনে পোড়া মাটিতে সবুজের সাড়া পড়ে গিয়েছে। উপত্যকার বুকের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে ঝরণা-বহা ক্ষীণ স্রোতস্বিনী দূরান্তরের দিকে।

আবেষ্টনীতে শব্দ নেই সব নিঝুম। অকস্মাৎ দূরে শ্যামবার হরিণের আর্ত্তনাদ অথবা নিকটে পেচকের অস্বস্তিকর রব শোনা যায়।

দুপুরে আমার বন্ধু ফরেষ্টার (forester) ও কুলীদের নিয়ে রসদ সংগ্রহ করতে সুদুর গ্রামে চলে গিয়েছিলেন। ক্রোশ খানেক হাঁটলে জরিলের রাজপথেই মোটর বাস ধরা যায়। কথা ছিল জঙ্গলীদের গ্রাম থেকে আলাদা কুলী পাঠিয়ে দেবেন মাচান তৈয়ারীর জন্য। তারাও আসেনি, একেবারে একলা পড়ে গিয়েছি। বেলা তখন পড়ে এসেছে। এতক্ষণেও যখন কেউ এল না তখন বুঝতে বাকি রইল না বন্ধু ফিরতি পথে বাস ধরতে পারেননি। কিন্তু মাচান বাঁধার জন্য নিকট গ্রামের জঙ্গলীরা এল না কেন?

দেখতে দেখতে দিনের আলো শেষ হয়ে আসতে লাগল। পাহাড়ে গোধূলির রশ্মি অনেকক্ষণ থাকলেও হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যায়। বিবেচনা করে দেখলাম, এখন থেকেই হ্যারিকেন লণ্ঠনগুলো জেলে রাখা ভাল। পুবমুখো ঘর, সেই দিকটাই নিরেট দেয়াল, মাত্র একটি দরজা, বিপরীত দিকে জানালা থাকলেও, গোধূলির আলো শেষ হলেই ঘর অন্ধকারে ভরে যাবে। ঘরের ভিতর যা অবস্থা তাতে মা মনসার শত দোহাই পাড়লেও আচমকা অন্ধকারে কিছুর উপর পা চাপিয়ে দেয়া বিচিত্র নয়। উঠলাম আলো জালতে।

ভিতরে ঢুকতেই মনে হল পিছনের ভাঙ্গা জানালাটার বাইরে কি যেন হঠাৎ সরে গেল, হয়ত আমাকে দেখছিল। চলাটা মানুষের মত নয়, খটকা লেগে গেল। মুখুজ্জ্যে মশাই এর মহীশুরের নরভুকের গল্প চোখের সামনে সাক্ষাৎ ঘটনার মত হয়ে উঠল। কালবিলম্ব না করে ভরা দোনলাটা তুলে নিয়ে সন্তর্পণে ঘর থেকে বার হলুম। জানালার যে দিকে জানোয়ারকে চলতে দেখেছিলাম সেই গতি অনুসরণ কোরে আস্তে আস্তে এগুতে লাগলাম, যথা স্থানে এসে দেখি কোথাও কিছু নেই। অযথা আতঙ্কের জন্য লজ্জা এল। ফিরে এলাম ঘরে। ফিরে এসে, ম্যাগাজীন ভারী রাইফেলটা ভোরে রাখবার ইচ্ছে এল কিন্তু সেটা তখনো বাক্স থেকে বার করা হয় নি। ঘরের ভিতর বেশী আওয়াজ করার সাহসও ছিল না, ঠিক করলাম মাটির তলায় গর্ত্তের জীবকে ঘাঁটিয়ে লাভ নাই।

অল্প সময়ের ভিতর অন্ধকার যেন তেড়ে এসে সব কিছু ঘিরে ফেললে। এই সময়টা কিরকম লাগে তা একলা গভীর জঙ্গলে না থাকলে অভিজ্ঞতা হাত বদল করবার উপায় নেই।

ঘরে একটি জানালা, তার পাল্লাও গরাদহীন, হাঁ হাঁ করছে! আলো জেলে জানালার উপরেই রাখলুম, ভদ্র বাঘ হলে ঘরের ভিতর খানাতল্লাসী করতে আসবে না। একটি খবর জানা ছিল এ অঞ্চল বাঘে ভরা হলেও এমন কোনটা নরভুকের উচ্চাসন দখল করেনি।

ছুটো লণ্ঠনই জ্বেলেছিলাম। একটা মেজেতে রাখতে আশ্বস্ত হওয়া গেল। বসতে গিয়ে মনে পড়ল দরজাটাও বন্ধ করতে হয়। দীর্ঘকাল ধরে বাংলো এই অবস্থায় পড়ে আছে। বাঘ না এলেও ঘরটি যে গুহার বাসিন্দা, ভালুকের প্রেমকেলীর জায়গা নয় তা কে বলতে পারে। জোর করে দরজা বন্ধ করতে যেতে পাল্লার উপরকার কব্জার জোর খুলে গিয়ে কবাট আর একটু হলেই মাথায় পড়েছিল। কোন-প্রকারে মাথা বাঁচিয়ে সেটাকে ভেজান গেল। তবু খুঁৎখুঁতে ভাব কাটিয়ে উঠতে পারলাম না। একদিকে খোলা জানালা অপর দিকে মাত্র ভেজান পতনোন্মুখ দরজা। একটা দিক অন্ততঃ নিরাপদ হওয়া দরকার। দরজায় মোটা পাথরের চাঁই ঠেকা দিতে পারলে কতকটা নিশ্চিন্ত হওয়া চলে। সামান্য সন্ধানেই মনের মত ছুইটি পাথরের চাঁই পেলাম, ভাঙ্গা ছাদের টুকরো। পাথর দরজায় ঠেকা দিয়ে বসতে যাব ছাদের ভাঙ্গা খোলা জায়গাটা ক্ষণিকের জন্য আড়াল পড়ল তারপরই আলগা গাঁথুনির টুকরো ঝরে পড়তে লাগল। পাথরের নুড়ী ঘরের ভিতর ছাদ ধসা শুকনো বালিও পাথরের উপর পড়তে, লণ্ঠনের আলোয়, ধুলো হালকা ধোঁয়ার মত সারাটা ঘর ঘিরে ফেললে। ভগ্নস্তূপের নুড়ী পড়তে সতর্কিত হতে হয়েছিল। উপরে আলোর আড়ালে সন্দেহ এলেও ঘরের ভিতর সরীসৃপের ভয়ে আতঙ্কিত হয়েছিলাম।

আশ্চর্যের ব্যাপার ছাদের আলো আড়াল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট শুনলাম পিছনে জানালার দিকে বেজায় ভারী দেহী জমাট তুলার উপর লাফিয়ে পড়ার মত আওয়াজ। ভাবলাম বন্দুক নিয়ে উঠে দেখি, কিন্তু দরজার কাছেই যদি সন্দেহের জীবটি লুকিয়ে থাকে তাহলে তার দিকে বন্দুক ফেরাবার আগেই হয়ত আমার ভবলীলা শেষ হয়ে যাবে। শেষপর্যন্ত ঘরের ভিতরই বসে থাকা যুক্তিসঙ্গত। মনকে স্তোক

দিলাম উপর থেকে সুড়ী পড়ার পরেও যখন কিছু অঘটন ঘটেনি তখন আমার আতঙ্ক অর্থহীন। যুক্তি-গুলি আপনা থেকে আত্মরক্ষার জন্য গড়ে উঠছিল। আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে আত্ম নির্দিষ্ট সতর্কতা যাবতীয় প্রাণীরই বাঁচার অবলম্বন—তবে মানুষ instinct ছাড়া বুদ্ধিকে ব্যবহার করে থাকে। উপস্থিত ক্ষেত্রে বুদ্ধি নানা রকম সম্ভাবনার ফাঁপরে ফেলে দিল।

ঘরের ভিতরও বসে থাকা যথেষ্ট নিরাপদ মনে করতে পারছিলাম না।

সিদ্ধান্ত দাঁড়াল বিষধরের মত সাক্ষাৎ যমের সঙ্গে বাস করা অপেক্ষা যে কোন বিপদের সামনে এগিয়ে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত। পরিত্রাণের স্থান ছাদের উপরে। ওখানে উঠতে পারলে, আক্রমণকারীর সঙ্গে অন্ততঃ বোঝাপড়ার সুবিধা পাওয়া যাবে। দোনলা প্যারাডনের (Paradon) দিকে তাকাতে আত্মনির্দিষ্ট ভরসায় বলীয়ান হয়ে উঠলুম। ছাদ হাতের নাগালেই সাড়ে সাত ফিটের উপর হবে না। প্রাচীন কালের কম খরচায় জঙ্গলী বিশ্রামাগারের উচ্চতাকে শোভনীয়ই বলতে হবে। কিন্তু যেখান দিয়ে উঠব সেইখানেই তো সাপের কেল্লা। ইতস্ততঃ করছি এমনি সময় স্পষ্ট শুনলাম, ছাদের উপর কোন জন্তু লাফিয়ে উঠল। ভরা বন্দুক বাগিয়ে রাখলুম, ঠিক জানতাম এইবার একটা কিছু ঘটে যাবে। অনুমান প্রমাণিত হতে সময় লাগল না। একটু পরেই খোলা জায়গাটা থেকে ছোট সুড়ী ঝরে পড়তে লাগল। তার পরই দেখলাম একটি বিশালাকার থাবা সন্ত্রস্তভাবে খানিকটা করে ঘরের ভিতর বেশ খানিকটা ঢুকে আসছে আবার ছাদের উপর উঠে যাচ্ছে। বাঘের মুখ দেখতে পাচ্ছি না থাবা থেকে বুঝলাম আমার মুখোমুখি হয়ে বসে নি। থাবার উপরই গুলী চালিয়ে দিলে কি হয়? নিজের কাছে উত্তর পেলাম, বাঘ জখম হয়ে পালাবে এবং বেশী চলতে না পেরে যদি বন্ধুর ফেরার পথে কোথাও বসে থাকে, তাহলে একজনকে সে নেবেই, আহত বাঘ, হাতীর পল্টনকেও আক্রমণ করতে ভয় পায় না। পরক্ষণেই বন্ধুকে বাঁচান অপেক্ষা নিজের বাঁচাটা বেশী প্রয়োজন মনে করলুম। তখন মরা-বাঁচার সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি—অস্বাভাবিক শক্তির আশ্রয় পেলাম।

ছাদের ফুটোর দিকে টরচ ঠিক করে সুইচ টিপে দিলাম। তীব্র বৈদ্যুতিক আলোও জ্বলেছে আর ঠিক সেই মুহূর্তে বাঘও ফুটো দিয়ে মুখ বার করেছে। রক্ত হিম হয়ে যাবার উপক্রম হল, টরচ রেখে বন্দুক তুলে নেবার ক্ষমতাটুকুও হারিয়েছি—কতকটা সম্মোহিতের মত হয়ে গিয়েছিলাম। অকস্মাৎ সাংঘাতিক তীব্র আলো চোখে পড়ায় বাঘ ভড়কে গেল, তারপরেই হুঙ্কার দিয়ে নীচে লাফিয়ে পড়ল তারপর লাফের পর লাফের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যেতে শুনলাম, নিশ্চিন্ত হলাম বাঘ আর এদিকে ফিরছে না জন্তুটা পালিয়েছে। এইবার ঘর থেকে বার হতে হয়।

স্তূপের কাছ থেকে লাফ মেরে কড়ি কিম্বা বরগা ধরে একবার ঝুলতে পারলে উপরে উঠে যাওয়া শক্ত-নয়। কিন্তু যেখানটা ধরব সেই জায়গাটা আমার ওজনে যদি ধসে যায় তাহলে সশরীরে বিষধরের সম্বর্ধনার জন্য মাটিতে পড়তে হবে।

সরীসৃপের কথা যতই ভাবতে লাগলাম ততই তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়ে উঠছিলাম কপাল দিয়ে ঘাম ঝরতে আরম্ভ করেছে, ঘরের ভিতর আর এক মিনিটও থাকা নয়, পলে পলে মৃত্যুকে কাছে ডেকে আনা অপেক্ষা বাঘের কামড় ঢের বেশী বাঞ্ছনীয়।

বন্ধুর বাঁধা হোলড্ অল (Hold all) চোখে পড়ল দ্বিধা না করে উঠলুম। পিঠে বন্দুক ঝুলিয়ে ধীরে বাঁধা বিছানা তুলে নিয়ে স্তুপের কাছে শুধু পায়ে এগুতে লাগলুম। অতি সন্তর্পণে বিছানা তার উপর রেখে, কোটের পকেটে চৌকো শিকারের টরচ পুরে ফেলতে সময় লাগল না। তারপর আরো সন্তর্পণে তার উপর উঠতে আমার মাথা ছাদের উপর এসে পড়ল—পিঠের বন্দুক ছাদে রেখে, দুইটি হাত ভাঙ্গা জায়গার কিনারায় রাখতে পায়ের তলার একটু বেসামাল হয়েছিল। নড়া চড়ায় বিছানার তলার খানিকটা স্তূপ ধসে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমি ঝাঁকুনি দিয়ে প্যারালাল (paralell) বারে ঝোলার মত মাটি থেকে উঠে পড়লাম। তখন কোমর থেকে দেহের নিম্নাংশ ঘরের ভিতর দোল খাচ্ছে। এই সময় ঘরের ভিতর যেসব শব্দ আরম্ভ হল তার সঠিক বর্ণনা দেবার শক্তি আমার নেই। একাধিক সাপের ছোবল একটির পর একটি পড়তে আরম্ভ করেছে, তাড়াতাড়ি উপরেও উঠতে পারছি না হাঁটু দুটো মুড়ে মাটি থেকে শরীর আরো একটু উপরে তুলে কোন প্রকারে ছাদের উপরে এসে পৌছালাম। ধড়ে প্রাণ এল। উপরে উঠেই প্রথমে জঙ্গলের আস পাশ দেখে নেয়া দরকার বোধ করলুম। উঠে দাঁড়িয়ে সবে টরচ পিছন দিকে ফেলেছি, দেখি নিচেই প্রকাণ্ড বাঘ, উপরে লাফাবার জন্য অপেক্ষা করছিল হয়ত আর এক মুহূর্ত্ত টরচ জ্বলতে দেরী হলে আমার কোলের উপরেই এসে পড়ত।

আলো পড়তে বাঘ সামনের একটা ঝোপের দিকে ছুটতে লাগল। টরচ ঠিক রেখে বন্দুক তুলে নিতে নিতে, জানোয়ার ঝোপের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। টরচটি বন্দুকের সঙ্গে লাগিয়ে নেবার ব্যবস্থা ছিল। গোড়াতেই সংলগ্ন করে নিলে হাতে পাওয়া শিকার ফসকাতো না। নিজেকে স্তোক দিলাম যাক্ সাপের ছোবল থেকে বেঁচে গিয়েছি এই ঢের।

কিন্তু বড় বাঘের এইরূপ আচরণ আমি কখন দেখিনি। লেপার্ড (চিতা নয়) অবশ্য তাড়া খেয়েও বার বার ফিরে আসে কিন্তু বড় বাঘ (stripes) একবার ভড়কালে তাকে কখন ফিরতে দেখিনি। আসলে জানোয়ারটা মূর্খ, কোন শিকারীর সঙ্গে পরিচয় হয়নি বলেই মনে হল। তবু তার সাহসের কারণ অনুসন্ধান করতে লাগলাম। ছাদ পরীক্ষা কালে দেখি ধূলায় ভরা, সর্ব্বত্র জন্তুটির থাবার দাগ পড়েছে তার উপর, ভাঙ্গা জায়গাটার পাশেই তার বসবার জায়গা। অর্থাৎ বাঘ প্রত্যহ এই ছাদটিকে observatory করে—শিকারের অপেক্ষায় ওৎপেতে বসা সঙ্গত দাবী করে ফেলেছিল। ঘরের ভিতর আলো আর মানুষের গন্ধে সন্দিগ্ধ হওয়ায় অনধিকার চর্চ্চায় ব্যস্ত জীবটি কে জানবার কৌতূহল দমন করতে পারে নি। এইবার ঘরের ভিতর কি ব্যাপার চলেছে জানবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল, এগিয়ে গিয়ে বন্দুকে লাগান টরচের আলো ঘরের ভিতর ফেললাম। লোমহর্ষণকর দৃশ্য—চার পাঁচটা অতিকায় বিষধর, ঘরের চার পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর হোলড্-অলের উপর একটি রাজগোক্ষুরা সাড়ে তিনফিটের কাছা-

কাছি খাড়া হয়ে ফণা ধরে দুলছে। আক্রোশ তার বাঁধা বিছানাটার উপর, হয়ত এক আধটা ছোবল ইতিমধ্যে দিয়েও ফেলে থাকবে। বন্দুকে লিথেল বল ভরা ছিল গুলী চালাতে সাহস পেলাম না। পাথরে লেগে ঠিকরে আমারই উপর ফিরে আসতে পারে। এইবার সামলে বসা দরকার, বাঘের যে বিচিত্র আচরণ দেখলাম তাতে সমস্ত রাত জেগে নিজেকে পাহারা না দিলে যে কোন মুহূর্ত্তে বিপদে পড়তে পারি।

বাংলোটি এমন একটি জায়গায় প্রস্তুত হয়েছিল যার নিকটেই চার পাঁচটি জন্তু চলার পথ এক জায়গায় এসে মিশেছে। খাদের নীচে পূর্ব্ববর্ণিত নদী ভিন্ন এ অঞ্চলে আর কোথাও জল পাওয়া যায় না। সুতরাং তৃষ্ণার্ত্তকে সঙ্গমস্থলটি মাড়িয়ে যেতে হবেই। মওড়াটি পছন্দ হয়েছিল বলেই এইখানেই আস্তানা গেড়েছিলাম। মাচান যেখানে বাঁধবো ঠিক করেছিলুম সে জায়গাটা এখান থেকে মাত্র ১০০ খানেক গজ দূরে, সঙ্গমস্থলটির পাশেই। টরচের আলোর পাল্লার পক্ষে বাংলো একটু দূরে।

আর একবার বন্দুক সংলগ্ন আলো ফেলে নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করতে লাগলাম। রাত জাগার উপকরণ শিকারে সব সময় সঙ্গে রাখি। পকেটেই থাকে। ফ্লাস্ক (flask) বার করতেই মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল, রসের রাজ্যে হাজিরা দিতে প্রায় দুই ঘণ্টা দেরী হয়ে গিয়েছিল। বুক পকেটে অধিকন্তু টোটাগুলি ঠিক আছে দেখে, প্রথম চুমুকের পর সিগারেট ধরালাম। নিটের ক্রিয়াই আলাদা, সঙ্গে সঙ্গে উগ্র তরল শক্তির সন্ধান দিতে লাগল, শিকারের আশায় বসিনি সুতরাং সিগারেট আর তরলের গন্ধ লুকাবার তেমন প্রয়োজন দেখলাম না। উভয় দিক দিয়েই যশ—আমাকে স্বনামধন্য পুরুষ করে ছেড়েছে। শিল্পীরা বলে, আমার মুখের সামনে সিগারেটের সাদা ধোঁয়া না থাকলে না কি আমার চেহারাই মেলান যায় না। আর উগ্রতরল সম্বন্ধে বলাই বৃথা—সোজা কথা লুকো-ছাপার বালাই অনেক দিন কাটিয়ে বসে আছি। কথায় বলে "ল্যাংটার নেই বাট পাড়ের ভয়।" গুণ কিছু থাকলে তবে তো তার হারানোর ভয় থাকে।

নিটের ক্রিয়া সুরু হতে সময় লাগল না—মৌজ বাড়তে আরম্ভ করেছে, একটার পর একটা সিগারেট নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে। আবার ধরাচ্ছি,—সময় কেটে চলেছে, নিঝুম রাতে জ্যোৎস্নার আলো আমাকে রসের রাজ্যে টেনে নিতে আরম্ভ করেছে।

মওড়ার দিকেই তাকিয়ে বসেছিলাম হঠাৎ দেখলাম দুইটি বাঘ মুখোমুখি হয়ে বসে আছে। আমার কাছ থেকে একশ গজ দূরে হবে—জঙ্গলের সরকারি পথের মাঝখানে একেবারে ফাঁকায় বন্দুক তুলে আবার নামিয়ে নিলাম। কেন বলতে পারি না—আমার হিংসাবৃত্তি স্তিমিত হয়ে এসেছিল। এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন অপ্রত্যাশিত। তথাপি অনেক সময় অনেক জিনিস ঘটে, যার সঠিক কারণ সব সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। কখন পশুরাজরা আমাকে দর্শন দেবার জন্য আসন গেড়ে বসেছিল জানতে পারিনি। নতুন অভিজ্ঞতার জন্য বন্দুক প্রস্তুত রেখে চুপচাপ বসে রইলাম। কিছুক্ষণ বাদে একটি উঠে আর একটির পিছনে যাবার চেষ্টা করতে, সাংঘাতিক গর্জ্জন করে—অপরটি মাটি ছেড়ে দাঁড়াল। বুঝলাম রাজা ও রাণীর গোপনে দেখাশোনা হয়, প্রেমের দ্বন্দ্বে রাজায় রাজায় বোঝাপড়া চলেছে। অল্পক্ষণের ভিতরেই দ্বন্দ্বের প্রকরণ স্পষ্ট হয়ে উঠল একেবারে মল্লযুদ্ধ, কখন সোজা দাঁড়িয়ে উভয় উভয়কে আলিঙ্গন করছে, কখন লাফের দ্বারা নানা

পেঁচের প্রয়োগ চলেছে। নখে নখে, দাঁতে দাঁতে সংঘর্ষণ তারই সঙ্গে থেকে থেকে ভয়ঙ্কর হুঙ্কার। দ্বন্দ্বের মীমাংসা অতি সহজে নিষ্পত্তি হয়ে গেল, দেখলাম একটি রীতিমত ঘায়েল হয়ে পরিচিত ঝোপের দিকে ঢুকে গেল—আর বিজেতা চলতে লাগল জলাশয়ের দিকে। সতর্কিত গতি, খানিকটা চলে আবার পিছু ফিরে তাকায়। আমার এখান থেকে সিগারেটের ধোঁয়া, মদের গন্ধ, দেশলাই জ্বালা—কোনটা ভ্রুক্ষেপের মধ্যে আনা দরকার বোধ করেনি—এটাও অশিক্ষিত বাঘ—তার ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হবার কিছু ছিল না।

বাঘ চলে গেল। জঙ্গল পুনরায় নিস্তব্ধতার মাঝে ডুবতে সুরু করল।

তখন ফ্লাস্ক খালির দিকে এগিয়ে চলেছে। পায়ের কাছে ছাদের মেঝে সিগারেটের টুকরায় বেশ খানিকটা সাদা হয়ে গিয়েছে। মৌজ জমাট বাঁধতে আরম্ভ করেছে হঠাৎ শুনলাম দূরে বহুদূরে প্রপীড়িত নারীর আর্ত্তনাদ। আওয়াজ থেকে থেকে অধিকতর করুণ ও দীর্ঘ হয়ে উঠছে, এবং আরো নিকটে চলে আসছে। তিরুপতি তীর্থে যদি কেহ ডোলী চড়ে গিয়ে থাকেন তো শব্দের অনুকরণ দৃষ্টান্তে বুঝতে পারবেন—আর্তনাদ কতকটা ডোলী বাহকদের টানা সুরের মত। কান খাড়া করে বসেছিলাম শব্দ যথেষ্ট নিকটে এসে পড়ল। বুঝলাম, ফেউ ডাকার মত বাঘের আগমন বার্ত্তা। শেয়ালের বিকৃত ডাক নয় ভিন্ন জানোয়ারের স্বর। আমি জানোয়ারটিকে কখন দেখিনি তবে শুনেছি পোহাড়গেল সাপের নাকি সগোষ্ঠী। যাই হোক শব্দ বাংলোর নিকটে এসে থেমে গেল। আমি খাদের দিকে পিঠ করে প্রস্তুত হয়ে বসলুম। যে দিক দিয়েই রাজ্যেশ্বর আসুন না কেন আমার অজ্ঞাতে ছাদের উপর চলে আসা চলবে না। অনেকক্ষণ একই ভাবে বন্দুক হাতে বসে রইলুম কোন সাড়া নেই। আরো খানিকটা সময় কাটতে দূরে জলাশয়ের দিক থেকে ভয়াল বার্ত্তা আসতে লাগল, বাঘ ঐ দিকে চলে গিয়েছে। নিশ্চয় দূর থেকে আমাকে দেখে, চলার পথ বদলে ফেলেছিল। এতক্ষণে একটি শিক্ষিত বাঘের সন্ধান পাওয়া গেল, জন্তুটি এদিকে তিন চার দিনের ভিতর মুখ দেখাবে কিনা সন্দেহ।

শিকারে তখন আমার কোন স্পৃহা ছিল না। জ্যোৎস্নাস্নাত প্রকৃতির অপূর্ব্ব রূপ আমাকে মোহ মুগ্ধের মত জঙ্গলী করে তুলেছিল, ভাবছিলাম কেন অহেতুক এই হত্যার সৌখিনতা, আর কত কি তা বলতে পারি না সংক্ষেপে বিশাল বনস্পতিদের অবর্ণনীয় রূপ আমার অন্তরকে ভাবময় করে তুলেছিল। কারণ মুক্ত ভাবের স্রোত বাধা পেল।

ধাবমান সম্বর হরিণের ক্ষুরধ্বনি শুনলাম। সোজা পথে অবর্ণনীয় দ্রুত গতিতে আমার দিকে ছুটে আসছে।

নতুন ঘটনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। দেখতে দেখতে বড় ঘোড়ার মত একটি বিপুলাকায় হরিণ আমার চোখের সামনে দিয়ে জলাশয়ের বিপরীত দিকে চলে গেল। আমি আধ মিনিটের ভিতরেই আন্দাজ তিরিশ চল্লিশটা জঙ্গলী কুকুরকে (আকার সাধারণ দেশী কুত্তার চেয়ে ছোট) বেগে ছুটে আসতে দেখলুম। বাংলোর কাছাকাছি এসেই সব কয়টা থমকে দাঁড়িয়ে গেল তারপর পলাতক হরিণের পিছু না গিয়ে জলাশয়ের দিকে মন্থর গতিতে মোড় ফিরল। শিকার ছেড়ে দেবার কারণ অনুমান করলুম, বাংলোর

আলো। ছাদ ধসা বাংলোতে কোন সৌখীন শিকারী আসে না, সেই কারণে বৎসরের পর বৎসর পোড়ো বাড়ী হয়ত অনেক জন্তুর বিশ্রামের স্থান হয়েছিল। হঠাৎ পরিচিত জায়গার রূপ পরিবর্ত্তনে চালাক কুকুরদের আতঙ্ক আসা বিচিত্র নয়। তৃষ্ণার্ত্ত বাঘের কথা মনে পড়ল, নিশ্চয় জানতাম কুকুরের পাল তার সন্ধান পেলে, পালান শিকারের অভাব মিটিয়ে যেত, জীবন্ত বাঘের মাংস টুকরো টুকরো কোরে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে।

কুকুরের পালও দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। মৌতাত ঝিমিয়ে আসছিল। নিজের অজ্ঞাতেই ফ্লাস্কের দিকে হাত চলে গেল। অপ্রীতিকর অনুভূতি পাত্রটির ওজন কমে গিয়েছে। সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় সঞ্চয়ের কথা ভুললাম কিন্তু রসের টান এমনই বেড়ে উঠল যে শেষ-রক্ষা করতে পারলাম না, বোতল খালি হয়ে গেল।

নিট রংদার হয়ে উঠল। বাঘ ভালুক তখন আমার দোস্ত হয়ে গিয়েছে। নিজেকে জঙ্গলের একজন বিশিষ্ট প্রাণী ভাবতে আরম্ভ করেছি।

নিঝুম রাত বোধ হয় দ্বিপ্রহর পার হয়ে গিয়ে থাকবে। এমনই একটি স্থান যে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক পর্য্যন্ত নেই। অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতার মাঝে বসে আছি। নিটের ক্রিয়া দারুণ ভাবে দ্রুত বেড়ে চলেছে। অহিংসা মতবাদের প্রতি সঙ্গত আক্রোশ আসতে সুরু করে দিল। বন্দুক হাতে বসে থাকা বিড়ম্বনা মনে বোধ করছিলাম। ভাবলাম, যে-ঝোপটায় বার বার বাঘকে ঢুকতে দেখলুম সেখানটা চেষ্টা করে দেখলে কি হয়। এখান থেকে ঝোপ পর্য্যন্ত একেবারে ফাঁকা। আমাকে নিকটে আসতে দেখে যদি ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসে, তাহলেও চার পাঁচ লাফের কমে আমার কাছে আসতে পারবে না। তবে আহত না হলে অত দূর থেকে বাঘ সহজে আক্রমণও করতে আসেনা। একমাত্র উপায় আছে ঐ পাশের টিলাটার কাছে যেতে পারলে ২০—২৫ গজের ভিতর এসে পড়া যায়। তখন শিকার ও সুরার ডবল নেশায়, কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছি অবলীলাক্রমে সাড়ে সাত ফুট উপর থেকে লাফিয়ে পড়লাম। ভয় ছিল বন্দুকটিকে নিয়ে, সেটা সামনে দুহাতে ধরে লাফিয়েছিলাম। ঘরের ভিতর তখন আলো জ্বলছে সেদিকে আর ফিরলাম না। টিলার দিকে চলতে লাগলাম। ঝোপের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে চলেছি একটু নড়লেই বন্দুক বগলে তুলে নেব বলে কিছু মাত্র বাধা না পেয়ে টিলার কাছে এসে পড়লাম, তার উপর উঠতেও সময় লাগল না। এইবার বাঘকে বার করি কেমন করে? বন্দুক বাগিয়ে নিয়ে কাশলাম, কোন প্রতিক্রিয়া নেই। ঝোপের অপর পাশটিও খোলা জায়গা। জ্যোৎস্নার আলোয় একটা ইঁদুর চলে গেলেও দেখা যায়। তবে কি বাঘ আমাকে আসতে দেখে পালাল নাকি? পরক্ষণেই মনে হল মোটের উপর বাঘ ঝোপের ভিতর আছে কি না তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়। একটা ফাঁকা আওয়াজ করবার ইচ্ছা হল। পরে বিবেচনা করে দেখলাম শূন্যে গুলী উড়িয়েই বা লাভ কি। সত্যি বাঘ বেরিয়ে এলে মাত্র একটি গুলির উপর নির্ভর করতে হবে। একগুলিতে না মরলে নতুন করে গুলি ভরবারও সময় পাব না। মানুষের কাশীর আওয়াজ অত কাছ থেকে শুনেও যখন বাঘ কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ করেনি তখন সে নিশ্চয় এখানে নেই।

এখন করা যায় কি? আর ঝোপের বেশী কাছে যাওয়া চলে না, অতর্কিতে ঘাড়ের উপর এসে পড়তে পারে। বাংলোর দিকে ফিরতে হলে, আমার পিছনটি বাঘের সামনে ধরতে হবে। সামনে মুখ রেখে পিছু হাঁটাও বিপদ সঙ্কুল, নিটের রস পায়ের উপরও প্রভাব জাহির করতে আরম্ভ করেছে ইতিমধ্যেই তার আভাস দুবার পেয়েছি। টিলার উপর বাঘের সামনা সামনি বসে রাত কাটান এ অবস্থায় অসম্ভব। গাছ খুঁজতে লাগলাম। টিলার নিচেই কয়েক হাতের ভিতর মন্দের ভাল একটি গাছ আছে বটে, ঢালুর দিকে পিছু হেঁটে নামতে পারলেই বাঁচা যায়।

নিটের প্রায়শ্চিত্ত না করে উপায় নেই। পলায়মান না হয়েই পিছু হাঁটতে লাগলাম। গাছের কাছে এসে পড়েছি এমনি সময় টিলার ওপাশ থেকে ঝোপ নড়ার আওয়াজ এল, শুকনো পাতার উপর খস্ খস্ চেনা পায়ের শব্দ তারপরই একটি ভারী জন্তুর পড়ে যাবার আওয়াজ। বন্দুক তুলে দাঁড়িয়ে গেলাম। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি টিলার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত ছোটাছুটি করছে যে-কোন মুহূর্তে বাঘের সম্পূর্ণ দেহ টিলার উপর দেখব বলে। কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল কিছুই ঘটল না, কেবল ঝোপের দিক থেকে ঘড়-ঘড়ানী শব্দ এল, ক্রোধের প্রকাশ নয়, যন্ত্রণার কাতর ধ্বনি।

আর বিলম্ব করা নয়। বন্দুক কাঁধে ঝুলিয়ে গাছে উঠতে লাগলুম। এ বিষয় অভ্যাস দ্বারা পারদর্শীতা লাভ করেছিলাম। বেশ উঁচু ডালে এসে পড়েছি। বসতে যাব পা বেসামাল হয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম। নিজেকে সামলাবার সময় বন্দুকের বাঁট গাছের ডালের সঙ্গে ঠুকে গেল, নিস্তব্ধ জঙ্গলে ঐ টুকু শব্দেরই প্রতিধ্বনি ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ঝোপ দারুণ ভাবে নড়ে উঠল তারপর আবার ভারী ওজন পড়ার শব্দ। ইতিমধ্যে বসবার ব্যবস্থা করে নিয়েছি।

নিরাপদ স্থানেই বসেছিলাম, ধীরে এবং সাবধানে পিঠের অস্ত্র সামনে নিয়ে এলাম। নড়া জায়গাটা লক্ষ্য করে বন্দুক সংলগ্ন টরচের সুইচ টিপে দিলাম। প্রথমে কিছু দেখতে পাইনি। আলো এদিক-ওদিক ঘোরাতে, নজর পড়ল বাঘের লেজের উপর, মৃদু দুলছে। বাঘ শুয়ে আছে, কখন কখন পিছনের পা দেখতে পাচ্ছি, কেমন একটা ছট ফট ভাব। অনেকক্ষণ আলো জ্বেলে বসে থাকলুম গুলী চালানর উপযুক্ত জায়গা সুবিধা মত পাওয়া গেল না। ক্রমান্বয়ে মাংসাসী নিশ্চল হয়ে আসতে লাগল, অল্প সময়ের ভিতর লেজের সামান্য দোলাও বন্ধ হয়ে গেল। রাতের বেলা নানা বিঘ্নের মাঝে বাঘ ঘুমায় এ রকমটি কখন দেখিনি। গুলি চালাবার জন্য হাত তখন নিস্ পিস্ করছে অথচ হৃদয় বা মাথা বহু চেষ্টা করেও খুঁজে বার করতে পারলাম না। নাচার হয়ে বন্দুক হাতে বসেই রইলুম। সময় কেটে চলেছে মাঝে মাঝে টরচ জ্বেলে দেখছি বাঘ নড়ে কি না। লেজ অসাড়।

নেশার ঘোর আমাকে তখন চেপে ধরেছে। খালি পেটে কড়া ব্র্যাণ্ডির (Brandy) ক্রিয়া, তার সঙ্গে কতক্ষণ টক্কর দিয়ে চলা যায়। বিপদ নিকটে জেনেও নিজেকে আর সামলাতে পারছিলাম না। কপাল গুণে সামনেই দুইটি কাছাকাছি ডাল পেয়ে গিয়েছিলাম। তার উপর হাত ছড়িয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ

করলাম। অল্পক্ষণের ভিতরই ঘুমের কবলে গিয়ে পড়লাম বহু চেষ্টা করেও নেশাকে দাবিয়ে রাখা সম্ভব হল না।

চোখ বুজবার সময় বন্দুকটা পিঠে ঝুলিয়ে রাখতে যেতে ডালের সঙ্গে সুইচের ধাক্কা লেগে গেল। টরচ জ্বলে উঠল। তখন এমন অবস্থা নেই যে বন্দুক সামনে এনে আলো নিভিয়ে দি। তন্দ্রার ঘোরে ভাবলুম একটু পরে নিভিয়ে দিলেই হবে। আলস্য আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল, অসহায়ের মত হয়ে গিয়েছিলাম।

কতক্ষণ এইভাবে বসেছিলাম, কিছু মনে নেই হঠাৎ ঝোপের ভিতর ঝটাপটির শব্দে তন্দ্রায় বিঘ্ন ঘটল। পরক্ষণেই মাংস ছিঁড়ে খাওয়ার আওয়াজ শুনতে পেলাম, নিস্তব্ধ জঙ্গলে মড়া জন্তুর পেটের উপর কামড় পড়লে যে শব্দ বার হয় তা অভিজ্ঞ শিকারী ভুল করতে পারে না। এক সঙ্গে অনেকগুলি জন্তুর ধস্তাধস্তির আওয়াজ পাচ্ছিলাম। তাড়াতাড়ি বন্দুক সামনে নিয়ে এলাম। লক্ষ্যের স্থান ঠিক করে বগলে তুলতেই অভ্যাসমত সুইচ টিপলাম—আলো জ্বলে না, ব্যাটারীর শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে।

তখন চাঁদের আলোর শেষরশ্মি পাহাড়ের আড়ালে। ঝোপের কাছে, ঘোর অন্ধকার।

তন্দ্রার ঘোর কাটিয়ে উঠতে পুর্ব্ব ঘটনাগুলি মনে পড়তে লাগল। বাঘের কথা, তার কাতর গোঙ্গানী, এবং মড়ার মত পড়ে থাকার কথা। ছবিটা চোখের সামনে দেখছিলাম তবে কি বাঘটা মরেছে? যারা মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে তারা কোন্ জাতীয় মাংসভুক। নিজের কাছেই উত্তর পেলাম, হাইনা।

ওরা পচা জন্তুর সন্ধানে বেরিয়েছিল দুর্ভাগ্যক্রমে টাটকা মড়া পেয়ে গিয়েছে। পূতিগন্ধ না পেলে ওদের রসনার তৃপ্তি হয় না। ক্ষুধার তাড়না কি রুচির বিচারের সময় রাখে?

কিন্তু একটা তাজা বাঘ অযথা এবং হঠাৎ মরতে গেল কেন? প্রেমের ব্যর্থতায় আত্মঘাতি হওয়া যে আরণ্যক-নীতির বিরুদ্ধাচরণ। তবে কি ঝোপের বাঘ গতরাত্রের মল্লযুদ্ধে নিহত হয়েছিল?

ঘুম কেটে গিয়েছে, হাইনাই মারব ঠিক করে বসে রইলাম। ভোর হোতেও বেশীক্ষণ সময় লাগল না!

একটু পরিষ্কার হতেই, ট্রিগার টিপবার লোভে একদৃষ্টে ঝোপের দিকে তাকিয়ে বসে আছি, যে কোন একটা হাইনা বেরুলে হয়। নিশ্চয় বলতে পারি তখন স্বপ্নের ঘোর ছিল না, মাংস ছেঁড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি না, তার পরিবর্ত্তে, কাছে দূরে তিতিরের ডাক শুনছি, মাঝে মাঝে ময়ূরের কেকারব। আকাশ ফর্সা হয়ে গিয়েছে। ঝোপে কোন চাঞ্চল্য নেই।

একটা গাছের ছোট ডাল ভেঙ্গে ঝোপের উপর ছুঁড়লাম, কোন সাড়া নেই। কিছুক্ষণ পরে আবার ডাল ছুঁড়লাম, ভিন্ন ফল পেলাম না। পরের পর বাহিরের উৎপাতেও বাঘ নির্লিপ্ত থাকায় খটকা লেগে গেল, ভাবতে লাগলাম আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাই স্বপ্ন নয় তো?

সকালের আলো ভিন্নপ্রকারের সাহস নিয়ে এসেছে। বিপদকে বোঝার শক্তি ফিরে পেয়েছি।

নেমে এলাম গাছ থেকে। একেলা ঝোপের দিকে যাবার ভরসা পেলাম না। বাংলো মুখে চলতে লাগলাম। বাংলোর কাছে এসে দেখি ঘরের গা ঘেঁসা একটি বিরাট পাথরের চাঁই, ছাদে ওঠার জন্য বাঘের সিঁড়ির ধাপ।

একলা ঘরের ভিতর ঢোকা বিপদজনক মনে কোরলাম। রাত্রির ঘটনা স্বপ্ন হলেও মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা ভাল লাগছিল না। পাথরের চাঁইয়ের সাহায্য নিয়ে আবার ছাদে উঠে পড়লাম। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় নেশা তখন একেবারে কেটে গিয়েছে।

বসে আছি বন্ধু ও কুলীদের ফেরার অপেক্ষায়। তারা যখন ফিরে এলো তখন বেলা হয়ে গিয়েছে। পরের ঘটনা এই শিকারের বিপদসঙ্কুল মুহূর্ত্তগুলির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। কারণ, এরপর আমাকে জঙ্গল ছাড়তে হয়েছিল বন্ধুর আতঙ্কের জন্য। বিষের ভয় তাঁকে এমন ভাবেই অভিভূত কোরেছিল যে যাবার পথে দামী সৌখীন বিছানা জঙ্গলীদের দান কোরতে কিছুমাত্র দ্বিধান্বিত হননি।

আকবরের বহু অনুরোধে তানসেনের গুরু হরিদাস গোস্বামী মোগল-বাদশাহের দরবারে গাইতে এসেছেন।

উদ্দেশ্য, শুনেছেন তাঁর প্রিয় শিষ্য নাকি এই দরবারে থাকে, যদি তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়!

তানসেন কিন্তু দূর থেকে গুরুর জীর্ণ বসন, ছিন্ন কন্থা দেখে দূরে সরে সরে রইলেন।

হরিদাস স্বামী বীণা বাজিয়ে গাইছেন···সে বীণার স্বরে সকলে সম্মোহিত··এমন সময় তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়লো, দূরে, প্রিয় শিষ্য তানসেনের ওপর। কই, তাঁকে দেখে তো তানসেন ছুটে আসে নি?

শোকে, ক্ষোভে, তিনি হাতের বীণা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

সেই সময় তাঁর সুরে দরবারের পাথরের মেঝে গলে গিয়েছিল···সেইজন্যে বীণাটা অনায়াসে তার মধ্যে খানিকটা প্রবেশ করে গেল···কিন্তু বীণাতে সুর থেমে গিয়েছিল বলে, সেই দ্রবীভূত পাষাণ আবার কঠিন হয়ে এলো···তাই হরিদাস গোস্বামীর পরিত্যক্ত বীণা আধখানা পাথরেই আটকে রইলো। তিনি রাজসভা ত্যাগ করে চলে গেলেন।

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

মাধবী বিধবা। সংসারে তাহার দুটি সহোদর ভিন্ন কেহ নাই। মার্কণ্ডেয়সাহীর বালুময় রাস্তার ধারে তাহাদের বাড়ী। উচ্চ দাওয়ায় উঠিয়া প্রথমে চোখে পড়ে তুলসীমঞ্চ এবং বেশ ঝাড়ালো একটি তুলসীর গাছ। দাঁড়ে বসিয়া একটি টিয়া শিস্ দিতেছে এবং কোনও আগন্তুক আসিলে চীৎকার করিয়া বাড়ী মাতাইতেছে।

উড়িষ্যার পল্লী যেমন হয়, রাস্তার দুধারে সারি বাঁধিয়া বাড়ীর পর বাড়ী চলিয়া গিয়াছে বহুদূর। প্রত্যেক বাড়ীর দাওয়াই প্রায় সমান উঁচু। রাস্তা হইতে কয়েক ধাপ উঠিতে হয়। এই ঘরগুলিকে বলে 'দাণ্ড-ঘরঅ'। এই ঘরই শয়ন-ঘর ও সম্ভ্রান্ত লোকদের বৈঠকখানা। মাধবীর বাড়ীর ঘরখানি অপ্রশস্ত নহে। তাহারা তিন ভাইবোন এই একখানি ঘরেই প্রায় সময় কাটায়। শয়ন ভোজনও এই ঘরে, যদিও বাড়ীতে ভিতরের দিকে অন্য ঘর আছে।

মাধবীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শিখিধ্বজ পুরীর রাজার কাছারীতে লেখকের কাজ করে। তাহাতেই সংসার চলিয়া যায়। লিপিকরের কাজ শিখিধ্বজ ভাল করিয়াই করে। লেখাপড়া তখনকার দিনের পদ্ধতি অনুসারে সে ভালই শিখিয়াছিল। স্বাধীন রাজ্য—গজপতি প্রতাপরুদ্র সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। অভাব বলিয়া কোনও জিনিষ রাজ্যে নাই বলিলেই হয়। প্রজারা অবসর সময়ে বিদ্যাচর্চ্চা ও ধর্ম্মচর্চ্চা করিবার প্রচুর সুযোগ পাইত। সকল দেবদেবী যেমন পূজা পাইতেন, শাস্ত্রগ্রন্থের অনুশীলনও হইত ব্যাপক ভাবে। লোকের মধ্যে পড়িবার আগ্রহ জাগে যেমন, পুস্তকের প্রয়োজনও তেমনি বাড়ে। উড়িষ্যায় সেজন্য একশ্রেণীর লোক এই লিপি-ব্যবসায় করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিত। ইহাদের নাম ছিল 'করণ', কখনও কখনও করণ-কায়স্থও বলিত। শিখিধ্বজ বা শিখি মাহিতী এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিল। লিপিকারের কাজে দক্ষতা অর্জন করিবার জন্য মাহিতীর পোকে অনেক কিছুই শিখিতে হইয়াছিল এবং সেজন্য রাজদরবারে শিখিধ্বজের সমাদরও ছিল বেশী।

মাতা পিতার বর্ত্তমানে মাধবী বৈধব্য দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। তাহাকে "বাহা ঘর-অ" অর্থাৎ স্বামীর ঘরে যাইতে হয় নাই। উড়িষ্যায় মেয়েদের বিবাহ অতি অল্পবয়সেই হইত। কন্যা বয়স্থা না হইলে তাহাকে শ্বশুর ঘর করিতে পাঠানো হইত না। কিন্তু মাধবী তাহার পূর্বেই বঞ্চিতা হইল। তখন শিখিধ্বজ তাহার মন বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট করিবার জন্য তাহাকে লেখা পড়া শিখাইতে আরম্ভ করিল। সংসারে আপনার জন বলিতে আর কেহ ছিল না বলিয়া ইহাদের ভাই বোনের প্রীতি অত্যন্ত নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল। রাজদরবার হইতে গৃহে ফিরিয়া শিখিধ্বজের কাজই ছিল প্রতিদিন ছোট বোনটি ও ছোট ভাই মুরারিকে শিক্ষা দান করা।

মুরারি লেখা পড়ায় মন্দ ছিল না। কিন্তু সে দিদির মন যোগাইতেই সারাদিন ব্যস্ত থাকিত। তাহার পূজার ফুল তুলিয়া দিতে, ঠাকুরের নানা শিঙার (বেশ বিন্যাস) করিতে, ভোগরাগের ব্যবস্থা করিতে সে ভালবাসিত। রাধাকান্ত মঠে যে নূতন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তাঁহার বর্ণনা সে শতমুখে দিদির নিকট করিত এবং মাধবীও অনন্যমনে সে বর্ণনা বার বার করিয়া শুনিত। সমুদ্রতীরে হরিদাসের মঠে তিনি যখন যাইতেন, মুরারি অনতিদূরে থাকিয়া তাঁহার প্রতিটি কথা শুনিত, প্রতিটি কার্য দেখিত।

মুরারী বালক, সাধু সন্ন্যাসীর মর্ম সে যে ভাল বুঝিত তাহা নহে। কিন্তু এই ঋজুদেহ, ভাবে বিভোর গৌরবর্ণ সন্ন্যাসীকে তাহার অত্যন্ত ভাল লাগিত। ভক্তের ভীড়ে প্রথম প্রথম সে কাছে যাইবার সুযোগ পাইত না, কিন্তু সময়ে সময়ে অতর্কিতে আসিয়া উপস্থিত হইত এবং দুই একদিন সন্ন্যাসীর পদধূলি লইবারও সাহস করিত। সেদিন তাহার আনন্দের সীমা থাকিত না। সে তাহার দিদির কাছে গিয়া নানাভাবে সেই সব গল্প করিত। মাধবী জিজ্ঞাসা করিত: "আর কে কে থাকেন তাঁর সঙ্গে?"

"আমি ত চিনি না।"

"মেয়েছেলে কেউ সঙ্গে থাকেন?"

"না, ত!"

"কোনও মেয়েছেলে তাঁকে দর্শন করতেও যান না?"

"না, কাছে যাবার হুকুম নেই।"

মাধবীর মন মুশুড়িয়া পড়ে। "যাবার হুকুম নেই"—কিন্তু দূর থেকে—দূর থেকে দেখা যায় না? নিশ্চয় যায়। পথের লোককে কে নিষেধ করিতে পারে? মাধবী ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিল, জগন্নাথের মন্দিরে গিয়া সন্ন্যাসীকে দেখিবে। সমুদ্র স্নানে যাওয়া পুরীর মহিলাদের পক্ষে একরূপ নিষিদ্ধ। পাল্কি করিয়া বা গোশকটে যাওয়া যায় বটে, কিন্তু দাদার অনুমতি বিনা ত হয় না। কাজেই মাধবী স্থির করিল, সকালে বিকালে সন্ধ্যায় কোন না কোন সময়ে যখন তিনি 'দেউলে' আসেন, তখন তাঁহাকে দেখিব। দেখিবই দেখিব! মুরারী বলিয়াছে এমন সন্ন্যাসী হয় নাই, হবে না। মুরারী বালক, সে আর কত জন সন্ন্যাসী দেখিয়াছে? কিন্তু এই সন্ন্যাসীর কথা বলিতে বলিতে সে কখনও কখনও কাঁদিয়া ফেলে। এমন রূপ! এমন মধুর কথা! অনেকদিন সে সন্ন্যাসীর বর্ণনা করিতে তার দিদির অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে।

(২)

মাধবী তাঁহাকে দেখিয়াছে। সেই গৌরবর্ণ সন্ন্যাসী দেউলে আসিতেন সন্ধ্যারতির সময়। সে চাহিয়া দেখিল—দেখিল কষিত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, আজানুলম্বিত ভুজ, তাঁহার নয়নে যেন অশ্রুর বান ডাকিয়াছে। তিনি বিস্ফারিত লোচনে চাহিয়া আছেন—রত্নবেদীতে দেববিগ্রহের দিকে। মাধবী আর চোখ ফিরাইতে

পারে না। সে বুঝিলনা এই যুবক সন্ন্যাসীর প্রাণে কিসের এত বেদনা! কি অভাবে এই তরুণ বয়সে তিনি বিবাগী হইয়াছেন! মাধবী বালিকা, তরুণ সন্ন্যাসীর দুরবগাহ ভাব সে বুঝিবে কেমন করিয়া?

কিন্তু তাহারও কান্না পাইল। দেউলে কত লোক আসিতেছে, কতলোক যাইতেছে। যাত্রীর দল পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া আসিয়া দেবতাকে প্রণাম করিয়া যাইতেছে। কেহ কেহ বা গম্ভীরকণ্ঠে 'আহে মহাপ্রভু' 'আহে মহাপ্রভু' বলিয়া জগন্নাথ দেবের মন্দির শব্দমুখর করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু মাধবীর চিত্ত সে দিকে নাই। সে সেই গরুড়স্তম্ভাবলম্বী সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া কেমন অবসন্ন হইয়া পড়িল! মুরারী তাহাকে ঝাঁকি দিয়া বলিল,

'দিদি, বাড়ী যাবে না?"

'না ভাই, আর ঘরে যাবো না।" বলিয়াই সে চমকিত হইল—একি কথা সে বলিল? তাহারও নয়নে অশ্রুপ্লাবন ছুটিল। মুরারী অবাক্ হইয়া দেখে। ছড়িদার সন্দিগ্ধ মনে তাহাদের দিকে আগাইয়া আসে। মাধবী বলে:

'চল যাই!'

অন্যদিন অপরাহ্নে সমুদ্রতীরে হরিদাসের কুটীরে মাধবী আবার তাঁহাকে দেখিল। সে লুকাইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে, সঙ্গে মুরারী। সমুদ্রের বেলাভূমিতে কত লোক আসিতেছে, যাইতেছে, সিক্তবালুরাশির উপর তাহাদের পদচিহ্ন অঙ্কিত হইতেছে আবার পরক্ষণেই মিলাইয়া যাইতেছে। সমুদ্রের কলকল্লোল গভীর হইতে গভীরতর হইয়া আসিতেছে, আবার দূরে প্রতিধ্বনির সহিত বিলীন হইয়া যাইতেছে। কত নরনারী সারি বাঁধিয়া নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিতে অগ্রসর হইতেছে, মাধবীর আকাঙ্ক্ষা মিটিয়াও মিটে না। সে দেখিতে চায়, শুনিতে চায়, ভাল করিয়া জানিতে চায়। শিশুরা যেমন থিয়েটার দেখিতে গিয়া যবনিকার দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকে—কি জানি কখন যবনিকা উঠিবে, একটু নড়িলে বা অন্যমনস্ক হইলে তাহার আর সে আবৃত ঘন রহস্য দেখা হইবে না—এমনি এক আগ্রহ লইয়া মাধবী সেই রহস্যের সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। তাহার ইচ্ছা যে আরও নিকটে যায়, তাহার স্নেহের ধারা ঢালিয়া ঐ তরুণ সন্ন্যাসীর চরণ যুগল ধোয়াইয়া দেয়। কিন্তু সে যে রমণী!

দুর্ভাগ্যের পরাকাষ্ঠা! মুরারী গিয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া আসিতেছে। তিনি কি কথা বলিলেন তাহা দিদিকে বলিতেছে। কিন্তু মাধবীর পক্ষে সে পথ রুদ্ধ। কেন না সে রমণী।

মাধবী ছবি আঁকিতে পারে। সে একবার পুরীর রাজার, আর একবার জগন্নাথদেবের রথের ছবি আঁকিয়া যথেষ্ট প্রশংসা পাইয়াছে। সে তুলিকা লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ছবি আঁকিতে বসে। কিন্তু সে ছবি কি আঁকা যায়! সে সৌন্দর্য রং তুলিকায় ধরা দিতে চাহে না।

অসম্পূর্ণ চিত্রপট সে গোপনে রাখে।

(৩)

'কি হে শিখি বাড়ীতে আছ ?'

'কে ? মহাপাত্র ? আরে এসো, এসো।' বলিয়া শিখিধ্বজ দাওয়ায় একখানি তালপত্রের আসন পাতিয়া দিল এবং মহাপাত্র উঠিবার আগেই সে ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল।

মহাপাত্র উঠিলেন না, দাঁতন করিতে করিতে বলিলেন, 'আরে ছিঃ ছিঃ ছিঃ।'

'হলো কি ?'

'হলো আমার মাথা আর মুণ্ডু।'

শিখি কিছুই বুঝিতে পারে না। মহাপাত্র উঠিলেন না দেখিয়া সে দাওয়ার প্রান্তে আগাইয়া আসে গূঢ় রহস্য শুনিবার জন্য।

মহাপাত্র একটু ঝুঁকিয়া বলিলেন, 'তোমাদের কোনও পুরুষে যা নয় তা-ই। বিধবা মেয়েটা ঘরে আছে, একটু নজর রাখ্‌তে হয় ত ? কেবল কি কাছারী আর কাছারী করলে চলে ?'

শিখিধ্বজের মুখমণ্ডল নিমেষের মধ্যে ফ্যাকাসে হইয়া গেল।

'মাধবীর কথা বলছেন ?'

'ওগো হাঁা, হাঁা।—আর কার কথা বল্‌তে যাবো ? পাড়ায় গিয়ে দেখগে যাও—কান পাতা যাচ্চে না যে। কে কোথাকার সন্ন্যাসী এসেছে—বাপু, তাতে তোর কি ? তার চেহারা ভাল হোক্‌, আর মন্দ হোক, তুই বিধবা মানুষ, তোর অত ঢলাঢলি কেন ?'

মহাপাত্র দাঁতন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। শিখিধ্বজ দাওয়ায় বসিয়া অনেকক্ষণ ভাবিল। একবার মনে করিল যে, মাধবীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু সে যে বড় আদরের বোন্‌। এই কলঙ্কের কথা শুনিলে, সে কি আর মুখ দেখাইতে পারিবে। শিখিধ্বজ নিজেই অনুতপ্ত হইল। সে ভাবিল যে একমাত্র মাতৃহীনা ভগ্নীর প্রতি সে তাহার কর্ত্তব্যপালনে একেবারেই মনোযোগ দেয় নাই। কিন্তু সে জানিত তাহার ভগ্নী সাধারণ মেয়েদের মত নয়। সে যে নিজে তাহাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছে। সে উড়িয়া জানে, তেলেগুতে কথা বলিতে পারে, শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণ পড়িতে শিখিয়াছে, সে এমন কলঙ্কের কাজ করিবে ?

শিখিধ্বজ এই নূতন সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছে। রাজপণ্ডিত সার্বভৌমের বাসভবনে তাঁহার বিদ্যার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছে। সেই যুবকের ভক্তিবিগলিত মূর্ত্তি দেখিয়া নীলাচলের সমস্ত লোক একবাক্যে তাঁহার স্তুতিগান করিয়াছে। সেই সন্ন্যাসী কি কখনও নিন্দার কাজ করিতে পারেন। অথচ এমনভাবে মহাপাত্র আজ সকালে মুখে চুণকালি লেপন করিয়া দিল কেন ?

ভাবিতে ভাবিতে শিখি মাইতি রাজার কাছারীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সেদিন সে আহারাদি করিল না। মাধবী বলিল : "আজ অবঢ়া খাবে নাকি ?" মহাপ্রসাদকে অবঢ়া বলে।

শিখিধ্বজ উত্তর করিল না। বাহিরে যাইবার সময় বজ্রকঠোর স্বরে বলিয়া গেল:

'মাধবী, আজ থেকে তুমি ঘরের বাইরে পা দিতে পারবে না। বুঝলে? আমার কথা যদি না শোন, তা হলে আমার এ বাড়ীতে—'

অবশিষ্ট সম্পূর্ণ করিতে পারিল না। সে যে বাল্যকাল থেকে, কত যত্নে এই বোনটিকে মানুষ করিয়াছে! শিখির কণ্ঠ বাষ্পভারে রুদ্ধ হইল, সে কোনও দিকে না চাহিয়া বাহির হইয়া গেল।

(৪)

মাধবী আর ঘরের বাহির হয় না। গৃহকর্ম্মের মধ্যে ডুবিয়া থাকে—কিন্তু তাহার প্রাণ পড়িয়া থাকে সমুদ্রতটে, নয়ত দেউলে। কোথায় সে মধুর মূর্ত্তি—কোথায় সেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী! তাহাই সে ভাবে। সেই অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি সে ভুলিতে পারে না।

আবার ভাবে সন্ন্যাসী যেমনই হউন, আমার তাহাতে কি? ভগবান যাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া সংসার হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি স্নেহ মমতা বর্ষণ করিয়া কি লাভ? আর তাঁহাকে স্নেহের দ্বারা অভিষিক্ত করিলেই কি তাঁহার পক্ষে শুভ হইবে? মাধবীর হৃদয় স্নেহ করুণায় উদ্বেলিত হইয়া উঠে। সংসারের অনেক উর্দ্ধে সে যে প্রেমের ছবি দেখিয়াছে তাহাকে সে ভক্তিচন্দনে চর্চ্চিত করিয়া হৃদয়ে দেবতার আসনে বসাইয়াছে। অশ্রুজলে তাঁহার অভিষেক করিয়াছে। সংসারের তুচ্ছ কামনা বাসনা ত তাহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই. তবে তাহার দাদা এমন কঠোর তিরস্কার করিলেন কেন? কিসের কলঙ্ক? তিনি ত মানুষ নন যে কলঙ্ক হইবে! দেবতাকে ভজিয়া যদি অপরাধ হয়, তবে জন্মে জন্মে সে অপরাধিনী হইতে প্রস্তুত।

মাধবী তাহার ভ্রাতাদের সঙ্গে দাওঘরেই শয়ন করে। ক্ষুদ্র জানলার কাছে তাহার শয্যা। সে ফুলে ফুলে তাহার শয্যাটিকে সুরভিত করিয়া রাখে। আঙ্গিনায় কনক চাঁপার গাছ হইতে ফুল পাড়িয়া সে শয্যায় বিছাইয়া রাখে। গন্ধরাজ রাশিকৃত করিয়া সে কোমল দুগ্ধফেন উপাধান রচনা করে। তাহার বিছানার পার্শ্বেই একটি বড় পর্দা। এই পর্দা তাহার শয্যা ও ভ্রাতাদের শয্যার মধ্যে ব্যবধান।

একদিন রাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া শিখিধ্বজ শুনিল কে মৃদু সঙ্গীত করিতেছে। সে সন্তর্পণে উঠিয়া পর্দাটির কাছে গেল। সে পর্দার ফাঁকে দেখিল ছোট জানালা দিয়া জোছনা আসিয়া পড়িয়াছে মাধবীর শয্যার উপর। প্রাঙ্গণের চম্পকবৃক্ষে কোকিল ডাকিতেছে অতি মধুর কণ্ঠে। আর মাধবী জানালার পাশে বসিয়া করুণ কোমল সুরে গাহিতেছে। শিখিধ্বজ বহুক্ষণ কান পাতিয়া শুনিল মাধবী গাহিতেছে রায় রামানন্দের গান:

মঞ্জুতর গুঞ্জ দলি কুঞ্জমতি ভীষণং

মন্দমরুদন্তরগ গন্ধকৃত ভূষণং *

অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে গান ক্রমেই অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে, কিন্তু মনে হইতেছে যেন সেই গানের মধ্যে গায়িকার প্রাণ গলিয়া গলিয়া ঝরিতেছে। শিখিধ্বজ নিঃশব্দে আসিয়া শুইয়া পড়িল এবং ভাবিতে লাগিল।

পরদিন মাধবী যথারীতি গৃহকর্ম্মে মন দিয়াছে। শিখিধ্বজ ডাকিল,

'মাধবী'

'যাই দাদা।'

'আচ্ছা, অতরাত্রে তুমি কি গান গাইছিলে?'

'তা তো আমার মনে নেই।'

'যাক্‌গে, তোমার বিছানায় অত ফুলের ছড়াছড়ি কেন আমায় বল দেখি।'

মাধবী কাঁদিয়া ফেলিল। শিখিধ্বজ বলিল,

'কান্না এখন রাখ্‌। আমি যে কিছু বুঝে উঠ্‌তে পারছি নে। তুই আমার প্রশ্নের উত্তর দে।'

'কি প্রশ্ন?'

'তোরা বিছানায় অত ফুলের সজ্জা কেন?'

'আমাকে জিজ্ঞাসা করো না দাদা, তুমি বুঝতে পারবে না।'

দেখ্‌ মাধবী! আমি তোর দাদা। ছেলেবেলা থেকে কোলে পিঠে করে' মানুষ করেছি তোকে। মা, বাবা ফেলে গিয়েছিলেন আমি যথাশক্তি তাঁদেরই মতো স্নেহ দিয়ে তোকে ঘিরে রেখেছি। তুই বল্‌ সত্যি কি না? আর আজ কি না তুই আমাকে বঞ্চনা করবি!'

মাধবী ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু সে কি বলিবে? অথচ আজ তাহার দাদার অন্তরের ব্যথাও সে যেন বুঝিতে পারিল।

সে বলিল 'আমি তাঁরই উদ্দেশে—আমার ইষ্টদেবের উদ্দেশে শয্যা সাজাই।' তিনি কৃপা করে' আসেন, আমার অর্ঘ্যগ্রহণ করেন—'

'কি সর্বনাশ!' শিখিধ্বজ ভাবিল, তবে লোকে ত ঠিক কথাই বলে। সে পুনরায় কঠোর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,

'তুই কি সেই সন্ন্যাসীর কথা বলছিস্‌? পাপিষ্ঠা, এবাড়ী তাকে কে দেখালো?'

মাধবী চমকিত হইল। সে বলিল,

'না,—না—তিনি এবাড়ী চেনেন না।'

---

* অলিপুঞ্জের মধুর গুঞ্জনে নিকুঞ্জ অতি ভীষণ হইয়াছে। মন্দ মলয়ানিল গন্ধ বহন করিয়া আরও ভয়াবহ করিতেছে।

(রাধার বিরহ)

'তবে ? তোকে তিনি কি করে' চিনলেন ?'

এবার মাধবী বলিল, 'সর্বনাশ !'

'তার মানে ?'—

'তিনি ত আমায় কখনও দেখেন নি—'

বিদ্রূপের স্বরে শিখিধ্বজ বলিল,

'বটে ! তিনি তোমায় কখনও দেখেন নি—'

'জানো না, তিনি ত কখনও কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে বাক্যালাপ করেন না—'

'মাধবী হেঁয়ালি ছাড়। আমায় কি শেষে পাগল না করে' তুই ছাড়বি নে—'

মাধবী শিখিধ্বজের পায়ের কাছে বসিল এবং অশ্রুধারে তাহার অঙ্গ সিক্ত করিয়া দিল। মাধবী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল ;

তোমাকে ত বলেছি তুমি বুঝতে পারবে না। আমার আরাধ্য দেবতা কখনও শ্রীমদনমোহনের বেশে, কখনও গৌরাঙ্গের বেশে আমাকে কৃপা করেন। দাদা, তুমি বিশ্বাস করো। আমার প্রাণের ঠাকুর জাগ্রত দেবতা, আমি তাঁর নূপুরের ধ্বনি শুন্‌তে পাই, তাঁর বাঁশী আমার কানের কাছে বাজে। ঐ জানালা দিয়ে তাঁর মনোহর গৌরকান্তি জ্যোছনার মতোই আমার শয্যায় লুটিয়ে পড়ে। আমি তাই সারারাত্রি ব'সে তাঁরই গুণগান করি। তুমি আমার উপর রাগ কোরো না—অন্যে যে যা বলে বলুক। তুমি আর মুরারি এই সংসারে আমার সর্বস্ব—তোমরা রাগ করলে, ঠাকুরও অকৃপা করবেন। এই দেখ না আমি তাঁর নূপুরের শব্দ আর শুনতে পাচ্ছি নে।—'

'কৃপা কর, কৃপা কর, দাদা—কৃপা কর, আমি অতি অভাগিনী' বলিয়া মাধবী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

এক ইঞ্জিন-চালকের ভয়ানক বাসনা ছিল, মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আলাপ করবার কিন্তু সুযোগ আর ঘটে উঠতো না।

শেষকালে একবার মহাত্মার জন্যে এক স্পেশালের সে ড্রাইভার হলো। দূর থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় দেখে, লোকে আসছে যাচ্ছে ষ্টেশনে, মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করছে। সে আর সময় পায় না। হতাশ হয়ে পড়ে।

এইভাবে ট্রেণ নির্দ্ধারিত গন্তব্যে এসে পৌছল।

ট্রেণ থেকে নেমেই মহাত্মাজী ট্যাঙ্কের ঝোলানো ঘড়িটা একবার দেখলেন, তারপর প্লাটফর্মের ভিড় ঠেলে সোজা চল্লেন এঞ্জিনের দিকে। এঞ্জিন ড্রাইভার দেখে, তারই গাড়ীর সামনে তারই জন্যে হাত বাড়িয়ে স্বয়ং মহাত্মাজী !

মহাত্মাজী হেসে বলেন, ঠিক সময়ে এসেছ বলে, তোমাকে ধন্যবাদ দিতে এলাম !

কনে দেখা

শ্রীশান্তা দেবী

হরিকেশবের মা বলিলেন, "হ্যাঁরে, সাতটা নয় পাঁচটা নয় আমার তুই একটা মাত্র ছেলে, এখনও বিয়ের নাম করলেই মারতে আসিস, শেষে আমি কি বৌএর মুখ না দেখেই মরব?"

হরিকেশব বলিল, "কি যে বল! এখনি কি তোমার মরবার বয়স হয়েছে নাকি? তোমার বয়সে আর আমার বয়সে কতই বা তফাৎ? মাত্র ত সতের বছরের বড় তুমি আমার চেয়ে।"

মা বলিলেন' "আচ্ছা তাই যেন হল। তাহলে তোর বয়সটা যে কিছু কম হয়নি সেটা ত স্বীকার করিস্? তবে নিজের দিকটা ভেবেই বল্‌না, আর কি দেরী করা উচিত?"

ছেলে চটিয়া বলিল, "আমি অমন বিয়ে কর্‌ বললেই বিয়ে করতে পারি না। আমার পছন্দমত মেয়ে হবে তবে ত বিয়ে করব?"

মা বলিলেন, "কি এমন ইন্দ্রানীর মত বৌ চাই যে বাংলাদেশে খুঁজেই পাওয়া যাবে না? আচ্ছা, কালই আমি ঘট্‌কী লাগাব দেখি সুন্দরী মেয়ে পাওয়া যায় কি না।"

হরিকেশব বলিল, "শুধু সুন্দরী হলেই তো হয় না। মেয়ের মাথায় গোবরপোরা থাকলে চলবে না, একটু বিদ্যে বুদ্ধিও দরকার। আর একেবারে রামা শ্যামার বাড়ীরমেয়ে এনো না যেন। তাহলে আমি দেখবও না।"

মা বলিলেন, "আচ্ছা রে আচ্ছা। ম্যাজিষ্টরের মেয়ে ব্যালিষ্টর দেখে কনে খুঁজতে বল্‌ব। তাহলে ত হবে?"

হরিকেশবের ছোটবোন মালতী পাশের ঘরে বসিয়া পড়া মুখস্থ করিতেছিল, এমন রসাল গল্পের স্বাদ পাইয়া সে উঠিয়া আসিয়া বলিল, "মা জান, পল্টুদা বলছিল যে তাদের মাষ্টার মশায়ের মেয়ে ব্যারিষ্টারী পড়তে বিলেত যাবে। সব ঠিক হয়ে গিয়েছে, শুধু জাহাজটা পেলেই হয়। তার সঙ্গে দাদার বিয়ে দাও না!"

মা বলিলেন, "যা যা, তুই নিজের চরকায় তেল দিগে যা ত! তিনদিন পরে পরীক্ষা, এখন এলেন দাদার বিয়ের ঘটকালী করতে। পল্টু অনেক জায়গায় ঘোরে বটে, তাকে আমি জিগেষ করব কত বিদ্যেবতীর খবর জানে।"

পল্টু দরজা দিয়া ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল, "আমার নামে কি সব বলাবলি হচ্ছে শুনি?"

মা বলিলেন, "কিছু না বাবা। এই কেশবের জন্যে একটি সুন্দরী গুণবতী মেয়ে দেখে দিতে পার কিনা তাই বলছিলাম। তুমি ত অনেক জায়গায় যাও।"

পল্টু বলিল, "হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গে পোষ্ট গ্রাজুয়েটে পড়ে অনেক মেয়ে। একজন আছে ভীষণ

লম্বা, পাঠানের সঙ্গে বিয়ে হলে মানায়। মেয়েটি কিন্তু দেখ্‌তে ভাল। আর একজন আছে দারুণ বেঁটে, কেশবদার কোমর পর্য্যন্ত হবে। তোমাদের পছন্দ মতও জন দুই ছিল, কিন্তু তাদের পছন্দ করবার জন্যে এত ছেলে ব্যস্ত যে সাহস হয় না এগোতে। শেষকালে কার না কার রোষে পড়ব।"

মা বলিলেন, "তা যাহোক কোনরকমে একটু চেষ্টা করে দেখ্‌না, ঘটকীরা কোথা না কোথা থেকে সম্বন্ধ আনে সেসব কি আর আজ কালকার ছেলেদের মনে ধরবে? তারা এখন ট্রামে বাসে সারাক্ষণ কত চাকুরে আর পড়ুয়া মেয়ে দেখছে সাজে পোষাকে সব সাক্ষাৎ মেম সাহেব। ওইরকম চলন-ধরণই ত পছন্দ হবে।"

হরিকেশব মনে মনে ভাবিল, "মা অনেকটা ঠিকই আন্দাজ করেছেন।" মা বলেন বটে 'বিয়ের নাম করলেই মারতে আসে!' কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি বিবাহের বিষয় সে যত ভাবে অন্য কোন বিষয় তত ভাবে না। সেই কুড়ি বাইশ বছর হইতে আজ পর্য্যন্ত কত মেয়ে যে তাহার মনে ক্ষণিকের ছাপ রাখিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে তাহার ঠিক নাই। কেহ বা মন হইতে সম্পূর্ণ মুছিয়া গিয়াছে, কেহ এখনও মনের কোনে উঁকি ঝুঁকি মারে। তাহাদের শিথিল কবরী, এলায়িত অঞ্চল, দীর্ঘ দেহযষ্ঠির ছন্দোময় গতি, অঞ্জনঅঙ্কিত সজল চোখের করুণ দৃষ্টি···কিম্বা লতার মত বাহুদুটির নীরব সঙ্গীত কি যে কখন তাহাকে চকিতে মুগ্ধ করিত এখন সব সুস্পষ্ট মনে নাই। বারে বারে মনে হইয়াছে যাহার সন্ধানে ফিরিতেছিলাম, এইবার বুঝি বা তার দেখা মিলিল। ইহারা ত সকলেই পথে দেখা, অজানা রাজ্য হইতে সহসা আবির্ভূতা। হাতে মেমসাহেবী ব্যাগ দোলাইয়া কেহবা আপিসে চাকরী করিতে যায়, হেলাভরে খান দুই বই খাতা দুই আঙুলের টিপে ধরিয়া কেহ বা কলেজে পড়িতে যায়। কে যে কোথায় যায় তাও দুই একবার সে খোঁজ লইয়াছিল। কিন্তু আর বেশী অগ্রসর হইতে সাহস হয় নাই। তারপর একে একে সকলেই তাহার চিত্তাকাশ হইতে ধীরে ধীরে অস্তমিত হইয়াছে। বয়স বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহার সঙ্গে মনটাও ক্রমে বেশী হিসাবী হইয়া উঠিতেছে। সে বয়সে যদি সাহস করিয়া আর একটু অগ্রসর হইতে পারিত, হয়ত এতদিনে বৃহৎ সংসার লইয়া বসিয়া থাকিত। অথবা হইতে পারে তাহার দুঃসাহসের ফলে সমাজে একটা দুর্নামের বোঝা বহিয়া চিরদিন কাটাইতে হইত। মেয়েজাতকে বোঝা শক্ত! তাহাদের সুনজরে পড়িলে অগ্রসর হওয়ার সাহসের অভাবটাই মস্ত দোষ, কুনজরে পড়িলে অগ্রসর হইলেই সর্ব্বনাশ। শেষপর্য্যন্ত মায়ের শরণ লওয়া ছাড়া উপায় কি? কিন্তু মা যে একাধারে লক্ষ্মী সরস্বতী আনিয়া উপস্থিত করিতে পারিবেন এমন আশাও খুব কম। তিনি দুনিয়ায় কটা লোককেই বা চেনেন?

পণ্টু বলিল, "আচ্ছা কেশবদা, আমাদের ক্লাশের নীরাকে আমি কাল তোমাকে দেখিয়ে দেব। কলেজ আওয়ার্সের পর টু-এ বাসে চড়ে সে ফেরে। আমিও কলেজ থেকে কাল সেই সময় ফিরব। আমাকে বাসে চড়তে দেখেই চট্ করে চড়ে পোড়ো। তারপর আমি বলে দেব।"

মায়ের সামনে আর কিছু না বলিয়া হরিকেশব অন্য ঘরে পলায়ন করিল।

পরদিন বেলা সাড়েতিনটার পর রাস্তার ধারে ট্রাম ও বাসের অপেক্ষায় একপাল ছেলেমেয়ে দাঁড়াইয়া আছে। পাঞ্জাবী পায়জামা ও গান্ধী টুপি পরা জনকয়েক ছাড়া ছেলেরা প্রায় সকলেই আধাহাতা সাদাজামা ও সাদাধুতি পরিয়া এবং পায়ে চটিজুতা, মেয়েদের পরণে নানা রঙের চৌখুপী শাড়ী আর ছাপানো ছিটের শাড়ী; মস্তক সকলেরই অনাবৃত হইলেও দুইচারজনের সীমন্তে সিন্দুর আঁকা। পল্টুর সন্ধান করিয়া লইয়া হরিকেশব গিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল। নীল চৌখুপী পরা মেয়েটি কি চমৎকার দেখিতে! কিন্তু তাহার ত মাথায় সিঁদুর! লালবুটি শাড়ী পরা মেয়েটির একটু মোটার দিকে ঝোঁক তবুও দেখিতে বেশ ভালই, ওই বোধহয় নীরা, পল্টুর সঙ্গে পড়ে। কিন্তু পল্টুহাবাটা ত একবারও সেদিকে তাকাইতেছে না, সোনার চশমা পরা লম্বা ছেলেটা ত ওর সঙ্গে বেশ ভাব জমাইয়া গল্প জুড়িয়াছে। বেশ রীতিমতই ভাব মনে হয়। ও কখনই হরিকেশবের ভাগ্যে জুটিবে না। হরিকেশব পল্টুকে কনুই দিয়া একটা ধাক্কা মারিয়া চোখের ইসারায় জিজ্ঞাসা করিল, 'কোন্ জন?' পল্টু বলিল, "একটু অপেক্ষা কর।" 'ও হরি! এখনও সে আসেই নি!' ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিয়া হরিকেশব চুপ করিল।

মাথায় মস্ত কবরী ও হাতে একরাশ বই লইয়া ব্যস্ত সমস্ত ভাবে একটি লম্বামত মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল। বেশ গৌরবর্ণ রং। পরণে ঢাকাই শাড়ী। পল্টুর দিকে তাকাইয়া পরিচয়ের ক্ষীণ স্মিতহাস্য করিল। পল্ট বলিল, "এইবারের বাসটায় আমরা উঠ্‌ব। এই মেয়েটি, গাড়ীতে ভাল করে দেখে নিও।

হুড় মুড় করিয়া রাজ্যের ছেলে মেয়ে এবং বুড়ো আধবুড়ো সকলে বাসে উঠিয়া পড়িল। কেশব অনেক চেষ্টা করিয়া মেয়েটির সামনের আসনটি দখল করিল। এখুনি ত হাতল ধরিয়া একসারি কি দুইসারি লোক মাঝখানে দাঁড়াইয়া যাইবে, তখন আর ওদিকে কাহাকেও চোখে দেখা যাইবে না। নামিবার সময় সঙ্গের সাথীকে পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এমন ভীড়। রসা রোডে নামিয়া পড়িয়াই পল্টু অত্যন্ত উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি কেশবদা, কেমন দেখ্‌লে? পছন্দ হল?"

কেশব মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমাদের কলকাতার সমাজে যাকে বলে সোন্দর মেয়ে সেই আর কি। কিন্তু মুখ ত একেবারে চন্দ্রবদন, তার উপর চেপ্টা নাক চশমা আঁটা গুরু মহাশয়।"

পল্টু চটিয়া বলিল, তোমাকে আনাই আমার ভুল হয়েছে। তুমি একটা পয়লা নম্বরের গেঁয়ো। মেয়েদের বিষয়ে মানুষ কি ঐরকম করে কথা বলে? অমন একরাশ চুল, অমন লতার মত গড়ন, অমন বুদ্ধির দীপ্তি কিছুই দেখতে পেলে না, কেবল চশমা জোড়াই দেখ্‌লে। তোমার পাশে দাঁড়ালে ঠিক মেঘের কোলে ইন্দ্রধনুর মত দেখাত! বার কর দেখি ওরকম মেয়ে আর দু একটা?"

পল্টুর উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া কেশব বলিল, "হ্যাঁ, আমার ভাষাটা ঠিক হয়নি তা স্বীকার করছি। কিন্তু যাকে পছন্দ হয় নি তাকে পছন্দ হয়েছে বল্‌লে কি আসল কাজের দিকে যথাযথ অগ্রসর হওয়া হবে?"

পল্টু বলিল, "আচ্ছা, তাহলে এখানেই পটক্ষেপ করা হোক্। আমি মোটেই মনে করিনি যে

নীরাও এইখানে নেমে পড়বে, খুব ত দুজনে মিলে ওকে নিয়েই চেঁচাচ্ছিলাম এদিকে ও ঠিক পিছন পিছনই নেমে পড়েছে !"

শঙ্কিত মুখে কেশব ও লজ্জিত মুখে পল্টু সেখান হইতে ধীরে ধীরে পলায়ন করিল। নীরা একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পল্টুর দিকে তাকাইয়া একটা গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

*　　*　　*　　*　　*

বাড়ী ফিরিয়া কেশব দেখিল মার ভাঁড়ার ঘরের সম্মুখে রীতিমত সভা বসিয়া গিয়াছে। কার্পেটের একখানা ছোট আসনের উপর বসিয়া একটি বর্ষীয়সী রমণী, মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা, তার উপর অর্দ্ধঘোমটা, গায়ে একটা গেরুয়া ধরণের চাদর জড়ানো বেশ মোটা সোটা মানুষটি। এ পাড়ার ঘটকীকে হরিকেশব দেখিয়াই চিনিল। বড় একটা কার্পেটে মা মালতী ও খুড়তোতো বোন শোভা দল পাকাইয়া বসিয়াছেন। মা বলিলেন, "তুমি বল্‌লে বিশ্বাস কর না বাছা, কিন্তু সত্যিই বলছি আমার ছেলের উপর আমার কোন হাত নেই। ওর যেখানে পছন্দ হবে সেখানে করবে, যেখানে হবে না সেখানে আমি হাজার মাথা কুট্‌লেও হবেনা।"

ঘটকী বলিল, "খুব সুন্দরী মেয়ে মা, এমন যেখানে সেখানে পাবে না। জলভরা বড় বড় চোখ, কোঁচ্‌কা কোঁচ্‌কা কোমর পর্য্যন্ত চুল, মোমবাতির মত হাত পা,...

মা বলিলেন, "রং কি রকম ?"

ঘটকী বলিল, "রং বেশ পরিষ্কার।"

মা বলিলেন, "কতটা পরিষ্কার ? আমার মেয়েদের মত ?"

ঘটকী নাক উল্টাইয়া বলিল, "কি যে বল মা ? এরা দাঁড়াতে পারে না তার কাছে।"

কেশব নীরবে থাকিবে মনে করিয়াছিল। কিন্তু অকস্মাৎ বলিয়া বসিল, "বাড়ী কি রকম ? বিদ্যে-বুদ্ধির সঙ্গে কিছু সম্পর্ক আছে ?"

ঘট্‌কী বলিল, "ওমা, বাড়ী একেবারে সায়েব বাড়ী বল্‌লেই হয়। তারা ঘণ্টা দিয়ে টেবিলে যায়, এত্তালা না দিলে দেখা করে না। দরোয়ান আছে, ম্যাষ্টর আছে, চৌদ্দটা চাকর। পাঁচখানা গাড়ী; একটা গাড়ী দিদিমণিদের নিয়ে সকাল সন্ধ্যে ঘোরে, কর্ত্তার আপিসের আলাদা গাড়ী, মাঠাকরুণের বাজার-হাট নেমন্তন্নের আলাদা গাড়ী। থালা বাসন সাজিয়ে যখন খেতে বসে বাটিতে বাটিতে মেঝে আর দেখাই যায় না। তারপর আঁস্তাকুড়ে যা খাবার ফেলে সে ত এক যজ্ঞির সমান !

আর মেয়ের বিদ্যেবুদ্ধির কথা যদি বল—বাংলা বল, ইংরিজী বল, সমস্কৃত বল, হেন বিদ্যে নেই যা জানে না। আঁশের ছবি, পশমের ছবি ঘরে ঘরে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রেখেছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। আবার গান বাজনাও করে; কাননবালা চন্দ্রাবতীর চেয়ে কিছু কম নয়।

বাপেরও টাকা বলিবার মত টাকা আছে, সাধ আহ্লাদ সব মিটিয়ে করবে, কাজেই দেওয়া-থোওয়ার জন্যে কাউকে ভাবতে হবে না।"

মা বলিলেন, "তাত হল। কিন্তু এখন মেয়ে দেখতে পাঠাই কাকে? কেশব তুই গিয়ে দেখে আস্‌বি?"

কেশব বিরক্ত মুখ করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আরও কিছু নয়? আমি নিজেই যাই আর কি?"

মা বলিলেন, "তোমার বাপ নেই, ভাই নেই, নিজেও যদি না যাবে ত কি আমি যাব নাকি অচেনা বাড়ীতে? পন্টুকে সঙ্গে করে যা না, কত ছেলেই ত বন্ধুর সঙ্গে কনে দেখ্‌তে যায়।"

কেশব বলিল, "পন্টু আমার উপর চটে আছে। এখন দুচার দিন যাক্, একটু ঠাণ্ডা না হলে তাকে কিছু বলা যাবে না।

ঘটকী বলিল, "এসব কি পড়ে থাকবার মেয়ে দাদাবাবু? দু চার দিন দেরী করতে করতে অন্য কোথাও থেকে কেউ এসে পছন্দ করে নিয়ে যাবে। যেতে হয়ত কাল পরশুই যেতে হবে। একটা সময় ঠিক করুন আমি তাঁদের খবর দিয়ে যাব।"

কেশব খানিক ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, কাল এসে খবর নিয়ে যেও। আমি আজ ততক্ষণ মণিকে সাধি গিয়ে যদি আমার সঙ্গে যেতে রাজি হয়।"

হরিকেশব ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। ঘটকী জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ মা, দাদাবাবুর কথা কি বল্‌ব? ক'টা পাশ দিয়েছে কোন্ আপিসে চাকরি করে, মাইনে কত পায় সবই ত জিগ্‌গেস করবে তারা!"

মা হাত তুলিয়া বলিলেন, "কি আর বলবে বাছা? যতখানি বল্‌তে পারতাম ততখানি বলবার মুখ ত নেই। ছেলে এম, এ পাশও করেছে, যেমন তেমন একটা বাড়ীও আছে। কিন্তু আসল জিনিষ ত টাকা আজকাল? এই যুদ্ধের বাজারের চাকরী আজ আছে ত কাল নেই। ওর উপর নির্ভর করে বেশী জাঁক ত করা যায় না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে এ চাকরী যদি নাও থাকে, তবুও বৌকে ভাত দেবার যোগ্যতা আমার ছেলের আছে।"

ঘটকী বলিল, "ও সব কথা কেউ বলে না মা। আমি বল্‌ব বড় চাকরী করে, এখনই তিন শ' পায়, পরে আরও বাড়বে। তবে চেহারার কথাও ত বল্‌তে হবে ভাল করে!" মা হতাশ ভাবে বলিলেন, "ভাল করে আর কি বল্‌বে মা? ছেলে ত আমার কার্ত্তিক ঠাকুরটি নয়। কালো মায়ের কালো ছেলে, যেমন দেখ্‌ছ তেমনি বোলো।"

দুই হাত নাড়া দিয়া ঘটকী বলিল, "একে তুমি কালো বল? পুরুষ ছেলে রোদে রোদে পথে-ঘাটে ঘোরে, রোদপোড়া ত খানিকটা হবেই। দেখ্‌বে এখন একমাস ঘরে থাকলে ঐ রং কেমন হয়! আমি বাপু ফরসাই বলব।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "তা তুমি যা ভাল বোঝ তাই বোল। তাদেরও চোখ আছে, তারা না দেখে ত আর জামাই করবে না। তুমি বল্‌লে যদি তাদের দৃষ্টি বদলে যায় ভালই ত!"

মালতী বলিল, "তোমাদের বেশ ভাল বিচার, আমরা হলাম কালো, আর দাদা হ'ল ফরসা! বৌও তেমনি ম্যাট্রিক পড়া বিদুষী। আর আমি বেচারী আই, এ পাশ করেও দিন রাত মুখ্যু গালাগালি খাই।"

শোভা বলিল, "আরে বোকা! তোর ঘটকালী করবার সময় কি আর তুই মুখ্যু থাকবি না কালো থাকবি! তখন বিদ্যেয়ও বাপ ডাকবে রূপে ত ডাকবেই। পিথিমিতে এমন তখন আর মিল্‌বে না।"

সেদিনকার মত ঘটকী বিদায় হইল।

*　　　*　　　*　　　*　　　*

বন্ধু মণিকে সংগ্রহ করিয়া হরিকেশব কনে দেখিতে গেল। কনে দেখা মানেই সঙ্গে সঙ্গে এক পেট চর্ব্ব-চোষ্য খাওয়া, কাজেই এহেন সুখের কাজে মণির বিশেষ আপত্তি ছিল না। যুদ্ধের বাজারে কে বা এখন শুধু শুধু খাইতে দেয়? বাড়ীতেও ত ভাত ডাল কুমড়ো আর শাক ছাড়া বেশী কিছু জোটে না।

কনের বাবার সত্যই জাঁকজমকের সংসার। কার্পেট মোড়া ঘরে চক্‌চকে নূতন আসবাব মার্ব্বেলের সিঁড়ির উপর পাছে জুতার দাগ পড়ে তাই সিঁড়িতে পা দিবার আগেই অভ্যাগতদের জুতা খুলিয়া রাখিতে হয়। গৃহকর্ত্তাদের জুতাও বাহিরে দরোয়ানের জিম্মায়। ঘরের ভিতর সখের পশমী চটি কেহ ব্যবহার করে, কেহ করে না।

দালানে গালিচার আসনের সম্মুখে রূপার বাসনে কেশব ও মণিকে জলযোগ করিতে দেওয়া হইল। থালার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া রেকাবী ও বাটি। কেশব ভাবিল, ঘটকী নিতান্ত মিথ্যা বলে নাই। রূপার বাসনেরই যখন এত ঘটা, তখন কাঁসার বাসনে মেঝে যে ঢাকা পড়িয়া যাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

আহারের পর কন্যা দেখার পালা। অন্তরালে অলঙ্কারশিঞ্জন ও মহিলাদের মৃদু কণ্ঠের হাস্যালাপ শোনা যাইতেছিল। বাড়ীর বুড়ী ঝির সঙ্গে রুজ ও লিপষ্টিকশোভিতা কন্যা ঘরে ঢুকিয়া একটুখানি দাঁড়াইল, তারপর একটু ইতস্ততঃ করিয়া পাশের একটা গদিমোড়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল। কন্যা ত নয় গহনার দোকান! অষ্ট অঙ্গে অষ্টের স্থলে প্রায় চৌষট্টি অলঙ্কার। গহনার ছটা দেখিয়া মণির ত চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। কেশব কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মেয়ের চেহারার খুঁটিনাটি দেখিতেছিল। ঘট্‌কী মিথ্যা কথা বলিয়াছে বলা যায় না। তবে অনেকগুলি সত্য কথা বলে নাই।

কন্যার পিতা বলিলেন, "কিছু জিগেষ করুন।"

মণি অনেক ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কোন্ স্কুলে পড়েন আপনি?"

কনে বলিল, "বেলতলা।"

মণি বলিল, "বেলতলা? বেলতলাতে আমার বোন মাধুরীও পড়ে। তাকে চেনেন?"

"মাধুরী?" কনে ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিল।

মণি উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া বলিল, "চেনেন বুঝি? মাধুরী সেন।"

কনে বলিল, "আমার সঙ্গেই ত পড়ে। বলবেন আরতি।"

মণি চমকিয়া উঠিল। এই সেই আরতি? মাধুরীর নিকট ইহার অনেক গল্প সে শুনিয়াছে। আরতির গলা কিরকম মিষ্ট, সে কত আধুনিক গান জানে, মণি গান শুনিতে ভালবাসে বলিয়া দুই বন্ধুতে তাহাকে লইয়া কত রসিকতা ও হাসাহাসি করে সমস্তই মণির মনে পড়িয়া গেল।

মণি বলিল, "একটা আধুনিক শোনান না!"

কর্ত্তা হাঁকিলেন, বিষ্টু, ওঘর থেকে বক্স হার্ম্মোনিয়ামটা নিয়ে আয় ত।

বিষ্ণুচরণ সবুজরঙের একটা মস্তবড় বাজনা আনিয়া অন্য একটা চেয়ারে আরতির সম্মুখে বসাইয়া দিল। আরতি বাজনার উপরের ঢাকাটা খুলিয়া এবং আওয়াজটা নানা উপায়ে যথাসম্ভব বাড়াইয়া, উচ্চগ্রামে গান ধরিল, "কথা কোয়োনা কো, শুধু শোনো।"

তীক্ষ্ণ উচ্চ-গলা যেন কানের পটাহ ছিঁড়িয়া ভিতরে গিয়া ঢোকে। আরতি ভোলে নাই যে মা বলিয়া দিয়াছিলেন, "গান শুনতে চাইলে গলা চেপে গেও না, গলায় কতটা জোর আছে যেন ওরা বোঝে।" আরতি যে একলা গাহিয়া একটা হল ভরাইয়া দিতে পারে তাহা বুঝিতে কাহারও দেরী হইল না। কেশব মনে মনে ভাবিল, "এযে একেবারে কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো," কিন্তু মুখে কিছু বলিতে পারিল না। গান বলিতে সে রবীন্দ্রনাথের গানই বুঝিত। আধুনিক নাম দিয়া রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি ওলোট-পালট করিয়া সাজাইয়া এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ অশ্রুবাষ্প মিশাইয়া যে গান রচিত হয় কেশব তাহার উপর ছিল হাড়ে চটা। গান শুনিয়া ভাবুক মণি তন্ময় হইয়া গেলেও কেশবের পিত্ত শুদ্ধ জ্বলিয়া গেল। তাহার মতামত কড়া, হয় তাহার ভাল লাগে, নয় তাহার হাড় জ্বলিয়া যায়। আরতি গান গাহিয়া চলিয়া গেলে আরতির পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কিছু জানতে চান?

মণি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কেশবের দিকে তাকাইল। কেশব বলিল, "না আর হাজারটা খুঁটি নাটি জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই।"

কন্যাকর্ত্তা বলিলেন, "কিছু বলে যাবেন?"

কেশব বলিল, "বাড়ী গিয়ে মার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে খবর দেব।"

নমস্কার করিয়া দুই বন্ধু বিদায় লইল।

মণি গেটের বাহিরে আসিয়া বলিল, "বাব্বা; টু পাইস হাজ, এরকম খ্যাঁট কেউ খাওয়ায় না, তার উপর এইরকম বাড়ী।

কেশব বলিল, "শুধু পাইস দেখলেই ত আর পৃথিবীতে চলে না। আরও অনেক দেখবার জিনিষ আছে।"

মণি বলিল, "কি দেখবে? চেহারা? খাসা ত দেখতে মেয়েটি।"

কেশব বলিল, "রং মাঝারি, সামনের একটা দাঁত বেরিয়ে থাকে, ভুরু ত প্রায় নেই বললেই হয়।"

মণি বলিল, "তোমার চেয়ে অনেক ফরসা। বাঙালীর মেয়ে আবার ক'টা তপ্তকাঞ্চন বর্ণা হয়। তাছাড়া মানুষের মুখে একটুখানি খুঁৎ থাকলে তাঁকে ত ভালই দেখায়। সব যদি একরকম জাপানী পুতুলের মত দেখতে হয়, তবে মানুষে মানুষে আর তফাৎটা কি রইল? ছোট ছোট খুঁৎগুলোই ত মানুষের নিজস্ব রূপ।"

কেশব বলিল, "আচ্ছা, তা না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু পশমের পাখী আর আঁশের ফ্লাওয়ার বাস্কেট গড়লে ত আর সত্যিকারের কলচর হয় না। গান গাইবে তা আধুনিকী, শাড়ী পরবে তা জরির মুরগী কি হাঁসওড়া জর্জ্জেট, গয়না পরবে তা বগলস প্যাটার্ণ হার আর মেট্রো প্যাটার্ণ নেকলেস। সব আমার মনে নেই, কিন্তু একটা জিনিষের মধ্যেও সত্যিকারের শ্রী নেই। একটা কিছু দেখে কি শুনে আনন্দ পেলাম না।"

মণি বলিল, "আধুনিক গান ত আমি গাইতে বলেছিলাম, ও ত নিজের থেকে গায়নি। আর গহনা তুমি যদি অজন্তা প্যাটার্ণের পরাতে চাও, পরে পরিও। আশা করি ও তাতে আপত্তি করবে না। ওসব মাইনর পয়েণ্ট নিয়ে মাথা ঘামালে চলে না।"

কেশব বলিল, "তুমি যাই বল, আমার মন উঠ্‌ছে না।"

*　　　*　　　*　　　*

বাড়ী গিয়াই মণি মাধুরীর টিকি ধরিয়া টানিয়া বলিল, "এই, আজ তোর আরতিকে ডিস্‌কভার করেছি। চোখেও দেখেছি, গানও শুনেছি।"

মাধুরী দুই হাতে বিনুনিটা ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "যাও যাও, চাল মেরো না। আরতি তোমার মত রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে কি না, তাই তুমি তাকে ডিসকভার করবে! মিথ্যে গল্প বানাবার আর জায়গা পাও নি।"

মণি হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁরে, তোদের ভাষায় গড্‌প্রমিশ! একটুও গল্প বানিয়ে বল্‌ছি না। হরিকেশবের সঙ্গে কনে দেখ্‌তে গিয়েছিলাম ওদের বাড়ীতে, কিন্তু অমন মেয়েকেও কেশবের পছন্দ হল না। তুই যেন আরতিকে বলে দিস্‌নে। ও সব স্পষ্ট করে না বলাই ভাল।"

মাধুরী বলিল, "দেখি আমার পেটে কতক্ষণ কথাটা থাকে! অত যদি ভয় আমাকে না বল্‌লেই পারতে। আমি বাপু, কথা চেপে রাখ্‌তে পারিনা, প্রাণ আইঢাই করে।"

*　　　*　　　*　　　*

এবারও কনে পছন্দ না হওয়ায় কেশবের মনটা একেবারে খারাপ হইয়া গেল। নিজের উপর ভয়ানক রাগ হইতে লাগিল। নীরা মেয়েটি মন্দ কি ছিল? আরতির চেয়ে অনেক ভাল। ফস্ করিয়া পণ্টুর কাছে ঐ রকম মত না প্রকাশ করিয়া যদি একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া কথা বলিত, তবে পণ্টুটা চটিত না। ইতিমধ্যে আরতিকে দেখিয়া লইলে কিই বা ক্ষতি হইত, কেই বা জানিত? কিন্তু এখন আপশোষ করিয়া লাভ আছে কি? মুখটা ভগবান তাহার এমন আল্‌গা না করিলে পারিতেন। সাতদিন আটদিন ধরিয়া কেশব এক কথাই ঘুরিয়া ফিরিয়া ভাবে। মা নানা প্রশ্ন করেন জবাব দেয় না। মণিও একবার খোঁজ করিতে আসিয়াছিল, শরীরের একটা অজুহাত দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছে।

অবশেষে দিন দশ পরে কেশব পণ্টুর বাড়ী গিয়া হাজির হইল। তাহাকে একটা কফি হাউসে

ধরিয়া আনিয়া নিজের ভুল স্বীকার করিল, বলিল, "দেখ্, আমার এই মুখটা বড়ই আলগা। সেদিন অমন করে তোকে আমার চটিয়ে দেওয়া উচিত হয় নি। ও কথাগুলো ভুলে যা। ওদের বাড়ীর কাকে কাকে চিনিস? আমার কথা একটু বলে দেখ্না।

পণ্টু অকস্মাৎ আগাগোড়া লাল হইয়া উঠিল। বলিল, "দেখ কেশবদা, সে একটা মস্ত কেলেঙ্কারী হয়ে গিয়েছে। সেদিন আমরা গাড়ী থেকে নেমে এমন চেঁচামেচি করেছিলাম যে অনেক কথাই নীরার কানে গিয়েছে। সে আমাকে পরদিন পথে আটক করে জেরা সুরু করে দিলে। আমাকে বলতেই হল ব্যাপারটা। এখন কি আর কথা দ্বিতীয় বার তোলা যায়?"

কেশব একটু অপ্রস্তুত মুখ করিয়া বলিল, "শক্ত বটে! তবে আমি যখন ভুল স্বীকার করছি, তোমার আর বল্‌তে কি? তুমি ত আর অন্যায় কিছু বল নি!"

পণ্টু আমতা আমতা করিয়া বলিল, "অন্যায় বল্‌লে ত তবু সহজ ছিল, ন্যায় এত সজোরে এত বেশী করে বলে ফেলেছি যে এখন আর অন্যায় বলে নিজের মতটা ঢাকা দিতে পারব না। তুমি শুধু অপছন্দ করেছিলে, আমি তোমার উপর ক্ষেপে গিয়েছিলাম। কাজেই আমার কথাটাই তার কানে বেশী গিয়েছে। তারপর আর বেশী কি বল্‌ব ভাই, আমি নিজেই জালে জড়িয়ে গিয়েছি।"

কেশব বলিল, "কংগ্রাচুলেট করি তোমাকে। আমার ফুটো কপালে ম্যাট্রিক অবধিও আছে কিনা জানি না।"

বাড়ী ফিরিয়া কেশব ভাবিতেছিল আজ পর্য্যন্ত আট দশটা ত খবর করা হইল। একটাও যখন পছন্দ হয় না, তখন যা পাওয়া যায় তাই করা ছাড়া উপায় কি? মণিকে এখনও ত শেষ কথা বলা হয় নাই। তাহারই কাছে যাইব কি? কানে এখনও বাজিতেছে, "কথা কোয়োনা কো, শুধু শোনো।" শিক্ষার দোষে অমন হয়, আর একটু আস্তে গাইতে বলিলে হয়ত অনেক মিষ্ট শোনাইত। আর সত্যইত, সাজ-পোষাক আমার পছন্দ মত করাইলে ঐ মেয়েই ইণ্ডিয়ান আর্টের ছবির মত হইয়া উঠিতে পারে। তবে সময় লাগিবে কিছুদিন।

দরজা ঠেলিয়া মণি আসিয়া ঘরে ঢুকিল। বলিল, "মাধুরী ঘটকালিতে সকশেশফুল হয়েছে। তুমি ত করলে না, ওরা মেয়ের বিয়ে দিতে এতই ব্যস্ত যে আমাহেন অর্ব্বাচীনকেই অ্যাকসেপ্ট্ করেছে।" কেশব বলিল, "মাধুরী ত কিছু মন্দ নয়। ওকেও শেষে কেউ কাল কি পর্শু বিয়ে করে বস্‌বে, তার চেয়ে আমিই ওকে বুক্ করে রাখি।"

মণি বলিল, "মাধুরী হাবা নম্বর ওয়ান্!"

কেশব বলিল, "তা হোক্। নিজের বুদ্ধির উপর আর বেশী শ্রদ্ধা নেই।

বাঙালীর বীরত্ব কাহিনী ২

"সিংহল নামে রেখে গেছে
নিজ শৌর্য্যের পরিচয়"

আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাংলার বীর সন্তান বিজয়সিংহ মাত্র সাত শত অনুচর লইয়া অদ্ভুত সাহস ও বিক্রমের সহিত সুদূর লঙ্কার দুর্গভালে বাংলার জয় পতাকা প্রোথিত করিয়া• স্বীয় নামানুসারে বিজিত দ্বীপের নাম রাখিয়াছিলেন "সিংহল"।

বাঙ্গালীর সেই শৌর্য্য বীর্য্য আজ কাহিনীতে পর্য্যবসিত—স্বাস্থ্যহীনতার জন্য জাতীয় জীবন প্রতিপদে ব্যাহত।

ল্যাড্‌কোভাইন
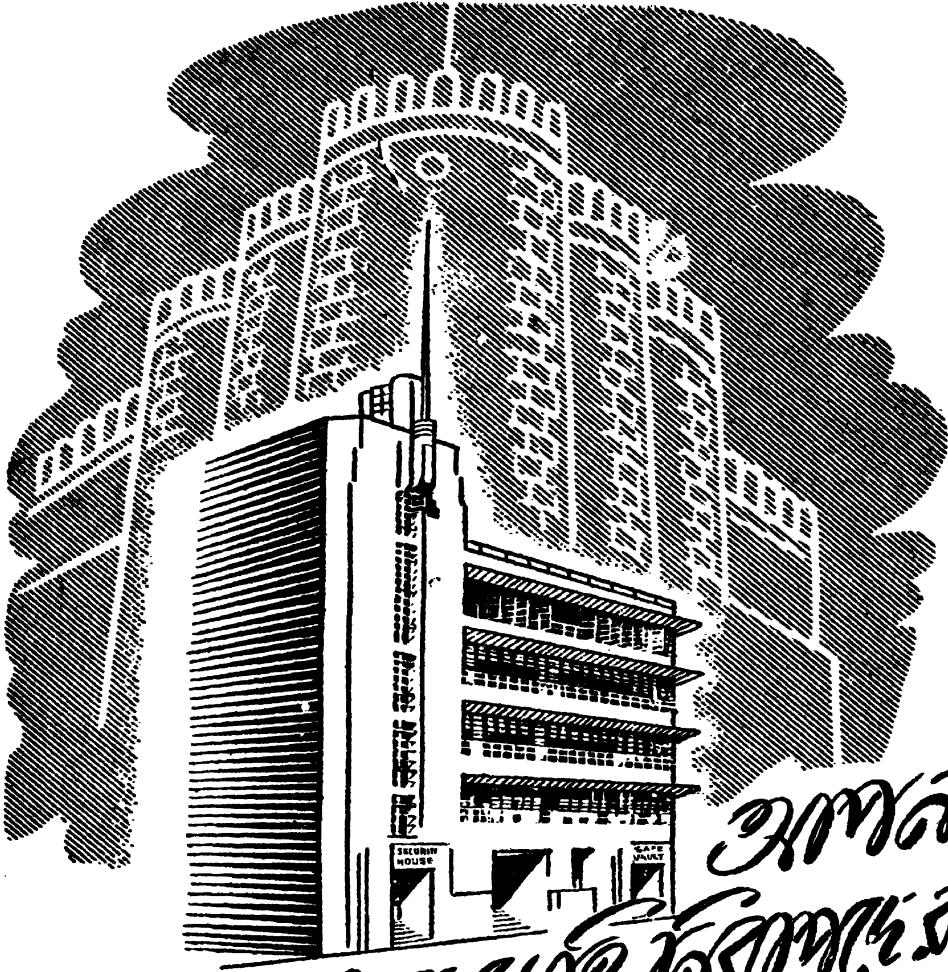
স্বাস্থ্যহীনতার গ্লানি দূর করে। এই সুবিখ্যাত টনিকটির প্রতি বিন্দু শক্তি, পুষ্টি ও উদ্যমের শ্রেষ্ঠ পরিবেশক।

ল্যাড্‌কোভাইন

আদর্শ টনিক ওয়াইন

লিষ্টার এণ্টিসেপটিকস্ · কলিকাতা

A. A. S.
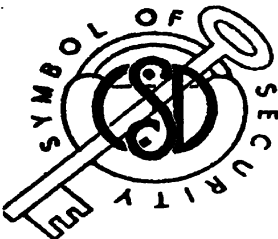
প্রাণের গুদাম

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

গুদামটা আগে ছিল পুরাণো একটা শেড, তাড়াতাড়ি টিন দিয়ে ঘিরে ফেলে গুদামে পরিণত করা হয়েছে। টিন দিয়ে ঘিরে দিয়েছে কণ্ট্রাক্টর, মেঝেটা পাকা করে দেবার ভারও ছিল কণ্ট্রাক্টরের। কথা ছিল নতুন টিন দেবার, কিছু কিছু যে দেওয়া হয়েছে নতুন টিন তাতে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। মেঝেটা উঁচুও করা হয়েছে চারিদিকের জমি থেকে হাতখানেক, গুদামের বাইরের ভিটেটুকুতে সিমেণ্ট ঝক-ঝক করে। ভেতরে ইঁট পড়েছে কিরকম, সিমেণ্ট খরচ হয়েছে কত, লোক খেটেছে কতজন সে সব জানবার প্রয়োজন কারো হয় নি। জেনে লাভও নেই।•

মাল বোঝাই হবার আগে গুদামের ভেতরটা ছিল আবছা অন্ধকার। মাল বোঝাই হবার পর তো মেঝে একেবারে আড়াল হয়ে গেছে। তাছাড়া, গুদাম একরকম একটা হলেই হল—মানুষ স্বচ্ছন্দে কোন খাদ্য চুরি করে নিতে পারে এইটুকু ঠেকালেই যথেষ্ট। তাই বোধ হয় ফাঁকায় গাদা করে না রেখে শেডের নীচে ঘেরা জায়গায় সশস্ত্র প্রহরী দিয়ে রাখা হয়েছে। ক্ষুধার্ত্ত মানুষের হাত থেকে খাদ্য বাঁচল, সেই সঙ্গে বর্ষা বাদলেও খুব বেশী ক্ষতি করতে পারবে না।

শিবরামের হাত থেকে কণ্ট্রাক্টটা ফস্‌কে চলে গিয়েছিল মিঃ রায়ের হাতে, আত্মীয়তামূলক যোগাযোগের বাড়তি টানে, ঘুষে মিঃ রায় শিবরামকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি নিশ্চয়। শিবরাম ধীরে ধীরে টের পাচ্ছিল, শুধু টাকার ঘুষের আর সেরকম দাম যেন নেই অনুগ্রহকারীদের কাছে, দেবতার কাছে নিছক চাল-কলার নৈবিদ্যের মত, সেই সঙ্গে ফুল চন্দন ধূপ-ধুনা প্রভৃতিরও দরকার হয়েছে আজকাল। আত্মীয়তা কুটুম্বিতা থাকে তো ভালই, নয় তো আনাগোনা, টুকিটাকি উপহার, মিঠেকথা মোসাহেবী এসব উপচারে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলে বজায় রেখে চলতে হয়। মানুষের মনস্তত্বের বিশ্লেষণ যে তার ভুল হয় নি পরে নিবারণ তার প্রমাণ পেয়েছে। মিঃ রায়ের হাত থেকে কণ্ট্রাক্ট খসে চলে এসেছে তার কাছে। ঘুষ দিয়ে পেরে উঠবে কেন মিঃ রায় তার সঙ্গে, সেই সঙ্গে সে যদি মানুষকে বশ করতেও আরম্ভ করে অন্যভাবে তবে আর কথা কি।

শিবরাম বলেছিল, 'এমন ফাঁকি আমরাও দিতে শিখি নি, আমাদেরও বিবেক আছে। তিনভাগ টিন মর্চেধরা, ফেলে দিতে হত। ভেতরে একটু সিমেণ্টগোলা জল ছিটিয়ে দিয়েছে। ইঁট তো দেয় নি, মাটিও দেয় নি ভিটেতে—জঞ্জাল আর আবর্জ্জনায় ফাঁপা করে রেখেছে। এমনিতেই লাখখানেক ইঁদুর বাসা করত, এখন শেয়াল গর্ত্ত খুঁড়ে বাচ্চা মানুষ করবে!'

শশাঙ্ক বলে, 'উপায় কি, একজায়গায় তো জমা করে রাখতে হবে, বাজারে ছাড়লেই তো পড়বে গিয়ে আপনাদের এজেন্টদের হাতে। এমনি তবু গরীবদের পাবার ভরসা আছে দু'দশ ছটাক, তখন আর চোখেও দেখতে পাবে না।'

ওসব আটাময়দা চাল আমরা খাই না মশায়।

'আপনারা ভাল জিনিষ খান, কিন্তু বেচেন তো এসব। খাবার জন্য না কিনুন, চালান দেবেন, নয় চালানী দামে আশেপাশে বেচবেন।'

এমনিভাবে কথা বলে শশাঙ্ক, জীর্ণ শীর্ণ আধবুড়ো এক কেরানী। এই দুর্ভিক্ষের দিনে তেত্রিশ-হাজার মন খাদ্য দেখাশোনা করার দায়িত্ব পেয়ে বুকটা যেন তার ফেঁপে উঠেছে। দায়িত্ব তো ভারি, শুধু দেখা যে বড় বড় তালাগুলি ঠিকমত লাগানো আছে আর দারোয়ান ও পাহারাওলা কজন ঠিকমত কাজ করছে। একটা তালা খুলবার ক্ষমতাও তার নেই। তবু তার কথা শুনে মনে হয়, চারিদিকের ওৎ-পাতা মুনাফাখোরদের কবল থেকে সেই বুঝি এই খাদ্যগুলি প্রাণপণ চেষ্টায় বাঁচিয়ে সাধারণ দুঃখী লোকের জন্য জমিয়ে রেখেছে। তবে, শশাঙ্ক কখনো শত্রুতা করে না। হাতের তালুতে ভাঁজকরা কিছু নিয়ে ওর হাতে হাত মেলালে খালি হাত ফিরে আসে, খাতির বাতিল করার বাহাদুরী ওর নেই। তার সরবরাহ আটহাজার মন আটা দেখেও মুখ বাঁকিয়েছিল, কিন্তু সময়মত জায়গামত ঠিক কথাটি বলতে কসুর করে নি, আটা মোটা হলে একটু ভোঁতা গন্ধ ছাড়ে হুজুর, নতুন আটাতেও। লোকে এ আটা পেলে লুফে নেবে।

না বললেও অবশ্য ক্ষতি ছিল না কিছু। কেনা মাল যেমন হোক গুদামে তোলাই তখন কাজ। পরের কথা পরে।

শশাঙ্ক নিজেও জানে না, বিশেষ দরকার না থাকলেও নিবারণ বা মিঃ রায়ের পক্ষ টেনে সময় মত ওসব সমর্থনের কথা কেন বলতে যায়। কতটুকুই বা ক্ষমতা তার উপকার করা বা ক্ষতি করার। সব কিছু ঘটে একরকম তার নাগালের বাইরে, দু'চারটে নোট তার হাতে গুঁজে দেওয়া হয় সে যাতে কোন গোলমাল না করে, চুপ করে থাকে। মুখটা বন্ধ করে রাখার পুরস্কার ওটা। কেন তবে সে বাহাদুরী করতে যায়? টাকার কৃতজ্ঞতায়? অথবা ওপরওয়ালাকে জানিয়ে দিতে, আমিও আছি এর মধ্যে, কিন্তু ভয় পাবেন না, আমি আপনার অনুগত, আপনারি পক্ষে?

হয় তো ভালই হয়েছে ফলটা। তাকে যে বিশ্বাস করে ওপর থেকে, তার তো প্রমাণই পাওয়া গেল। কিন্তু উপার্জ্জনটা বড় কমে গেছে এই বিশ্বাসের বোঝায়। এই কাজে এসে উপরি তেমন জুটছে না। আগেকার বাটোয়ারার জের টেনে কিম্বা নায়েবের সঙ্গে এখনো তার খাতির আছে এইজন্য ভিক্ষার মত কিছু যদি কেউ দেয়।

বিশেষ কিন্তু আপশোষ হয় নি শশাঙ্কের। মনটা তার চিরদিনই একটু স্পর্শপ্রবণ ছিল, চারিদিকের আকাশ ছোঁয়া লোভ ও স্বার্থপরতার চাপে কঠিন হয়ে গেলেও এখনো দুঃখের ছোঁয়া লেগে তাকে একটু তন্মনা করে দেয়। অন্তরের এই বিলাসিতাটুকু সযত্নে বাঁচিয়ে সে পুষে রেখেছে, সময় ও সুযোগ মত উপভোগ করে। চারিদিকে অনাহারে মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা চোখে দেখে এবং বর্ণনা শুনে ও পড়ে' সে দুঃখিত হতে সাহস পায় নি, নিজেকে উদাসীন করে রেখে দিয়েছে। আনমনা হয়ে মানুষ পুত্রশোক ভুলে যেতে পারে, এতো পরের, গরীব দুখীর, না খেয়ে মরার জন্য সমবেদনা বোধ করা।

এখন আর অতটা মনকে বাঁচিয়ে চলবার দরকার হয় না শশাঙ্কের, খেতে না পেলে ক্রমে ক্রমে নানা বয়সের মানুষের কি অবস্থা হয়, কি অবস্থায় তারা মরে পড়ে থাকে পথের ধারে, এসব এখন সে চোখ মেলে চেয়ে দেখতে পারে, দীর্ঘনিশ্বাসও ফেলতে পারে। তেত্রিশ হাজার মন খাদ্য তার মনে এই জোরের সঞ্চার করছে। এই বিরাট খাদ্যভাণ্ডারের সংস্পর্শে থেকে সে অনুভব করে, আর ভাবনা নেই, না খেয়ে এবার আর মরবে না কেউ এ সহরে বা আশে পাশের গ্রামে। কে পেট ভরে খেল কার আধ পেটা জুটল সে হিসেব চুলোয় যাক, না খেয়ে কেউ মরবে না এত খাদ্য থাকতে।

টিনের ফুটো আর ফাঁক দিয়ে খাদ্যের গন্ধ প্রতিদিন নাকে এসে লাগে শশাঙ্কের, খাদ্যবস্তুর এই অবিস্মরণীয় ঘনিষ্ঠতায় তার হৃদয় স্বস্তিতে ভরে যায় : হাজার হাজার মানুষকে বাঁচিয়ে রাখবে এই খাদ্য, দুর্দ্দিন পার করে দেবে।

ষ্টেশনে নেমে লাইন ধরে হেঁটে লেভেল ক্রশিং-এর রাস্তা দিয়ে সহরে যাবার সময় গুদোমটা ডাইনে পড়ে। এ রাস্তায় লোক চলাচল কম, গাড়ীঘোড়াই চ'লে বেশী। দুপুরবেলা হঠাৎ জামাই সত্য এসে প্রণাম করায় শশাঙ্ক টের পায়, একটার গাড়ী থেকে নেমে সত্য বাড়ীতে যায় নি, লেভেল ক্রশিং হয়ে সোজা এখানে এসেছে। কারণটা শশাঙ্ক বুঝে উঠতে পারে না। এইখানে যে তার অপিস হয়েছে আজকাল তাও জামাই কি করে জানল সে ভেবে পায় না।

'বাড়ীতে যাও নি ?

'আজ্ঞে না। ভাবলাম যাবার পথে আপনাকে প্রণাম করে যাই। এই নাকি ফুড ষ্টোরেজ ?

এসে দাঁড়িয়েই মুখ বাঁকিয়েছিল সত্য, মুখের ভঙ্গিটা তার আরও গভীর ভাবোদ্যোতক হয়ে ওঠে।

আটা ময়দা থাকলে ওরকম গন্ধ একটু হয়। চলো তোমাকে নিয়ে বাড়ী যাই।

'আপিস ?'

'আপিস আর কি, বসে থাকা। একদিন একটু তাড়াতাড়ি গেলে কিছু হবে না। ন'মাসে ছ'মাসেও এখানে কেউ খোঁজ নিতে আসে না।'

একটা ঘোড়ার গাড়ী ডেকে কুলির মাথা থেকে সত্যের মালপত্র গাড়ীতে তোলা হয়। প্রথম মেয়ের প্রথম জামাই, বিয়েও হয়েছে মোটে বছর দুই, তাকে এভাবে নিজে হাজির থেকে আদর অভ্যর্থনা জানাবার সুযোগ পেয়ে শশাঙ্ক খুব খুসী হয়। আগের কাজে থাকলে এভাবে হঠাৎ যখন খুসী জামাইকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী যাওয়া সম্ভব হত না। তবে, আগের কাজে থাকলে জামাই বাড়ী যাবার পথে তাকে প্রণাম করার জন্য অতটা ঘুরে যেত কিনা সেটা ভাববার কথা বটে।

'আপনার ও আটাময়দা কিন্তু খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

'গরীব দুখী খেতে পায় না, তাদের আবার ভাল আর খারাপ।'

দু'একমাস পরে আর মানুষের গ্রহণের যোগ্য থাক্‌বে না। ভেতরে গিয়ে কেউ কখনো দ্যাখে না?'

'কই না। দরকার লাগলে বার করা হবে, কে আবার দেখতে যায় গেট খুলে ভেতরে গিয়ে? তুমি তো ভাবিয়ে দিলে আমায়!'

ভাবনা ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখবার কায়দা আয়ত্ত করতে হয়েছে শশাঙ্ককে অনেকদিনের চেষ্টায়, নতুন জামাইকে সঙ্গে রেখে অত ভাবনা ভাবলে চলবে কেন। কিন্তু রাস্তার দু'পাশের শত শত চিহ্ন যেন ষড়যন্ত্র করেছে কথাটা তাকে ভুলতে দেবে না। গাছের ছায়ায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে গাঁ থেকে পলাতক কঙ্কালগুলি, সূর্য্যাস্তের সঙ্গে ওদের কতগুলির জীবন অস্ত যাবে কে জানে। ছায়া না খুঁজে দুপুরের এই খর-রোদে হেঁটেও বেড়াচ্ছে অনেক কঙ্কাল ধূলায় ধূসর হয়ে, উৎসুক ভয়ার্ত্ত চোখে ঘোড়ার গাড়ীর দিকে চেয়ে ওরা কি কামনা করছে শশাঙ্ক জানে। জামায়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বারবার সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, তার ভীরু করুণ উদাস চাউনি দেখে সত্য অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

বাড়ী পৌঁছেই শশাঙ্কের ছুটি, জামাইকে লুপে নেয় মেয়েরা। নীচে পিছন দিকের ছোট ঘরখানায় বসে শশাঙ্ক আকাশ পাতাল ভাবে। গন্ধ? গুদামের ভেতর থেকে গন্ধ কিছু বেরোচ্ছে বৈকি, সে তো রোজই টের পাওয়া যায়। সে কি ভেতরের সমস্ত খাদ্য পচবার গন্ধ? অথবা অত খাদ্য একসঙ্গে জমা করা থাকলে এখানে ওখানে একটু আধটু পচন ধরে ওরকম গন্ধ ছাড়ে, তার কোন প্রতিকার নেই। মানুষের খাদ্য নিয়ে যত সাজানো গুছানো কায়দা করা মিথ্যা শশাঙ্ক শুনেছে আর নিজে বলেছে আজ সেইগুলিই তার মনের মধ্যে ভাঁজ খুলে খুলে নতুন যুক্তি আর সত্যের রূপ নিয়ে তাকে নিশ্চিন্ত করতে চায়। মেঝেতে যে বস্তা লেগে থাকে ড্যাম্প লেগে সে বস্তাগুলি খারাপ হয়ে গন্ধ বেরোয়—কিন্তু উপরের বস্তাগুলির কিছুই হয় না। একটা বস্তা কোন কারণে আগে থেকেই খারাপ হয়ে থাকলে সেটা ক্রমে ক্রমে চারপাশের অন্য বস্তাগুলি নষ্ট করতে থাকে, তাতেও পচা গন্ধ বার হয়, কিন্তু তাই বলে একটু তফাতের বস্তা কেন নষ্ট হবে! সত্য এসব বিষয়ে কি জানে যে বাইরে থেকে শুধু গন্ধ শুঁকেই সে বলে দিতে পারবে ভেতরের সব জিনিষ খারাপ হয়ে যাচ্ছে! ভাঁড়ারঘরে একটা ইঁদুর পচলেও তো মনে হয় সমস্ত জিনিষ বুঝি পচে গলে ভাপ্‌সে উঠেছে! সেই ভুলই হয় তো করেছে সত্য?

মন শান্ত হয় না। তেত্রিশ হাজার মন খাদ্য যদি সত্য সত্যই নষ্ট হতে বসে থাকে, প্রায় অযোগ্য হয়ে গিয়ে থাকে মানুষের খাবার? তার নিজের কোন ক্ষতি নেই, শশাঙ্ক জানে। গুদামের জিনিষ কি অবস্থায় আছে দেখবার দায়িত্ব তার নয়। সে শুধু দেখবে তালা ঠিক মত লাগানো আছে কি না, পাহারা ঠিকমত চলছে কি না আর লিখিত হুকুম এলে ঠিক সেই পরিমাণ জিনিষ ডেলিভারি হল কি না। তার বেশী আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামাবার কথা তো তার নয়। দোষ তাকে কেউ দিতে পারবে না। তবু এই দুর্দ্দিনে তেত্রিশ হাজার মণ খাদ্য নষ্ট হওয়ার কথা ভাবলেও নিজেকে কেমন তার দুর্ব্বল মনে হয়। পুণ্যের বোঝা ফাঁকি দেখলে পাপীর যেমন হয়, তেমনি যেন অসহায় ঠেকে তার নিজেকে।

'দুটি ভিক্ষে দাও গো মা।'

খিড়কির এই দরজাতে ভিখারিণী এসে জুটেছে, জঙ্গল বাঁশ ঝাড়ের বাধা না মেনে? এঁটো-কাটা ফেলবার আস্তাকুড় বাড়ীর পিছনে থাকে বলে বোধ হয়—জঞ্জালও ঘাঁটা চলে, ভিক্ষাও চাওয়া চলে। বাড়ীর পিছনে ছিটাল দিয়ে ভিখারীও চলাফেরা করে কম। জানালা দিয়ে শশাঙ্ক চেয়ে থাকে ভিখারিণীর দিকে। জট-বাঁধা রুক্ষ চুলের নীচে শ্যাওলা ধরা মেঝের মত সেঁত সেঁতে মুখ, কোলে একটি শিশু। বাচ্চাটিকে দেখে কেমন একটা ক্লেদাক্ত ভয়ের স্পর্শে সর্ব্বাঙ্গে তার শিহরণ বয়ে যায়, গা ছম ছম করতে থাকে। এতটুকু মানুষের বাচ্চা মাথা উঁচু করে অস্ফুট আওয়াজে কাঁদছে? একটা অপুষ্ট ভ্রূণ যেন অভিনয় করছে জীবন্ত শিশুর। দড়ির মত পাকানো রুগ্ন শিশু দেখেছে শশাঙ্ক, কি করে বেঁচে আছে ভেবে দেহ শির শির করে উঠেছে কিন্তু এ বাচ্চাটার দিকে তাকালে যেন ধাঁধাঁ লেগে যায় চোখে।

ভিখারিণী ক্ষীণস্বরে ডেকে চলে, দুটি চাল কেউ দিয়ে যায় না। জামাইকে নিয়ে বাড়ীর সকলে ব্যতিব্যস্ত।

'এই শোন্। এদিকে আয়।'

ভিখারিণী উবু হয়ে বসেছিল, জানালায় একটু তাকিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট পিষে ফেলে মুখের একটা ভঙ্গি করে। ভেতরটা রি রি করে ওঠে শশাঙ্কের। নির্জ্জন দুপুরে আধবুড়ো ভদ্রলোকও জানালা দিয়ে হাতছানি দিয়ে কেন ডাকে এত বেশী করে ভিখারিণী তা জেনে গেছে, লোল চামড়া বুড়ীর চেয়েও ভাঙ্গা শিথিল ও রোগজীর্ণ ওই বয়সকালের দেহটি নিয়ে!

কচুগাছ সরিয়ে ভিখারিণী জানালার সামনে আসে।

'ক'মাসের ছেলে?'

'বছর পুরবে বাবু।'

বছর পুরবে! খানিকক্ষণ শশাঙ্ক কথা কইতে পারে না। কাছে থেকে বাচ্চাটাকে দেখে ভেতরটা তার পাক দিয়ে দিয়ে উঠতে থাকে।

এসব বিস্ময় ও কৌতুহলের সঙ্গে ভিখারিণীর পরিচয় আছে, সে বলতে থাকে, 'হওয়ার পর বাপ মোলো। আমি না খেতে পেলে দুধ পাবে কোথা? খেতে না পেয়ে ওমনি হয়ে গেছে।'

'না খেয়ে হয়েছে? না, ভিক্ষে বেশী পাবি বলে নিজে করেছিস?'

'কার জন্যে ভিক্ষে করা বাবু? ওরি জন্যে তো। নইলে—' ভিখারিণী নির্ব্বিকার দৃষ্টিতে তাকায়, 'মরলে বাঁচি, তা মরবে না। আমার পোড়াকপাল তাই বেঁচে রয়েছে, মেরে ফেলতে পারি না তাই!'

একবছর আগেও সে গেরস্ত ঘরের বউ ছিল, স্বামী নিয়ে ঘর করত। আজ তার মুখে হৃদয়ের ছায়াপাত হয় না, শুধু জ্বালার প্রতিচ্ছবি ছাড়া। শশাঙ্ক নিজে উঠে গিয়ে কিছু চাল আর বাটিতে দুধ নিয়ে আসে। দুধের জন্য স্ত্রীর সঙ্গে কলহ করতে হয়।

'জামায়ের এদিকে দুধ কুলোবে না, একবাটি দুধ তুমি দাতব্য করছ!'

'ওবেলা একসের দুধ বেশী এনে দেব।'

খিড়কির দরজা খুলে দুধের বাটি নামিয়ে রেখে শশাঙ্ক ভিখারিণীকে বলে, 'আমার সামনে বসে খাওয়া ছেলেকে পেট ভরে।'

'আমি খেয়ে ফেলব ভাবছ বাবু?' গাছের পাতা ছিঁড়ে চট করে একটা চামচ বানিয়ে সে বাচ্চাটিকে দুধ খাওয়াতে সুরু করে, 'এই জন্য বেঁচে আছে বাবু, তোমাদের দয়ায়। কেন দয়া কর বাবু, কেন দয়া কর? মরলে যে আমি রেহাই পাই!'

গুদামের পচা খাদ্যের গন্ধ নাকে লাগায় শশাঙ্ক আশ্চর্য্য হয়ে এদিক ওদিক তাকায়। এখানেও গন্ধ কোথা থেকে আসচে? ভিখারিণী উঠে দাঁড়াতে গন্ধটা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শশাঙ্ক অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পচা মানুষের গন্ধও কি পচা খাদ্যের মত? আশ্চর্য্য কি, খাদ্যই তো প্রাণ মানুষের, খাদ্য থেকেই তো দেহ! ভিখারিণী চলে যাবার পর তেত্রিশ হাজার মণ খাদ্যের রক্ষক বলে নিজের মধ্যে যে অর্থহীন স্বস্তিটা সে গড়ে তুলেছিল তার অস্তিত্বটুকুও যেন আর খুঁজে পায় না। মনে হয় তারই বোকামিতে তারি একটু অবহেলায়, ওই খাদ্যে যতলোকের জীবন রক্ষা হতে পারত ততগুলি লোক মরে পচতে আরম্ভ করেছে, দায়িত্ব তার। পচা গন্ধে মস্‌গুল হয়ে উঠেছে চারিদিক, সে কি বলে চুপ চাপ বসে রয়েছে গুদাম পাহারা দিয়ে?

শশাঙ্ককে জামাকাপড় পরতে দেখে তার স্ত্রী বলে, 'আবার বেরুচ্ছো নাকি?'

'হ্যাঁ, সায়েবের সঙ্গে একবার দেখা করব।'

'জামাই বলছিল তোমার সঙ্গে কি দরকারী কথা আছে।'

'ডাকবো নাকি, না, আমিই যাব?' জামাইরা সত্যি লাটসাহেব!

'তুমিই যাও না, জিজ্ঞেস করো কি বলবে।'

খেয়ে উঠে ওপরের ঘরে পান চিবুতে চিবুতে সত্য সিগারেট টানছিল, শশাঙ্ককে দেখে সিগারেটটা একটু আড়াল করে অনেক ভূমিকা ও ভনিতার পর সে তার দরকারী কথায় আসে।

'জানেন তো চাকরী করি না, আমি এখন সুখনলালের এজেন্ট। ব্যবসাই করছি বলা চলে এক-রকম। কমিশন যা পাই কোনকালে ব্যবসা করে অত পার্সেন্ট লাভ কেউ করে নি। এখন কথা হল কি, আপনার গুদামের আটা ময়দা তো পচে যাচ্ছে।'

কথার যোগাযোগটা বুঝে উঠতে পারে না কিন্তু বুকটা শশাঙ্কের ধরাস্ ধরাস্ করে।

'গুদামটা আমার নয় বাবা।' কোন মতে সে বলে।

সত্য হাসে, 'ও একই কথা। সে যাই হোক, এখনো গুদামের মাল বাজারে বেচা-কেনা চলবে। আমার হাতে কিছু রদ্দিমাল আছে, সেটা বদলে দিতে হবে আপনাকে। তেল যা লাগে খরচ করব, তাতে আটকাবে না। আপনারও কোন ভয় নেই," চ্যালেঞ্জ করলে বলবেন শুনে দ্যাখো মেপে দ্যাখো। যে পরিমাণ নেব ঠিক সেই পরিমাণ রিপ্লেস করব।'

পাংশু বিবর্ণ মুখে ঢোঁক গিলে শশাঙ্ক বলে, 'কিন্তু আমার কাছে তো চাবি নেই।'

নিরুপায় হয়ে মিথ্যা কথাই বলে শশাঙ্ক। গুদামের আপিসে সত্যের আকস্মিক আবির্ভাবের কারণটা এতক্ষণে তার কাছে পরিষ্কার হয়।

সত্য আশ্চর্য্য হয়ে বলে, 'গুদামের চাবি আপনার কাছে নেই? দরকার হলে গুদাম খোলে কে?'

'আমিই খুলি, সায়েব তখন আমাকে চাবি দেয়। অন্য সময় নিজের কাছেই রাখে।'

'তাই তো!' সত্য বলে চিন্তিত হয়।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে মিঃ নন্দীর কাছে হেঁটে যাওয়ার ধৈর্য্য শশাঙ্কের থাকে না, সে একটা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে বসে। তার চিরকুট পেয়ে খাস কামরায় উঠে গিয়ে সেখানে মিঃ নন্দী তাকে ডেকে পাঠায়।

'আটা ময়দা পচে যাচ্ছে? এইজন্য আপনি এমন ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন?'

'অতগুলি ফুড হুজুর। কতলোকে খেয়ে বাঁচত।'

'ঢেঁরো দিয়ে বিতরণ করতে চান না কি?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে?' মিঃ নন্দীর মুখে হাসি ফোটে, 'আপনি তো বড় নার্ভাস লোক মশায়! নষ্ট হয় তো হবে, আমাদের কি করার আছে! ষ্টোর করার কথা, আমরা ষ্টোর করেছি। তার বেশী কিছু করার ক্ষমতাই বা কই আমাদের? ইনষ্ট্রাকসন না পেলে কিছুই করা চলে না। তাছাড়া—' মিঃ নন্দীর হাসিটা এবার করুণাদ্যোতক মনে হয়, 'নানা কোয়ালিটির জিনিষ পোরা হয়েছে, সব মাল খারাপ হয়ে দাঁড়ালে ধরা যাবে না। ভাববেন না, সব ঠিক আছে।'

বাড়ী ফিরে শশাঙ্ক শোনে, জামাই নাকি সে বেরিয়ে যাবার আধঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে গেছে, এখনো ফেরে নি। সন্ধ্যার সময় মিঃ নন্দীর বাংলোতে শশাঙ্কের ডাক আসে। সেখানে সে দেখতে পায় সত্যকে।

মিঃ নন্দী বলে, 'আপনার কথাটা ভাবছিলাম শশাঙ্ক বাবু। আটা ময়দা নষ্ট যখন হয়ে যাচ্ছে, কিছু বাজারে গেলেও লোকে খেতে পাবে। ইনি দু'হাজার বস্তা খারাপ মাল বদলে নিতে চান। ষ্টোর থেকে ওঁকে পছন্দসই দু'হাজার বস্তা দিয়ে, ওঁর বস্তা সেখানে রেখে দেবেন।'

'কেউ জিগ্যেস করলে—'

'জিগ্যেস করলে বলবেন, কিছু নতুন মাল এল, কিছু পুরানো মাল চালান গেল। রিপোর্ট ঠিক করে নেব'খন।'

শালাশালীরা বলামাত্র জামাই বাড়ীতে সে রাত্রে মস্ত ভোজ দেয়, হৈ চৈ চলে অনেক রাত পর্যন্ত। শরীর খারাপের অজুহাতে শশাঙ্ক সকাল সকাল শুয়ে পড়ে। ঘুম কিন্তু তার আসে না সহজে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করে।

সকালে সত্য সত্যই শরীরটা খারাপ লাগে। খেয়ে-দেয়ে আপিসে বেরোবে, সদরের সামনে দেখা হয় গতকালের সেই ভিখারিণীর সঙ্গে।

এগিয়ে এসে নিস্পন্দ বাচ্চাটিকে সে শশাঙ্কের পায়ের কাছে নামিয়ে রাখে।

'তোমার দুধ খেয়ে মরেছে বাবু।'

কারুর পৌষ মাস, কারুর সর্বনাশ।

রায় হুজরীমল বাহাদুরের আধ-মাইল ব্যাপী চালের গুদামের তলায় বড় বড় ইঁদুরদের মস্ত বড় সভা বসে গিয়েছে।

রোজ যত বস্তার পর বস্তা জমা হয়, ইঁদুরদের ততই উল্লাস বাড়ে। পচা চালের দুর্গন্ধ গর্তের ভেতর দিয়ে সোজা চলে যায় লেক-পাড়ায়, কালিঘাট-পাড়ায়···সে-গন্ধে উন্মাদ হয়ে দলে দলে আসে ভাইঝি, বোনঝি, ভাইপোদের নিয়ে ধেড়ে-ইঁদুরদের দল।

মস্ত বড় সভা বসে। আলোচনার বিষয়, হঠাৎ এত চাল এলো কোথা থেকে?

বহু গবেষণার পর স্থির হলো, বাংলা দেশে চাল খাবার আর লোক নেই···তাই সব চাল কুড়িয়ে এনে পচানো হচ্ছে তাদের জন্যে!

কিন্তু নিখিল-ইঁদুর-জাতির এই জাতীয় মহাকল্যাণ কোন্ মহাপুরুষের দ্বারা সাধিত হচ্ছে, তা ঠিক জানতে না পেরে, তারা একটা কমিটী গঠন করলো, সেই মহাপুরুষের নাম যেমন করেই হোক খুঁজে বার করতে হবে! ইঁদুর জাতির এত বড় বন্ধুর নাম অজানা থাকতে পারে না!

অগাস্ত্য

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

দেড়বছর পরে আবার কলকাতার মাটিতে পা দিলে শুক্লা।

আঃ কী চমৎকার!

দুই চোখ দিয়ে দেখে ফুরোয় না—সমস্ত প্রাণ দিয়ে ঘ্রাণ নিতে ইচ্ছে করে; স্বর্গের যদি সত্যিই কোন আস্বাদ থাকে, তো—সে আস্বাদ আছে কলকাতার বাতাসে।

দেড়বছর সময়টা আর এমন কি বেশী? কত লোকই তো থাকে কলকাতার বাইরে। শুক্লার নিজের দিদিই তো এলাহাবাদ থেকে দশবছরে দু'বার আসে কিনা সন্দেহ। কিন্তু এতো তা নয়! এ যে অসম্ভব অপ্রত্যাশিত, আশা আর কল্পনার অনেক উর্দ্ধে।

একটা দেশ থেকে আর এক দেশে ফিরে আসা—শুধু এইটুকুইতো ঘটনা নয়, এ যে মৃত্যুর অতল গহ্বর থেকে ফিরে আসা জীবনের দরজায়। যে ঘর থেকে একদিন বিদায় নিয়েছিল শুক্লা হতাশার নিশ্বাস ফেলে, যে নিষ্ঠুর দরজার দিকে এতদিন ধরে তাকিয়েছিল করুণ বেদনায়, বঞ্চিত লোলুপতায় সে দরজা খোলবার চাবিকাঠি আবার সংগ্রহ করেছে শুক্লা।

স্যানিটেরিয়ামের বিজ্ঞ ডাক্তাররা ওকে ছাড়পত্র দিয়েছে।

সেই শেষ এক্স'রে ফোটোটা আছে ওর সুটকেসের গোপন গহ্বরে, সার্টিফিকেটগুলো আছে ব্লাউসের নীচে।

পৃথিবীর উপস্বত্ব ভোগ করতে পাবার দলিল এগুলি, সযত্নে আর সাবধানে সঙ্গে এনেছে শুক্লা।

স্বামী নিজে তাকে আনতে না গিয়ে খুড়তুতো ভাই রথীনকে পাঠিয়েছে এর জন্যে প্রথমটা বড় বেশী মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে গিয়েছিল বেচারা···শুক্লা সেরে উঠেছে—শুক্লা বেঁচে উঠেছে—এতবড় একটা অদ্ভুত ঘটনায় অফিসের ছুটি পায়না শরদিন্দু? এ আবার কি অবিশ্বাস্য গল্প?

দেড়বছর ধরে সমাজ সংসার আত্মীয় স্বজনের দৃষ্টির আড়ালে লোকালয়ের বাইরে, স্যানিটেরিয়ামের অস্বাভাবিক আবহাওয়ার মধ্যে বাস করে পৃথিবীর সত্যিকার চেহারাটা যেন ভুলে গিয়েছে শুক্লা, ফিকে হয়ে গিয়েছে জীবন সমস্যার ঘোরালো রং।······শুক্লা আবার কলকাতায় ফিরে এল—এর চেয়ে বড় ঘটনা আজকের দিনে আর কিছু ঘটতে পারে—সে কথা তবে মানবে কেন সে? শরদিন্দুর অফিসের বড় সাহেব বিলেত যাবে—সেইটাই এত ভীষণ জরুরী হয়ে উঠলো পৃথিবীতে?

তবু ট্রেণে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মনের অভিমান গেল কেটে··পাঁকে পুঁতে যাওয়া নৌকাখানা যেন আবার ভেসে উঠেছে জোয়ারের জলে। চলমান বেগের মধ্যে একটা খুসীর খোরাক আছে বৈকি। তাই মনের মেঘ ঝেড়ে ফেলে হাসি গল্পে চঞ্চল হয়ে ওঠে শুক্লা।

—জানলার কাঁচ আবার তুলে দিচ্ছ ঠাকুরপো? ভালো হবেনা কিন্তু, ঠাণ্ডা লাগবে? ঠাণ্ডা লাগবে কি বল? ওখানে তো আমরা খোলা দালানে শুতাম। সে এক মজার নিয়ম, যতখুসী হাওয়া খাও। শুধুই কি হাওয়া? তা নয় মশাই তা নয়, শুধু হাওয়া খেয়ে আর বৌদিটী তোমাদের বেয়াল্লিশ পাউণ্ড ওজন বাড়াননি। শুনলে তুমি হাসবে ঠাকুরপো, রীতিমত একটি ক্ষুদে রাক্ষস হয়ে উঠেছি আমি, খাওয়ার ফিরিস্তি শুনলে মূর্চ্ছাই যাবে হয়তো।

—মূর্চ্ছা আমি যাবো কেন—রথীন হাসে—গেলে বরং দাদাই যাবেন, যাঁকে জোগাতে হবে।

—তাঁর কথা আর বোলনা, দাদাটীতো তোমার ডাক্তারদের চেয়েও এককাঠি সরেশ। কলকাতায় থাকতে—অসুখের সময় মনে নেই? খাওয়া কম হচ্ছে আর ওজন কমে যাচ্ছে এই ভাবনাতেই দণ্ডে দণ্ডে মূর্চ্ছা যেতেন। চিঠিতেও সেই উপদেশ! লম্বা লম্বা চিঠি—পাশের নম্বরের মেয়েরা ভাবতো কী না জানি প্রেমপত্তর, ওমা, সুদ্ধু উপদেশের জাহাজ 'খাওয়া বাড়াও—ওজন বাড়াও—বেড়াও আর ফূর্ত্তি করো'—এই কথাতেই পাঁচপাতা ভর্ত্তি।······এখন কিন্তু আর রুগীর মতন থাকতে পারবোনা ঠাকুরপো তা বলে দিচ্ছি।

—না, তুমি গিয়েই বরং কোদাল নিয়ে গড়ের মাঠে নেমে পোড়ো।

—ঠাট্টা হচ্ছে? দেখে নিয়ো কেমন শক্ত হয়ে গেছি আমি।

—এখনই তো দেখছি একেবারে লৌহ-প্রতিমা।

—তোমার ঠাট্টার ধরণটা একই রকম রয়ে গেল ঠাকুরপো। আচ্ছা···ততক্ষণ বাস্কেটের ফলগুলোর সদ্ব্যবহার করা যাক—কি বল?

ফলের ডিশটা হাতে করে রথীন কেমন যেন বিমনা হয়ে যায়···একটা কমলা লেবুর কোয়া দাঁতে চেপে অস্পষ্টভাবে বলে—দাদা শেষ কবে এসেছিলেন তোমায় দেখতে?

—ওঃ সে তো সেই পাঁচমাস আগে। আর বোলোনা—শুক্লার স্বর অভিমানে গাঢ় হয়ে আসে—তোমাদের পুরুষের—ভালবাসাই ওইরকম। যখন পাঠিয়ে দিলেন—সে কী মর্ম্মান্তিক বিরহ, বেটাছেলে চোখের জলে নদী বইয়ে দিলেন একেবারে, তারপর প্রথম প্রথম মাসে একবার করে দেখতে আসা, তারপর তিনমাস পরে, শেষকালে পাঁচমাস। চিঠিও পাই দেরীতে। তাও—ওই যা বললাম— রসকস-হীন মাষ্টারী চিঠি।

—দাদার শরীরটাও এদানীং তেমন ভালো যাচ্ছে না—তা ছাড়া—টাকার টানাটানি তো আছেই।

—তা সত্যি—শুক্লা সহজ সৌজন্যের সুরে বলে—এখানেই তো মাসে মাসে তিনশোখানি টাকা পাঠাতে হ'ত—কোথা থেকে যে পেরে উঠছেন ভেবেই পাইনা।

ভাষায় আন্তরিকতার অভাব নেই—তবু রথীনের যেন মনে হয় সুরে নেই দরদের স্পর্শ! কোথা থেকে যে পেরে উঠছে শরদিন্দু সে কথা ভেবে বার করবার ক্ষমতা হয়তো ওর নেই, কিন্তু তেমন করে কি দেখেইছে কোনোদিন ভেবে?

অবিশ্যি ওকে ঠিক দোষ দেওয়া যায় না।

দীর্ঘ দু'বছর ধরে শুক্লা জেনে এসেছে বেঁচে ওঠার সাধনাই ওর একমাত্র কাজ, বেঁচে উঠে—সেরে উঠেই কৃতার্থ করে দেবে শরদিন্দুকে।

শরদিন্দুর অনেক কষ্ট আর অনেক ত্যাগ স্বীকারের চরম পুরস্কারই তো সে নিয়ে যাচ্ছে আজকে।··· স্বাস্থ্যের লাবণ্যে টলটল ওর এই দেহ। অনেক বিরহের পর মিলনোৎসুক মনের সজীব তারুণ্য।··· জমার ঘরে তুলে এনেছে সেই ঐশ্বর্য্য—খরচের খাতায় যা লেখা হয়ে গিয়েছিল।

তুচ্ছ তিনশো টাকা! শুক্লার জীবনের দামের কাছে তার দাম?

—কই ঠাকুরপো কিছুই তো খেলেনা তুমি? ফল ভালবাসতে তো আগে। আমারই বরং জন্মের অরুচি ধরে গেছে বাবা। গিয়েই কিন্তু আগে দ্বারিকের দোকানের সমস্ত ভালো ভালো খাবারগুলো খাবো। আছে তো দোকানগুলো? বড় একঘেয়ে খাওয়া বাপু এখানে—সেই মাখন আর ডিম, ফল আর ছানা, টোষ্ট আর পুডিং···না ঠাকুরপো কলকাতায় নেমেই আগে দ্বারিকের সিঙাড়া খেয়ে তবে আর কাজ।

রথীনের উচিৎ বইকি এইসব উচ্চাঙ্গের আলোচনায় উৎসাহিত হয়ে ওঠা, কিন্তু তেমন পারছে কই? উৎসাহ যেটুকু দেখাচ্ছে নেহাৎই যেন মৌখিক, মনটা পড়ছে ঝিমিয়ে।

—চলোতো কত সিঙাড়া তুমি খেতে পার দেখি। যাবার সময় ট্যাক্সি দাঁড় করিয়েই না হয় কিনে নিয়ে যাবো একঝুড়ি।

—বলো যে দু'ঝুড়ি, একটা তো আমার একলার—আর তোমরা দুভাই বুঝি উপোস করবে?··· কিন্তু সে তো এখন বাইশ ঘণ্টা পরের কথা—এখন তো কিছু খেতে হয়। পরের স্টেশনে ভালো হোটেল নেই ঠাকুরপো? অন্ততঃ চা টোষ্ট আর ডিম সেদ্ধ···তোমারও নিশ্চয় খিদে পেয়েছে? পায়নি? আমার ভাই এই এক বদরোগ হয়েছে খাবার সময় একমিনিট পার হবার জো নেই।··আচ্ছা তুমি অমন বুড়োটে হয়ে গেছ কেন ঠাকুরপো? হাসি নেই, কথা নেই, চলো এইবার একটি সুন্দরী পাত্রী জোগাড় করে বিয়ে দিই গে তোমার। কলকাতায় নেমেই প্রথম এই কাজ আমার।

—বিয়ে? রক্ষে করো! ওতে আর রুচি নেই।

—কেন বাপু না করেই অরুচি কিসের? দাদার জ্বালা দেখে? তা সত্যি আমাকে নিয়ে ঢের ভুগতে হ'ল তোমাদের কিন্তু সকলের তো আর সমান ভাগ্য নয়!

—এই দেখ আমি কি তাই বলছি? পৃথিবীর অবস্থা দেখে ইচ্ছে করে লোটা কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।···আচ্ছা যাক সামনেই একটা স্টেশন আসছে দেখি যদি কিছু খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করতে পারি···

হাওড়া স্টেশন থেকে বেরিয়ে—হাওয়ায় উড়ে যেতে চায় যেন শুক্লা, ট্যাক্সির বাঁধাধরা গতিতে কুলোবেনা ওর।···কি একটা দেখে নেহাৎ ছেলেমানুষের মত হাততালিই দিয়ে বসলো।

—ও ঠাকুরপো কি কি ছবি হচ্ছে আজকাল কলকাতায়? দেয়ালের পোষ্টারগুলো তো পড়তে পাচ্ছিনা গাড়ীটা ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। আগেই কিন্তু সমস্ত ভালো ভালো ছবিগুলো দেখে নেব তা বলে রাখছি বুঝলে?

—বুঝলাম! কিন্তু কোনটা যে ঠিক আগে করবে সেটাই বুঝছিনা—সিঙাড়া খাওয়া—সিনেমা দেখা—না আমার বিয়ে দেওয়া?

—আহা বিয়ের জন্য তো ত্বর সইছেনা দেখছি—এদিকে বলা হচ্ছিল রুচি নেই।···কিন্তু এটা কোন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি আমরা বলোতো? ড্রাইভার জানেতো ঠিক, না ঘুরিয়ে মারবে? মনে হচ্ছে যেন আমাদের বাড়ীর দিক নয়। কে জানে আমিই ভুলে গেছি হয়তো বা।

—ঠিক যাচ্ছে।

শুক্লা একটু চুপ করে চারিদিক দেখতে থাকে।···কিন্তু রথীন বল্লেই বা শুনবে কেন সে? এটা যে একেবারে তাদের বাড়ী থেকে উল্টো রাস্তা! বড় পিসশ্বাশুড়ির বাড়ী যেতে এই রাস্তাটা পড়ে, আগে তো কত এসেছে শুক্লা।

নাঃ আর একবার না বলে উপায় নেই, সন্দেহ প্রকাশ করতেই হয় শুক্লাকে।

—ও ঠাকুরপো—

—ঠিক যাচ্ছে। ব্যস্ত হচ্ছ কেন বৌদি, সে বাড়ীতে আর থাকা হয়না এখন।

—সে বাড়ী? মানে আমাদের নিজেদের বাড়ীটা? কেন ভাড়া দেওয়া হয়েছে বুঝি? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে শুক্লা।

সেই সাজানো সংসারে—নিজের হাতে গোছানো ঘরে আর যেতে পাবেনা শুক্লা? রথীন বলে কি! এ আবার কি বিপদ তার জন্য তুলে রেখেছে শরদিন্দু?

রথীন গম্ভীর হয়ে বোধকরি বলবার জন্যেই ইতস্ততঃ না করে বলে—ভাড়া আর কই? সোজাসুজি বিক্রমপুরেই পাঠাতে হ'ল।

—মানে? বাড়ী বিক্রি করে ফেলেছেন?

—তীব্র আর্ত্তনাদের মত শোনালো শুক্লার তীক্ষ্ণ প্রশ্নটা।

—কি করবেন—নিরুপায় হয়েই—

—সে বাড়ীতে আর কোনদিনই যেতে পাবোনা তা'হলে? শুতে পাবোনা আমার নিজের ঘরে? বিকেল বেলা বেতের চেয়ার পেতে বসতে পাবোনা ছোট্টো ছাতটায়? আমি যে একথা ভাবতেই পারছিনা ভাই ঠাকুরপো! বাড়ীটা একেবারে বিক্রি করে ফেলতে হল এমন নিরুপায় অবস্থা? আমার কত আশার সংসার সব ভেঙে চুরে তচনচ হয়ে গেলো! কিন্তু তুমি? তোমারও তো ভাগ ছিল বাড়ীতে—তুমি কেন বেচতে দিলে?

—আমার আবার ভাগ! আর হাসিও না বৌদি। চলো এখন—যেখানে হোক আছি তো আমরা একজায়গায়? নাকি ফুটপাথে পড়ে আছি?

কিন্তু বাড়ী ফেরার বারোআনা উৎসাহই তো জল হয়ে গেছে, শুক্লার।

কিছুক্ষণ পরে যখন জরাজীর্ণ একখানা শ্রীহীন বাড়ীর সামনে এসে ট্যাক্সিটা দাঁড়ালো তখন বাকী চারআনাটুকুকেও যেন আর হাতড়ে খুঁজে পায়না বেচারা।

শরদিন্দু তখনো আসেনি, রথীন নিজেই খানিকটা হৈ চৈ লাগিয়ে দেয়, বাচ্ছা একটা চাকর রয়েছে দেখা গেল, তাকে কর্ণধার করেই ঘর গৃহস্থালীর কাজ সুরু হয়।

বামুন ঠাকুর নেই এটুকু অবশ্য বুঝতে পেরেছে শুক্লা, রথীনই তবে তার কাজ চালাচ্ছে! কিন্তু তারও কয়েকদিনের অনুপস্থিতিতে বিশৃঙ্খলার শেষ নেই।

রোগীর মত পড়ে থাকবেনা বলে শাসিয়ে এসেছিল শুক্লা, কিন্তু সে কথা আর মনেও নেই তার। ট্রেনের কাপড় চোপড়গুলো কোনোরকমে বদলে ফেলে নির্জীবের মত শুয়ে পড়ে···বোধকরি তার উদ্দেশ্যেই পাতা ছিল যে শয্যা তা'তেই।

বুদ্ধি করে বিছানাটাই সুধু ফর্সা করে রেখেছে শরদিন্দু।

কিন্তু এই কি গৃহসজ্জা?

এখানে ওখানে এলোমেলো জিনিষের স্তূপ, কয়েকটা প্যাকিং বাক্স পড়ে আছে খাটের নীচে, বাড়ী উঠে আসার পর আর পেরেক খোলা হয়নি তার।

বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে শুক্লা দাঁত বার করা শূণ্য দেয়ালের পানে। সত্যিই কি শরদিন্দুর অবস্থা এই দুর্দ্দশার চরমে এসে ঠেকেছে? না কি শুক্লার সঙ্গে এ এক অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া পরিহাস তার?

কোথায় গেল তার পরিপাটি সংসারের সমস্ত উপকরণ? সমস্তই তবে বেচে খেয়েছে শরদিন্দু? এই কি তবে শুক্লার জীবনের মূল্য? কিন্তু সর্ব্বস্বের বিনিময়ে—সর্ব্বস্বান্ত হয়ে শুধু প্রাণটুকু টিকিয়ে রাখার কি প্রয়োজন ছিল?···স্ত্রীলোকহীন সংসারের দারিদ্র্য এত স্পষ্ট, এত প্রখর! এই নিষ্ঠুর দৈন্যের ছবি যেন চারদিক থেকে নির্লজ্জ ব্যঙ্গ করতে থাকে শুক্লাকে।

শরদিন্দু যে আসেনি এখনো, সে কথাও আর মনে থাকেনা শুক্লার। স্বাস্থ্যের লাবণ্যে টলটলে দেহের মধ্যে মিলনোৎসুক তাজা মনটা মুহূর্তে এমন শুকিয়ে গেল কি করে?

বরং অনেক দেরী করে এলেই ভালো হয় যেন···নিজেকে সামলে নিতে তবু খানিকটা সময় পাবে শুক্লা।

খানিক পরে রথীন এসে ওর সামনে ধরে দিলে খাবারের থালা, সে থালায় উপকরণের ত্রুটি ছিলনা তবু খেতে যেন প্রবৃত্তি হয় না শুক্লার, বিরক্ত বিদ্রূপ স্বরে বলে—তোমার দাদাটী কি ফেরার হলেন ঠাকুরপো? এত রাত অবধি কিছু আর অফিসে বসে নেই!

—একটা টিউশনী আছে কিনা—কিন্তু তুমি খেয়ে নাও রাত করে লাভ কি?

—থাক খিদে নেই।

দেয়ালের দিকে ফিরে শুলো। এবার সত্যিই চোখে জল এসে যায়। টিউশনীও কি অফিসের বড় সাহেবের সমান মারাত্মক! ওরও আর কামাই চলে না একদিন?

ট্রেনের ক্লান্তিতে পরিশ্রম-অনভ্যস্ত শরীরে ঘুম এসেই যায় এক সময়···হঠাৎ শরদিন্দুর গলার স্বরে ঘুম ভেঙে গেলো···ঘরের বাইরে কথা কইছে রথীনের সঙ্গে।

যাক কল্পনার সমস্ত ছবিই তো তার ব্যর্থ হয়ে গেছে···এটুকুও গেল। শরদিন্দু এসে ওর ঘুম ভাঙাবে—আদরে ডুবিয়ে দেবে এমনই একটা আশা নিয়ে চোখ বুজেছিল···ঘুমিয়ে পড়েছিল বৈ কি! নইলে স্বপ্ন দেখলে কি করে?

দেখছিল···তাদের নিজেদের বাড়ীতে—অসুখের প্রথম মুখে উদ্‌ভ্রান্ত শরদিন্দুর ব্যাকুলতা, শুক্লার সামান্যতম সুখ-সুবিধের জন্য ত্রুটিহীন চেষ্টা···শুক্লা হেসে ফেলছে ওর পাগলামী দেখে।···দিনের পর দিন অফিস কামাই করতেও তো বাধেনি তখন?···

ডাক্তারের নিষেধ অগ্রাহ্য করে অবিরত শুক্লার পরিচর্য্যা আর সাহচর্য্যে কাটিয়েছে।

—ট্রেনে কোনো কষ্ট হয়নি তো?

নীরস কুশল প্রশ্নটুকু।

শুক্লা কথার উত্তর দিতো না···শুধু চমকে উঠলো শরদিন্দুর চেহারা দেখে, আচমকা বেরিয়ে গেল মুখ থেকে—তোমার একী চেহারা হয়েছে?

—চেহারা? হুঁঃ। আমার আবার চেহারা।···যাক তুমি বেশ ভালো আছো তো?

—আছি আছি। কিন্তু ভিটেমাটি বেচে আমাকে না বাঁচালেই কি চলছিল না? নিজের এই অবস্থা করে?

হয়তো এর উত্তরে আশা করছিল একটু আদরের সুর। শুক্লাকে ফিরে পেয়েই যে সব ক্ষতি সুদে আসলে পুষিয়ে গেছে শরদিন্দুর—তারই স্বীকারোক্তি···শুক্লা এসেছে—এইবার ও নিজেও সেরে উঠবে এমনি একটু ইসারা।

কিন্তু শরদিন্দু কি এত বদলে গেছে?

কথা কইতে—কথার মত কথা কইতে একেবারে ভুলে গেছে?

বললে—একখানা ভাঙা হাত পাখা নিয়ে বাতাস খেতে খেতে—আমার অবস্থার কথা বাদ দাও, কিন্তু বাঁচানো কথার কোন অর্থ নেই শুক্লা, মরা বাঁচা ভগবানের হাত···আমায় কে বাঁচাচ্ছে? অথচ চালিয়েও তো যাচ্ছি বেশ···তবে এটুকু বলতে পারি কর্ত্তব্যের ত্রুটি অন্ততঃ করিনি।

শুক্লা একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলে—তোমার শরীরটা হঠাৎ এত খারাপ হ'ল কেন? ওখানে যখন গিয়েছিলে তখনও তো—ডাক্তারে কি বলে?

—ডাক্তার? হঠাৎ চেঁচিয়ে হেসে ওঠে শরদিন্দু—ডাক্তারকে দেখাচ্ছে কে? সে তো ঘুসঘুসে জ্বরের খবর পেলেই রাজসূয় যজ্ঞের ফর্দ্দ করে বসবে···আরও একখানা বাড়ীতো নেই বাবার।···সে যাক এখন কথা হচ্ছে—তোমাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে, তুমি এখন সেরে এসেছো—বলা যায় না এখন আবার হয়তো আমার থেকে তোমারই ছোঁয়াচ লেগে যেতে পারে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে শুক্লা শরদিন্দুর বিদ্রূপ-লাঞ্ছিত শীর্ণ অপরিচিত নিষ্ঠুর মুখের দিকে।··· ভালো করে কিছু ভাবতে পারে না—শুধু মনে হয় শুক্লাকে এই নির্দ্দয় অপমান করবার সুযোগ নিতেই এতদিন ধরে এত আয়োজন এত ষড়যন্ত্র করে এসেছে শরদিন্দু।

শুক্লার আর শরদিন্দুর কাহিনী ওইখানে শেষ হয়ে গেছে—একটু শুধু বাকী ছিল রথীনের জন্যে··· অবিশ্বাস্য খানিকটা বিস্ময়।···শুক্লার গলায় দড়ি লাগিয়ে মরাটাও তত অসহ্য অসম্ভব লাগেনি তার, যতটা লেগেছিল শরদিন্দুর নির্ব্বিকার ভাব!

দড়ি কেটে বিছানায় শুইয়ে একখানা চাদরে মাথা অবধি ঢেকে দিয়ে স্পষ্ট হেসে উঠে বলেছিল শরদিন্দু—এ সুমতিটা যদি তোর বৌদির দু'বছর আগে হ'ত তা হ'লে আর সবাই মিলে ডুবতে হ'ত না—কি বলিস রে রথী?

সত্যমিথ্যা

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

বাংলা বিহারের মাঝামাঝি এক জায়গায় নদীর ধারে ছোটো ছোটো পাহাড় আর বড়ো বড়ো শালবন দিয়ে ঘেরা এক অখ্যাতনামা গ্রামে একবার আমরা দলবল বেঁধে গিয়েছিলুম অহেতুক হাওয়া বদল করতে, অর্থাৎ কিছুদিন ছুটি উপভোগ করতে। মস্ত একটা ফ্যামিলি পার্টি বললেই হয়, তার মধ্যে ছেলেও ছিল, বুড়োও ছিল, মেয়েরাও ছিল, যুবারাও ছিল, তা ছাড়া চাকর বামুনও সঙ্গে ছিল। দলের মধ্যে সকলেই পরস্পরের আত্মীয়, কেবল আমিই ছিলুম অনাত্মীয়। কিন্তু অনাত্মীয় হলে কি হয়, আমি তাদের সকলেরই বন্ধু, বাইরের লোক হলেও একেবারে ঘরের লোকের মতো। সেইজন্যে সকলেই আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে গেল। স্বয়ং শ্রীমতী ঘোষজায়া ছিলেন দলের কাণ্ডারী, আর আমার জানাও ছিল যে মাংসপাক ও মিষ্টান্ন প্রণয়নে তাঁর কখনই ক্লান্তি হয় না, সুতরাং অনুরোধটা কোনোমতে এড়ানো গেল না। ঐ অঞ্চলটায় নাকি তাঁর একখানা বাড়িও অসমাপ্ত হয়ে পড়ে আছে, অতএব সকলে মিলে গিয়ে জায়গাটা একবার দেখে আসাও হবে, কিছুদিন বেড়ানোও হবে।

শরৎকাল কেটে গিয়ে শীতকাল পড়ি পড়ি করছে। পশ্চিম বেড়াবার এই উপযুক্ত সময়। কিন্তু আমরা যেন হোল্ড-অলের মধ্যে বহুদিন বিগত শ্রাবণের বর্ষাকে কোথা থেকে কুড়িয়ে সঙ্গে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিলুম। আহারাদি সেরে যেমনি হোল্ড-অল খুলে বিছানাপাতি পেতে শোওয়া হলো, অমনি অবিশ্রান্ত বর্ষা শুরু হয়ে গেলো। তাকে শুধু বর্ষা বললে কিছুই বলা হয় না, সে একটা বিরামশূন্য দুর্যোগের চব্বিশপ্রহরা। অতি বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, মেঘগর্জ্জন, ঝড়ঝাপ্‌টা, শীতের কন্‌কনি, সবই যেন একসঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে, একবার দেখিয়ে দিতে চায় কার কত প্রতাপ।

বেড়াতে গিয়ে আমরা সাতদিন পর্যন্ত বাড়ির মধ্যেই আটকে রইলুম। প্রত্যহই মনে করি দুর্যোগটা কাল থেকে ছেড়ে যাবে, ভোর না হতেই মশারির আবরণ ছেড়ে তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখি, কিন্তু আকাশও তেমনি মশারি দিয়ে ঢাকা, মেঘে মেঘে ভর্তি, কোথাও একটু ফাঁক নেই। বৃষ্টির ছাটে বারান্দায় দাঁড়ানো যায় না, ঘরের মধ্যে পালিয়ে আসতে হয়। বেলা বেড়ে যায় কিন্তু সূর্যের মুখ একবারও দেখা যায় না, দুপুর হলো না বিকেল হলো তা কিছুই বোঝা যায় না।

আমরা সারাদিন বসে বসে কেবল যত জল্পনা-কল্পনাই করতে থাকি। খাওয়া আর গল্প করা ছাড়া কোনোই কাজ নেই। বারান্দার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সারি সারি কাপড় টাঙিয়ে দেওয়া হয় শুকোবার জন্যে, সেগুলো একবার করে হাওয়াতে কিছু শুকোয়, আবার বৃষ্টির ছাট লেগে ভিজে জব্‌জবে হয়ে যায়। আমরা তারই আড়ালে খাটিয়া পেতে বসে বলাবলি করতে থাকি, দুর্যোগের পালা শেষ হয়ে

গেলে তখন কী মজাটাই হবে। জোড়া জোড়া কেড্‌সের জুতো আনা হয়েছে যাতে অনেক হাঁটলেও পায়ে একটুমাত্র ঘাঁটা না পড়ে, ডজন ডজন কার্টি্‌জ আনা হয়েছে যাতে একটি শিকারও হাতছাড়া হয়ে না পালিয়ে যায়, আরো কত কত রকমের আমোদ উপভোগের তোড়জোড় রয়েছে সঙ্গে। মাছ ধরবার সরঞ্জামগুলোও নেবার কথা ছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নেওয়া হয়নি, পরামর্শ করে স্থির হয়েছিল যে ওসব জিনিস স্থানীয় লোকদের কাছেই সংগ্রহ করে নেওয়া যাবে। শুধু বৃষ্টিটা একবার ছাড়লে হয়, তখন দলে দলে বেরিয়ে পড়া যাবে পর্ব্বতে প্রান্তরে বনে জঙ্গলে নদীতীরে নদীপারে নব নব অ্যাডভেঞ্চারের অন্বেষণে। জায়গাটাকে আমরা চষে বেড়াবো, কোথাও কিছু বাকি রাখবো না। কোথায় বসে সাঁওতালদের হাট, সেটা একবার দেখতে হবে। কোথায় আছে নেকড়ে বাঘের গুহা, তাও একবার দেখতে হবে। কোথায় কোন্ বনে ভালুকের দল মহুয়া খেতে আসে, কোন্ পাহাড়ে বুনো হাতীরা যূথবদ্ধ হয়ে ঝর্ণার জল খেতে এসে বড়ো বড়ো থালার মতো পদচিহ্ন রেখে বৃংহতি করতে করতে চলে যায়, কোথায় কোন্ গুহার মধ্যে ত্রিশ ফুট লম্বা অজগর সাপ কুণ্ডলি পাকিয়ে লুকিয়ে থেকে চারণরত বাছুরগুলোকে স্রেফ নিশ্বাসের জোরে টেনে এনে এক এক গ্রাসেই উদরসাৎ করে ফেলে, কোথায় কোন্ বনে গাছের মগডালে উঠে সাঁওতালরা কুকি দেয় আর সেই শব্দের মন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে হরিণশিশুরা দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসে, কোথায় কোন্ কুল বনের গাছে গাছে লাক্ষাপোকারা গুটি বাঁধে, কোথায় কোন্ ফুলবনের কাছে কাছে মৌমাছিরা চাকার মতো মৌচাক বাঁধে, এ সমস্ত আমাদের দেখাই চাই, নইলে এতদূর এলাম কী করতে? বিশেষ করে নদীতে যতখানিই প্লাবন হয়ে থাক, সেই নদী যেমন করেই হোক পার হয়ে ওপারে তো একবার যেতেই হবে। শোনা গেছে ওপারেই রয়েছে যত কিছু রহস্যময় দেখবার জিনিস। বৃষ্টিতে ঝাপ্‌সা হয়ে থাকলেও বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঐ যে দূরে দেখা যায় নদীর জলের অস্পষ্ট রেখা, তার অপর পারে ঐ যে ধূসরবর্ণ সুদীর্ঘ বনশ্রেণী তারও পিছনে আবার ঐ যে উঁচু নিচু ঢেউ খেলানো পাহাড় শ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে, যা কখনো দেখায় কালো কখনো দেখায় বেগুনি আবার কখনো দেখায় মেঘের মতো, ঐ সমস্ত যদি ডিঙিয়ে যাওয়া যায় তাহলে এমন একটা স্থান মিলবে যেখানে অনেক কিছুই দেখবার আছে। যেতেও বিশেষ কষ্ট নেই, নদী পার হয়ে খানিকটা বন ভাঙতে পারলেই পাহাড়ের গা দিয়ে গা দিয়ে বরাবর পাকা রাস্তা চলে গেছে, এমন কি সেখানে সাইকেল চড়েও অনায়াসে যাওয়া যায়। ঐ খানে নাকি কিছুকাল পূর্বে সাহেবদের মস্ত নীলকুঠি আর লাক্ষার কুঠি ছিল, অনেক কল কারখানা ছিল, সেখানে তারা ডাইনামো লাগিয়ে ইলেক্‌ট্রিক ফিট করে একটা শহরের মতো বানিয়ে তুলেছিল, অনেক সাহেব সুবো সেখানে স্ত্রীপুত্র নিয়ে কলোনি করে বাস করতো, অনেক লোকজন খাটতো, অনেক মালের আমদানি রপ্তানি হতো। কিন্তু কালে তাদের ব্যবসাটা ফেল মেরে গেল, কারখানা উঠে গেল, কলোনি ফাঁক হয়ে গেল। জায়গাটা এখন একেবারে জনশূন্য হয়ে পড়ে আছে, কোনো মানুষ আর সেখানে বাস করে না, দিনে দুপুরে শেয়াল ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু শূন্য বাড়িগুলো, অনেক ভেঙে চুরে গেলেও এখনো নাকি তেমনি শহরের মতো সাজানো আছে, সে একটা দর্শনীয় ব্যাপার। আধুনিক কালের সমৃদ্ধি আধুনিক কালেই লোপ পেয়েছে,

তারই কত আশ্চর্য চিহ্ন এই নির্জন বনাস্ত প্রদেশের খানিকটা স্থান জুড়ে এখনো টাটকা অবস্থাতেই জাজ্বল্যমান দেখা যাবে। নিশ্চয়ই সে খুব লোভনীয় দৃশ্য। সংকল্প করলাম, বৃষ্টি ছাড়লেই একদিন ঐ দিকে অভিযান করা যাবে।

কিন্তু সাত দিনের মধ্যে বৃষ্টি ছাড়বার একটুও লক্ষণ দেখা গেল না। তখন হতাশ হয়ে সকলে সময় কাটাবার মজলিশি পন্থাগুলো অবলম্বন করতে লাগলো, অর্থাৎ ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থেকে যা কিছু করা যায়। স্থানে স্থানে সতরঞ্জি পেতে উত্তেজনাপূর্ণ উচ্চৈঃস্বরে তাস পেটাপেটি চলতে লাগলো, আর ডিবে ডিবে পান নিমেষে নিমেষে উড়তে লাগলো। আমি তেমন তাসও খেলতে জানি না আর পানও তাদৃশ চর্বন করি না, সুতরাং একখানা বই হাতে নিয়ে স্মিতমুখে সকলের তাস খেলা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম।

কিন্তু ঐ এক তাস খেলা নিয়ে কতটাই বা সময় কাটতে পারে? মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে অনেকে তাস ফেলে দিয়ে উঠে পড়তো, অন্যান্য রকম আমোদ আবিষ্কারের চেষ্টা করতো। গবেষণা চলতে লাগলো এমন বাদলার সময় কোন্ বস্তু 'সকলের চেয়ে বেশী মুখরোচক? কেউ কেউ বললে, খিচুড়ি আর মাছভাজা। প্রশ্ন হলো, সে তো খাওয়ার সময় মিলবে, তার এখনও অনেক দেরী, কিন্তু উপস্থিত পক্ষে কোন্‌টা উপ-যোগী? একজন বললে, চিঁড়েভাজা, ঘিমরিচ মাখিয়ে। উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু চিঁড়ে কোথায় মিলবে? এই দুর্যোগে কেই বা যাবে গ্রামের মধ্যে চিঁড়ে কিনতে? কথাটা শ্রীমতী ঘোষজায়ার কানে গেল, তৎক্ষণাৎ তিনি কোথা থেকে অতিবাঞ্ছিত চিঁড়ে এনে হাজির করলেন, স্টোভ জ্বেলে ভাজতে বসে গেলেন। তাঁর বেতের বাক্সের মধ্যে চাল-ডালের সঙ্গে কিছু চিঁড়েও তিনি সংগ্রহ করে এনেছিলেন।

তিনু ছেলেটিকে নিতান্ত নিরীহ ভালোমানুষ বলেই জানতাম। কিন্তু এই বাদলা দেখে তারও মাথায় হঠাৎ এক খেয়াল চাপলো। মামাবাবুর সিদ্ধি খাওয়ার অভ্যাস আছে, তিনি সিদ্ধি ঘুঁটছেন দেখে তিনু বলে উঠলো, সেও সিদ্ধি খাবে। হাবলু তাই শুনে বললে, তারও চাই। মামাবাবু খুশি হয়ে দু'জনকেই কিছু কিছু ভাগ দিলেন। কিছুক্ষণ পর থেকেই তিনু ফিক্‌ফিক্ করে বেজায় হাসতে শুরু করলে। হঠাৎ তার মনে হলো ভারী খিদে পেয়েছে, সে আতা খাবে। সকালে কোথা থেকে এক ঝুড়ি আতা সংগ্রহ হয়েছিল, তিনু সেটা জানতো। সে আতার ঝুড়িটা নিয়ে বসলো, এবং তেমনি ফিক্‌ফিক্ করে হাসতে হাসতে অম্লানবদনে সব আতাগুলোই খেয়ে ফেললে।

হাবলু এতক্ষণ পর্যন্ত গুম্ হয়ে বসেছিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ এক মেছুনি বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে একটা মস্ত মাছ এনে হাজির করলে। হাবলু তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে গান শুরু করে দিলে—"আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কী এনেছিস বল—।" মেছুনি হকচকিয়ে বললে—"মাছ এনেছি।" সবাই উচ্চরোলে হেসে উঠলো। হাবলু বেজায় চটে উঠে বললে—"তোমরা বুঝি মনে করছো সিদ্ধির নেশা হয়েছে? একটুও না। আমি খুব সুস্থ মস্তিষ্কেই বলছি। খিচুড়ির সঙ্গে মাছভাজার কথাটা উঠেছিল, তা আমার খুবই মনে আছে। মাছ দেখেই তাই ফূর্তি হলো নইলে কি আর আমি জানি না যে এমন দিনে পূর্ণিমা হতেই পারে না? বরং আমাবস্যে হতে পারে তাই দিনের বেলাও অন্ধকার।"

আবার একটা হাসির উচ্চরোল উঠলো। হাবলু আরো চটে গিয়ে বললে—"তোমাদের কাছে কিছু বলবারও জো নেই, যা বলবো তাতেই অমনি হেসে উঠবে। অতো হাসি আমার ভালো লাগে না, হঁা। কেন, অন্যায়টা আমি কী বলেছি?"

বেজায় ভীতু ছিল আমাদের সঙ্গের উড়িয়া চাকরটি, তার নাম ছিল নটোবর (ন দিয়ে নামটা কেউই উচ্চারণ করতো না)। বেঁটে খাটো গভীর মসীবর্ণ মানুষটি, পা দুটো শরীরের অনুপাতে অনেক ছোটো, থপ্‌থপ্‌ করে চলে, কিন্তু অঙ্গভঙ্গিতে দেখায় যেন খুব ফূর্তি করেই চলেছে। কেউ কোনো কথা বললেই অমনি মুচকি মুচকি হাসে, মনে করে সর্বদাই বুঝি আমরা তাকে ঠাট্টাই করছি। বাড়ির মধ্যে যে-কোনো কাজের ফাইফরমাস করো সমস্তই সে অম্লানবদনে করে যাবে, তাতে তার কোনো বিরক্তি নেই। কিন্তু বাড়ির বাইরে পা বাড়াতে হলেই তার পক্ষে মহা বিপদ, বিশেষত সন্ধ্যার পরে দোকানে যেতে বললেই আতংকে তার মুখখানা শুকিয়ে যায়। "অন্ধকারে রাস্তায় গেলেই জলের মধ্যে ডুবে মরবো বাবু, আমার পা দুখানা একটু খাটো আছে কিনা।" পথে স্থানে স্থানে যে খানিকটা করে জল জমে আছে, সেই গুলোকেই ওর অত্যন্ত ভয়, ওর ধারণা সেখানে এক একটা গভীর পুকুর হয়ে আছে, ওর পক্ষে নিশ্চয়ই সেখানে ডুবজল। তাই ও দিনের বেলাতেও প্রাণান্তে পথের কোনো আবদ্ধ জলে পা দেয় না, কোন্ জল কতখানি গভীর তা জানা নেই, যদি পা বাড়ালেই পিছলে গিয়ে তার মধ্যে তলিয়ে যায়! সুতরাং সন্ধ্যার পরে কোথাও যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব, চাকরির চেয়ে জানের দাম অনেক বেশি। তার মা আসচে ফাল্গুনে তার বিয়ে দেবে বলেছে, এখন খুব সাবধানে থাকতে হবে বলে তাকে চিঠিও দিয়েছে। তবে কেউ যদি আগে আগে লণ্ঠন ধরে তার সঙ্গে যায়, তাহলে তার পিছু পিছু সে যেতে পারে। অবশ্য একটা লাঠিও হাতে থাকা চাই।

একদিন সন্ধ্যার পরে গানে আর তাস খেলায় আমাদের মজলিস যখন মশগুল হয়ে উঠেছে, তখন নটোবর হঠাৎ কেমন একরকমভাবে হামাগুড়ি দিতে দিতে একেবারে আমাদের মাঝখানে এসে হাজির। ভয়ে মুখখানা তার শাকবর্ণ হয়ে গেছে। ব্যগ্র হয়ে দুহাত তুলে সে কাঁপতে কাঁপতে বললে—"চুপ চুপ, বাবুরা সব চুপ করুন। এই এতখানি একটা কালো ভালুকের বাচ্চা, আমি নিজের চোখে দেখলাম।" সবাই তৎক্ষণাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। "কোথায় রে, কোথায়?" "ঐ বারান্দার নিচে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বন্দুকে টোটা ভরে নিয়ে চলুন, দেখবেন।" সকলে মিলে বারান্দায় বেরিয়ে দেখি, একটা অত্যন্ত নিরীহ নেড়ি কুকুর, নিতান্ত নিরাশ্রয় হয়ে বারান্দার গা ঘেষে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির ঝাপট থেকে যথাসম্ভব আত্ম-রক্ষা করচে। আমাদের দেখেই সে দারুন ভয় পেয়ে গেল, লেজ গুটিয়ে বিহ্বল চোখে আমাদের দিকে চেয়ে অনবরত কাঁপতে লাগলো। ভাবটা এই যে যদি তাড়া দাও তবে অবশ্যই ছুটে পালাবো, আর যদি দয়া করো তাহলে এখানেই একটু দাঁড়াই। সবাই খুব হাসতে হাসতে ঘরে ফিরে গেল, আমি তাড়াতাড়ি কয়েকখানা বিস্কুট এনে প্রলোভন দেখিয়ে কুকুরটাকে বারান্দার উপরে উঠে আসবার জন্যে আহ্বান করলাম। কিন্তু মানুষকে এত অল্পে এতখানি বিশ্বাস করা তার অভ্যাস নেই, আরো বেশি ভয় পেয়ে সে পালাবার

উপক্রম করতে লাগলো। তখন যেখানে বারান্দার নিচে ঘাসের বনের মধ্যে সে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই বিস্কুটগুলো ফেলে দিয়ে আমি খানিকটা দুরে সরে গেলাম। দূর থেকে দেখলাম, এইবার সে আশ্বস্ত হয়ে বিস্কুটগুলো গোগ্রাসে গিলে ফেললে।

অধিক রাত্রে আহারাদির পরে সিগারেট টানতে টানতে বারান্দায় গিয়ে দেখি, সেই কালো কুকুরটা বারান্দার নিচে সেই ভিজে ঘাসের উপরে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে আছে। আমাদের ভুক্তাবশিষ্ট খিচুড়ি আর মাছের কাঁটা একত্রিত করে নটোবরকে দিয়ে বারান্দায় এনে আবার তাকে খেতে আহ্বান করলাম। কিন্তু কিছুতেই সে উপরে উঠলো না, নিচের থেকেই করুণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। উচ্ছিষ্ট-গুলোকে নটোবর তখন সেই ঘাসের মধ্যেই ফেলে দিলে। কুকুরটা নিমেষের মধ্যে ঘাসের পাতা সমেত সমস্তই উদরসাৎ করে ফেললে। বোঝা গেল সে বহুদিন অভুক্ত ছিল।

সেই দিন থেকেই ঐ কালো কুকুরটা হয়ে রইল আমাদের দিবারাত্রি পাহারাদার। বৃষ্টিবাদলকে অগ্রাহ্য করে প্রায় অষ্টপ্রহরেই-সে ঐ বারান্দার নীচে নির্দিষ্ট স্থানটিতে বসে থাকতো। অন্য সময় যদিবা অন্যত্র চলে যেতো, কিন্তু খাবার সময়টিতে সে নিশ্চিত সেখানে হাজির থাকতো। আর সারা রাতই কুকুরটা সজাগ হয়ে পাহারা দিতো। বাড়ির ত্রিসীমানা দিয়ে কোনো মানুষ কিংবা জানোয়ার যাতায়াত করলেই সে গম্ভীরস্বরে তাড়না করে উঠতো, আমরা বিছানায় ঘুমের ঘোরে তার গলার আওয়াজ শুনে পরম আশ্বস্ত হয়ে পাশ ফিরে শুতাম। বিশেষ করে নটোবরের সে খুব বাধ্য হয়ে উঠেছিল। কোথাও যেতে হলেই নটোবর তাকে ডাক দিতো, সে অমনি ওর পিছু পিছু যেতো। এমন কি কুয়োতলায় জল আনবার সময়েও ওর সঙ্গে সঙ্গে বার বার যাতায়াত করতো। কিন্তু এতখানি বাধ্য হয়ে গেলেও কুকুরটা কোনো দিন আমাদের বারান্দার উপরটায় ওঠেনি, এমন কি নটোবরের অনুরোধেও না।

যে বারান্দার কথাটা এতবার করে বলছি তার কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার। পশ্চিম অঞ্চলের বাংলোগুলোতে সাদা থাম দেওয়া তিন দিক জোড়া প্রশস্ত আর উঁচু বারান্দা প্রায়ই যেমন হয়ে থাকে তেমনি। এমন ধরণের ঢালাও বারান্দা থাকলে সেটা ঘরের চেয়েও বেশী লোভনীয় হয়, বিশেষ করে তার সুমুখে যদি কিছু গাছপালা আর খোলা মাঠ পড়ে থাকে, আর চারিদিকে যদি মন-উদাস-করা প্রাকৃতিক দৃশ্য থাকে। খুব ভোরে উঠে সেখানে গিয়ে চোখ মুছে চাইলেই দেখা যাবে যে সাদা থামগুলোয় ইতিমধ্যে কখন লাল রং লেগে গেছে, পূর্বদিকের সারা আকাশকে হিঙ্গুলবর্ণে রাঙিয়ে দিয়ে সামান্য একটুখানি লাল টুকটুকে সূর্যোদয় হচ্ছে, সেটা দেখতে দেখতে বেড়ে চলেছে। অবাক হয়ে তখন ভাবতে থাকবে, প্রভাতের এতখানি রূপ, আগে তো জানতুম না। ক্রমশ আলো হয়ে উঠবে চতুর্দিক, সেই আলোতে সব কিছু দৃশ্যবস্তু নতুন করে ঝলমল করে উঠবে। দুপুরে আহারান্তে সেই বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে বসে দেখা যাবে দিকে দিগন্তে প্রখর রোদ ছড়িয়ে পড়েছে, শুব্ধ মধ্যাহ্নে কোন গাছের মাথায় লুকিয়ে বসে কেবল একটা কাঠঠোক্‌রা পাখী অনবরত একই রকমের শব্দ করে চলেছে, অনেক দূরে বাঁধের পুকুরে কে একজন গরু নামিয়ে স্নান করাচ্ছে, তার পাশের পথটা দিয়ে একজন চাষী টোকা

মাথায় গান গাইতে গাইতে চলেছে। গরু চরছে এদিকে ওদিকে, সাদা বকের দল তার পিছু পিছু চলেছে পোকার আশায়—একটা ষাঁড় ঝোপের গোড়ায় তার শিং ঘসছে। এই সব দেখতে দেখতে চোখ ঢুলে আসবে, হাই উঠতে থাকবে, ঘুমের আমেজ সারা দেহমনে যেন জড়িয়ে ধরবে। আবার সন্ধ্যা হবার আগে অন্য রকম চিত্রবৈচিত্র, তখন সূর্য্যাস্তের পালা, ছড়ানো-আলো গুটিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে দিনটার বিমর্ষ হয়ে বিদায় নেবার কত অভিনব আয়োজন। তারপর রাত্রের পালা, তখন চমৎকার চাঁদের আলো আছে, নইলে ফুটফুটে তারার ঝিকিমিকি আছে, তাদের আবার কত কিছুই বলবার আছে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত প্রকৃতি যেন সেখানে পর্বের পর পর্ব একটা একটানা কাহিনী বলে যাচ্ছে। এমন একখানা বারান্দা যদি বাইরে কোথাও পাওয়া যায় তাহলে সেখানেই দিবারাত্র থাকতে ইচ্ছে করে, ঘরের মধ্যে যেতে একবারও মন সরে না।

এমনি একখানা বারান্দাই আমাদের ভাগ্যে জুটে গিয়েছিল, আর এমনি একটা দৃশ্যই আমরা দেখলাম যেদিন প্রথম আকাশের মেঘ কেটে বর্ষাটা একেবারে ছেড়ে গেল। সেদিন যে আমাদের কী বিস্ময়, কী আনন্দ! সকালে উঠেই দেখি মেঘ-ফাটা সূর্যোদয়ের সে কী অপরূপ বাহার! কচি কচি শিশুরা ঘুম ভেঙে উঠেই ঢাকা দেওয়া সমস্ত কাপড় চোপড়গুলো এদিকে ওদিকে টান মেরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে যেমন অকারণে খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে, এও যেন ঠিক তেমনি। শুধু দিনের আলোই তো নয়, সে যেন একটা সত্যিকারের হাসি। আলো হাসছে, তাই দেখে আমরাও হাসছি, তাই দেখে গাছপালাও হাসছে। বর্ষাস্নাত পৃথিবী সদ্যস্নাত বধূটীর মতো সবুজ রঙের শাড়িখানি সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আপন রূপের গরিমায় যেন ডগমগ করছে—স্নানান্তের জলবিন্দুগুলো তাড়াতাড়িতে সব মুছে ফেলা হয়নি, সর্বাঙ্গের স্থানে স্থানে সেগুলো যে এখনো মুক্তাবিন্দুর মতো লেগে রয়েছে, তার যেন সে খেয়ালই নেই। সুদীর্ঘ একটা অন্ধকারময় সপ্তাহের শেষে কী সুন্দর এই সকাল হওয়া! প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া এর চমৎকারিত্ব কেহই বুঝতে পারবেনা। নদীপারের হাঁসেরাও এই সকাল দেখে আর স্থির থাকতে পারেনি। মস্ত একটা হাঁসের ঝাঁক কেন্দ্রাপসারী এক সুদীর্ঘ বলাকা রচনা করে আমাদের ঠিক মাথার ওপর দিয়ে হুশ্‌হুশ্ শব্দ করতে করতে পূর্বদিক থেকে পশ্চিমদিকে উড়ে চলে গেল। হিরন্ময় বাবু তাই দেখে একবার চীৎকার করে উঠলেন—

"শিগ্‌গির, শিগ্‌গির একটা বন্দুক বের করো।" সে কথা শুনেও সবাই হাঁ করে সেই বলাকার দিকে চেয়েই রইল, বন্দুক আনবার কথাটা আর খেয়ালই করলে না।

বর্ষা ছাড়লো বটে, কিন্তু সেই দিনটাতে চললো শুধু আলো অন্ধকারের লুকোচুরি খেলা। মাঝে মাঝে বেশ রোদ ওঠে, আবার হঠাৎ কোথা থেকে একখানা কালো মেঘ এসে কিছুক্ষণের জন্যে সমস্ত অন্ধকার করে দেয়। অগত্যা সেই দিনটাও আমরা একরকম ঘরে বসেই কাটালুম। কিন্তু তার পরে বেশ রোদ উঠে গেল, মাঠ ঘাট সব শুকিয়ে গেল, কিন্তু আমাদের যে সব দূরে দূরে অ্যাডভেঞ্চারে যাবার সংকল্প আগের থেকে ঠিক করা ছিল, যার জন্যে আমরা বর্ষাদুর্যোগ ছাড়বার এত প্রতীক্ষা করছিলাম, তা আর যেন তখন কিছুতেই ঘটলো না। প্রত্যহই এক একটা নতুন নতুন হুজুগ ওঠে,

তাই নিয়েই সারা দিনটা কোন্‌খান দিয়ে কেটে যায়, সুদূর অভিযানের আগ্রহটা স্থগিতই থেকে যায়। রাত্রে শোবার সময় কথাটা একবার ওঠে বটে, কিন্তু সকাল হলেই সবাই ভুলে যায়, তখন চা খাওয়া প্রাতঃকৃত্য, আর কুঁড়েমি নিয়ে সবাই এমন ব্যস্ত থাকে যে বেলা কখন দশটা বেজে গেল তা আর কারো হুঁশই থাকেনা। তারপর অতখানি বেলায় তো আর দূরের অ্যাডভেঞ্চারে বেরুনো যায় না!

আমাদের দলের হিরন্ময় বাবু এক সৌখীন প্রকৃতির মানুষ। জমিদারী চালেই বরাবর অভ্যস্ত, খুব দামী জিনিস না হলে কিছুই তিনি ব্যবহার করেন না। হাতে পরেন অতি দুষ্প্রাপ্য বেলজিয়ান হীরের আংটি, পায়ে দেন ডিশিনের বাড়ির সবচেয়ে দামী সোয়েটের জুতো, গায়ে দেন চৈনিক রেশমের চক্‌চকে শার্ট, তাতে লাগান খাস গাজীপুরের আমদানি গোলাপী আতরের গন্ধ। সব কিছুই তাঁর একটু অসাধারণ, এমন কি যে সিগারেট পান করেন তাও। অনেক খুঁজে অনেক হাঙ্গামা করে কলকাতার কোন বড়ো দোকানদারের কাছ থেকে ত্রিশ টাকায় মাত্র তিনটি ফাইভ-ফিফ্‌টি-ফাইভের টিন কিনে এনেছেন, ঐ তিনটি মাত্রই টিন তার কাছে লুকোনো ছিল, হিরন্ময় বাবুকে খুব চেনে বলেই তাই দিয়ে দিলে। সারা কলকাতা শহরে ও সিগারেট আর কোথাও এখন মেলেই না, অথচ ঐ সিগারেট না হলে ওঁর চলেই না। দুরধিগম্য দূর অঞ্চলে যাবার প্রস্তাবে তিনি বরাবরই একটু নারাজ, মুখ ফুটে কিছু না বললেও বনে জঙ্গলে হাঁটাহাঁটি করা তিনি তেমন পছন্দ করেন না। তবে ঘরে শুয়ে বসে থাকতে তাঁর আপত্তি নেই, এমন কি কাছাকাছি কোথাও খানিকটা দূর পর্যন্ত বেড়িয়ে আসতেও তাঁর আপত্তি নেই। অর্থাৎ এমন রকমের আমোদ উপভোগ করতে রাজি আছেন যার মধ্যে বেশি মেহনত কিংবা বেশি ঝুঁকিঝামেলা নেই। ভদ্রলোকের কিন্তু একটা বিশেষ রকমের গুণ আছে, সে তাঁর অসাধারণ রন্ধনপটুতা। এমন চমৎকার মোগলাই রোস্ট বানাতে পারেন যা স্বয়ং মোগল-পাচকদেরও হার মানিয়ে দেয়। তাঁর আবার একটি উপযুক্ত চেলাও আছে, তার নাম গোকুল। হিরন্ময় বাবু যেমন রন্ধনবিলাসী, গোকুল তেমনি ভোজনবিলাসী, কাজে কাজেই খুব মিলে গেছে। ওঁরা দুজনে মিলে ঘরে বসেই নতুন নতুন ভোজনানন্দের আয়োজন করতে থাকেন, আর বলা বাহুল্য সবাই তাতে আগ্রহের সঙ্গে যোগ দেয়। অমন বিদেশ বিভুঁয়ে অভিনব যে সমস্ত পিক্‌নিকের ব্যবস্থা হচ্ছে, তাতে কার না মনে উল্লাস জাগে, আর কেই বা সেই সব ফেলে যত বুনোকাঁটায় ঘেরা পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরতে যায়?

খানিকটা রোদ উঠতেই মা বসলেন বারান্দার ধারে খাটিয়া পেতে, রোদের দিকে পা ছড়িয়ে দিয়ে তিনি রোদ পোয়াতে লাগলেন। খুব বেশী বয়স না হলেও অকালে তিনি বার্ধক্যকে ডেকে বরণ করে নিয়েছেন, তাই তিনি এখন সকলেরই মা। জানেনও সব, বোঝেন সব, কিন্তু বার্ধক্যটাই নাকি কতকটা বিলাসের মতো, তা ছাড়া তিনি একটু শীতকাতুরে, তাই রোদে পা ছড়িয়ে বসতে বেশ ভালোই বাসেন। ঘরে বসে আনন্দ করবার আয়োজনের তিনিও বিশেষ পক্ষপাতী, এ বিষয়ে তাঁর কাছেও অনেক রকমের প্রশ্রয় ও পরামর্শ পাওয়া যায়। তাঁরই সঙ্গে কী একটা মতলব এঁটে হিরন্ময় বাবু ডাকলেন— "গোকুল।" গোকুল কাছেই হাজির ছিল। "কোথাও থেকে ডজনখানেক মুরগি সংগ্রহ করে আনতে

পারো?" গোকুল এতে খুবই ওস্তাদ, বললে—"নিশ্চয়ই পারি।" "আর কিছু পেঁয়াজ আর আদা, আর অল্প একটু হিং?" "হাঁ তাও পারবো।" গোকুল তৎক্ষণাৎ ছুটলো, ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সব কিছুই এনে হাজির করলে। অতঃপর বিকেলে একটু বেড়াতে যাবার চেষ্টাও সকলের ঘুচে গেল, সন্ধ্যার আগের থেকেই বারান্দায় ষ্টোভ জ্বালিয়ে মাংস রন্ধনের আয়োজন শুরু হয়ে গেল।

সকালে তাড়াতাড়ি রোদ উঠে পড়ছে বলে কোথাও যাওয়া হচ্ছেনা, বিকেলে নতুন নতুন রান্নার ব্যাপার নিয়ে পড়তে হচ্ছে বলে কোথাও যাওয়া হচ্ছেনা। তাতে কারো কোনো দুঃখ নেই, সবাই বেশ সন্তুষ্ট চিত্তেই রয়েছে দেখা যায়, কিন্তু আমার মনটা কেবলই খুঁৎখুঁৎ করতে থাকে। আমি বেড়াতেই ভালোবাসি, বাইরে কোথাও গেলে বেড়ানোটাই সব চেয়ে বেশী পছন্দ করি। যে দিনটা কোথাও বেড়াতে যেতে পাইনা, কোনো নতুন দৃশ্য দেখে আসতে পারিনা, সে দিনটা মনে হয় বৃথাই গেল। আমি তাই সুযোগ পেলেই একটু আধটু এদিকে ওদিকে ছট্‌কে পড়ি। হয়তো গ্রামের ভিতর দিয়ে এক চক্কর ঘুরে আসি, নয়তো একটা শালবনের মধ্যে ঢুকে এলোমেলো এমনিই খানিক ঘুরে বেড়াই, নয়তো কাছের পাহাড়টায় উঠে পাথরের ঢিপির আড়ালে চুপচাপ খানিকক্ষণ বসে থাকি। মাঝে মাঝে বেরিয়ে গিয়ে একা একা থাকতে আমার ইচ্ছে হয়, সর্বক্ষণ এতগুলো মানুষের সঙ্গ আমার ভালো লাগেনা! তাই আমি সুবিধা পেলেই পালিয়ে যাই, যদিও বেশীক্ষণ তা চলেনা, হয়তো ঘণ্টা খানেকের জন্যে। অন্য সকলে নিজেদের আমোদপ্রমোদ নিয়ে এমনি মশগুল হয়ে থাকে যে আমার এই অন্তর্ধানটা তারা লক্ষ্য করতেই পারেনা। কিন্তু আমি ভুল বুঝেছিলাম, কেউ কেউ এটা ঠিকই লক্ষ্য করেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে এমনি কিছুক্ষণের জন্যে সরে পড়েছিলাম। দূরে কোথাও যাইনি, বাড়ির কাছের মাঠটার চারিদিকেই একটানা চক্কর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। বারান্দাতে রান্না চড়েছিল, সেখান থেকে হয়তো আমার এই শখের পরিভ্রমণটা দেখা যাচ্ছিল। ফিরে যেতেই একজন ঠাট্টা করে বললে—"আপনার বুঝি নিশাচরের মতো ঘুরে বেড়ানোর বাই আছে?" হিরণ্ময় বাবু হাসতে হাসতে বললেন—"বয়সকালে অমন একটু ঘূর্ণিরোগ মানুষের হয়েই থাকে।" আমি কোনো জবাব দিতে না পেরে অপ্রস্তুত হয়ে উঠছি, দেখে শ্রীমতি ঘোষজায়া বললেন—"না না, ঠিক কথাই তো! আমরা এখানে বেড়াতেই এসেছি, অথচ কোথাও কোনদিন যাওয়া হচ্ছেনা, কেবল ঘরে বসেই গুলতুন করছি। এ আমাদের অন্যায় হচ্ছে। আমাদের জন্যে ওঁরও কোথাও যাওয়া হয়না। যাক্‌গে, কাল ভোরে উঠেই সকলকে বেড়াতে বেরিয়ে যেতে হবে, কারো কোনো ওজর আমি শুনবো না। খুব ভোরে উঠে আমি চা করে দেবো, খেয়ে নিয়েই সবাইকে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়তে হবে।"

এ কথায় সকলে রাজি হয়ে গেল, কারণ তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি চলেনা।

খুব ভোরেই তিনি আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন, তখনো রীতিমত অন্ধকার আছে। এক ডাকে আমার ঘুম ভাঙেনা, দুবার তিনবার ডেকে ডেকে আমাকে তুললেন, বললেন—"চা টা সব রেডি।"

তাড়াতাড়ি উঠে বসতেই গরম গরম চায়ের বাটীটা হাতে পেলাম। ভারি ভালো লাগলো, এক কাপ্ নয়, বসে বসে দু কাপ্ চা খেলাম। তারপর দেখি সবাই ইতিমধ্যে চা খেয়ে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। কিন্তু আমার আবার এক রোগ আছে, সব কিছু প্রাতঃকৃত্য সমাধা না করে আমি কোথাও বেরুতে পারিনা। অগত্যা আমারই জন্মে সেদিন বেরুতে একটু দেরী হয়ে গেল, সূর্য উঠে পড়লো।

সেই দিন আমরা প্রথম গেলাম নদীর ধারে। নদী আমাদের বাড়ির থেকে বেশ খানিকটা দূরে। গিয়ে দেখি নদী কূলে কূলে ভরা, নৌকা ছাড়া পার হবার কোনই উপায় নেই। সন্ধান করতে করতে দেখা গেল ওপারে একটা পারানি-নৌকা বাঁধা রয়েছে। তবে তো পার হবার আশা আছে ভেবে আমরা সকলে মিলে তারস্বরে চীৎকার করতে লাগলাম—"মাঝি হৈ, মাঝি হৈ—।" বারে বারে তার প্রতিধ্বনিটাই ফিরে আসতে লাগলো, কিন্তু অনেকক্ষণের পরেও ওপার থেকে কারো কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তখন এপারের একজন গরুর গাড়ির গাড়োয়ান বালি বোঝাই করতে এসে আমাদের জানিয়ে দিলে যে নদী পার হতে হলে আরো ভোরে আসতে হয়। আমরা আসবার আগেই মাঝি পারানি সেরে নৌকো রেখে চলে গেছে, বেলা দুই প্রহরের আগে আর আসবে না। মোট তিনবার সে নদী পারাপার করে,—একবার ভোরে, একবার দুপুরে, আর একবার সন্ধ্যায়।

বিফল্ মনোরথ হয়ে আমরা এই পারেই আমাদের সমস্ত উৎসাহটার নিবৃত্তি করে নিলাম। সঙ্গে ছিল বন্দুক আর অনেকগুলো টোটা। যাদের শিকারের বাই আছে তারা ছুটলো পাখীর সন্ধানে। নদীর ধারে নিশ্চয়ই ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস আর কাদাখোঁচা থাকবার কথা। কিন্তু ঝোপে-ঝাড়ে কাদায় কাদায় ঘুরে বেড়িয়েও কেবল বক ছাড়া আর কোনো পাখীই দৃষ্টিগোচর হলোনা। সলিল বাবু বললেন—"কুছ পরোয়া নেই, ঐ বকই মারা যাক।" একটা বক্ বসেছিল একেবারে জলের ধারে, তাকে লক্ষ্য করে তিনি গুলি ছুঁড়লেন। প্রথম বারের গুলিতে বকটা একটুও নড়লোনা। দ্বিতীয় দফায় যখন আবার তাকে গুলি করা হলো, তখন সে খুব ধীরে ধীরে ডানা নাড়তে নাড়তে উড়ে চলে গেল। সলিল বাবু বললেন নিশ্চয় ও চোট খেয়েছে, খানিকটা গিয়েই জলে পড়ে যাবে।

তারপরে আরো খানিক সময় কাটলো অন্যান্য রকমের আনন্দে। কেউ কেউ বালির চরেই ঘুরে বেড়াতে লাগলো, কেউ আবার কাপড় তুলে হাঁটু জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে জল ছিটিয়ে ফিরতে লাগলো। জুতো পায়ে বালির মধ্যে চলতে গেলেই ভিতরে অনেক বালি ঢুকে যায়, তখন জুতো জোড়াটা খুলে জলের স্রোতে একবার বেশ করে ধুয়ে নিতে হয়। আবার বালিমাখা পা নিয়ে সেই জুতো পরলেই তাতে নতুন করে বালি ঢোকে। তখন জুতো ফেলে রেখে অগত্যা খালি পায়েই ঘুরতে হয়। অনেকে তাই করতে লাগলো। কেউ কেউ বসে বসে বালির রাজ্য গড়তে লাগলো। দুমহল তিনমহল বাড়ি করলে, খুবরি খুবরি দরজা করলে, স্কুল করলে, আদালত করলে, পাচিলঘেরা সৈন্যনিবাস করলে, রাস্তা ঘাট বাগান করলে—তারপর সে সমস্তই ফেলে রেখে হাসতে হাসতে নদীর জলে হাত ধুয়ে ফেললে।

দুপুরে মুখ লাল করে যখন আমরা বাড়ি ফিরলুম তখন লটোবর জিজ্ঞাসা করলে কি কি শিকার হলো, কতদূর আমরা গিয়েছিলুম। সলিলবাবু বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বললেন—"ওপারে আমরা ভাল্লুক মারতে গিয়েছিলুম। একটা ভাল্লুক জখম হয়েও পালিয়ে গেল, তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।" লটোবর বিস্মিত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

আমি কিন্তু মনে মনে অপ্রস্তুত হয়েছিলাম। তাই হয়তো সংকল্প করলাম, নদীপারে সেই নীলকুঠির জায়গায় আমাকে একা একা একবার যেতেই হবে। কাউকে একথা আর বলা হবে না, দুপুরে প্রফেসরের বাড়ি থেকে একটা সাইকেল সংগ্রহ করে সময় মত পারানি-নৌকোয় পার হয়ে আমি একাই চলে যাবো। নদীর ধার পর্যন্ত গিয়ে এমনি এমনি ফিরে এলুম, অমন লোভনীয় ওপারটায় পৌছনোই গেল না, এর ক্ষোভ যেন আমার কিছুতেই মিটছিল না।

পরের দিন সকালে এক ফাঁকে প্রফেসারের বাড়ি থেকে সাইকেলখানা চেয়ে আনলাম। দুপুরে খেয়ে ওঠবার পরেই সকলকে বললাম—"সাইকেলটা যখন জুটে গেছে তখন খানিক ঘুরে আসি, একটু পরেই ফিরবো।"

বরাবর চলে গেলাম নদীর ধারে। মাঝিকে আর ডাকাডাকি করতে হলো না, দেখি পার হবার জন্যে কয়েকজন গ্রাম্য লোক আগের থেকেই অপেক্ষা করছে। কিছুক্ষণ পরে ওপারের লোকদের নিয়ে নৌকোটা এপারে এসে হাজির হলো, তারা নেমে গেলেই সাইকেল নিয়ে আমি এপারের লোকদের সঙ্গে নৌকায় চড়ে বসলুম। মাঝি লোকটা বেশ রসিক বলতে হবে, বাবু গোছের একজন সাইকেল নিয়ে নদী পার হচ্ছে দেখেই সে বলে বসলো—"নীলকুঠির দিকে বেড়াতে যাবেন বুঝি? পারাপার করিয়ে দেবো, কিন্তু একটি টাকা বকশিশ চাই।" আমি হাসছি দেখে সে আরো প্রশ্রয় পেয়ে বললে—"একটা বিড়ি দিন বাবু, বিড়ি,—এক টান খেয়ে গায়ে জোর করে নিই।" আমি তাকে একটা সিগারেট বের করে দিলুম, তাই পেয়ে মহাখুশি।

পার হতে হতে নৌকোটাকে স্রোতে অনেকখানি পিছনে টেনে নিয়ে গেল, কারণ এ-নদী অত্যন্ত খরস্রোতা যেখানটায় নামতে হলো সেখানে বালি নেই, খুব পিছল পাড়ের উপর দিয়ে উঠতে হবে। মাঝি বললে,—আমি সাইকেলটা তুলে দিচ্ছি। কিন্তু অভ্যাস নেই, সাইকেল সমেত সে নিজেই পিছলে পড়ে গেল। তখন অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি সে গোটা সাইকেলটাকে নদীর জলে চুবিয়ে ধুতে লেগে গেল। আমি যখন বললাম জল লেগে নষ্ট হয়ে যাবে, তখন আবার অপ্রস্তুত হয়ে কাপড় দিয়ে মুছে দিলে।

পাড়ের উপর উঠে খানিকদূর পর্যন্ত সঙ্গে গিয়ে সে আমাকে গন্তব্যস্থানে যাবার পথ দেখিয়ে দিলে। বললে যে বনজঙ্গলের ভিতরকার সেই দুর্গম বন্ধুর পথ দিয়েই দু মাইল পর্যন্ত আমাকে হেঁটে যেতে হবে। তারপর সাইকেল চড়ে যাবার মতো চমৎকার বাঁধা রাস্তা পাওয়া যাবে, যেতে যেতেই দেখতে পাবো নীলকুঠির সাহেবদের সব ভাঙা বাড়ি। আরো বলে দিলে যে সন্ধ্যার মধ্যেই যেন আমি ফিরে আসি, এখানে জানোয়ারের বিলক্ষণ ভয় আছে। আমাকে পার করে দেবার জন্যে সে অপেক্ষা করে থাকবে, ফিরে না আসা পর্যন্ত নৌকো ছাড়বে না।

হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা গিয়ে তবে পাকা রাস্তায় ওঠা গেল। দেখলাম সত্যিই খুব চমৎকার রাস্তা, বরাবর লাল কাঁকর বিছানো, মোটর চালাবার পক্ষেও উপযুক্ত। রাস্তাটা আগের থেকেই পাকা ছিল, সম্প্রতি মিলিটারি গাড়ি চলবার জন্তে তার নতুন করে আরো সংস্কার করা হয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে নাকি বহু দূরদূরান্ত দেশ পর্যন্ত যাওয়া যায়।

সাইকেল চড়ে খুব আরামেই যেতে লাগলাম। রবারের চাকা দুটো কাঁকরগুলোকে মাড়িয়ে শ্রুতিমধুর একটা মর্মর শব্দ করতে করতে গড়িয়ে যেতে থাকে, দুইপাশের গাছপালার সোঁদালেগন্ধ-সিঞ্চিত ঠাণ্ডা হাওয়া মুখে চোখে লেগে শরীর স্নিগ্ধ করে তোলে। এমন রাস্তায় অনেক মাইল সাইকেল চালাতেও কোনো কষ্ট হয় না।

কিন্তু সাইকেলেই হোক কিংবা পদব্রজেই হোক, সম্পূর্ণ একটা নতুন রকমের নির্জন জায়গায় নিঃসঙ্গ হয়ে যদি অনেক দূর পর্যন্ত যেতে হয়, তখন চোখ দুটো যেমন চারিদিকের দৃশ্য দেখতে দেখতেই যায়, মনটিও তেমনি নেহাৎ চুপ করে থাকে না। সে তখন হরেকরকমের কত কথা বলতে শুরু করে, আর নিজেই যা বলে নিজেই তাতে তন্ময় হয়ে থাকে। সে সব কথা নিজের কাছে খুব ভালোই লাগে, কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে তা হয়তো হাস্যকর। যেতে যেতে হঠাৎ দেখলুম শাল-সেগুনের অরণ্যের মধ্যে একটা মস্ত বড়ো গাছ অত্যন্ত কচি কচি সবুজ পাতায় আপাদমস্তক ভরে রয়েছে। তখনকার পক্ষে এ একটা অতি আশ্চর্য দৃশ্য। মন বললে,—বা বা বা বা, একী মনোরম শোভা রে! এমন সুন্দর কচি-পল্লবকে কী যেন বলে? ভুলে যাচ্ছি। কী যেন—মনে পড়েছে, কিশলয়। বুড়ো বুড়ো শুকনো পাতাদের পত্র বলো, পাতা বলো, যা খুশি তাই বলো, কিন্তু অমন নবীন-পাতাদের জন্তে একটা সুন্দর গোছের আলাদা নাম থাকা চাই বৈকি। প্রবীণে আর নবীনে খুবই একটা তফাৎ আছে। মানুষের মধ্যে যেমন শিশু, যেমন কিশোরী, পাতার মধ্যে তেমনি কিশলয়।

কিছুদূর যেতে যেতে পাওয়া গেল একটা অজানা ফুলের গন্ধ। খানিকটা পর্যন্ত তারই মিষ্টি গন্ধে সারা পথটা ভুরভুর করতে লাগলো, মন অমনি তাতে মাতোয়ারা হয়ে উঠলো। কিসের গন্ধ এটা, কোন্ ফুলের? আমের বোল হতে পারে কি? অসম্ভব, এ-যে কার্তিক মাস! কুরচি ফুলের মতো গন্ধ বুঝি? সেও তো এসময় ফোটেনা। তবে কী এ ফুল? খুবই যেন চেনা, অথচ নাম তো জানি না!

আজ কিন্তু ভারী একটা চমৎকার জায়গায় এসে পড়েছি। ভাগ্যিস নদী পার হয়ে জোর করে চলে এলাম, নইলে তো এমন দৃশ্যগুলো দেখতে পেতাম না! এ যেন আমাদের আগেকার জগৎ পিছনে ফেলে রেখে বৈতরণী পার হয়ে সম্পূর্ণ একটা স্বতন্ত্র জগতে চলে এসেছি। এখানকার প্রাণীরা স্বতন্ত্র, তাদের ভাষা স্বতন্ত্র, তাদের রীতিনীতি স্বতন্ত্র। মানুষ নামের প্রাণী এখানে বাস করে না, কেবল গাছ-পালারাই এখানকার প্রাণী। ওদের প্রাণী বলতে হবে বৈ কি! প্রাণ না থাকলে কি ওরা বর্ণে গন্ধে রূপে অমন লাবণ্যের বৈচিত্র্য ছড়িয়ে দিতে পারে? প্রাণ নিশ্চয়ই আছে, তবে তার প্রকাশ অন্যতর। মূক হয়ে থাকাই ওদের চিরকালের অভ্যাস, তাই কোনো মুখরতার দরকার হয় না। ওদের হয়তো ধারণা, মুখরতার চেয়ে

মুকতার দ্বারাই ওদের জীবনের অভিপ্রায়কে ভালো করে প্রকাশ করা যায়, তাই ওদের কোনো বাক্যরীতি নেই, আলাপন বা তর্কের দ্বারা মনোভাব বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা নেই। ওরা ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকতেই চিরকাল শিখে এসেছে, তাই ওরা একই স্থানে শিকড় গেড়ে অচঞ্চল হয়ে থাকে, জীবনকে উপভোগ করতে স্থিতি কিংবা ভঙ্গি পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। হয়তো সুদীর্ঘ জীবন যাপনের জন্যে ওদের এমনি থাকাই প্রয়োজন। আমরাও যেমন আমাদের ধারা বজায় রেখে চলেছি, ওরাও তেমনি ওদের ধারা বজায় রেখে চলেছে। কিন্তু এই যেমন আমি ওদের দেখে আজ মুগ্ধ হয়ে উঠেছি, ওরাও তেমনি নিঃশব্দে ভালো-বেসে আমাকে চিনে রেখে দিলে। আমি নিশ্চয় ভুলে যাবো, কিন্তু ওরা এটা ভুলবে না। আজ যেমন আমি এখানে এসে ঘুরে যাচ্ছি, হয়তো তিন চার পুরুষ বাদে আমার কোনো বংশধর এখানে একদিন আবার এমনি করেই ঘুরতে আসবে। এই সব গাছপালা তখনও বেঁচে থাকবে। সে আমার আগমনের কথা কিছুই জানবে না কিন্তু এরা পরস্পর পাতা নেড়ে আজকের কথা নিয়ে গা টেপাটেপি করবে।

সুযোগ পেলেই মন অমনি অনাবশ্যক রকমের বকতে থাকে, তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। অমনি ধরণের কত কথা ভাবতে ভাবতে আমি মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে চললাম। ক্বচিৎ এক একটা মিলিটারী লরি এসে পড়ে, আমি একটু পাশ কাটাই গাড়ীখানা পথ পেয়ে তীর বেগে ছুটে চলে যায়। মাঝে মাঝে বনের পাশে দু'একটা সামান্য গ্রাম দেখা যায়, দু একজন গ্রাম্য বৃদ্ধাকে দেখা যায়। আমি সাইকেল থেকেই জিজ্ঞাসা করি—"এ গ্রামের কী নাম?" মেয়েটি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে অবশেষে কী একটা কথা বলে আমি বুঝতেই পারি না, কারণ ততক্ষণে আমি অনেক দূরে এগিয়ে গেছি।

অভিপ্রেত স্থানটিতে যখন গিয়ে পৌছলাম তখন অপরাহ্ন হয়ে এসেছে। পথের দুই ধারে সাজানো বাংলো-প্যাটার্ণের বাড়িগুলো দেখেই চিন্তে পারলাম। পাশাপাশি সুন্দর সুন্দর বাড়িগুলো শূন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে, প্রত্যেকটার চারিদিকে অনেকখানি করে স্থান অনুচ্চ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। প্রত্যেক বাড়িটার চারিদিকে পর্যাপ্ত জঙ্গল গজিয়েছে, পাঁচিলের ইটগুলো খসে পড়েছে। বাড়িগুলো এখনো বাইরের থেকে দেখতে খুব সুন্দর বলেই মনে হয়। এখনও কোনো কোনোটার চুণকাম দেখা যায়, কিন্তু একটিও জানালা দরজা অবশিষ্ট নেই, সমস্তই যেন চক্ষুবিহীন কঙ্কালের অক্ষিকোটরের মতো খাঁ খাঁ করছে। দুইধারে অমন সুন্দর করে সাজানো কত অসংখ্য বাড়ির পর বাড়ি, মাঝখান দিয়ে চলে গেছে অমন সুদৃশ্য সুপরিসর রাজপথ অথচ কোথাও কোনো জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। দেখলেই কেমন কেমন মনে হয়। মনে হয় আমি যেন সেই ছেলেবেলাকার গল্পে শোনা কোন্ এক খামখেয়ালি রাজপুত্র, মৃগয়া করতে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এক রাক্ষস কবলিত অভিশপ্ত অদ্ভুত রাজ্যের মধ্যে ঢুকে পড়েছি,—যেখানে পথ আছে কিন্তু পথিক নেই, দোকান আছে কিন্তু দোকানী নেই, ঘর আছে কিন্তু গৃহস্থ নেই, রাজ্য আছে কিন্তু রাজা নেই, হাতীশালে হাতী নেই, ঘোড়াশালে ঘোড়া নেই, নহবৎখানায় সানাই বাজতে বাজতে থেমে গেছে, জীবন্ত মানুষের শতেক চিহ্নের মধ্যেও তাদের একজনকে দেখা যাচ্ছে না। উপকথার সেই রাজপুত্রের এই সব দেখে শুনে কেমন অবস্থা

ঘটেছিল তা আমি জানি না, কিন্তু আমার মনে বেদনা জড়িত একটা দারুণ অস্বস্তি দেখা দিল। বাড়িগুলোর প্ল্যান দেখে আর বাহার দেখে খুব আশ্চর্যই হবার কথা, কিন্তু আশ্চর্য হলেও খুশি হতে পারি না, কেমন যেন একটা বিক্ষোভ হতে থাকে। প্রাণশূণ্য কোনো রূপসীর মৃতদেহ যদি নগ্ন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়, তাহলে তার রূপ দেখে চমক লাগলেও মনটা লুব্ধ না হতে পেরে যেমন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, এও কতকটা তেমনি। কত বহুমূল্য সামগ্রী এখন কত অনাদরে পড়ে রয়েছে। সৌন্দর্যসৃষ্টির এমন কুৎসিত পরিণাম? এ যেন তাজমহলস্রষ্টা সাজাহানের সর্বরিক্ত সমাপ্তির মতো এক দারুণ ট্রাজেডি। আর ঐ কবাটশূন্য দরজা জানালার অক্ষি-কোটরের মতো ফোকরগুলো! গভীর জঙ্গলের মধ্যে কে যেন ঐ সাদা সাদা বাড়িগুলোকে এক একখানা হাসির টুকরোর মতো বাঁধিয়ে রেখে দিয়েছিল, কিন্তু এখন তারই ঐ সব ফোকর দিয়ে বেরিয়ে আসছে কালো কালো অন্ধকারের হাহাকার। জার্মানি আগে কেমন ছিল, আর এখন হিটলারের অধঃপতনের পরে তার কী দুর্দশা হয়েছে, ঐ বাড়িগুলোর দিকে চাইলে তা যেন কিছু কিছু বুঝতে পারা যায়।

সাইকেল থেকে নেমে হ্যাণ্ডেল ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমি চারিদিক ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলাম। বড়ো বড়ো চিমনি লাগানো বিরাট কারখানার ইমারতগুলো একেবারে ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, মস্ত মস্ত গম্বুজ আধখানা হয়ে ভেঙে তার ইটগুলো চারিদিকে ছত্রাকার হয়ে পড়ে আছে। এখনো তার এক একটা লম্বা দেয়াল এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত অটুট অবস্থায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, দেখলেই বোঝা যায় কত পাকা তার গাঁথুনি। কারখানার পাশেই প্রকাণ্ড গুদাম, ভিতরে ঢুকলেই দেখা যায় লম্বায় চওড়ায় কতদুর পর্যন্ত বিস্তৃত, কিন্তু মাথার উপরে তার ছাদ নেই, ভিতরটা সমস্তই জঙ্গলাকীর্ণ, সেখানে ঘুঘু চরছে।

জঙ্গল ভেদ করে এক একটা বাংলো বাড়ির সীমানার মধ্যে ঢুকে তার কাছে গিয়ে দেখবার চেষ্টা করি। অন্যান্য বাড়িগুলোর তুলনায় এই বাড়িখানা আরো কত চমৎকার, এটার মধ্যেও অন্তত দু-একজন মানুষ কি এখনও থাকতে পারে না? মনে হলো যেন আছে, মনে হলো আমাকে দেখে কেউ যেন চট্ করে দরজার পাশে সরে গেল। একটু ভয় ভয় করতে থাকে, আমি হয়তো এখানে অনধিকার প্রবেশ করে ফেলেছি। ফিরে চলতেই নিজের ভ্রম বুঝতে পারি, দরজার ফোকরের সুমুখ দিয়ে চলাফেরা করতে গেলেই আলো-আঁধারিতে দেখায় যেন কিছু একটা এপাশ থেকে ওপাশে সরে গেল। নিশ্চিন্ত হয়ে আমি আবার বাড়িটার এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে বেড়াই। বারান্দার পরেই মাঝখানে রয়েছে মস্ত একটা হলঘর, নিশ্চয় ওটা ছিল ড্রয়িংরুম। তার সঙ্গে সংলগ্ন রয়েছে দুপাশে দুটি ঘর। দুটোই কি বেডরুম ছিল? তা তো নয়, এদিকের ঘরের পাশে রয়েছে বাথরুম, ওদিকে তা নেই। তবে এইটাই ছিল শোবার ঘর। বাথরুমের দরজায় একটা কবাট এখনো লেগে রয়েছে। কবাট দেখেই হঠাৎ মনে হলো একদিন ওর অন্তরালে কত নিভৃত মিলনলীলা ঘটে গেছে, ঐ উইধরা রুদ্ধ কবাটটা হয়তো এখনো তারই সাক্ষীস্বরূপ টিকে রয়ে গেছে।

ঘুরতে ঘুরতে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পড়লুম যেখানে রাস্তাটা পাহাড়ের গা থেকে কোনাচে হয়ে মোড় নিয়ে পশ্চিম ছেড়ে উত্তর মুখে চলে গেছে, তার পরে খানিক দূর পর্যন্ত ঢালু হয়ে নেমে আবার পাহাড় ঘুরে মোড় নিয়ে উত্তর ছেড়ে পশ্চিমের দিকেই চলে গেছে। প্রথম মোড়টার পাশেই দেখি অনেকখানি বিস্তীর্ণ

ঘাসের জমি, সেখানে রয়েছে একটা শান-বাধানো টেনিস কোর্ট, তার অনতিদূরেই ইটের পয়েন্টিং করা দোতলা একটা পাকা বাড়ি। এমন নিটোল বাড়িখানা যে দূর থেকে দেখলে মনে হয় এর কিছুই এখনো নষ্ট হয়নি, নতুনের মতো অটুট অবস্থায় আছে। বিস্মিত হয়ে আমি সেই দিকে অগ্রসর হলাম। বাড়িটার আশেপাশে অনেক বড়ো বড়ো পুটুসের ঝোপ আর বনতুলসীর ঝাড়। আমি তারই একটা ঝোপের গায়ে সাইকেলখানা হেলান দিয়ে রেখে ঢোকবার পথ অনুসন্ধান করতে লাগলাম। বাড়িটার ভেতরে ঢুকে একবার দেখতেই হবে।

প্রদক্ষিণ করতে করতে এক দিকের কোনে একটা মস্ত দরজা অর্থাৎ ফোকর মিললো। সেখান থেকে একটা সিঁড়ি উঠেছিল, তার কয়েকটা ধাপ পর্যন্তও দেখা গেল, তার পর আর কিছু নেই। উপরের ছাদ নেই। দোতলার মেঝেও নেই, সমস্তই অন্তর্ধান হয়ে গেছে। কেবল বাইরের দেয়ালগুলোর খুব শক্ত গাঁথুনি ছিল বলে তাই এখনো পর্যন্ত টিঁকে আছে। ভেতরে কেবল কাঁটার জঙ্গল, সেখানে ঢোকা একেবারে অসাধ্য। কিন্তু আর ঢোকবার কোনো প্রয়োজনও নেই, বোঝা গেল যে এটা ক্লাব ঘরের মতো ছিল, সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে আড্ডা জমতো, হয়তো নাচের উৎসবও হতো।

সেখান থেকে ফিরে সাইকেলটা নেবার জন্যে আবার ঝোপের কাছে গেলাম, কিন্তু আপাদমস্তক চমকে উঠে দেখি সেখানে সাইকেল নেই! এ কী সর্বনাশ! এইমাত্র এখানে রেখে গেলাম, চোখের নিমেষে কোথায় উড়ে গেল? ছোটোখাটো জিনিস নয়, অতখানি আকারের বিলক্ষণ ভারী একটা মানুষ-চড়া সাইকেল, সে তো এমনই উড়ে যেতে পারে না! নিশ্চা কেউ সেটাকে এরই মধ্যে কোথাও সরিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এ কাজ যার-তার দ্বারাও সম্ভব হতে পারে না, এমন লোক হওয়া চাই যে রীতিমত চড়তে জানে। আনাড়ি লোকে সরাতে গেলেই নৌকোর মাঝির মতো তার দুর্দশা হবে, সব সমেত হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে, তার একটা শব্দ হবে। কিন্তু এই নির্জন স্থানে জঙ্গলের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারে এমন সুদক্ষ সাইকেল চোর? তাও কি সম্ভব? অথচ আপনা-আপনি অমন একটা গুরুভার বস্তু অদৃশ্য হয়ে যাওয়াও তো সম্ভব নয়? কী তাহলে হতে পারে, কী জবাবদিহি আমি প্রফেসারের কাছে দিতে পারি? কোনো কথাই তো আমার বিশ্বাসযোগ্য হবে না! আর হাঁটতে হাঁটতে সন্ধ্যার মধ্যে আমি ফিরবোই বা কেমন করে? মাঝি অনেকক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করে চলে যাবে, কোনমতে নদীর ধার পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলেও আজ রাত্রের মধ্যে পার হতে পারবো না, জঙ্গলের মাঝেই সারা রাত কাটাতে হবে। তারপর এদিকে যে জানোয়ারের ভয় আছে শুনেছি, জীবন নিয়ে ফেরাই হয়তো আর যাবে না। এ কী বিড়ম্বনার মধ্যে আমি পড়লাম!

নিমেষের মধ্যেই এতগুলো কথা একসঙ্গে ভাবা হয়ে গেল। বোঁ বোঁ করে মাথাটা ঘুরতে লাগলো, কপালে আমার ঘাম দেখা দিল, গলা শুকিয়ে উঠলো। কিন্তু সাইকেলটার কী গতি হলো, খোঁজ করে দেখতে হবে তো! আমি আবার বাড়িটাকে প্রদক্ষিণ করে প্রত্যেক ঝোপের কাছে সন্ধান করতে লাগলাম। একদিক ছেড়ে অপর দিকে গিয়ে দেখি একটা ঝোপের গায়েই সাইকেলটা হেলানো রয়েছে, যেমন রেখেছিলাম

তেমনি। চারিদিকে চেয়ে বুঝলাম ভুলটা আমারই, ঐ বাড়িটার দরজা খুঁজতে এদিক ওদিক করায় আমার দিকভ্রম হয়ে গিয়েছিল, যেদিকে প্রথমে রেখেছিলাম তার অন্যদিকে সন্ধান করছিলাম। আমার লক্ষ্য করা উচিত ছিল যে ঐদিকে একটা মস্ত মেহগিনি গাছ রয়েছে, কিন্তু অন্য দিকে তা নেই।

নিজের মনেই হাসতে হাসতে আমি সাইকেল নিয়ে আবার রাস্তায় গিয়ে পড়লাম। যেখানে জনমানব নেই, সেখানেও চুরির ভয়! মানুষ বুদ্ধিমান হয়েও সময় বিশেষে এমনি বোকা বনে যায়। এই সব অবস্থাতেই লোকে ভূতের অস্তিত্ব কল্পনা করে।

যদিও ক্ষণেকের জন্যেই অমন অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু নিশ্চিন্ত হবার পরেই তার ফলে খুব একটা অবসাদ এসে পড়লো। তখন মনে হলো আর ঘোরাঘুরি করে কাজ নেই, এবার একটু বিশ্রাম নিলে হয়। ঐ মোড়ের একটু পরেই একটা সাঁকোর মতো রয়েছে, তার নিচে একটি শীর্ণ জলস্রোত অসংখ্য উপলখণ্ডের অন্তরাল দিয়ে বেঁকেচুরে বয়ে চলেছে। ঐ সাঁকোর দুই পাশে রয়েছে দুটি শান-বাঁধানো চমৎকার বসবার জায়গা, তার পিঠ রাখবার ঠেস দুটিও ঢালু করে বাঁধানো। শুধু তাই নয়; ঠেস দুটিতে বাহার আছে, খানিকটা কোণা বের করে উর্ধ্বোত্থিত হাতীর শুঁড়ের মতো তার অলঙ্করণ করা হয়েছে।

সাইকেলের হাণ্ডেলের অংশটা ঐ শুঁড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে আমি রুমাল দিয়ে ধুলো ঝেড়ে শানের ওপর বসে পড়লাম। বেলা একটু একটু করে পড়ে আসছে, সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে, পাহাড়গুলোর কতকটা অংশ আলোয় ঝিকমিক করতে থাকে, কতকটা জায়গায় ছায়া পড়ে অন্ধকার দেখায়, তার কোলের কাছের ঝোপঝাড়ের মধ্যে বেগুনি রঙের একটা ধোঁয়ার মতো কী যেন ছড়িয়ে পড়ে। পাথরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে নিচেকার শীর্ণা স্রোতবতী একটানা জলতরঙ্গ বাজতে থাকে, কলহ-নাদিনী প্রচণ্ডস্বরা গৃহিণীর মতো নয়, অস্ফুটগীতগুঞ্জরিণী ক্ষীণস্বরা বধূটির মতো। আর কিছু নয়,—সুমুখে রয়েছে সেই মেহগিনির গাছ, তার পিছনেই রয়েছে সেই ক্লাব ঘর, কানে শুনছি সেই মৃদুমৃদু জল-কলধ্বনি, চোখে দেখছি দিগন্তবিস্তৃত বনপর্ব্বতের অবারিত সৌন্দর্য,—এতেই খুশি হয়ে উঠে আমি পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালাম। গভীর আরামে সিগারেটের ধোঁয়াটা গলাধঃকরণ করতে করতে নিজের কাছেই স্বীকার করলাম যে জায়গাটা যথার্থই খুব লোভনীয়, কয়েকজনে মিলে কলোনি করে বাস করবার পক্ষে খুবই উপযুক্ত, যদি অবশ্য খাবার পরবার বেশ সংস্থান থাকে। এই তো জায়গাটা এমনিই অযত্নে পড়ে রয়েছে. খুব সস্তা দরেই হয়তো কিনে নিতে পারা যায়। হাতে কিছু টাকা থাকলে বেশ হতো।

বসে থাকতে থাকতে কখন অন্যমনা হয়ে গেছি। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে চেয়ে দেখি নিচেকার মোড় পেরিয়ে একটা মিলিটারি লরি আসছে। নিমেষের মধ্যে সেটা আমার কাছে এসে পড়লো, পলক ফেলতে না ফেলতে অদৃশ্য হয়ে চলে গেল। ড্রাইভারের পাশে বসেছিল একজন গোরা সৈনিক, ওরই মধ্যে সে

আমার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে একবার চেয়ে নিলে। লরি চলে যাবার পরে সমস্ত রাস্তাটাকে আচ্ছন্ন করে বিস্তর ধুলো উড়তে লাগলো।

ধীরে ধীরে ধুলোটা যখন অনেক কমে গেল তখন তফাতের মোড়ের দিকে চেয়ে দেখি সেই দিক থেকে আবার যেন একটা ধোঁয়ার রেখা অগ্রসর হয়ে আসছে। এটা কিন্তু ধুলো নয়, প্রকৃতই ধোঁয়ার মতো, ক্রমশ সেটা আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। দেখতে দেখতে মনে হলো একটা মানুষ যেন মুখ থেকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আসছে। নিরীক্ষণ করে থেকে একটু পরেই বুঝলাম, মানুষই বটে, প্রচুর ধূমপান করতে করতে খুব মন্থরপদে আসছে। আরো কাছে যখন এসে পড়লো তখন দেখলাম সাহেবের মতো পোষাক পরা একজন ক্ষীণকায় মানুষ, হাতে আছে একটা লাঠি, পিছনে একটা কুকুর। খুবই কাছে যখন এলো তখন দেখি এক অশীতিপর বৃদ্ধ সাহেব, তার পিছু পিছু আসছে ওরই মতো শীর্ণকায় একটা লম্বা গ্রেহাউণ্ড। সাহেব অনবরত একটা পাইপ টানছে, তাই থেকে অতো ধোঁয়া উদ্গীরণ হচ্ছে।

অবাক হয়ে আমি দেখতে লাগলাম, সাহেব লাঠির ওপর ভর দিয়ে ঠুক্‌ঠুক্‌ করতে করতে আমারই কাছে আসছে। হাতগুলো শির বের করা, মুখের চামড়া শতস্থানে কুঁচকে খাঁজ হয়ে গেছে, গলার চামড়া লোল হয়ে ঝুলছে, পরণের প্যাণ্ট কোট ঢলঢল করছে, মাথায় রয়েছে সেকেলে ধরণের প্রকাণ্ড সোলার টুপি। কব্জির কাছে শার্টের সাদা কাফ্, গলায় সাদা কলার, কাচিয়ে কাচিয়ে তার কিনারা থেকে অসংখ্য ছেঁড়া সুতোর ফুঁপি বেরিয়ে পড়েছে। পাইপে টান দিতে দিতে তার গালে বারবার প্রকাণ্ড রকমের টোল খেয়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে সে সজোরে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করছে। সাহেবের ঠোঁট দুটো থেকে থেকে নড়ছে, হয়তো আপন মনে কিছু বকতে বকতে আসছে।

আমার কাছাকাছি এসেই সাহেব দাঁড়িয়ে গেল, ভুরু দুটোকে যথাসাধ্য কুঞ্চিত করে আমার দিকে চেয়ে রইল। কী যে সেই চোখের অতলস্পর্শ দীপ্তি, কী তার অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণতা! সেই দৃষ্টিকে সরাসরি আমার চোখের ভিতর দিয়ে প্রেরণ করে আমার সমস্ত সত্তাকে যেন একচোট ভেদ করে নিয়ে সাহেব খনখনে-ভাঙা গলায় বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বললে—"তুমি এখানে বসে আছ কে হে ছোকরা?"

আমি খুব বিনম্র কণ্ঠেই বললাম—"কেউ নই, এমনি বেড়াতে এসেছি এখনই চলে যাবো।"

—"হাঁ গো মাই ডিয়ার ল্যাড, তুমি যে অচেনা মানুষ তা আমি বিলক্ষণই জানি। কিন্তু আপন জায়গা হলে কি অমন করে ওখানে সাইকেল ঠেসিয়ে রাখতে? পরের জিনিষ পেয়েছো কিনা, তাই কোনো দরদ নেই।"

—"আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু ওটা এত সহজে ভাঙবে না। আপনি বুঝি এইখানেই থাকেন? এ-জায়গাটা কি আপনারই সম্পত্তি?

সাহেব কানের কাছে একটা হাত কোষার মতো আড়াল দিয়ে বললে—"চেঁচিয়ে বলো, আমি কানে একটু কম শুনি। ওখানে আর কখনো অমন করে সাইকেল রেখোনা।"

আমি এবার চেঁচিয়ে বললাম—"আচ্ছা আমাকে এবারকার মতো ক্ষমা করুন। কিন্তু আমি জানতে চাইছিলাম এখানে কোন্ বাড়িটায় আপনি থাকেন? বাসের উপযুক্ত একখানা বাড়িও তো এখানে দেখলাম না।"

সাহেব নিঃশব্দে লাঠি উঁচিয়ে আমার ঠিক পিছনের দিকটায় নির্দেশ করলে। আমি ঘাড় ফিরিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম, সত্যিই তো, অনতিদূরে চমৎকার একখানি বাংলো বাড়ি। আশ্চর্য কথা, এতক্ষণ পর্যন্ত ওদিকে আমার নজরই পড়েনি। সুন্দর বাংলো, দরজা জানলা সমস্তই রয়েছে, দরজায় পর্দা ঝুলছে। বাড়িটার চারিদিকে অনেকখানি জমি ঘিরে আছে নানারকম ফুলের বাগান, শাকসব্জির বাগান। সুমুখে বড়ো বড়ো সূর্যমুখী ফুল ফুটে আছে, একপাশে খানিকটা চষা জায়গায় কপির চারা গজিয়েছে। আশেপাশে কয়েকটা মুরগি চরছে।

এই সমস্ত দেখে নিতে কিছুক্ষণ সময় লাগলো। তখন সাহেবের দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু অপ্রস্তুত হয়েই আমি বললাম—"ও দিকটাতে আমি মোটে চেয়েই দেখিনি।"

সাহেব বললে—"ওদিকে না চেয়ে থাকো, সুমুখের দিকে চেয়েই তো বসেছিলে মাই ল্যাড্। ঐ গাছটার গায়ে বড়ো বড়ো অক্ষরে কী লেখা রয়েছে তাও কি চোখে দেখতে পাওনি? তোমার মতো এই বয়সে দৃষ্টিশক্তিটা আরো কিছু প্রখর হওয়া উচিত ছিল।"

সাহেব আবার লাঠি দিয়ে মেহগিনি গাছের দিকে ইঙ্গিত করলে। সেই ইঙ্গিত অনুসরণ করে চাইতেই দেখলাম গাছের গুঁড়িটার মাথায় একটা কাষ্ঠফলক পেরেক দিয়ে ঠুকে লাগানো রয়েছে, তাতে লেখা আছে—"ম্যানেজারস্ বাংলো"। সাদা রঙের ইংরেজী অক্ষরগুলো যদিও খুব অস্পষ্ট হয়ে গেছে, তবু এখনো চেষ্টা করলে পড়া যায়। সাইকেল হারাণোর ব্যাপারে হয়তো একটু বিভ্রান্ত হয়েছিলাম, তাই এটাও আমার লক্ষ্য হয়নি।

কিন্তু সাহেবের শ্লেষবাক্যের একটা জবাব দিতে হবে, তার সঙ্গে একটু আলাপ জমিয়ে নিতে হবে। তাই আমি বললাম—"এখানে কোনো লোক থাকেনা বলেই জানতাম, তাই ওসব দিকে হয়তো আমি খেয়ালই করিনি। কিন্তু বারে বারে আপনি আমাকে ল্যাড্ বলে সম্বোধন করছেন কেন? হয়তো আমার চেহারা দেখে আপনি ঠাহর করতে পারছেন না, কিন্তু আমি নেহাৎ ছোকরা নই, যথেষ্টই আমার বয়স হয়েছে।"

—"কত বয়স হলো তোমার শুনি!"

—"তা পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে।"

সাহেব শ্লেষ্মাজড়িত খন্‌খন্ শব্দে একটা অদ্ভুত রকমের হাসি হেসে উঠলো! গুটি দুইমাত্র হল্‌দে দাঁত বের করা সেই হাসিটা দেখতেও অতি বিকট, তার মধ্যে হাস্যরসের চিহ্নমাত্র নেই। তেমনি ভাবে হাসতে হাসতে সে বললে—"ওন্‌লি ফিফ্‌টি? তাই খুব যথেষ্ট হলো তোমার মতে? হিটলার সাবালক হয়ে কত বয়সে

যুদ্ধ শুরু করেছিল তা জানো? পঞ্চাশ বছর পার হয়ে যাবার পরে। আমি যখন বিয়ে করে আমার প্রথম বৌকে সঙ্গে নিয়ে এখানকার ম্যানেজারি করতে আসি, তখন আমার বয়স কত ছিল তা জানো? ঠিক তোমার মতোই ওন্‌লি ফিফ্‌টি। সে হয়ে গেল আজ প্রায় চল্লিশ বছরের কথা তারপর সে বৌ আমার মরে গেল, আবার একটা বিয়ে করলাম, তারও আবার একটা মেয়ে জন্মালো। আমার চোখের সামনে এই কোম্পানির দেখতে দেখতে কত উন্নতি হলো, তারপর আবার অবনতিও হতে লাগলো, ক্রমে ক্রমে কোম্পানি ফেল মেরে ব্যবসা গুটিয়ে নিলে। কিন্তু আমি সেই অবধি এখানেই থেকে গেলাম, এ দেশের মায়া কাটাতে পারলাম না। এখনো দেখছো বেঁচে আছি, আশাকরি আরো কিছুকাল এমনিভাবে বেঁচেই থাকবো। পঞ্চাশ আবার বয়স?"

—"আপনি কি এখানে একা একাই থাকেন?"

"না না, একা থাকবো কেন? ঐ যে আমার সেই মেয়ে থাকে সঙ্গে, এখন সে খুব ডাগর হয়েছে। সে ঐ বাড়ির মধ্যেই আছে। বিদেশে এই জঙ্গলের মধ্যে কেমন করে একা বাস করা সম্ভব?"

—"আপনার দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় না?"

—"সিভিলিজেশনের দেশে? ইচ্ছে হতে পারতো হয়তো, কিন্তু আগেকার আমলের সে সভ্যতার কিছুই তো এখন নেই, এখনকার দিনের সভ্যতা মানেই কেবল মারামারি আর কাটাকাটি। আমার সঙ্গে তার কোনোই মিল হবে না, তার চেয়ে এখানেই আমি থাকি ভালো। জায়গাটা আমাকে খুব স্যুট করে। তা ছাড়া আজকালকার অন্তঃসারশূন্য লোকজনদের কাউকেই আমার ভালো লাগে না, এখানে নির্জনে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা যায়। আগে আগে বাইরের খবর বরং একটু আধটু রাখতাম, কিন্তু এখন চোখেও তেমন দেখতে পাই না, কাগজও আর পড়ি না, দুনিয়ার কোনো খবরই আর রাখি না। তবু তো আমি বেশ আছি।"

—এখানকার সমস্ত জায়গাটাই বুঝি এখন আপনার সম্পত্তি? ইচ্ছে করলে একটু আধটু বেচতেও পারেন?"

—"না না, এ-সমস্তই সরকারের জায়গা। আমি কেবল ঐ বাড়িটুকু আর চারিপাশের খানিকটা মাত্র জমি কোম্পানির কাছে নিয়ে নিয়েছিলাম, ঐটুকুই আমার নিজের। এত বড় জায়গা নিয়ে আমি কী করবো? তুমি বুঝি ভাবছো আমি মস্ত একটা জমিদার? তা নয় হে বাপু, তা নয়, আমি হচ্ছি এখন চাষা। তোমাদের দেশের এই মাটিতে সামান্য একটু জমি নিয়ে চাষ করতে জানলে বারো মাস ফসল পাওয়াও খুব সহজ, আর গোয়ালে জানোয়ার পুষতে জানলে দুধ ডিম মাংস মেলাও খুব সহজ। আর চাই কি? জীবন তো এই নিয়েই স্বচ্ছন্দে কেটে যায়। তোমারও এই সব দেখে শুনে লোভ হয় কিনা তাই বলোতো?"

আমি কী একটা বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ পিছনের বাংলোটায় পিয়ানোতে বেজে উঠলো অপূর্ব একটা নাচের সুরের বাজনা। সঙ্গে সঙ্গেই হতে লাগলো দুটি সম্মিলিত কণ্ঠের গান—একটি ভারী

রকমের পুরুষ কণ্ঠ, একটি কোমল নারীকণ্ঠ। দুজনে যেন পিয়ানোর বাজনার তালে তালে নাচছে এবং গাইছে। কী চমৎকার একটা নতুন ধরণের সুর। কিন্তু গানের উচ্চারণগুলো শুনতে শুনতে মনে হলো যেন বাংলা ধরণের, কথাগুলো নিশ্চয় কোন বাংলা গানের। একটু কান পেতে শুনলাম, ঠিক বোধ হলো যেন বারে বারে ওরা বলছে—"তুলনা তার নাই, মরি তুলনা তার নাই।" ঘুরে ঘুরে কেবলই ঐ এক কথা বলছে আর তালে তালে নাচছে। কার তুলনা নাই, কিসের এই তুলনা? ওরা বুঝি কোন আনন্দের কথাই অমনি নেচে গেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলছে? হঠাৎ মনে পড়তে লাগলো, এই কথাগুলো যেন আগেও কোথায় শুনেছি। হাঁ শুনেছি তো বটে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে—"যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।" কিন্তু সে তো কাব্য, সে কথাগুলো এরা কেমন করে জানলে, তাতে কেমন করে এমন সুরটি লাগিয়ে দিলে? বাংলা কবির কথার সঙ্গে ইংরেজি ছন্দ আর সুর মিশে অপূর্ব এক সমাবেশ ঘটেছে তো!

আমি সচকিত হয়ে উঠে সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনার বাংলোর মধ্যে পিয়ানো বাজিয়ে কারা অমন চমৎকার গান গাইছে?"

আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে সাহেবের মুখখানা এতাবৎ একটু খুশিই হয়ে উঠছিল, তার প্রথম বিরক্তির ভাবখানা ক্রমশ কেটে গিয়েছিল। কিন্তু আমার এইকথা শোনবামাত্রই সেই মুখ যেন সম্পূর্ণ বদলে গেল, ক্রোধে বিরক্তিতে সমস্ত মুখমণ্ডল নিরতিশয় বিকৃত হয়ে উঠলো। ঠোঁট দুটোকে কাঁপাতে কাঁপাতে সাহেব বললে—"যেমনি একটু চোখের আড়াল হয়েছি অমনি আবার শুরু করেছে? ভেবেছে আমি শুনতেই পাবো না। পাজি বদমাশ রাস্কেল ওরা দুটোতেই, ঐ আমার মেয়ে লুসি. আর সেই ডেঁপো চার্লি ছোঁড়াটা। মনে করেছে আমি বেড়াতে গিয়ে এখনো ফিরিনি, আর কানেও তো কম শুনি, নির্ভয়ে তাই নাচগান লাগিয়ে দিয়েছে, যা আমি একেবারেই অপছন্দ করি। অবশ্য লুসির তেমন দোষ দিতে পারি না, এসব নাচগান ও মোটে জানতোই না, কিন্তু যত দোষ হচ্ছে ঐ ছোঁড়াটার। বিলেতের আমার ছেলেবেলাকার এক বন্ধুর ছেলে, এ দেশে বেড়াতে এসেছিল, তারপর আর এখান থেকে নড়তেই চায় না। সেই তো এসব অসভ্যতা শিখিয়েছে। লুসির হচ্ছে কাঁচা বয়স, কারো সঙ্গে দুটো কথা বলতে পায় না, দেশের ইয়ংম্যানকে কাছে পেলে সে তো একটু ভাবসাব করবেই। কিন্তু ওর আক্কেলটা কী? আসলে ওর ইচ্ছে লুসিকে সঙ্গে করে বিলেত নিয়ে যাবে, কিন্তু তা আমি কিছুতেই হতে দেবো না। হাজার বার বলে দিয়েছি যে লুসি হচ্ছে আমার ঘরে থাকবার মেয়ে, তাকে আমি নিজের হাতে সেইজন্যেই এতটা বড়ো করে তুলেছি, শেষ পর্যন্ত সে আমারই কাছে থাকবে। আমি মরে গেলে তখন যা ইচ্ছে হয় তাই করবে, কিন্তু ততদিন পর্যন্ত সে আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব, ওর দিকে নোংরা হুলো বাড়ানো চলবে না। ঐ তো জগতে আমার একমাত্র সম্বল, আর আমার কে আছে? হাজার বার বলে দিয়েছি যে লুসিকে আমি কিছুতেই ছাড়বো না, ওর সঙ্গে বেশি মাখামাখি কোরো না, মেয়েটাকে নাচিয়োনা, ভদ্রতার সীমা-রেখে চলো। কিন্তু এসব বললে কী হয়, যেমনি একটু ফাঁক পেয়েছে অমনি যত বেহায়া বেলেল্লাগিরি! দেখাচ্ছি এবার মজা। লুসি! লুসি! লুসি!"

সাহেব তারস্বরে তিনবার চীৎকার করে উঠলো। বৃদ্ধ হলে কী হয়, কণ্ঠস্বরে কিছুমাত্র বার্ধক্যের

লক্ষণ আর নেই। সুতীব্র সেই চীৎকারের শব্দ বহুদূর পর্যন্ত চলে গেল, পাহাড়ের গায়ে গায়ে লেগে চতুর্দিক থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। দেখলুম সাহেব এবার থেমে উঠেছে, সমস্ত অঙ্গ থর্ থর্ করে কাঁপছে।

পিয়ানোর বাজনা আর গানের সুর তখন থেমে গেল। চারিদিকে উঁকিঝুঁকি মেরে একটি সুন্দরী তরুণী বাংলো থেকে বেরিয়ে এলো। "আমায় ডাকছো বাবা?"—বলতে বলতে মেয়েটি বরাবর আমাদের কাছে এসে হাজির হলো। কচি কচি সুগোল মুখখানি তার দুষ্টামিতে মাখানো। হাজার ভালোমানুষির মুখোশ লাগালেও সেই দুষ্টামির ছটা চোখ দিয়ে ফুটে বেরিয়ে পড়ে। সেই অপরূপ চোখ দুটির তারা খঞ্জনের মতো অস্থির, অনবরতই যেন নেচে বেড়াচ্ছে। কানে আছে আরব-বেদুইনের মতো দুটি কাঁচকড়ার বড়ো বড়ো চক্রাকৃতি কর্ণবলয়, গলায় আছে হলুদবর্ণ টিবি টিবি পুঁতির মালা, প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সেগুলোও যেন ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে নেচে উঠছে। যৌবন-লাবণ্য তার অঙ্গে অঙ্গে উচ্ছ্বলিত, স্কার্ট ব্লাউজের আবেষ্টন তাকে সীমার মধ্যে এঁটে রাখতে পারছেনা। নাচবার সময় চুলগুলোকে সামলে রাখবার জন্যেই বোধ হয় জিপ্সিদের মতো একখানা লাল রুমাল দিয়ে মাথাটা তাড়াতাড়ি কোনরকমে তেৎছা করে বেঁধে নিয়েছিল, কিন্তু অবাধ্য চুলগুলোও তার ফাঁক দিয়ে গুচ্ছে গুচ্ছে মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ফাঁকি দেবার বাহাদুরি দেখাচ্ছে। আর উদ্ভিন্ন দুটি শুভ্র পেলব পদ্মকোরকের মতো স্তনাভাসদায়ী যেটুকু বক্ষমাংস ব্লাউজের গণ্ডী অতিক্রম করে উপর দিকে ঠেলে উঠেছে, তাও যেন ওর পদক্ষেপের ছন্দে ছন্দে আন্দোলিত হয়ে কোন দুর্বোধ্য দুষ্টামির খুশিতেই নেচে নেচে উঠছে।

একান্ত নির্ভয়ে মেয়েটি সাহেবের কাছে এগিয়ে গেল, পরম নিঃসংকোচে দুই হাত দিয়ে সাহেবের হাতখানাকে লাঠিসমেত চেপে ধরলে, এবং তৎক্ষণাৎ তাকে বাড়ির দিকে টানতে টানতে বললে—"এখানে দাঁড়িয়ে অমন করে ডাকছো কেন বাবা, চলো চলো বাড়িতে চলো, দেখবে চলো কী একটা মজার জিনিস এসেছে।"

সাহেবের রাগের উষ্মা তাতেই তখন অর্দ্ধেক জুড়িয়ে গেছে। তবু সে তার মাত্রাটাকে যথাসম্ভব বজায় রেখে মুখখানাকে খিঁচিয়ে মিচিয়ে বললে—"হাত ছেড়ে দে লুসি, ওসব বাজে কথা আমি শুনতে চাই না। আমি যে ওর সঙ্গে তোকে নাচতে গাইতে এত মানা করেছিলাম, তুই তবুও কেন তাই আবার করছিলি, সে কথার আগে জবাব দে।"

—"সেই কথাই তো বলছিলাম বাবা, তুমি না দেখলে তা বুঝতে পারবে না। সেই যে নদীচরের নীল হাঁসগুলো, যা গুলিতে মারা ভারী শক্ত, যার মাংস তুমি খেতে খুব ভালবাসো, সেই একটা গোটা হাঁস চার্লি মেরে এনেছে তোমার জন্যে, বুঝলে বাবা? আমি দুদিন ওর সঙ্গে মোটে কথাই বলিনি, তুমি যে বারণ করেছিলে, তাই। চার্লি আজ করলে কি, ভোরে উঠেই বন্দুক নিয়ে বেরিয়েছিল, সারাদিন কিছু খায়নি, এখন হঠাৎ হাঁসটা মেরে এনে হাজির করলে। তখন আর কথা না কয়ে কী করি বলো? হাঁসটা দেখেই আমি ওর সঙ্গে পরামর্শ করলাম যে বাবাকে এবার চমক লাগিয়ে দিতে হবে। হাঁসের কথা আগে বলাই হবেনা। আমরা খুব নাচগান করি এসো, বাবা যখন তাই

দেখে ভীষণ রেগে উঠবে, তখন আমরা হাঁসটা এনে নাকের ডগায় হাজির করে দেবো। বাবা তাই দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে যাবে, রাগ-টাগ কোথায় ঘুচে যাবে। আমরা ত ইচ্ছে করেই বাজনা বাজিয়ে নাচছিলাম, তোমাকে রাগাবা'র জন্যেই তো। এই চার্লিকেই জিজ্ঞাসা করোনা, সত্যি বলছি না মিথ্যে বলছি!"

ইতিমধ্যে একটি সুবেশ সুসভ্য সুদর্শন ইংরেজযুবক হাত কচলাতে কচলাতে লুসির পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে তার এমন একটা সলজ্জ হাসি যে দেখলেই মনে হয় যেন নিতান্ত গোবেচারা ভালোমানুষ। কিন্তু বৃদ্ধ সাহেব ওর দিকে আর চেয়েই দেখলে না, ওকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবার ফুরসুৎই নেই। হাঁসের নাম শুনেই তার রসনা লোলুপ হয়ে উঠেছে, সেটা দেখবার জন্যে সে ব্যাকুল। ব্যগ্র হয়ে লুসিকে জিজ্ঞাসা করলে—"কৈ কৈ, কোথায় হাঁস? কতটা মাংস হবে বলতো?"

লুসি ততক্ষণে বাপের হাত ছেড়ে তার দুটি কাঁধে হাত দিয়েছে। নিতান্ত নিরীহের মতো বললে—"সে বুঝি যেখানে সেখানে ফেলে রাখবো? যত্ন করে বারান্দাতে দড়ি বেঁধে টাঙিয়ে রেখেছি। দেখোগে না, ঠিকপুরো একসের মাংস হবে, বেশী তো কম নয়। তোমার দুদিন খাওয়া হবে। আর শোনো বাবা, তুমি বাড়ির ভেতর গিয়ে হাঁসটা দেখোগে, আমরা ততক্ষণ চট্ করে ঐ মোড়ের কাছ পর্যন্ত একটু বেড়িয়ে আসি, কেমন? সমস্ত দিন ঘরে বসে বসে পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে গেছে, চার্লিও তো বাড়ি ছিলনা। ওকে সঙ্গেই নিয়ে যাই, একা যাওয়া ঠিক নয়, কেমন? যাই? যাই বাবা? তুমি তো বেড়াতে যেতে কোন আপত্তি করোনা। যাই তাহলে? এবার আর রাগ করবে না তো? তোমার অনুমতি নিয়েই যাচ্ছি।"

সাহেবের তখন হাঁসের দিকেই মন পড়ে আছে। সে বললে—"আচ্ছা যেতে পারো, কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসবে।"

—"আচ্ছা তুমি ঘড়ি দেখে রাখো দশ মিনিটও আমাদের লাগবেনা।"

খুশি হয়ে বৃদ্ধের গলাটা জড়িয়ে ধরে লুসি টাটকা গোলাপদলের মতো ঠোঁট দুটি দিয়ে তার সেই শুকনো দুই গালে চুম্বন করলে। বৃদ্ধও তখন খুশি হয়ে মাথাটা কাঁপাতে কাঁপাতে বাংলোর দিকে অগ্রসর হলো। গ্রেহাউণ্ড কুকুরটা ধীরে ধীরে তার পশ্চাদ্‌গামী হলো।

যেমনি সাহেব পিছু ফিরেছে, অমনি প্রচুর হাসতে হাসতে লুসি হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললে ইংরেজ যুবকের একখানা হাত। হাতখানাকে ধরে জোরে দোলা দিয়ে সে যেন একটা গতিবেগ দিয়ে দিলে। তারপর দুজনে হাত ধরাধরি করে সেই ঢালু পথ দিয়ে ওরা গান গাইতে গাইতে বালকবালিকার মতো ছুটতে লাগলো—সেই একই আশ্চর্য গান—"তুলনা তার নাই, তুলনা তার নাই।" একটু পরেই দেখলাম, ওরা কেবল ছুটছে না, ছুটতে ছুটতে লাফিয়ে লাফিয়ে রীতিমত নৃত্য করছে। নাচতে নাচতে ওরা ক্রমে মোড়ের কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তখন আমার চোখের সুমুখে ধীরে ধীরে একটা ছায়া পড়ে এলো। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম, সূর্য আরো নেমে গেছে, পাহাড়ের যে অংশটা এতক্ষণ আলো ছিল তারও অন্তরালে সূর্য চলে গেছে, সেইজন্যেই ছায়া পড়লো। অকস্মাৎ তখন মনে হলো, আর এক্টুও দেরী করা চলবেনা, এবার আমাকে ফিরতে হবে। উঠে দাঁড়িয়ে কী ভেবে পিছনের বাংলোটার দিকে একবার চাইলাম। আশ্চর্য, সেখানে আর বাংলোও নেই, কিছুই নেই। সব ফাঁক। সুমুখের গাছের দিকে চেয়ে দেখি, সেখানে কিছুই লেখা নেই। শুধু তাই নয়, ও গাছটাই আসলে মেহগিনির গাছ নয়; ওটা একটা সিসু গাছ, আগে দেখেও চিনতে পারিনি। মিথ্যে, মিথ্যে, তাহলে এ সমস্তই ডাহা মিথ্যে কথা!

পারানি-নৌকোয় যখন নদী পার হচ্ছি তখন চাঁদ উঠে গেছে, নদীর জলটা তার আলোতে রূপালী টিস্থর শাড়ির মতো ঝলমল করছে। মাঝি আমার কাছে একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরিয়েছে। ভাবলাম এও মিথ্যে, এখন বুঝতে পারছিনা, কিন্তু পরে বুঝবো। যখন যে অবস্থায় থেকে যা কিছু দেখি তাই মনে করি সত্যি, কিন্তু তারপর অবস্থা বদলে গেলেই বোঝা যায় যে সব মিথ্যে।

বাড়িতে যখন ফিরলাম তখন দেখি বারান্দায় স্টোভ জ্বেলে মুরগীর মাংস চড়েছে। শ্রীমতী ঘোষজায়া তার তদারক করছেন। হিরন্ময় বাবু খুন্তি নাড়ছেন, লণ্ঠনের আলোতে তাঁর হাতের হীরের আংটিটা ঝকমক করছে। তিনু বেচারা বাজার খরচের হিসেব নিয়ে লণ্ঠনের কাছে ঝুঁকে পড়েছে, কিছুতেই তার হিসেব মিলছেনা। সেই কালো কুকুরটা বারান্দার নিচে ঠায় নিশ্চল হয়ে বসে আছে।

এতক্ষণ সবাই চুপচাপ ছিল, আমি যেতেই সকলে একসঙ্গে মুখর হয়ে উঠলো। কোথায় ছিলুম এত রাত পর্যন্ত? এখনই আসছি বলে এত দেরী? সবাই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল, সকলেরই ভাবনা হচ্ছিল আমার জন্যে। আমি একটু হাসলাম। মনে মনে ভাবলাম, এও কি মিথ্যে!

সুচরিতা কহিল, আপনিও কি কোন দলের লোক নন?

গোরা কহিল, আমি হিন্দু। হিন্দু তো কোন দল নয়। হিন্দু একটা জাতি। এ জাতি এত বৃহৎ যে কিসে এই জাতির জাতিত্ব তা কোন সংজ্ঞার দ্বারা সীমাবদ্ধ করে বলাই যায় না। সমুদ্র যেমন ঢেউ নয়, হিন্দু তেমন দল নয়।

সুচরিতা কহিল, হিন্দু যদি দল নয় তবে দলাদলি করে কেন?

গোরা কহিল, মানুষকে মারতে গেলে সে ঠেকাতে যায় কেন? তার প্রাণ আছে বলে। পাথরই সকল রকম আঘাতে চুপ করে পড়ে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সন্ধানী

শ্রীমতী বাণী রায়

'প্রোসারপিনা, অনির্ব্বাণ দীপ কেবল তোমার ধরিত্রী মাতা সেরিসের হস্তেই জ্বলে নাই। রসাতলের রাজা প্লুটোর অপহৃতা সুন্দরি, অনির্ব্বাণ মশাল জ্বালাইয়া তোমার মাতা তোমার সন্ধানে ফিরিয়াছিলেন। সে সন্ধানের শেষ হইল ধরিত্রীর বসন্তে। কিন্তু হায় প্রোসারপিনা, আমার সন্ধানের শেষ নাই। সেরিসের হাতের অনির্ব্বাণ শিখা আমার অন্তরে জ্বলিতেছে চিরকাল।'

রজত আমার দিকে চাহিয়া ছিল না, কোনদিনই সে থাকে না। তবু তাহার চুরোটিকা-চুম্বনকারী নির্ব্বাক অধরোষ্ঠ হইতে ওই কথাগুলি যেন আমার দিকে ভাসিয়া আসিল। সিগারেটের নীল ধূম্রজাল ভেদ করিয়া ঈষৎ কপিশ নেত্রতারকায় তাহার জ্বলিয়া উঠিল সেই সন্ধানের আলো, সে আলোকে আমি ভয় করিতে শিখিয়াছি।

"শোন কাঞ্চন, কয়েকদিন একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসতে চাই। আমার হয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে তুমি নোট টোক এখানে পড়ে পড়ে।"

হায় রজত! চিরকালই আমি পড়িয়া থাকি, আজও থাকিব। কিন্তু তুমি কোনদিন আমার নীরব প্রতীক্ষার কথা আভাসেও জানিতে পারিলে না! কতদিন তোমার নিকটে গিয়াছি মনে অসম্ভব সাহস লইয়া। ভাবিয়াছি, আজ আমি অবশ্যই নিজের অন্তর উন্মোচন করিব। আজ আমি চিত্রাঙ্গদার মত আমার পার্থের প্রেমভিক্ষা করিব। চোখে চোখ মিলিয়াছে। সহসা যেন মনে হইয়াছে তুমি আমার বড় আপন, তোমার কাছে লজ্জা আমার নাই। এই মুখ খুলিলাম। একটি নিমেষ মাত্র। সহসা তোমার চোখ যেন আমার প্রতি চাহিয়াও আমাকে দেখিল না। যেন আমার গণ্ডী হইতে তোমার দৃষ্টি বহুদূরে প্রসারিত হইয়া গেল—মিশরের নদীতটে, আরবের বালুকায়। তোমার চক্ষে প্রদীপ্ত আলোক জ্বলিয়া উঠিল। সেই আলোকে ছিন্ন কাগজের মত আমি ভস্মসাৎ হইয়া গেলাম।

রজত, তুমি সন্ধানী। কখনও তুমি ভালবাসার সন্ধান কর, কখনও সাফল্যের। কখনও মনে কর একটি চমৎকার কর্ম্মজীবনই তোমাকে আনন্দ দিতে পারিবে। তুমি জাননা তুমি কি চাও। খুব কম মানুষই জানে তারা কি চায়। যদি জানিত তাহা হইলে সেই বস্তুর সন্ধান করিয়া তাহারা নিজের সুখের ব্যবস্থা নিজে করিয়া লইত। প্রকৃত জ্ঞান তাহারা লাভ করিত, জ্ঞানের ফল স্বরূপ সুখ দূরে থাকিত না।

আমি জ্ঞানি নই, তবু আমি জানি আমি কি চাই। আমি চাই তোমাকে। তোমার হাতেই আমার সুখের সন্ধান আছে।

কলিকাতার অখ্যাত গলিতে পাশাপাশি দুইখানি ছোট বাড়ী, এক আকারের, এক রংয়ের, এক দরের বাড়ী। এক সঙ্গে তোমার এবং আমার বাবা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বন্ধু। সেই বাড়ীতে প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম তুমি ও আমি সামান্য কয়েকমাসের ব্যবধানে। আশ্চর্য্য নয় কি? নাম রাখা হইয়াছিল মিল রাখিয়া, রজত ও কাঞ্চন।

কিন্তু মিলের শেষ ওইখানেই। আকারে প্রকারে এত বৈলক্ষণ্য কেহ দেখে নাই। একসঙ্গে খেলা করিয়াছি, পড়াশোনা করিয়াছি। কিন্তু, এক হইতে পারি নাই। তোমার নামের মর্য্যাদা রাখিয়া তুমি কি হইয়াছ? দাঁড়াও তোমার ছবি দেখি। চুপে চুপে তোমার ছবি আঁকিয়াছি, গোপনে তাহা ডেস্কে লুকাইয়া রাখিয়াছি। রাত্রির জনহীন প্রহরে অনিমেষ নেত্রে তাহা দেখি। প্রতিদিন তোমার সহিত দেখা হয়। কিন্তু, চির-চঞ্চল তুমি, তোমাকে ধরিতে পারি না। তাই রংয়ের বন্ধনে তোমাকে ধরিয়া রাখিয়াছি। ওই চিত্রে অঙ্কিত তুমি একান্তই আমার। তোমাকে দেখিলে মনে হয় ঠাকুর মায়ের মুখে শোনা স্তোত্র—

"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নকল্পোজ্জলাঙ্গম্—"

রজত-গিরি তোমার উপমা, রজত। আমি? দাঁড়াও আমারও ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছি আয়না সম্মুখে ধরিয়া। বিশেষত্ববিহীনা, সাধারণ শ্যামাঙ্গি। চক্ষে আমার রত্ন জ্বলেনা, অধরের হাস্যে গোলাপ ঈর্ষায় পাণ্ডু হয় না। তবু পাশাপাশি দুইখানি চিত্র রাখিয়া চুরি করিয়া দেখিবার লোভ আমার প্রচুর।

একত্রে আমরা মানুষ হইলাম। কিন্তু, রজতকে ছোট দ্বিতল বাড়ী, গলির রাস্তা বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। বৃহৎ জীবনের মহত্ব তাহাকে বহু দূরে, আমার নিকট হইতে দূরে টানিয়া লইতে লাগিল। আমি বড় হইলাম। স্কুল-কলেজে নিয়মিত যাইতাম, বাড়ীতে ঘরের কাজ করিয়া অবকাশ সময়ে ছবি আঁকিয়া সময় কাটাইতাম। রজত চাহিত অন্য কিছু, যাহা তাহার গণ্ডীর বাহিরে, যাহা তাহার দুইখানি শয়নের এবং একখানি বসিবারঘর-ওয়ালা ঈষৎ হলুদ রংএর বাড়ী, খোয়া-ওঠা প্রাচীন গলিপথের কোথাও নাই। কেমন অস্থির ভাবে সে কি যেন খুঁজিয়া বেড়াইত, কখনও উন্মনা হইয়া বিবর্ণ, ধূম্র-মলিন আকাশের ফালির দিকে, চাহিয়া থাকিত। তাহার তাহাই ছিল অসামান্যতা। ভাগ্য তাহাকে যেমন বঞ্চনা করিয়াছে, তেমনি ভাগ্যের নিস্ফল করিবার চক্রান্তে ধরা দিয়া সুশীলা, সাধ্বী শ্যামাঙ্গীর স্বামী হইয়া; রুগ্ন, সাধারণ পুত্রকন্যার জনক হইয়া দিনযাত্রার একঘেয়েমিকে সুখ বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য রজত জন্মগ্রহণ করে নাই। জীবনকে সে নিজের মূল্যে গ্রহণ করিবে ইহাই ছিল তার পণ। শিল্পী চরিত্রের অনুসন্ধিৎসা তাহার চরিত্রে প্রবল দেখিতাম। তাই আমার শিল্পী হৃদয় স্বজাতি জ্ঞানে তাহাকে ভালবাসিত। আমার আত্মা সন্ধান করিত না? তাহার চাওয়ার বস্তু তাহার সম্মুখেই ছিল, সে বস্তু রজত। রজতের বিচিত্র মনের অনুসরণই আমার সন্ধানের রূপ।

আই-এ পাশ করিলাম রজতের একবছর পরে। রজত তখন বি-এ পড়ে। বি-এ পড়িতে পড়িতে রজতের খেয়াল হইল সে শিল্পী-জীবন গ্রহণ করিবে। সুতরাং পড়াশোনা ছাড়িয়া সে আর্ট-স্কুলে ভর্ত্তি হইল। তাহার পিতা ধনী না হইলেও একমাত্র সন্তান হিসাবে রজতের সমস্ত খেয়ালই প্রশ্রয় পাইত।

আমি চিরদিন চিত্রকলার অনুরাগী। আমার অঙ্কিত ছবির উপর মুরুব্বিয়ানা করিয়া রজত কলাবিদ্যা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিল। আমার সহিত পাল্লা দিয়া জলে রং গুলিয়া রজত কাগজ চিত্রিত করিয়াছে। তাই বি-এ পড়িতে পড়িতে অশান্ত চিত্ত তাহার অন্য কিছু নির্গম পথ খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। সন্ধানী চিত্ত শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক এবং পল্‌গ্রেভের কাব্য সঞ্চয়নে ডুবিয়া রহিল না।

সেদিন রজতকে বলিয়াছিলাম, "বি-এ পড়াটা ছাড়লে কেন রজত? বড় অস্থির তুমি।"

রজত আমার ঘরটির মধ্যে ইতস্তত পদচারণা করিতেছিল, মুখে তাহার জলন্ত সিগারেট। চুল রুক্ষ। অতি প্রশস্ত তুষার-গৌর ললাটে চিন্তিত অন্যমনস্কতার ছায়া। বায়রণের মত প্রেমিক অধর তাহার।

রজত একবার আমার দিকে চাহিল, তারপরে বামহস্তে ললাটের কেশ অপসারিত করিয়া ছাদের কড়ি-বরগার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অতি মৃদু কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "কাঞ্চন, প্রোসারপিনার গল্প জান?"

আমার স্বীকারুক্তি শুনিয়া রজত বলিল, "সেরিমের হাতের মশালের কথা মনে আছে, কাঞ্চন? সেই সন্ধানের মশাল আমার মনে সব সময় জ্বলে। কি চাই বুঝিনা, খুঁজে বেড়াই।" মৃদুকণ্ঠ রজতের আরও মৃদু হইয়া অস্ফুট আবৃত্তিতে নিবৃত্ত হইল—

,—"The soul is fainting
Till she search and learn her own:"

অধোমুখে কাঠের মত বসিয়া রহিলাম। চক্ষে অভিমানে জল আসিল। আমি যে-সন্ধানের মধ্যে নাই সে-সন্ধান আমার পক্ষে অসহ্য পীড়াদায়ক। তবু আমার সুখ ওই নিষ্ঠুর সন্ধানীর হাতে। সুতরাং আমিও তাহার সহিত আর্টস্কুলে ভর্ত্তি হইব। সে সাধারণী পাঠ গ্রহণ করিতেছিল, তাই তাহারি জন্য আমিও আমার প্রকৃত শিল্পীচরিত্রের তাগিদ অমান্য করিয়া আই-এ পড়িতে গিয়াছিলাম। এখন তাহারি জন্য আমিও তাহার পথ,—আমার নিজের পথ,—ধরিলাম।

সেই দিন হইতে বুঝিলাম রজতকে আমি কত ভালবাসি, আর বুঝিলাম আমার প্রতি তাহার প্রেমের একান্ত অভাবকে। সেইদিন হইতে রজতের চক্ষে সন্ধানী আলোর নিশান ওড়া দেখিতে শিখিলাম। অহরহ যেন রজতের মনের অকথিত বাণী শুনিতে লাগিলাম,—'হায় প্রেসারপিনা, আমার সন্ধানের শেষ নাই।'

রজত শিল্পী হইল। দেখিতাম বাড়া চায়ের পাত্র এবং অসংখ্য সিগারেট মুখে ধরিয়া রজতের রাত্রিদিন ছবি আঁকা। স্কুলে যতক্ষণ থাকিত ততক্ষণ চলিত। বাড়ী ফিরিয়াও সে তন্ময়তার বিরাম ছিলনা। একখানি ঘরকে রজত তাহার চিত্রশালাতে পরিণত করিল। একপার্শ্বে পাথরের ত্রিপদীর উপরে তাহার জননী আহার্য রাখিয়া যাইতেন। যখন সময় হইত তখন সে আহার করিত।

সেদিন ছিল রজতের জন্মদিন। সকাল বেলা তাহার প্রিয় খাদ্য বাঁধাকপির পায়েস ও রাধাবল্লভী

নিজহাতে তৈরী করিয়া মুখ-ঢাকা পাত্রে দিতে গেলাম। দেখিলাম চিত্রশালায় রজত এধার-এধার খাঁচার সিংহের মত অসহিষ্ণু ব্যস্ততায় পায়চারি করিতেছে। চলাফেরায় তাহার উল্লাস-মত্ততা।

"হেলো কাঞ্চন, ও-কি? দাও খাই। জান কাঞ্চন, আজ কি হবে? মৃগাঙ্ক দত্ত আসবেন আমার ছবি দেখতে আমার এই বাড়ীতে। মিসেস্ ভাটিয়া ঠিক করে দিয়েছেন।" মিসেস্ ভাটিয়া রজতের প্রেমমুগ্ধা বান্ধবী, প্রৌঢ় স্বামীর তরুণী স্ত্রী।

মৃগাঙ্কমোহন দত্ত খ্যাতনামা শিল্পী ও চিত্রসমালোচক। তাঁহার মতামত শিল্প-জগতে অতি মূল্যবান। আমাদের নিকট তিনি দেবতা বিশেষ। সুতরাং পুলকিত হইলাম।

রজত সহজ আত্মপ্রত্যয়ের সহিত বলিয়া চলিল, "কিভাবে ছবিগুলো সাজালে ভাল হ'বে বলতো কাঞ্চন। আজ ওঁর মত শুনে কাল নিশ্চয় বাবাকে যেয়ে বলবো, আমি প্যারিসে যাচ্ছি ছবি আঁকা শিখতে। আমি মৃগাঙ্ক বাবুর সার্টিফিকেট্ পেলে বাবা নিশ্চয়ই বুঝবেন যে আমি চেষ্টা করলে বড় শিল্পী হ'তে পারি। এ দেশ আর ভাল লাগেনা। অন্য কোথাও দূরে চলে যেতে চাই। বেশ হয়েছে খাবার, কাঞ্চন। কিন্তু এত কেন? একটা রাধাবল্লভী খাও তুমি।" বন্ধুর সহজ আগ্রহে রজত আমার মুখে খাবার তুলিয়া দিল।

হৃদয়াবেগ দমন করিয়া বলিলাম, "দেশে থেকে কি বড় হওয়া যায় না রজত?"

"না। আমি পালিয়ে বাঁচতে চাই।"

চিত্রাদি সজ্জিত করিতে করিতে রজত সহসা আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুমিও তো ছবি আঁক, কাঞ্চন। তোমার ছবি ক'খানা নিয়ে এস।"

'তুমিও তো ছবি আঁক কাঞ্চন!' কষ্ট করিয়া রজতের মনে করিতে হয় আমি কি! বলিলাম, "আমার ছবি তোমার পাশে! থাক রজত।" আমার অনিচ্ছাতে তাহার জিদ বাড়িয়া গেল। বাধ্য হইয়া তিনখানি ছবি আনিয়া একপাশে রাখিলাম।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে মৃগাঙ্কমোহন দত্ত দেখা দিলেন। অতি রাশভারী বুলডগের মত মূর্ত্তি। কথাবার্ত্তা কম বলেন। মিসেস্‌ভাটিয়ার সুন্দর মুখের অনুরোধে একটি অপরাহ্ন নষ্ট করিতে হইবে এইভাব তাঁহার নির্লিপ্ত আত্মসমর্পণের। গিলে-করা দেশী ধুতির প্রান্ত এবং আদ্দির পাঞ্জাবীর আস্তিনের সহিত সাদৃশ্য রাখিয়া ক্ষণেক্ষণে ললাটদেশ তাঁহার তরঙ্গিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ঘরটির প্রত্যেকখানি ছবি তিনি নীরবে মনোযোগ দিয়া দেখিলেন। তারপরে দরজার পাশে চেয়ারে বসিয়া রজতের সুশীতল আতিথ্য বরফ-শীতল লিমোনেড, আইসক্রীম সন্দেশ ইত্যাদির সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। একটি দুইটি অতি প্রয়োজনীয় কথা ভিন্ন তখনও তিনি নীরব।

আমার হাত ঠাণ্ডা হইয়া যাইতে লাগিল। রজত আশা করিয়াছিল মৃগাঙ্ক দত্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবেন। ব্যতিক্রম দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলেও সে নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিল। তাই অভ্যস্ত প্রফুল্ল সহৃদয়তার সহিত সে একাই কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিল।

ভৃত্য ভুক্তাবশেষ অপসারিত করিলে মৃগাঙ্ক মোহন মোটা চুরোট ধরাইলেন। রজতের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তারপর, এ লাইনে তুমি এলে কেন?"

রজতের চক্ষে পরিচিত সন্ধানের আলোক জ্বলিয়া উঠিল, ব্যগ্রভাবে সে বলিতে লাগিল, "ভেতর থেকে একটা তাগিদ এসেছিল আমার। কি যেন খুঁজে বেড়াতাম! ছবি আঁকার মধ্যে মন অনেকটা মুক্তি পেয়েছে। একটা আলো যেন—"

বাধা দিয়া মৃগাঙ্ক মোহন অকস্মাৎ মুখর হইয়া উঠিলেন,—"পথ দেখিয়েছে তো? ওসব কথা জানি আমি। কিন্তু, সে আলো তোমাকে ভুল পথ দেখিয়েছে, রজত রায়। জীবনে মাত্র এক-খানিও ভাল ছবি তুমি এঁকে উঠতে পারবেনা। তোমার চোখ নেই, মন নেই। প্রত্যেকটি ড্রয়িং তোমার ভুল হয়েছে, প্রত্যেকখানার রং স্বাভাবিকের বাইরে গেছে। কিন্তু অতীন্দ্রিয়ের রং-ও তুমি ধরতে পারনি। রজত রায়, তোমার ছবি ভালগার।" বিরক্ত উত্তেজনায় মৃগাঙ্কমোহন চুরোটের দ্বারা একের পর এক চিত্র নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন,—"এগুলো কি ছবি হয়েছে, না ছোট ছেলের রং-তুলি নিয়ে খেলা হয়েছে।"

আমার চোখের সম্মুখ হইতে যেন আর একটা ছদ্মচক্ষুর আবরণ খসিয়া পড়িল। সেই নূতন চক্ষে মৃগাঙ্কমোহনের নির্দ্দেশ মত রজতের ছবি দেখিয়া চমকিত হইলাম। হায় মোহ! আমার শিল্পীর চোখ কোথায় ছিল? এই ছবি দেখিয়া কেন বুঝি নাই রজত কখনও চিত্রকর হইতে পারিবে না!

আমার দিকে ফিরিয়া মৃগাঙ্ক বলিলেন, "তুমি আর একটু খাটো। ওই ছবিখানা চমৎকার হয়েছে।"

গোধূলির আলোতে আমাদের বাড়ীর ছাদে একদিন রজতের আত্মবিস্মৃত মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম! সেই আলো, সেই মূর্ত্তি আঁকিয়াছি, কেবল মুখ দিয়াছি অন্যের। আমার প্রিয়তমকে প্রকাশ্যে স্বীকার করিবার অধিকার যে আজও পাই নাই। প্রেমের রং-এ রঙীন জগৎ সেদিন আমার তুলির রং-এ ধরা দিয়াছিল।

মৃগাঙ্ক উঠিয়া হাত বাড়াইয়া আমার ছবিখানি গ্রহণ করিলেন। "এটাতে কিছু দোষ আছে, আমি সংশোধন ক'রে দেবো। মিসেস ভাটিয়ার কাছে ফেরত পাবে। রং ধরেছো ঠিক, কিন্তু আরও চড়াতে হতো। তোমার সাহস নেই।"

মৃগাঙ্কমোহন চলিয়া গেলেন। স্থাণুর মত বসিয়া রহিলাম। আমি শিল্পী, রজত নহে। ইহা আমার অপরাধ। রজত হয়তো ক্ষমা করিতে পারিবে না। নিজের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণার আকস্মিক অবসানের দুঃখ-বিস্ময়ের মধ্যেও ঈর্ষায় নীলাভ ছায়া যেন তাহার মুখের উপর ভাসিতে দেখিলাম! এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমার জীবনে প্রমাদ আসিবে। রজতের ভুল সহ্য করিতে পারিয়াছি, নীচতা পারিব না। ভীতি-জড়িত সংশয়ে তাহার প্রতি চাহিলাম।

সেই মুহূর্ত্ত আসিল। এই বুঝি আমার জগৎ চুরমার হইয়া যায়! গেল! গেল! কিন্তু চকিতে রজত আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "অভিনন্দন, কাঞ্চন। চিত্রকলা, বিদায়।"

সেই সঙ্গে আমিও নীরবে চিত্রকলাকে বিদায় জানাইলাম।

সুদীর্ঘ চার বৎসর পরের কথা। রজত প্রথমে ডাক্তারী পড়িতে গেল। ছয় মাস পরে আবার সে পাঠ্যবস্তু পরিবর্ত্তন করিল। জার্নালিজম্ করিতে যাইয়া চলিয়া আসিল। এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে কয়েকদিন আনাগোনা করিয়া ক্ষান্ত হইল। রাজনীতি লইয়া নাড়াচাড়া করিল। অবশেষে বি-এ পড়িয়া পরীক্ষা দিয়া পাশ করিল। উকিল হইবার উদ্দেশ্যে আইন পড়িতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে এম-এ।

আমি? আমিও আর্ট স্কুল ছাড়িয়া রজতের পশ্চাতে ছায়ার মত বি-এ পাশ করিয়া এম-এ ক্লাশে যোগ দিলাম। যে-আর্ট আমাকে রজতের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাইবে, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই।

আজ রজতের কথায় বিস্মিত হইলাম না। তাহার এই দেশভ্রমণের প্রবৃত্তি মাঝে মাঝে উদিত হয়। চির-চঞ্চল চরিত্র তাহার। শান্তির আশায় সে মাঝে মাঝে দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া ফেরে। একবার এইরূপ ভ্রমণ হইতে সে চুলে বাবরি ও বসনে গৈরিক লইয়া ফিরিয়াছিল। প্রশ্ন করিলাম, "তোমার কোন বান্ধবী যাচ্ছেন কি?" কেরিয়ার পরিবর্ত্তনের মত দ্রুত রজতের প্রেমজীবনেও পরিবর্ত্তন ঘটে। তবে, আজ পর্য্যন্ত সে মানসীর দেখা পায় নাই।

"না। বড় একঘেয়ে লাগছে।"

রজত শিলংশৈলে গেল। সুদীর্ঘ দুইমাস। তাহার মাতাপিতাকে লিখিত পত্র হইতে নিরাপদ সংবাদ ও মাঝে মাঝে দুই একখানি রঙীন ছবি আঁকা পোষ্টকার্ড ভিন্ন আমি তাহার বিশেষ কোন গতিবিধির নির্দ্দেশ পাইতাম না। আজ সে ফিরিল। তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে ভাড়াটে ট্যাক্সি হইতে সে অবতরণ করিল। একটু পরেই শোনা গেল সাদর ডাক তাহার কণ্ঠে আমাদের বাড়ীর একতলায়,—"কাঞ্চন!"

কোনদিন তো রজত এত তাড়াতাড়ি আমার খোঁজ করে না! হৃদয় দ্রুতস্পন্দিত হইয়া উঠিল। হয়তো দুইমাসের অদর্শন আমাকে রজতের মনে নূতন রূপ দিয়াছে। সাগ্রহে অগ্রসর হইলাম।

আমার গৃহের নির্জ্জনতায় আসিবামাত্র রজত অধীর আনন্দে বলিয়া উঠিল, "কাঞ্চন, এতদিনে পেয়েছি।"

মাঝে মাঝে রজতকে কবি-ভাব আশ্রয় করে। সেই ভাবেরি বাহ্য প্রকাশ এই আচরণ মনে করিয়া সহজ সুরে প্রশ্ন করিলাম, "কি পেয়েছ, রজত?"

"তাকে! তাকে! যা খুঁজেছি এতদিন তা শিল্প নয়, সাফল্য নয়,—প্রেম। প্রেমই মনের সবচেয়ে বড় বিকাশ। জীবনে প্রথম সেই মেয়েকে দেখলাম, যে আমারও জীবনের ভার নিতে পারে।"

মনে হইল হৃদয় আমার বিন্দু বিন্দু রক্তমোচন করিতেছে। অতিকষ্টে মুখে হাসি টানিয়া বলিলাম, তার কথা সব বলো।"

জয়তী চক্রবর্ত্তী মাতাপিতার সাহচর্য্যে শিলং প্রবাসে গিয়াছিল। জয়তীর বড় ভাই পূর্ব্বেই রজতের পরিচিত ছিলেন। এবারে নিবিড় বন্ধুত্ব হইল। জয়তীর সহিত হইল নিবিড় প্রেম। রজত এতদিনে মানসীর সাক্ষাৎ পাইয়াছে। সুতরাং সে বিবাহ প্রস্তাব করিল। উভয়পক্ষের জনক-জননী মত দিলেন।

ধীরে ধীরে বলিলাম, "কই, আমি তো কিছু জানিনা? ব্যগ্রভাবে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া রজত বলিল, "আমি তোমাকে নিজের মুখে বলবো বলে মা-বাবাকে এ খবর দিতে নিষেধ করেছিলাম। তুমি আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু, কাঞ্চন। তুমি তাকে দেখলে বুঝবে আমি এতদিনে সব পেয়েছি। জয়তীও তোমাকে দেখবার জন্ম ব্যস্ত। আমি আজ বিকেলে তোমাকে ওদের বাড়ী নিয়ে যাব। ওরা-ও আজ এসেছে।"

যথাসময়ে জয়তীদের বাড়ীতে অবতরণ করিলাম। সম্মুখে ফালির মত জমিতে ক্রোটন ও গাঁদা গাছ রুটিনের নিয়মবদ্ধতায় প্রোথিত্। একতলায় বসিবার ঘরে উপনীত হইলাম।

যথানিয়মে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড সোফা-সেটী পিতলের সেণ্টারপিস্ ঘেরিয়া সজ্জিত। তাহার উপর মীনা কাজ করা অ্যাশ্‌ট্রে, মশলাদানী ও পিতলের হাতীঘোড়া বিন্যস্ত। দুইকোনে লম্বা ত্রিপদীর বক্ষে শূন্য পিতলের পাত্র। একপার্শ্বে একতোড়া কাগজের ফুল। জানালা দরজায় পুরাতন কাপড়ের চওড়া লেস্ দিয়া পর্দ্দা ঝুলানো হইয়াছে।

জয়তীর মাতা দর্শন দিলেন। "জয়তী গেল গোসলখানায় এইমাত্র। একটু বোসো বাবা।" সদ্য পাটভাঙা সোনালী জড়িপাড় শাড়ী এবং পায়ের অনভ্যস্ত চটী সামলাইতে সামলাইতে মাতা স্থূল দেহ লইয়া উপবেশন করিলেন।

চা আসিল রসগোল্লা ও শিঙারার সঙ্গে চায়ের অবসানে পর্দ্দা ঠেলিয়া প্রবেশ করিল জয়তী নিজে। "এই যে রজত, ওঁকে এনেছ তো! হাউ নাইস্ অব্ ইউ!"

নির্নিমেষে জয়তীকে দেখিলাম। উজ্জ্বল সবুজ কাপড়ে চওড়া লাল সুরাটী বর্ডার বসানো, নীল জামার হাতা গলা নানাবর্ণের রেশমের বিচিত্র ফুলপাতায় শোভিত। পায়ে কাল শোয়েটের গোড়ালি তোলা চটী। প্রখর গৌরবর্ণ গোলাপী পাউডারে গোলাপী। বৃহৎ ওষ্ঠাধরের গাঢ় রক্তিমার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কপোলও রক্তরূপ ধারণ করিয়াছে। ভ্রূ সূক্ষ্মতম রেখায় অঙ্কিত। চোখের পালক মাস্কারার দাক্ষিণ্যে শক্ত হইয়া বিস্ফারিত অক্ষিদ্বয়ের উর্দ্ধে নিজেদের জাহির করিতেছে। তাহার হাতের সূতীক্ষ্ণ নখর লালরংয়ের প্রাবল্যে চক্‌চক্ করিতেছে। যেন রক্তস্নাত! ওই হাতে সে আমার নিকট হইতে রজতকে ছিনাইয়া লইয়াছে। ওই রক্ত আমারি হৃদয়-শোণিত।

আমার ভীরু চোখ নামিয়া আসিতে লাগিল। রজত অন্যকে ভালবাসে—তাহাতে আমার বেদনা আছে। কিন্তু রজতের সন্ধানী মনের আদর্শ আমাকে প্রতি মুহূর্তে আশ্বাস দেয়: 'রজত তোমাকে ভালবাসিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে না, কারণ সে অসামান্য। তাইতো তুমি রজতকে ভালবাস।'

জয়তী রজতের সন্ধানের বস্তু, সে আমার শ্রদ্ধেয়া। তদ্‌গত-চিত্তে জয়তীর মুখে দম-দেওয়া গ্রামাফোনের অবিরাম বাক্যাবলী শুনিতে লাগিলাম। জয়তীর মা হাসিয়া উঠিয়া গেলেন। আত্মবিস্মৃত রজত জয়তীর পার্শ্বে সোফায় যাইয়া বসিল। স্বীকার করিতে হইল উভয়কে মানাইয়াছে।

জয়তী বলিতে লাগিল, "জানো রজত, কুলীগুলোর কাণ্ড? সেই চমৎকার টি-সেট না, -ওই যে গো হলদে পাখী আঁকা—সেইটের বাক্সটা আছড়ে ফেলেছে! সব ভেঙ্গে চুরচুর্! ইস, কি সস্তায় পেয়েছিলাম, না? আর, কি সুন্দরই ছিল! শুধু দুটো কাপ্ বেঁচেছে। ওই কুলীগুলো এমন অদ্ভুত, শোন রজত—"

দেখিলাম জয়তীর জগত আজ কাপ্‌ডিসের শোকে মুহ্যমান। দার্শনিকের একাগ্রতায়, নেতার তন্ময়তায় সে টি-সেটের অভাব ও অহেতুক ক্ষতি লইয়া দীর্ঘ আলোচনা করিতে লাগিল। রজতের উপস্থিতি অপেক্ষাও সামান্য ঘটনাটির স্মৃতি তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে বেশী। সে সত্যই মনে করিয়াছে জীবনের এই সমস্ত দিকগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এই সামান্য মেয়েটির পাশে আমার অসামান্য রজতকে এত মানাইল কেন? এই পরিবেশে রজতের যোগসূত্র কোথায়?

সহসা এক অপরাহ্নের স্তিমিত-আলোকদীপ্ত একটি দেহ চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল, অসংখ্য চিত্রে সজ্জিত। কর্ণে ভাসিয়া আসিল একটি বাণী,…'তোমার চোখ নেই, মন নেই।…রজত রায়, তোমার ছবি ভালগার।'

সেই অতীতদিনে রজত সম্বন্ধে প্রকৃত উপলব্ধির চাবিকাঠি আমার হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন মৃগাঙ্কমোহন দত্ত। তবু কেন ভুল করিয়াছিলাম! জীবনে দ্বিতীয়বার আমার ছদ্মচক্ষু প্রকৃত চক্ষু হইতে খসিয়া পড়িল।

বিদায় রজত। তুমি সন্ধানী নও, তুমি অসংযত। তোমার মধ্যে সন্ধানের আলো জ্বলেনা, জ্বলে দিকভ্রষ্ট আলেয়া। মানসীক স্থৈর্য্যের অভাবে বিক্ষিপ্ত, শিশুর ন্যায় রঙীন বস্তুর সন্ধানে হাত বাড়াও। জীবনে একবারও প্রকৃত মহত্ত্বের মুখোমুখী আসিতে তুমি পারিবেনা। তোমাকে অসামান্য ভাবিয়াছিলাম, সামান্যের মোহে ধরা দিয়া তুমি নিজের সামান্যতা প্রমাণ করিলে।

আমার ক্ষোভ নাই। আমার জন্য নীরবে এতদিন পথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে আমার তুলী, আমার রং। সেই আমার সন্ধান। তুচ্ছ পুরুষের মধ্যে সে সন্ধানের শেষ নাই।

তবু, তোমার সহিত আমার মিল আছে কোথাও। এ আখ্যায়িকার গোড়ায় বলিয়াছিলাম, নাই। আছে রজত, আছে। তুমি নির্ব্বোধ। আমিও সাময়িক ভাবে নির্ব্বোধ হইয়াছিলাম।

দরজা বন্ধ

শ্রীমনোজ বসু

বাড়ির সামনে নূতন চুণকাম-করা ঝকঝকে দেয়ালের উপর কয়লার বড় বড় অক্ষরে লিখে গেছে—'সরকারি গোলাম'। মতলব কি—বোমা মারবে নাকি? আগুন দেবে?

সেরেস্তাদার নিবারণ পালিত একমাত্র বন্ধু দেখা যাচ্ছে এত বড় জায়গাটায়। মুখ বেজার করে তিনি বললেন, বলেন কেন—ছ্যাঁচড়া, পরম ছ্যাঁচড়া হয়ে পড়েছে মানুষজন। আমার বাড়িতেও ইট-পাটকেল মারছে হুজুরের একটু নেকনজরে আছি বলে। পরশু রাতে কাজল তো কেঁদেই অস্থির!

পাশা উলটে গেছে। মহকুমার সর্বময় কর্তা—মানুষের আনাগোনার অন্ত ছিল না, ভিড়ের চোটে অতিষ্ঠ হয়ে উঠত, রাত্রি ন-টার আগে চন্দ্রার সঙ্গে একটু নির্ঝঞ্ঝাটে বসতে পারত না কোনদিন। হঠাৎ কি হয়ে গেল, এখন একটা কথা বলবার মানুষ খুঁজে পাচ্ছে না শিশির। হাকিম বলে খাতির নেই। এই সেদিন বড় উকিল শরৎ সামন্ত মশায়ের নাতির অন্নপ্রাশন হল, তা ভদ্রলোক মুখের কথাটা জানালেন না। মুখোমুখি দেখাও প্রায় হয়ে গিয়েছিল, সামন্ত মশায় মুখ ফিরিয়ে সরে পড়লেন। পায়ে হেঁটে বেড়ানো আজকাল এক রকম ছেড়েই দিয়েছে—যদি দৈবাৎ বেরোয়, দেখতে পায় চেনা মানুষেরা পাশ কাটিয়ে গলি ঘুঁজির মধ্যে ঢুকছে; নিতান্ত পথ না পেলে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে। অথবা দু-জনে গল্প করতে করতে এমন ভাবে চলে যায়; যেন শিশিরকে দেখতেই পায় নি। একটা নমস্কার করতে হবে, আর 'কেমন আছেন' 'ভাল আছি' গোছের দুটো শিষ্ট কথা বলতে হবে এই আতঙ্কে।

নিবারণ ঘাড় নেড়ে বলেন, ভিতরে 'কিন্তু' আছে হুজুর। ভয়ে বলি না নির্ভয়ে বলি—শরৎ সামন্ত মশাইকে শাসিয়েছিল, পংক্তি ভোজনে কেউ বসবে না সরকারি মানুষের সঙ্গে। আমাকেও কত ভয় দেখায়, আমি কেয়ার করিনে! লোক না পোক—যা ক্ষমতা থাকে করুক গে—হুজুর খুশি থাকলেই হল।

ক্লাব-ঘরে কেউ আসে না ব্রীজ আর বিলিয়ার্ড খেলতে। পেট্রোমাক্সগুলো কালিঝুলি-মাখা অবস্থায় এক কোণে পড়ে আছে। একটা কেরোসিনের টেবিল-ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিয়ে বেয়ারা দরজার ওধারে টানা-পাখার দড়িতে হাত রেখে বসে বসে ঝিমোয়। চুপচাপ ইজি-চেয়ারে পড়ে শিশির খানিকক্ষণ হয়তো ডিটেকটিভ নভেলের পাতা উলটায়, তারপর উঠে পড়ে। বাড়িতেও ভাল লাগে না। চন্দ্রার সঙ্গে খুনসুটি করবার জন্য আগে এমন উসখুস করত—কোর্টে যাওয়ার সময়টুকু ছাড়া এখন তো অখণ্ড অবসর, তবু ওসব ভালই লাগে না। চন্দ্রাও আলাদা মানুষ হয়ে যাচ্ছে, অহরহ কি বসে ভাবে। অতিরিক্ত গম্ভীর। কাছেই আসে না জরুরি সাংসারিক প্রয়োজন ছাড়া। অতি সংক্ষেপে কথা শেষ করে যেন দায় কাটিয়ে উঠে পড়ে।

শিশির একদিন হাত ধরে ফেলে প্রশ্ন করল,' আর কিছু বলবার নেই তোমার?

আর কি? ভীরু চোখ দুটো তুলে অসহায়ের ভাবে চন্দ্রা তাকায়।

শিখিয়ে দিতে হবে? অনেক কষ্টে মুখে হাসি টেনে এনে শিশির বলে, বলো—প্রাণকান্ত, ভালবাসি। চলবে না—বড্ড সেকেলে?

কণ্ঠ সহসা কাতর হয়ে এল। বলে, আগড়ুম বাগড়ুম বলো যা তোমার খুশি। চুপ করে থেকো না। দোহাই—

চন্দ্রার চোখের কোণে জল এসে গেছে। ঝাঁকি দিয়ে শিশির তার হাত ছেড়ে দিল। চলে যাও—বিদায় হয়ে যাও তুমি—

তারপর উঠে চঞ্চল ভাবে পায়চারি করতে লাগল।

পুরানো চাকর রাখাল, পঁয়ত্রিশ বছরের চাকরি, শিশির যখন জন্মেনি সেই সময় থেকে। রাখালেরও কাজ নেই একেবারে। পরিচ্ছন্ন ঘরবাড়ি, সাজানো গোছানো জিনিষপত্র—একটুকরো কাগজ কি এক কণিকা ধুলো পড়ে নেই কোথাও। মানুষজন আসে না, ছাড়া বাড়ির মতো—যে জিনিষটি যেমন রেখে দেয়, অবিকল তেমনি থাকে দিনের পর দিন। বিরক্ত হয়ে অকারণে সে এখানকার জিনিষ ওখানে নিয়ে রাখছে, তোয়ালে দিয়ে ঝাড়ছে এই এ-জায়গায় এই ও-জায়গায়। ট্রে সরাতে গিয়ে সৌখিন পেয়ালা পড়ে কুচি-কুচি হয়ে গেল।

শিশির ক্রুদ্ধ চোখে তাকায়। রাখাল বেকুব হয় না। বলে বুড়ো হয়ে গেছি, কাজের শক্তি নেই। ছুটি দাও ভাই বাড়ি যাই।

ভাঙা টুকরোগুলো কুড়োচ্ছে, থরথর করে হাত কাঁপছে। শিশির বিচলিত হল।

চলে যেতে চাচ্ছিস রাখাল দা?

অনেকদিন তো হয়ে গেল। চাকরি ছেড়ে দেশে ঘরে থাকিগে এবার।

কুণ্ঠিত স্বরে শিশির বলে, এটা কি ঘর নয় তোর? দেশে গিয়ে উঠবি কোথায় শুনি?

আমার বড়দিদি আছেন বিধবা। তিনি বলছেন—

বুঝেছি। বলে শিশির তার সামনে গিয়ে দু-কাঁধে দু-হাত রাখল।

হয়েছে কি বল্?

রাখাল দস্তুর মতো ভর্ৎসনা শুরু করল এবার। যেমন সে করত ছোটবেলায় শিশির যখন বড্ড দুরন্তপনা করত।

থাকব না আমি, থাকতে পারছি নে। ফটকের ধারে আমার ঘর—রাস্তা দিয়ে তোমার কুচ্ছো করতে করতে চলে যায়, সে সব কানে শোনা যায় না।

বটে!

বাপ তুলে গালিগালাজ করে, আবার খুন করবে বলে শাসায়—

শিশির বলে, খবর দিস আমায় যখন ঐ সব বলে। পুলিশ ডেকে অ্যারেষ্ট করাব।

রাখাল বলে, ঐ তো ক্ষমতার দৌড়। যারা মরতে ভয় পায় না, জেলে আটকে কি করবে তুমি তাদের?

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে, আমি বলি কি—চলো এসব ছেড়েছুড়ে। একবেলা আধপেটা খেয়েও যদি না কুলোয়—

চুপ! তাড়া দিয়ে উঠে শিশির শেষ করতে দেয় না। মুখের বাড় বড় বেড়েছে—না? নিজের কাজে-যা। না পোষায়, থাকিসনে—

ইস্কুলে পড়বার সময় শিশির দাবাখেলা শিখেছিল, একদিন ধরা পড়ে বাপের কান মলা খেয়ে ছেড়ে দেয়। এতকাল পরে সেইখেলা মরীয়া হয়ে সে আরম্ভ করল নিবারণের সঙ্গে। সন্ধ্যার পর শিশিরের ড্রইং-রুমে গালিচার উপর দু'জনে ছক পেতে বসে, গভীর রাত্রি অবধি খেলা চলে। চন্দ্রা পড়ে পড়ে ঘুমোয়, শিশির তাকে আর ডাকে না, নিঃশব্দে খাওয়া দাওয়া সেরে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ে। শুয়ে এপাশ-ওপাশ করে, ঘুম হয় না। অনেক খেটে খুটে কমপিটিটিভ পরীক্ষায় পাশ করে তবে এই চাকরি। চাকরি পাওয়ার পর আত্মীয়-পরিজন শতকণ্ঠে সাধুবাদ করেছিলেন। চিরদিনই সে ভাল ছেলে—ছোট্ট বয়স থেকে অজস্র প্রশংসা পেয়ে এসেছে সকলের। আর আজকে এই অবস্থা। অপরাধের তার সীমা নেই। সবাই মুখ ফিরিয়েছে এক নিবারণ ছাড়া। পেনসনের আর বছর দুই বাকি—ইতিমধ্যে এই অঘটনে সে ভদ্রলোকও যে কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। দাবা খেলতে খেলতে মনের দুঃখ শিশিরের কাছে ব্যক্ত করেন। যেন পায়ের নিচেকার মাটি সরে যাচ্ছে—দোর্দণ্ড প্রতাপ ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট অবধি হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে এই সব নিরন্ন নিরস্ত্র মানুষগুলোর কাছে। দাবা খেলবার সময় ম্লান কেরোসিনের আলোয় মনে হয়—অসম বয়সী দুঃখী দু'জন গালে হাত দিয়ে যেন দাবার চাল নয়—নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাবছে।

অবস্থা আরও সঙিন হয়ে আসছে। নানারকম গুজব। দল বেঁধে এসে দখল করবে নাকি এই শহর। নিবারণই ফিসফিস করে খবর দেন। আবার তাচ্ছিল্যের সুরে প্রতিবাদও করেন বোধকরি মনকে আশ্বাস দেবার জন্য। এই যেদিন হবে হুজুর, হাতের তলায় লোম উঠবে আমি বলে রাখছি। ঘরে বসে, দুটো বন্দে-মাতরম আওয়াজ ছাড়ে, চেঁচিয়ে পেটের ভাত হজম করে, গবর্ণমেণ্ট তাই কানে নিচ্ছে না। তা বলে রাজ্যটা ছেড়ে দিয়ে যাবে কি সহজে?

সেই নিবারণও আসছেন না আজ দিন চারেক। খেলা না হোক—দুটো খবরাখবর আর ভরসা দেওয়ার মানুষ না হলে বাঁচা যায় কি করে? বলতে গেলে কথার দোসরই নেই আজকাল। নিজেই শিশির খোঁজ নিতে চলল নিবারণের বাড়ি। পদের আভিজাত্য নিয়ে পৃথক হয়ে ঘরের ভিতর থাকবার কি অর্থ আছে, কেউ যখন ডেপুটিগিরিকে সম্মান বলেই আর বিবেচনা করছে না—চন্দ্রা অবধিও না। আর এই উপলক্ষে ঘোরাফেরা হবে খানিকটা। নদীর ধারে নিবারণের বাসা।

HAMSA
PADMA

নিবারণের জ্বর হয়েছে, সেই অবস্থায় বেরিয়ে এসে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করলেন। স্বল্প-পরিসর বৈঠকখানায় কোথায় শিশিরকে বসতে দেবেন, ভেবে পান না। আম-কাঠের সরু তক্তাপোষ ছেঁড়া মাদুর, ময়লা তাকিয়া—শিশির তার উপর গড়িয়ে পড়ল। বোধ করি এই একমাত্র বাড়ি, যেখানে তার সমাদর রয়েছে। সোরগোল করে নিবারণ চা করতে বললেন। শিশির হেসে যত নিরস্ত করবার চেষ্টা করে, ততই অধিক ব্যস্ত হয়ে ওঠেন তিনি। শিশির বলে, নাঃ—কোথাও তো যাইনে, অপনার এখানে এলাম—তা এমন করলে আর আসব না, বলে রাখলাম।

কাজল এল রেকাবিতে বাতাসা মুগের অঙ্কুর আমের কুচি আর দুটো মিষ্টি নিয়ে। নিবারণ দেখে অপ্রসন্ন মুখে বললেন, খানকতক লুচি ভেজে আনতে পারলিনে? কি দরের মানুষ উনি—কত ভাগ্যে এসেছেন—

মুখে রাগ দেখায়, মনে মনে খুশি হচ্ছে শিশির। এখনও এসব বলবার মানুষ আছে তা হলে, এই বিয়াল্লিশ সনের আগষ্ট মাসেও? কাজলের দিকে ফিরে সে বলল, অসময়ে আমি খাইনে। চা'র কথা বললেন, তাই শুধু নিয়ে আসুন এক কাপ—

লঘুপায়ে মেয়েটি অদৃশ্য হল। মৃদু হাসি তার মুখে। নিবারণ বললেন, কাজলকে আপনি বলে কথা বলছেন কেন হুজুর? আমার ছোট মেয়ে, আমারই লজ্জা হচ্ছে।

এরপর আরও পাঁচ সাত দিন শিশির এল নিবারণের বাড়ি। নিবারণ অন্নপথ্য করেছেন, কিন্তু রাত্রে যাতায়াতে ঠাণ্ডা লাগানো ঠিক নয়। ম্যালেরিয়া জ্বর—সাবধানে থাকতে হয়, নয়তো জ্বর আবার দেখা দিতে পারে। শেষের দিকে দু-একদিন দাবা-খেলাও চলল এখানে। তক্তাপোষে পা ঝুলিয়ে উবু হয়ে বসে চাল দিতে দিতে হঠাৎ একসময় শিশিরের মনে পড়ে যায় সেইসব দিনের কথা, যখন খালি পায়ে একহাঁটু ধূলোমাটি মেখে সে ইস্কুলে যেত, এত বড় হয় নি, এমন চাকরি পায় নি।

যত দেখছে, বড্ড ভাল লাগছে কাজলকে। ভাল মেয়ে, ভারি নরম তরিবৎ, চমৎকার মেয়ে শিশির এলে তটস্থ হয়ে থাকে, কি করে খুশি করবে খুঁজে পায় না। কোর্ট থেকে ফিরবার মুখে নিবারণকে প্রায়ই সে বাসায় নামিয়ে দিয়ে যায়। একদিন কি কাজে কোথায় গেছেন নিবারণ, তবু শিশির ঐ পথে ঘুরে আসছে। গাড়ির আওয়াজ পেয়ে কাজল দুয়োর ধরে দাঁড়িয়েছে। শিশিরকে বলে, নামবেন না?

তোমার বাবা আসেন নি—

আমরা ত আছি—

গাড়ির দরজায় হাত রেখে সে দাঁড়াল। শিশির নামল।

আচ্ছা, সত্যি বলো। কি ভাবো তোমরা আমার সম্বন্ধে?

কাজল জবাব দেয় না, টিপিটিপি হাসে।

ভয় করো না আমায়?

কেন?

আমার নামে নিশ্চয় বদনাম শুনেছ। চারিদিকে গণ্ডগোল এ মহকুমাটা আমি টিট করে রেখেছি। লোকে তাই রটিয়ে বেড়াচ্ছে, খয়েরখাঁ আমি একেবারে—

কাজল বলে, বাবাকেও লোকে ঐ সব বলে—

এ জবাব শিশিরের মনঃপুত হল না, জোর প্রতিবাদ সে প্রত্যাশা করেছিল। মেয়েটা তার মুখের দিকে চেয়ে কি বুঝল—কে জানে! খোসামুদি সুরে বলে, এত বড় হয়েও এই ভাঙা বাড়িতে ছেঁড়া মাদুরে এসে বসেন, ঘৃণা করেন না—

এ প্রশংসাও ঠিক তার প্রাপ্য নয়, এতদিনের মধ্যে কখনো তো আসেনি। নোংরা ঘিঞ্জি এই পূর্বপাড়ায় পা দেওয়ার কথা স্বপ্নেও সে ভাবতে পারত না। মোটরে তার সান্ধ্য ভ্রমণ হত—ধুলো লাগবার ভয়ে মোটর থেকেই মোটে নামত না। আজকে ঔদার্য ভরে আমকাঠের তক্তাপোশের উপর গড়িয়ে পড়েছে—কেন আসে এখন, কি জন্য এমন করে বোঝে না মেয়েটা? না জেনেশুনে ভান করছে? কাজলের বুদ্ধিপ্রদীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে প্রশংসাও শিশির সহজ মনে নিতে ভরসা পায় না। এমনি হয়ে উঠেছে আজকাল—কেউ তাকে ভাল বলছে, কানে শুনেও বিশ্বাস করবার প্রবৃত্তি হয় না।

খানিক গল্পগুজব করে শিশির উঠল।

যাচ্ছি, দরজা বন্ধ করো কাজল।

গাড়িতে গিয়ে বসতে সোফার একখানা খামের চিঠি হাতে দিল।

কে দিয়েছে?

তা তো বলতে পারিনে হুজুর। কোলের উপর ফেলে দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল।

বাড়ি এসে চিঠিটা পড়ল। বেনামি চিঠি। আবার ডাক পড়ল সোফারের।

এখানকার মানুষ তুমি—লোক চিনতে পারলে না?

মুখ দেখতে পাই নি—

নাম বলতে চাও না তাই বলো। সব তোমরা একদলের। আচ্ছা, দেখিয়ে দিচ্ছি মজা। রোসো—

খুব খানিকটা বকাবকি চলল। চন্দ্রা এসে ছায়ান্ধকারে দাঁড়িয়েছে। একটি কথা বলল না—যেমন এসেছিল, নিঃশব্দে তেমনি চলে গেল।

সেই রাত্রে। অনেক রাত—শিশিরের ঝিমুনি এসেছে, হাতের বইটা গড়িয়ে পড়েছে। ধড়মড়িয়ে হটাৎ উঠে বসল।

কে?

স্খলিতকণ্ঠে চন্দ্রা বলে, আমি—আমি—

শিশিরের দিকে কাতর দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে। বলে, পালিয়ে যাই চলো। দিনমানে না পারো, এমনি কোন রাতে। এভাবে থাকা যায় না, মরে যাবো।

শিশির বলে, চাকরি?

ছেড়ে দাও। নয় তো লম্বা ছুটি নাও অনেকদিনের জন্যে। আবার সুখী হব আমরা, শান্তি পাব—কিন্তু—

ঝর ঝর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে চন্দ্রার গাল বেয়ে। ব্যাকুল কণ্ঠে সে বলতে লাগল, জল-বিছুটি মারছে যেন এখানে। কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল—মানুষের সঙ্গ না পেয়ে কি করে বাঁচি? মানুষের এত ঘৃণা সহ্য করি কেমন করে?

কিন্তু তা হয় না। জীবন নাটক নয়—নানাদিক দিয়ে অসংখ্য বাঁধনে বাঁধা। চন্দ্রাকেই পাঠিয়ে দিল শিশির। চন্দ্রাও এমন বিশেষ আপত্তি করল না শিশিরকে এই অবস্থার মধ্যে রেখে যেতে। বাপের বাড়ি কলকাতায় গেল—যেখানে সে মহকুমা হাকিমের স্ত্রী নয়, সহজ সাধারণ মানুষ। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর সংগ্রামের সঙ্গে দোলায়িত হবার—অন্তত পক্ষে দুটো সহানুভূতির কথা বলবার অধিকার আছে সেখানে তার। তে-রঙা পতাকা নিয়ে কলেজের মেয়েরা মিছিল করে রাস্তা অতিক্রম করে, তারই সঙ্গে রোদে পুড়ে বৃষ্টির জলে ভিজে খালি পায়ে এক-পা কাদা মেখে সেও একদিন লক্ষকোটি মূক মানুষের মর্মকথা শহরের সুস্থ উদাসীন মানুষকে শুনিয়ে বেড়াত—এখন সেটা না পারুক বাপের বাড়ির জানলা খুলে দুচোখ ভরে দেখতে পারবে তো বছর দুই আগেকার সেইসব বন্ধুদের!

সোফার আসছে না পরের দিন থেকে। থানার অশোক বাবু ক'দিন পরে খবর দিয়ে গেলেন, বাইরের দল আসতে শুরু হয়েছে এবার। একস্ট্রা ফোর্স চেয়েছিলেন, মঞ্জুর হয় নি। সব জায়গায় একই তো অবস্থা! হাতে যা আছে, তাই নিয়ে তৈরি হতে হবে। আর অশোক বাবু তৈরি আছেনও। একটা বন্দুক তুলে ধরলে যেখানে একশ' মানুষের হুড়োহুড়ি পড়ে যায়, তাদের জন্য বেশী কি দরকার?

খবর দিয়ে পান চিবাতে চিবাতে হাসি মুখে অশোক বাবু বেরিয়ে গেলেন। এটা দুটো আন্দাজ বেলার কথা। শিশিরের খাস কামরায় বসে কথাবার্ত্তা হল। ক্রমশ তারপর রকমারি খবর চারিদিকে ছড়াতে লাগল। সন্ধ্যার কাছাকাছি মুখ-আঁধারি হলে সাব-রেজেষ্ট্রী অফিসের দোতলা বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে শিশির নিজের চোখে দেখেও এলো কিছুক্ষণ। উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম সকল দিক থেকে খাল পেরিয়ে বিল ঝাঁপিয়ে সদর রাস্তা বেয়ে জনপ্রবাহ ছুটছে সহর মুখে, ঢেউয়ের ফেনার মতো মাথার উপর তে-রঙা নিশানের সমারোহ। এলো—এসে পড়েছে এবার। চেয়ে চেয়ে শিশিরের বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে। জগদ্দল পাথর চাপা দিয়ে অন্ধকূপে যেন আটকে রাখা হয়েছিল ওদের, পাথর ঠেলে ফেলে বেরিয়েছে, আলোয় এসেছে—কে রুখবে আর এখন? এ ব্যাপার ভাবতেও পারেনি তো এই ক'ঘণ্টা আগে।

হঠাৎ কি হয়ে গেল, সকল চাঞ্চল্য স্তিমিত হয়ে মন তার অসীম শান্তিতে ভরে উঠল। চন্দ্রা গিয়ে পৌছনোর খবরটা অনুগ্রহ করে দিয়েছে। তারপর আর খোঁজখবর নেবার কোন আগ্রহ নেই। চুলোয় যাক—বন্ধনহীন, নির্ভীক সুস্থতার সঙ্গে কর্তব্য করতে আটকাবেনা আর এখন।

আর একটা বিশেষ কর্তব্যের কথা মনে পড়ল, গাড়ি নিয়ে চলল নিবারণের বাড়ি। সোফারের অভাবে নিজেই গাড়ি নিয়ে বেড়ায়। চাকরি ছোট হোক—নিবারণও তবু সরকারি চাকরে। তাঁর চেহারায় শঙ্কা বা উদ্বেগের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না, নির্লিপ্ত ভাব। বুড়ো হয়েছেন, কাজকর্ম এড়াতে পারলে বাঁচেন—এই হাঙ্গামায় আপাতত কোর্টে যেতে হবে না বলে বরঞ্চ তিনি যেন উল্লসিত হয়েছেন বোধ হচ্ছে।

দরজা বন্ধ করেন নি সেরেস্তাদার মশায়? কেউ ঢুকে না পড়ে—

কাজলও দরজায় এসেছে, প্রশ্ন করে, কেন?

শিশির বলে, খবর রাখো না? দলে দলে মানুষ আসছে—

সরকারি পাড়ায় ধাওয়া করেছে, আমাদের বাড়ি আসবে তারা কি করতে?

বলে, কাজল হেসে উঠল। উচ্চকণ্ঠে শিশির বলে, আমরা নিপাত যাব, ধর্ম দেখবে তোমরা বসে বসে?

দুম করে মোটরে ইট এসে পড়ল একখানা। অন্ধকার—কাছেই পুরানো আম কাঁঠালের বাগান—কোন দিক দিয়ে এল ঠাহর হয় না। নিবারণ ব্যাকুল হয়ে বললেন, সরে পড়ুন হুজুর, পাড়াটা সুবিধের নয়—

পা-দানীতে এক পা আর রাস্তার উপরে এক পা—শিশির কথা বলছিল। চোখের পলকে ভিতরে উঠল।

একলা যাবেন না, দাঁড়ান—এগিয়ে দিয়ে আসি—নিবারণ গিয়ে পাশে বসলেন। ঢিব-ঢাব ইট পড়ছে এদিক ওদিক থেকে। গাড়ি জোরে চলেছে। নিবারণের প্রতি কৃতজ্ঞতায় শিশিরের মন ভরে উঠল। তিনিই এখন কেবল তার পাশে। আর আছে রাখাল—ঝগড়াঝাঁটি করে, কিন্তু ছেড়ে যাবার তার উপায় নেই, শিশির জানে।

রাখাল গেটে দাঁড়িয়ে। এপথ ওপথ ঘুরে হর্ন না দিয়ে জনতার সান্নিধ্য এড়াতে প্রায় সারা শহরটা পাক দিতে হয়েছে। রাখাল সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলল। গলা খাটো করে বলে, বিষমকাণ্ড—আগুন দিচ্ছে সমস্ত সরকারি বাড়িতে। আর ঐ যে হরনাম সিং নতুন বাসের লাইসেন্সের জন্য এসে প্যানপ্যান করত, সেই শুনলাম টিন টিন পেট্রোল সরবরাহ করছে ওদের।

নিবারণের সামনে এ প্রসঙ্গ বিরক্ত হল শিশির। বলে, নিজের কাজে যা দিকি। তোর কাছে কে শুনতে চাচ্ছে এসব?

ড্রইংরুমে দু'জনে নিঃশব্দে বসে। আলোর জোর কমানো, দাবা বের করা হয় নি। মাঝে মাঝে উন্মত্ত চিৎকার শোনা যাচ্ছে। দীর্ঘকাল আফিং খাইয়ে খাঁচায় পুরে রাখা বাঘের দল যেন ছাড়া পেয়ে শহরময় তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে রাস্তায় রাস্তায়।

খানিকক্ষণ পরে নিবারণ বললেন, উঠি এবার হুজুর।

আসবেন আবার কাল, একা পড়ে আছি।

অনুরোধের চেয়ে অনুনয়ের মতোই শোনালো কথাটা। এমন অস্বাভাবিক কণ্ঠ যে মুখ ফিরিয়ে নিবারণ তাকালেন তার দিকে। শিশির তাড়াতাড়ি অন্য কথা তোলে।

এ অবস্থায় হেঁটে যাওয়া ঠিক হবে না। চলুন—ঐদিক দিয়ে ঘুরিয়ে হাটখোলায় আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আসি।

নিবারণ সভয়ে প্রতিবাদ করেন।

আজ্ঞে না। হেঁটেই যাবো। আমরা চুণোপুঁটি—আমাদের কে কি বলবে? দিব্যি চলে যাবো। আপনাকে কষ্ট করতে হবে না হুজুর।

বারাণ্ডায় শিশির স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জনতার চিৎকার আসছে, সেইদিকে নিবারণ ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ভয় করবার কিছু নেই ওদের। এই শ্রেণীকে চিরদিন সত্যই চুণো-পুঁটির মতো বিবেচনা করে এসেছে, আজকে দলে টেনে বিপদের ভাগ দিতে গেলে শুনবে কেন। তার সান্নিধ্যের নাগপাশ এড়িয়ে নিবারণ যেন বেরিয়ে চলে গেলেন।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডগোল স্তিমিত হয়ে গেল। গোটা শহরে সাকুল্যে গোটাকুড়িক কেরোসিন আলোর ব্যবস্থা আছে—তার একটাও জ্বালানো হয় নি আজকে। রাস্তায় মানুষ নেই, টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ছে, নীরন্ধ্র অন্ধকার। যেন শ্মশানভূমি। চিতাগ্নির মতো পোষ্টাফিসটা জ্বলছে। দুটো ট্রাকে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেছে, ফটফট শব্দ হচ্ছে, ঘন কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছেয়ে ফেলেছে আকাশ। ঘণ্টা কয়েক আগে ক্ষিপ্ত জনতা এত সব কাণ্ড করেছে, তাদের চিহ্নমাত্র নেই এখন।

উদ্বেগে স্থির থাকতে পারে না, পায়ে পায়ে এগুচ্ছে শিশির। হাসপাতালের সামনে জামরুল তলায় গিয়ে দাঁড়াল। কিছু কর্মব্যস্ততা দেখা যাচ্ছে, কেবল এই থানটায়। মফস্বল হাসপাতালে এমনই লোকাভাব—ডাক্তার আর দুজন কম্পাউণ্ডার ছায়ামূর্তির মতো ঘোরাফেরা করছে, অস্পষ্ট গোঙানি উঠছে থেকে থেকে। বাঁধানো চাতালে মুক্ত আকাশের নীচে দু-তিনটা মড়া—সিমেণ্টের উপর দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। অশোক বাবুর কীর্তি—কাজ সেরে তারপর সন্ধ্যাবেলা থেকে কোথায় নাকি তিনি উধাও হয়েছেন, কেউ সন্ধান জানে না।

রাখাল আর সে জেগে আছে—শেষ রাত্রে দরজায় টোকা। অশোক বাবু। পানাপুকুরের ধারে কচুবনে মাথা গুঁজে বসেছিলেন, এখন সদরে ছুটেছেন। দিনের আলোয় দেখতে পেলে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে।

আরও অনেক ভয়ানক খবর দিলেন অশোক বাবু। টেলিগ্রাফের তার কাটা, খেয়া নৌকা ডুবানো, রাস্তাও কেটে দিয়েছে আর বড় বড় গাছ কেটে এনে ফেলেছে রাস্তার উপর। আঁট-ঘাট বেঁধে ওরা এসেছে। সকালবেলা দেখা গেল, স্বদেশিরা টহল দিয়ে শান্তি রক্ষা করে বেড়াচ্ছে শহরের। একটা রাতের মধ্যে কি হয়ে গেছে—পৌনে দু-শ বছরের মধ্যে এমনটা ঘটেনি—ইংরেজের রাজ্য ভারতবর্ষ থেকে এক

টুকরো যেন আলাদা করে কেটে নিয়েছে—এই মহকুমা অঞ্চলটা। এ সব যারা করেছে, একেবারে সাধারণ পাড়াগাঁয়ে মানুষ তারা—জীবনে হয় তো প্রথম এই পা দিয়েছে পাকা ইটের রাস্তায়। মাথার উপরে থেকে নির্দেশ দেবার কেউ নেই—দু-পাঁচ জনে শলা-পরামর্শ করে যেমন অভিরুচি করে যাচ্ছে। কড়া শৃঙ্খলা না থাকলেও বেশ একটা নিয়ম দেখা যাচ্ছে এদের বিক্ষিপ্ত কাজকর্মের ভিতর। 'ভারত ছাড়'—এই যে বুলি উঠেছে, এটাই মানুষ-জনের মনে মনে বাতলে দিচ্ছে, কি করতে হবে, আর কি করতে হবে না।

আরও খবর এল, আদালতের নথি-পত্র নাকি টেনে টেনে বের করছে, পোড়াবে। এ অবস্থায় চুপচাপ ঘরের মধ্যে বসে থাকা যায় কেমন করে? কিন্তু দরজা চেপে দাঁড়াল রাখাল। শিশিরের তাড়া খেয়েও নড়ল না। মানুষজন ক্ষেপে আছে কাল গুলি খাওয়ার পর থেকে! কিছুতে ওদের মধ্যে যেতে দেবে না।

শিশির বলে, তা হলে তুই যা—দেখে আয় গিয়ে। আর সেরেস্তাদার বাবুর বাড়ি গিয়ে বলে আয়, খবরবাদ নিয়ে অতি অবশ্য যেন আসেন সন্ধ্যার পর।

ঘণ্টা দুই পরে রাখাল ফিরল। খদ্দরধারীরা এজলাসে বসেছে, আদালতের মাথায় তে-রঙা নিশান। অশোকবাবু শিশির এদেরই সব খোঁজাখুঁজি করছে হাতকড়ি পরিয়ে গারদে পাঠাবে বলে। আর দরজা বন্ধ সেরেস্তাদার বাড়ির। ডাকাডাকি করে সাড়াশব্দ পাওয়া যায় নি।

এত আতঙ্কের মধ্যে একটু আনন্দ হল শিশিরের। যেমন যেমন বলেছে, নিবারণ একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছেন!

চারটে দিন চলল এই অবস্থায়। বাজার হচ্ছে না, খালি ঝুড়ি নিয়ে রাখাল ফিরে আসে। এদের কেউ জিনিষ-পত্র বিক্রি করবে না। শিশিরের চাকরী হলে তার বন্ধুরা মনে মনে তাকে হিংসা করেছিল নিশ্চয়। আজকে যদি তারা এসে দেখে যায়!

কিন্তু চার দিন পরে ছাই-রঙের ট্রাক একের পর এক সারবন্দি আসছে—ইংরেজ সরকার মরে নি, তার নির্ভুল অকাট্য প্রমাণ। সাদা আর কালো সৈন্য শহর ছেয়ে ফেলল, বুটের দাপে অলি-গলি কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে। চৈত্রমাসে শিমুল বনে ফলফাটার মতো লুইস গানের আওয়াজ। শহর যারা দখল করেছিল কে কোথায় ছিটকে যাচ্ছে। বেড়াজাল ফেলে মাছ ধরার মত টেনে হিঁচড়ে বের করছে তাদের।

পুবপাড়ার ভিতর পালিয়ে আছে নাকি বড় একটা দল।

এক একটা রাস্তা ধরে বাড়ির পর বাড়ি খানাতল্লাস হচ্ছে। খবর ঠিকই—অনেকগুলো পাওয়া গেল। ক্ষেপে গেছে যেন শিশির। দুপুর গড়িয়ে গেছে, নাওয়া-খাওয়া হয় নি, কপালের শিরা দপ দপ করছে, চোখ লাল। তার গাড়িতে ইটের বৃষ্টি হয়েছিল এই রাস্তায়। অকথ্য গালিগালাজ করে বেনামি চিঠি দিয়েছিল। বজ্জাতগুলোকে সিধে না করে সোয়াস্তি নেই। সেই শেষ রাত্রি থেকে অবিশ্রাম ছুটোছুটি করছে সার্চপার্টির সঙ্গে। আর এর পরের অধ্যায়ও সাব্যস্ত করে ফেলেছে। সরকারি ক্ষতি কি পরিমাণ

হয়েছে, মোটামুটি তার হিসাব হচ্ছে। তার দুনো অন্তত উশুল করবে পাইকারী জরিমানা করে—বিশেষ করে এই পাড়াটার উপর।

নিবারণের বাড়ির সামনে এসে প্রসন্ন হল। দরজা বন্ধ। পাড়াময় এত সোরগোল, জানলার একটা কপাট খুলে দেখবার কৌতূহল নেই।

একজনে মনে করিয়ে দিল, এটা বাদ থেকে গেল স্যর—

দরকার হবে না। আমার নিজের লোক ও দিকটা শেষ করো তোমরা। আমি আসছি।

ঘা দিল দরজায়। সাড়া নেই। শিকল ধরে জোরে নাড়া দিল, ডাকতে লাগল, আমি গো আমি। ভয় নেই স্বদেশী টদেশী নই, আমি—সন্দেহ জাগে, বাড়ি ছেড়ে এরা চলে গেছে নাকি কোথাও?

অনেক ডাকাডাকির পর জানলা খুলে গেল। নিবারণ।

শিশির বলে, জল-তেষ্টা পেয়ে গেছে সেরেস্তাদার বাবু। দোর খুলুন।

হতভম্বের মত চেয়ে থেকে নিবারণ বললেন, আজ্ঞে –

শিশির হেসে উঠল। বলে, সব ঠাণ্ডা কোন ভয় নেই। বড্ড কষ্ট হয়েছে, জিরিয়ে যাই।·· কই, কি হল?

অবশেষে নিবারণ দরজা খুললেন। মনমরা ভাব। কি ব্যাপার বলুন তো?

সরু পথটুকু অতিক্রম করে বৈঠকখানায় পা দিয়ে শিশির শিউরে উঠল। যে তক্তাপোষে এসে সে গড়িয়ে পড়ত, দেখে আষ্টেপিষ্টে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা একটা মানুষ তার উপর। মেজেতেও দুজন—পা ফেলবার জায়গা নেই। খোলা দরজা দিয়ে পাশের ঘরে দেখা গেল, সেখানেও ঐ অবস্থা। বাড়িটা যেন হাসপাতাল। তার সরকারি পোষাক দেখে রোগীরা বিচলিত—ক্ষমতা থাকলে বোধ করি ছুটে পালিয়ে যেত।

কাজল বাটিতে করে বার্লি আনছিল এদের কারও জন্যে। তাকে দেখে থমকে দাঁড়াল, হাত কেঁপে ঝন ঝন করে বাটি পড়ে গেল মেজেয়। যেন ভূত দেখেছে, এমনি আতঙ্কিত চেহারা। হুঁ—বলে ক্ষুব্ধ আক্রোশে শিশির একবার নিবারণের দিকে আর একবার কাজলের দিকে তাকাল।

ক্রিং—ক্রিং। সাইকেল পিওন—কোয়ার্টার ঘুরে এসেছে। টেলিগ্রাম দিল শিশিরের হাতে। চন্দ্রা অ্যারেষ্ট হয়েছে, কলকাতা থেকে শ্বশুর তার করেছেন।

পা টলছে, দাঁড়াতে পারে না। বসে পড়ল তক্তাপোষের উপর আহত মানুষটার পাশে। সামলাতে মিনিট কয়েক গেল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে কাজলের দিকে চেয়ে শান্ত কণ্ঠে বলে, যাচ্ছি কাজল, দরজা বন্ধ করো।

কয়েক পা গিয়ে পিছনে তাকায়, কবাট ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়েছিল, এতক্ষণে নিশ্চয় খিল এঁটে দিয়েছে। দিয়েছে কি না—ফিরে গিয়ে দরজা ঠেলে দেখে আসবার উৎসাহ নেই আর শিশিরের।

কষ্টি পাথর

শ্রীনমিতা মজুমদার

অধ্যাপক যখন দেখা দিলেন গল্পের সূচনাতে তখন তাঁর বয়স হয়েচে। চুলে ধরেচে পাক। কিন্তু, বায়বীয় প্রবল-গতিস্রোতে সাদা ভাবনার ফেনাগুলোকে দিয়েচেন উড়িয়ে। বয়সের সিগ্‌ন্যালটা যদিচ খাড়া দাঁড়িয়ে, সন্দেহ জাগে মনে, তবু সন্দেহের আভাসকে মনে হয় ভীরুতার প্রশ্রয় বলে। অন্ধ আবেগে ধিক্কার দিতে দিতে বিপদের সম্মুখীন হ'তে হয়েচে বারবার তাঁকে। হয়তো শেষরক্ষাও হয়নি।

ইতিপূর্বে সন্দেহের আভাসে মনে মনে বলেছিলেন, ছুটি এসেচে। কিছুদিন বসেছিলেন চুপ্ করে। ফের বিপদ ঘনালো। অকস্মাৎ একদিন দেখা গেল অধ্যাপক দেখা দিয়েচেন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়বার কাজে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে জড়ো হোল গুটিকতক ছেলেমেয়ে। ছোটদের পড়াবার ভার নিয়েচে দু'তিনজনা তরুণী। ওধারে হাইস্কুলের ক্লাশে শিক্ষকের দল, কেউবা, সদ্য এম এ, পাশ করা, কেউবা এম এ, পড়া। অল্পবিত্ত শিক্ষিত ঘরের ছেলেমেয়ে। বাপ মায়ের কাছে সংকোচে হাত বাড়িয়ে ফেরে ছেলে পড়িয়ে। তবু আশ্চর্যের এই যে ক্ষুব্ধ নয় ওরা। মুখের 'পরে স্নিগ্ধ একটি হাস্য সমস্ত প্রয়োজনকে যেন হরণ করে নিয়েচে। মনে মনে জানে, বিদ্যাদান করচে, একে তো বলেনা ছেলে ঠ্যাঙানো। এও বলি অবৈতনিক এরা সকলেই। অধ্যাপক তাঁর থলির মধ্যে যে পাথেয় সংগ্রহ করে দেখা দিলেন কর্মক্ষেত্রে তার সাংখ্যিক দিকটা এত নিচের কোঠায় যে বাহবা লাগ্‌তে লাগ্‌ল মনে। আর তার পূর্ণতর যে অংক রইল মনে সেটি ডানা মেলে দিয়ে সাঁতার কেটে চলেছিল অবাধে। সেই শূন্যথলি নাড়ার সংগে সংগেই পূর্ণথলির রূপ জাগ্‌ত বারবার করে।

এত সহজেই তার সদ্যপ্রসূত মাথা নাড়িয়ে প্রতিষ্ঠানটি অবাক লাগাল সকলের। মেঘলোকে বর্ষণ অন্তে এক টুকরো বীজের থেকে দেখা দেবে একটু সবুজ প্রাণের ইশারা, এই ভেবে যারা ভুলে ছিল, চকিতে দেখলে, ঝরল না বৃষ্টি চাষ হোলোনা:ধরাতলে এমন কি বীজ যে বোনা হয়েচে সে খবরও জানলে না কেউ, হঠাৎ দেখা দিয়েচে সবুজ প্রাণের সচকিত ইশারা কচিকচি পাতাগুলিতে। তাতেই পড়েচে ভোরবেলাকার আলো। সকলেরি সন্দেহ এই অনভিজাতের 'পরে। কেবল দু'একজন যাঁরা চিরকাল অতি চালাক নন, যাঁরা চিরকালই এমনি একটি নতুন সংঘাতের ক্ষতিকে জায়গা দিয়ে এসেচেন জীবনে, তাঁরাই দেখা দিলেন দু'টি একটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে।

ইস্কুল যখন হোলো অধ্যাপক গৃহিণীর ভ্রূযুগল দৃঢ়সংবদ্ধ হয়ে এলো। একদিন দেখা গেল তাঁকে বাক্স সাজিয়ে পাড়ি দিতে পুত্রগৃহপানে। সেখানে নাতি নাত্‌নিকে নিয়ে তাঁর কাট্‌বে দিন। স্বামির খেয়ালের চেয়ে সে তাঁর ঢের বেশী সত্য। শুধু যাবার সময় বলে গেলেন মালীকে, তোর ওপরে বাবুর ভার রইল।

অধ্যাপককে অখুশি লাগল না। তাঁর ইস্কুলবাড়ীতে ছোট একটি দলের মধ্যে যে জিনিসটী গড়ে উঠল সে একটি সংঘ। সে তো কেবল পড়া নেওয়া আর পড়া বলে দেওয়ার পর্ব নয়। আসলে সেই জিনিষটিই শূন্যথলির বঞ্চনা সত্ত্বেও আপনার মধ্যে প্রাণরসের জোগান রাখতে পেরেছিল। ওদিকে গাছের তলে জড়ো ছোট ছেলেমেয়েদের দল বেঞ্চ-টেবিলহীন আসন 'পরে, মধ্যখানে ছোট জলচৌকির ওপরে বসে পড়িয়ে চলেছেন ওদের দিদি (কোনদিন বা তাও জোটেনি ভাগ্যে), ওদেরি মতো কলকণ্ঠে, ওদেরি মতো কলহাস্যে। এদিকে বড়োছেলেমেয়েদের ঘরের মেজেতে বসিয়ে পাঠ দিচ্ছেন সদ্য-পাশ-করা তরুণ তরুণী। খুশি তাঁদের হাসিতে, খুশি তাঁদের চোখে। আসবাবহীন পরিস্কার ঝাঁট দেওয়া মেজে তার শূন্য আকাশকে বিস্তৃত করে রেখেচে। কোনোখানে বাধা পড়েনি।

ইস্কুল যে হয়েচে একথা জেনেচে সকলেই। কারণে অকারণে পথে দেখা হলে শুধিয়ে নেয়, মেঘভারের তলে চমকাতে থাকে চাপা হাসি—শুনলুম নাকি, আপনাদের ইস্কুলটা উঠে যাচ্ছে? আহা!

অথচ বেদনা প্রকাশের তালটা সামলাতে না সাম্লাতেই শুনতে হয়—কৈ, কে বললে, না তো!

ইস্কুলবাড়ীর কিছুদূরের এক কিশোরী এসেছিল বাপের কাছে আর্জি পেশ করতে। বয়স হয়েচে তার, অথচ তার সংগে সমান পাল্লা রেখে বিত্তের দৌড় ছোটেনি। বিয়ের কথা চলছে এদিক ওদিক থেকে। সিনেমা থেকে অংগরাগ আর সংগীত ধার করে নিয়ে সে যেমনতর চলনসই হয়ে উঠেছে, সন্দেহ নেই, ভদ্রজনের পাতে পড়বার মতোই। তবু ক্ষোভ আছে তার মনে বিত্তের কমতিতে।

বাপকে গিয়ে বল্লে—ইংরেজী পড়্বার তো আর সময় নেই। ছোটদের সংগে পড়তে লজ্জা পাব। ওদের ওখানে যে বাংলা শেখাবার ক্লাশটা আছে তাইতে ভর্তি করে দাওনা।

অবাক হয়ে বাপ বল্লেন চেয়ার ঠেলে—কী বলছিস্?

মেয়ে জবাব দিল—পড়্ব।

বাপ বল্লেন—ওইখানে?

মেয়ে বল্লে—কেন কী হয়েচে?

—কী হয়েচে? বাপ বললেন—আইবুড়ো ছেলেমেয়েগুলো কেন ভিড় করে জুটেচে ওখানে? মরতে ছুটেচে উর্ধ্বশ্বাসে অথচ মাস গেলে পাইপয়সাও জোটেনা কপালে, সে কেন? বলেই হেসে উঠলেন বাপ, ঝাঁকি দেওয়া খিক্‌খিক্ তার শব্দ। মেয়ের কর্ণমূল পর্যন্ত রক্তিম হয়ে উঠল। ছুটে চলে গেল মুখে আঁচল চাপা দিয়ে। অথচ তারপরেকারই কোনো উৎসবে মেয়ের সংগে বাপ দেখা দিলেন ইস্কুল-প্রাংগনে। মেয়ের চোখে কাজল, ঠোঁটে গালে রং, আঁকা দুইভুরু, বুককাটা ব্লাউজের সূক্ষ্মতার ফাঁক থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্চে তলাকার সংকীর্ণ সংক্ষিপ্ত জামার আধখানা। শুনে গেলেন গান, কবিতা, দেখে গেলেন আলপনা-দেওয়া মেজেতে প্রদীপ জ্বলচে সারে সারে, তারি মাঝে মাঝে মাটীর কলসে কলসে আম্রকলি, আর দেখতে পেলেন আড়চক্ষে মরচে ঘোরাঘুরি করে ছেলেদের দল মেয়েদের পাশে।

এই ইস্কুল-গঠনের কাজে দেখা দিল অভিধা। প্রথম যেদিন তাকে দেখা গেল নারীদলমধ্যে অধ্যাপক দেখ্‌তে পাননি তাকে। ঝকঝকে নয়, তার চেহারা। এমন নয় যে হঠাৎ ঝলক দিয়ে টান্‌বে চোখকে। সে ছিল পেছন দিকে বসে। কাঁধটা হেলানো খেয়ালে, হাতদুটি আলগোছে ফেলে রাখা কোলেতে, চোখেমুখে একটি নিরুত্তেজিত ভাবনা।

এরপরে একদা ধরা পড়ল অভিধা। নিজেদের সাহিত্য-বাসরে দাঁড়িয়ে উঠে খাতা খুলে ধরল, পড়ে গেল অনায়াস সহজে :—

একবাক্যে বলে তো সবাই নারীমন
বৃহৎ সৃজন-ক্ষেত্রে ব্যর্থ অকারণ।

একান্ত সে আপনার হৃদয়ের ভারে
পাকে পাকে ফেরে ফেরে জড়ায়ে ফেলিছে আপনারে।

রসপাত্র রঙ্‌পাত্র ওষ্ঠপ্রান্তে নিয়া
সুধা তার একেবারে ফেলে নিঃশেষিয়া
'কিছু তার রাখে না যে বাকি
দূরে রাখি'
দেখে না সে কী তাহার নাম তার কী যে পরিচয়
অলক্ষ্য, অদৃশ্য, অলব্ধস্পর্শময়
তারি 'পরে পড়িয়াছে আসি;
পূর্ণতার বক্ষোমাঝে অপূর্ণের মায়াময় হাসি।

বলেতো সবাই—মায়াময়ী
আপন একান্ত ক্ষেত্রে নিয়ে যায়, দিয়ে যায়, রেখে যায় কই
নিখিল-লোকের হাতে সুধার-পশরা
বিরাট-চিহ্নিত-মন চিত্ত-স্পর্শ-করা।

বলেছে তো, নারী
আপনারি
সুখদুঃখ নিয়ে
মায়ামোহ দিয়ে
মায়ালোক করিছে রচন
জড়ায়ে ধরিতে তার আপনার ধন।

এইখানটিতে তার
পূর্ণ অধিকার,
তারপরে আর কিছু নেই
নিরাসক্ত দৃষ্টিতেই
আপনার শুভ্রাসন হয় যে রচিত
নারীর সে সাধ্যাতীত।

চমকে উঠ্‌লেন অধ্যাপক। অভিধার স্মিতমুখে, শান্ত চোখে, ক্ষণস্তব্ধ দু'টি ঠোঁটে, ঋজু দৃঢ় একটি সান্ত্বনা, তারি আলো-ছড়ানো ললাটের প্রান্তবেয়ে এলোচুল গাল বেয়ে বুক ছাপিয়ে নেমে পড়েছে অসংকোচে।

অধ্যাপক দেখচেন অভিধাকে, যেমন দেখে জহুরী। নানাদিক থেকে নানা রঙ পড়ল ঠিক্‌রে। দেখচেন তার পাশে ছেলেমেয়েরা কেমন জায়গা পেয়েচে অসংশয়ে। কেউ তার পাশে, কেউ বা কাঁধের কাছে, কেউ কোলে। কচি তাদের বয়েস, কাঁচা তাদের মন। প্রাণঝরণায় সদ্য আলোক-লাগা কাকলি। সেই কাঁচা সবুজের সংগে তার ঘন সবুজের রং মিলিয়ে চলেচে অভিধা, ঝুঁকে পড়েছে ওদের মুখে, ওরাও উঠে আসচে ওর হাঁটুর কাছাকাছি। চলেচে ছুটিতত্ত্বের আলোচনা! সহজপাঠপড়িয়ের দল ওরা। রবিবার কবিতাটি সুরে উঠেচে ভরে, ছেলেমেয়েরা উৎসুকদৃষ্টি মেলে মুখ তুলে ধরেচে উপরে। তবু মাথা নাড়িয়ে বল্‌লে একজন—চাইলে ছুটি, আমাদের ইস্কুলে কেন আসে রবিবার? অভিধা হাসিমুখে তাকাল তার দিকে। ওদের প্রত্যহের মাঝখানে আসন পেতেচে ছুটিতত্ত্ব। ইস্কুলের ক্লাশটিকে মনে হয় না পড়াবার ক্লাশ বলে। সে ওদের গল্পবলার ক্লাশ। ছুটির নির্মল অবকাশ ওদের সমস্ত প্রাণখানিকে ব্যাপ্ত করে। ভেতর থেকে বাঁধন খসেচে বলেই সেই বাঁধন খসাবার তাগিদ।

ভেতরে ভেতরে হয়তো এই ইস্কুল বানাবার কাজে একটা প্ল্যান ছিল অধ্যাপকের। সে নেহাৎই রসিক বানাবার নয়। মধ্যবয়সে তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল, রাজনীতিতে। তার একান্ত লক্ষ্য বিদেশী রাষ্ট্রশক্তির হাত থেকে দেশের মুক্তি পাওয়া। হয়তো ভেবেছিলেন অতিশিশুকালের সিক্ত কাদাভূমিতে যদি দেগে দিতে পারেন একটা ঈর্ষামিশ্রিত প্রবল বিদ্বেষভাব বিদেশী রাষ্ট্রশক্তির 'পরে, তবে যথার্থ কাজ করা হবে। বিস্মিত হয়ে দেখলেন, তার অবকাশ নেই। যে ঝকঝকে মনের বিজ্ঞানী দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়েচে আজকের তরুণদল, তারা কর্মের ক্ষেত্রে মোহরচনার আবেশকে বর্জন করতে চায়। তারা জাল বিছোতে চায় না, জাল গুটোতে চায়। মনে মনে এদের স্বীকৃতি দিতে হয়েচে অধ্যাপককে। প্রশংসা না করে পারেন না। তাঁর ইস্কুল থেকে তাঁর প্ল্যান পড়্‌ল খসে। দেখ্‌তে পাচ্চেন উপরের ক্লাশে বারো, তেরো, চোদ্দর, ছেলেমেয়েরা যে আলোচনা চালিয়েচে, যে ভাবে এবং ভাষায় সত্যিই তা আশ্চর্য। তাঁদের কালে তা সম্ভব ছিলনা। এদের শিক্ষকদের কাছ থেকে এরা বুঝতে শিখ্‌চে, কাকে বলে মুক্তি। সে যেমন বাহিরের তেমনি ভিতরের। সেই অন্দর

বাহিরে আলো না ছড়ালে মুক্তি নেই। বাইরের শক্তির নির্মম নির্দয়তা যতখানি ভয়ংকর, যত প্রবল হোক্ তার মার, আরো ঢের বেশি ভয়ংকর, বেশি প্রবল অত্যাচার তার মোহজড়ানো নিপুণ সেবার। তাতে চেতনাকে দিয়েচে পঙ্গু করে।

অফিস ঘরের চেহারাও আলাদা। সেখানে মেয়ে আর পুরুষ শিক্ষকের দল এসেছে পাশাপাশি। একটু একটু করে গড়্‌বার কাজে, উৎসবে, আলোচনাতে তারা নিবিড় হয়ে এসেচে। সেই নিবিড়তা যেন কোনো নিপুণ শিল্পীর হাতের রচনা। কোনো বিসদৃশ চেষ্টার কালিমা নেই আলাপনকে আচ্ছন্ন করে। মাঝে মাঝে তার যতি ভাঙলেও মৃত্যু ঘটেনি ছন্দের। চলেচে নানা আলোচনা, হাস্য-পরিহাস, কাজের আর অকাজের নানা টুকরো কথা। এমন কী ভাগাভাগি করে চলেচে ডাঁসা পেয়ারা খাওয়া। অধ্যাপকের ভাগ্যে পড়েচে একটু ভাপলাগা পেয়ারা, তার ডাঁসাত্বের স্বল্পতার কথা স্মরণ করে ঘরে উঠেচে তুমুল উচ্চহাসি। অধ্যাপকও যোগ দিয়েছেন খুশিমনে।

অধ্যাপক ভালো করেই জানেন—এর মূলে আছে অভিধা। অভিধার সমস্ত স্বভাব ঘিরে যেমন একটি নিবিড় গভীর নীরবতা, তেমনি একটি প্রকাশ-ব্যাকুল মুখরতা। ও ঢুকে পড়ে ঘরে, জায়গা নিয়ে কথা বলে যায় অসংকোচে, পেয়ারায় দাঁত বসিয়ে হেসে ওঠে কলহাস্যে। পরিহাসকালে পার্শ্ববর্তীর প্রতি বাঁকা কটাক্ষও কখনো হানে। বাতাবিলেবু ছাড়িয়ে নুন মেখে যখন ভাগ করে দেয় সকলকে তখন মুঠো ভরে ভরে দেয় মুঠ ভরে। পুরুষ সহকর্মীর হাতেও দেয় যথোচিত সহজে আপন হাত হাতের 'পরে রেখে, ওপর থেকে আল্‌গোছে ফেলে দিয়ে নয়। আঁটকরে কাপড় জড়িয়ে কোমরে কপাটি খেলেচে ছাত্রছাত্রী নিয়ে মাঝে মাঝেই, দেহভংগী স্পষ্ট হয়েচে সংকোচ আসেনি। অভিধাই প্রথমে ইস্কুলের সাঁতারে নেমেচে যথাসম্ভব আঁট আর খাটো সাঁতারু-পোষাক পরে। ওর মতে এইটেই স্বাভাবিক। এদিকে কোনও পুরুষ-সহকর্মীর সংগে আলাপনকালে একদা ঈষৎ শিথিল হয়েছিল তার বুকের বসন। ডান হাত তুলে জানালার গরাদে ধরা। খেয়াল হোলো যখন হাত নাবিয়ে নিলে চকিতে। রক্তিম হয়ে উঠ্‌ল। শাড়ী সরে দেখা দিয়েচে খদ্দরের মোটা ব্লাউজ। নারীর ইচ্ছাকৃত ঔদাসীন্যের মায়াবী আবেশের আভাস বলে লাগল কি তরুণ সংগীর মনে? সে লজ্জা, বড়ো লজ্জা। অথচ নগ্ন মনস্তত্ত্বের তাত্ত্বিক আলোচনায় অভিধা যে কেবলি চুপ করে বসে থেকে সম্মতি জানিয়েচে, তা নয়। স্পষ্ট ভাষায় সজোরে দাখিল করেছে তার মতামত, কিছুতে বাধেনি। বলেচে— সময় এসেচে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সেক্সের সত্যরূপকে দর্শন করবার। মোহের আবরণ তার খুলতেই হবে। তবু এও বলে রাখচি, মানুষের সাধনা নয় পিছু ফেরবার। মনে করে থাকো যদি তাকে টোটেমের কালের মতো মাঠে দেবে ভিড়িয়ে, মার খেতে হবে তোমাদের।

প্রশ্ন উঠ্‌ল—কী বল্‌তে চাও তুমি?

—বল্‌তে চাই, আজকের দিনে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোনো ক্ষুধাকেই গ্রহণ করতে মানুষ রাজী নয়, তার সেক্সকেও নয়। একদিকে তার বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ আর একদিকে। এই দুইয়ের মাঝখানটিতে যথার্থ সীমাটানাতেই মানুষের মানবিকতা।

—কিন্তু, মানুষকে যে দেখ্‌লেম ডাষ্টবিনের উচ্ছিষ্ট থেকেও আপনাকে বাঁচিয়ে রাখতে?

—ওই তো মানুষের সমাজের চরমতম পরাজয়। অভিধা বল্‌লে—ওকে বোলোনা সত্য, ও বিকৃতি। লোপ ঘটুক এই বিকারের। সহজ বলেই কেন স্বীকার করবে বিকারকে। বৈরাগ্যের সাধনা যথার্থ মানুষের নয়।

এরপরে একদিন এক বুড়ো ভিক্ষুককে দেখা গেল ইস্কুল-প্রাংগনে, কঙ্কালসার তার দেহ। অভিধা যেই হাত বাড়িয়েচে তার পার্সে, পার্শ্ববর্তিনী হাত ধরল চেপে। বল্‌লে জানো, ভিক্ষা দেওয়া কী অন্যায়। অভিধা বললে, জানি। তবু হাত সরাল না পার্স থেকে। হাত ছেড়ে দিয়ে বাঁকা হেসে বললে সংগিণী—তোমরা রাজরাণীর দলই পৃথিবীতে এনেচ ভিখিরীর দলকে। সাংঘাতিক তোমাদের দয়া করার ইচ্ছে। অভিধা ম্লান হেসে পার্স থেকে বার করলে একটা সিকি আর দু'আনি। মালিকে ডেকে বল্‌লে—পাশের দোকান থেকে বুড়োকে দইচিঁড়ে খাইয়ে দিতে। সংগিণী আপন পরিচয় দেয় কমিউনিষ্ট আর অভিধাকে বুর্জুয়া। তখন একটা বাঁকা সুর লাগে তার গলাতে। এদিকে ইস্কুল খোল্‌বার মাসকয় পরে যখন কিছু পুঁজি নড়া-চড়া করে অস্তিত্ব জ্ঞাপন করল থলিমধ্যে অধ্যাপক ভাবলেন স্বল্পবিত্ত ছেলেদের স্বল্প কিছু দেওয়া যাক্, যা বেতন নয়, যা নয় পুরো ফাঁকিও। অভিধাই সেখানে সমানে দাবী জানালে মেয়েদের আর যে পরিকল্পনা ছিল অধ্যাপককে সে ওপরের কোঠার এম, এ, থেকে সুরু করে নিচে দিককার ম্যাট্রিক পর্যন্ত সমান ভাবে ভাগবাটোয়ারার। ও জানে, এই তো সুস্থতার লক্ষণ।

অভিধা, অধ্যাপক জানেন, ও যে রুষিয়া। একান্তরূপে স্মার্ট নয় ও। কোনোদিনো শোনা যায়নি ওর চরণ তলে খুট খুট শব্দের দ্রুত আবর্তন। চটী পরে দেখা দেয় ইস্কুলে, স্নানশেষে সিক্ত কেশে। ছত্রাভাবে কোনো কোনোদিনো দেখা দিয়েচে গ্রাম্যজনের হাতে বোনা বাঁশের চুপ্‌ড়ি মাথায়। বাজার থেকে আপন হাতে টেনে এনেচে ছেলেদের জন্যে আনা মিষ্টির হাঁড়ি, ঘাম ঝরেচে কপালে, মুছেচে অঞ্চল-কোনে। অথচ কখনো কোনো বদরঙ্‌ লাগেনি শাড়ীতে। কোনো কিশোরী-ছাত্রী ফুলের মালা আনলে গেঁথে প্রচুর হেসেচে, গলা বাড়িয়ে দিয়েও বলেচে, এমন দুর্দশা তোর! ছাত্রী পালিয়েচে চকিতে।

কিছুদিন ধরে অধ্যাপকের মনে ধরা পড়েচে একটি কথা। সে অভিধাকে ধরা। সে পণের জন্যে অন্যায় করতেও তাঁকে বাধে না। এ তাঁর প্ল্যানকে যেমন করেই হোক্ কাজে খাটাবার অভ্যাসের ফল। অভিধাকে জায়গা দিতে চান সবার চেয়ে বেশি, বিশেষ সমারোহে। অভিধা বাধা দেয় সবল বেগে। সে দেখ্‌তে পায় এর আসন্ন ঝড়ের সম্ভাবনা। যে আসন ওর সত্যকারের সে আসন তো নিঃসংকোচেই গ্রহণ করেচে সবার হাত থেকে। যে আসনে চড়াবার বিষম ঠেলা সে নয় কল্যাণের। অধ্যাপক দেখ্‌লেন তার না বল্‌বার দীপ্ত, দৃঢ় তেজকে। যত দেখ্‌লেন, মুগ্ধ হলেন তত।

অভিধা—সে তো নয় সামান্যা, সে অসামান্যা, সে মহিয়সী। সে বন্ধু, জননী, প্রিয়া। তার আসনকে

বিস্তৃত করে জাল ফেললেন অধ্যাপক। এমনি সময় লাগ্‌ল নাড়া। ভূমিকম্পের আকস্মিক বেগঠেলা গতিস্রোতে নিচের বস্তু উঠে এলো উপরে। আমার গল্পের সুরু সেইখানটিতে।

থেকে থেকে অধ্যাপকের ভ্রু উঠ্‌ছে কুঁচকে। যেন খেলা করতে বসে খেলাটা মনোমত হয়নি। ঐ-যে কালো ছেলেটি, কলেজের পাঠ যার সাংগ হতে পারেনি অকস্মাৎ একটা প্রবল ব্যাধির আকস্মিক আক্রমণে, তারপর কেটেছে বছর কয় অথচ পড়াশোনার অভ্যেস আছে যথোচিত অর্থাৎ সাধারণ মাপের চেয়ে ঢের বেশি, ছাত্রছাত্রীদের যে পাঠ দেয় তাতে তোলাজলে স্নানের চেয়ে অবগাহনের দিকেই তার ঝোঁক, স্বল্পবিত্ত ঘরে বহু ভাই বোন নিয়ে মানুষ তাই ধোবাবাড়ির পাট-ভাঙা কাপড় জামায় যখন জমে ময়লা তখন ইচ্ছে থাকলেও পারেনা আর এক পাট-ভাঙা বদলিয়ে আস্‌তে, চওড়া কপালে এলোমেলো চুলে অভিধার মতোই যার বয়েস; তাকেই দেখা যেতে লাগ্‌ল অভিধার পাশাপাশি। এতে ক্ষতি নেই, এর অর্থ জানেন অধ্যাপক। ভাবনা নেই তাঁর। বরং মনে মনে আছেন খুশিই। ওর জাল বোনা রইল এখানে। শুধু ভাবনা জেগেচে মনে অভিধাকে নিয়ে। মাঝেমাঝেই সে ছেলেটিকে ঈষৎ উচ্চমধুর কণ্ঠের বকুনি দিয়েচে যখনি দেখেচে সে এসেচে অসুস্থ শরীর নিয়ে। আর যেদিন আসেনি, অধ্যাপকের মনে হয়েচে যেন অভিধা ভেতরে ভেতরে উঠেচে চঞ্চলিয়ে। তার সেই ব্যাকুলতার আভাস ছিট্‌কে পড়্‌চে যেন ঈষৎ-ব্যাকুল-কর-সঞ্চালনে, ক্বচিৎ চকিত পথ-চাওয়ায়। তখনি অধ্যাপকের ভ্রু ক্ষেপেচে।

অভিধাকে বল্‌লেন ডেকে—"আচ্ছা, অভিধা, অজিত কী তোমাকে বিরক্ত কর্‌চে?"

—"বিরক্ত করচে—অজিত—আমাকে"—

—"না না, ঠিক্ তাই নয়—ওকে যেন তোমার বড্ডো পাশাপাশি"

"—সে-কী, অভিধা বল্‌লে অসংকোচে—সে তো তাকে ডাকি বলেই।"

"হাঁ হাঁ, ডেকো ডেকো, ডাক্‌বে বৈ-কি। আমি বলি কি, অজিত তোমার সেতো ছোট ভায়ের মতো। তাকে ডাকো তাতে ক্ষতি কী?" হাস্‌তে গিয়ে চুপ করে গেলেন। অকস্মাৎ দু'পা গেলেন এগিয়ে, অকারণে কাঁধের ওপর পাঞ্জাবীটাকে জড়ো করে অভিধার দিকে চেয়ে হাস্‌লেন ম্লানহাসি।

একটা চমক লাগ্‌ল অভিধার। বুঝতে পারল কী ভাবনা অধ্যাপকের। গম্ভীর হয়ে বল্‌লে,—"নাও তো হতে পারে ভাই।"

অধ্যাপক ত্রস্ত। বলে উঠ্‌লেন—"বন্ধু। ও তো হতে পারত মেয়ে।"

—"হতে পারত, হয়নি।" আরো গম্ভীর অভিধা। বললে—"অজিত আমার পুরুষ-বন্ধুই।"

—"কিন্তু, পুরুষ-বন্ধু তো তোমার আরো আছে অভিধা!" কণ্ঠে ব্যাকুলতর বেগে, দু'চোখ মেলে দিয়েছেন অভিধার দিকে।

—"আছে।" অভিধা আরও স্পষ্ট হোলো। বললে—"অজিতকে আমার ভালো লেগেচে।"

—"ভালো লেগেচে, অজিতকে? এ-কী অজিত জানে?" তাঁর গলা ভেঙে গেল। দু'হাত চালিয়ে দিয়ে চুলে বসে পড়্লেন চৌকিটার একপ্রান্তে।

—"জানে।

মুখতুলে গম্ভীর হয়ে শুধোলেন—"তুমি তাকে জানিয়েচো?"

অভিধা বল্লে—"মুখে জানাবার কী প্রয়োজন আছে?"

হঠাৎ ক্ষেপে উঠলেন। এধার থেকে ওধার পর্যন্ত ছুটে এসে আর্তনাদ করে উঠলেন। "কী করেচ কী করেচ তুমি।"

—"কী করেচি?" অভিধা শান্ত।

—"কী করেচ, জানো না?" ভেতর থেকে একটা দুর্লক্ষণ ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে উঠতে লাগল। তারপরে পড়্ল ফেটে। অধ্যাপকের কণ্ঠ চড়ল উচ্চগ্রামে। গলা থরোথরো। "কী করেচ! তুমি আমার উৎস-স্বরূপিণী, আমার আনন্দ। আমার আশা। তোমার নন্দিনী আনন্দ দান করুক সর্বজনকে। ঝরুক মধু, তোমার প্রতিভার পায়ে মাথানত করুক মুগ্ধপুরুষের দল, ছেলেমেয়েরা আসুক ঘিরে। তোমার যে আগুন, সেই আগুনে হোক তাদের অগ্নিপরীক্ষা। তুমি আমার অগ্নি-সম্পদ। তুমি কেন ধরা দিলে অজিতের কাছে। কেন থাক্লে না মুক্ত, কেন থাকলে না!" অধ্যাপকের চোখ রক্তবর্ণ, সমস্ত দেহ কাঁপছে থরথর করে।

ভেতরে ভেতরে মর্মরিয়ে উঠ্ল অভিধা। একটা বিরূপ বিদ্বেষে দেহ মন উঠ্ল বিষিয়ে। দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁটে বেরিয়ে এলো বারান্দায়। বুঝতে পারলে অধ্যাপকের কাছে অভিধা তত্ত্বস্বরূপ। সে শক্তি, সে আনন্দ, সে আবেগ—আবেশ। বারান্দার রেলিং চেপে ধরে মাথাটা বাইরে হেলিয়ে দিল অভিধা। কপালে এসে লাগ্ল একপশলা ভিজে হাওয়া। বৃষ্টি হয়ে গেছে খানিক আগে। দূরে দীর্ঘ ঋজুদেহ বকাইন, তারিতলে চরচে গোরু ভিজে ঘাসে ঘাসে মুখ ডুবিয়ে ডুবিয়ে—কালো, শ্যামলা, ধবলী, পাটলী গাই। পেছনে কালো রোগা ছেলে, ময়লাধুতি মালকোঁচা করে পরা। এদিকে মাধবীলতা উঠেছে লতিয়ে, নরম সবুজ মাধবীলতা, অথচ তারিতলে তিনটে কুকুরে মত্তচে কামড়াকামড়ি করে। আপনাকে শান্ত করলে অভিধা। জানে অধ্যাপকের জীবনে এ-ই হ্লাদিনী মন্ত্র-মোহ জুড়েচে জায়গা। দেশের চিত্তভূমিতে যে খোরাক ওঁরা জুগিয়েছেন তা খাদ্যের নয় নেশার। সেই নেশার ঘোর জমে রয়েচে এখনও আপনার মধ্যে।

ফিরল ঘরে, দেখল অধ্যাপক নেই।

এর দিন পনের পরেই অভিধার ডাক পড়ল অধ্যাপকের গৃহিণীহীন গৃহে। তাঁর আপন ভাইপো অবনীশ আসবেন দূর প্রবাস থেকে, তাঁকেই আতিথ্যদানকল্পে। অতি শিশুকালেই অবনীশের বাপ মা গিয়েছেন মারা। সেই থেকে জ্যাঠা তাঁর একাধারে মা আর বাপের আসন গ্রহণ করলেন। সেই জ্যাঠা এমন করে গ্রহণ করলেন যে তাঁর আপন ছেলেরও বাড়া। কেননা, স্ত্রীর শক্তমুঠি ছাড়িয়ে অধ্যাপকের আপন ছেলেমেয়েরা এসে পৌছয়নি বাপের দিকে। মায়ের দিকেই তাদের টান। এতদিন পরে অবনীশকে দেখে অধ্যাপক ছলছলিয়ে উঠলেন। মোটা মাইনের চাকরী, প্রচুরতর উত্তরাধিকৃত-বিত্ত, প্রবলতর স্বাস্থ্য, বিদেশী য়ুনির্ভাসিটির গোটা দুই তিন ছাপ তবু পড়ে আছে দূর প্রবাসে একাকী, একলা, এমনি ক্ষ্যাপা। বয়স হয়ে গেছে। বল্‌লে বলে—বিবাহযোগ্যা কন্যার দর্শন মিল্‌ল কৈ। কী পাগল! সত্যিই কি মেয়ে নেই ওর মত ছেলের? অধ্যাপক হাসলেন একটু।

অভিধার আতিথ্য আন্তরিক। নিখুঁত না হলেও ত্রুটি নেই তার। অধ্যাপক দেখচেন খুশি মনে। খেতে বসে অবনীশ বললেন—"এই মাছ, ট্যু—গুড। বলুন এর রচননীতি। ফিরে গিয়ে ডিরেকশান দেব আমার নীরিন্দরকে। আমার বাবুর্চি বলুন, রাঁধুনি বলুন, ভাঁড়ারি বলুন, সেই সব—

"কী বল্‌চেন, কী সাংঘাতিক!" খিলখিলিয়ে উঠল অভিধা। "নীরিন্দরের পরিবেশনে মনে আনবেন অভিধাকে? তার আগে গিন্নী আনুন ঘরে।"

অবনীশ বল্লেন, "আজকের গিন্নী আর যাই হোন রাঁধুনী নন।"

আকাশ থেকে পড়ল অভিধা। চোখবড়ো করে বল্‌লে—"নারীকুল-লজ্জাদায়িনী বলুন। আমাদের প্রধান-অস্ত্রই তো রান্নাঘর, তাকে ছাড়বে কোন নির্বোধিনী। আপনাদের পাকযন্ত্রে একটা ব্যাপার ঘনিয়ে তুলে সেটাকে হৃদযন্ত্র পর্যন্ত ঠেলে বিকার করারি তো কাজ আমাদের। দেখেননি কি, পাঁচবাটি সাজিয়ে পাখা হাতেই আমাদের সব চেয়ে চোখা-চোখা বাণ ছোঁড়বার কী অনায়াস-নৈপুণ্য।"

বাক্যবাণ-লুব্ধ অবনীশ উঠলেন রাঙা হয়ে। অধ্যাপকের মুখে ফুটে উঠেচে সকৌতুক হাসি। ভালো লাগচে অভিধার এই ছলনাময়ী ললনাকে। তাঁর ঝিকিমিকি হাসির মাঝখানে কেবলি মনে বাজতে লাগল, ভালো করেচি, ভালো করেচি দীর্ঘদিন পরে অবনীশকে দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাতে ফল দিয়েচে।

অবনীশের যাবার সময় এলো রাত্রে। সারাদিন গেছে পরিহাসে, আলাপনে। মাঝখানে তর্ক জুড়ে দিয়ে শেষকালে সংগীতে সমাপ্তি টেনেচে অভিধা। পাশের ঘরে শোনা গেল অবনীশের কণ্ঠ বিদায়-কালের প্রস্তুতসাধনাতে—

"কেন বাজাও কাঁকণ কণকণ, কেন বাজাও" এঘরে অধ্যাপকের চোখ জলে ভরে এলো। দরজা খুলে এলেন অবনীশ। আলুথালু য়ুরোপীয় পোশাক। গাড়ীতে চড়ে বল্‌লেন অভিধাকে—"খুশি নিয়ে গেলেম আপন মনে, হয়তো আপনাকে করিনি খুশি।' টুপি খুলে হাতে ধরা।

—"সে-কী," অভিধা বললে মৃদুস্বরে—"খুশি কখনো একলার নয়।

—"মনে রইবে এই কথাটি, গুড্‌নাইট। গুড্‌নাইট জ্যাঠামশাই।"

গাড়ী চলে গেল। ঘরে ফিরে অধ্যাপক বিছানা আঁকড়ে বালিশে মুখ গুঁজে দিলেন।

পরদিন অভিধার কাছে আসছেন অধ্যাপক। একটা ঘোর তাঁর চোখের কোনে। উনি মেলে উধাও হয়েচে কোন দূর প্রবাসের রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রভাতে, যেখানে অভিধাকে আর অবনীকে চলেচে পাশাপাশি আর পৌছেচেন অধ্যাপক। যেখানে সরু-মোটা ডাক উঠেচে—জ্যাঠামশাই। উঠেচে অভিধার খিলিখিলি।

বললেন—"অভিধা, তুমি একলা কারুর নও, তোমার নিজেরও নও। তুমি সমস্ত দেশের। দুঃখ থেকে তোমার বাঁচতেই হবে, নইলে সেই দুঃখ তোমায় গ্রাস করবে তিলে তিলে।"

অভিধা অধ্যাপকের মুখে চোখ রেখে স্থির হয়ে রইল।

—"এখনো সময় আছে।" তার কাঁধে ঝাঁকি দিতে দিতে বললেন—"অভিধা, শোনো অভিধা, শোনো, তোমাকে ফিরতে হবে। আমি নিশ্চিত বুঝেচি, ঘর চাই তোমার। তুমি যে মেয়ে। ঘরে তোমার সত্যকার আসন বিছিয়ে যে তোমাকে ত্রাণ করতে পারবে দুঃখ থেকে সে অজিত নয়, সে অবনীশ।"

—"ভয় পাচ্চেন কেন দুঃখকে—দেখেচেন কি ক্ষুধার দুর্জয় বীভৎসরূপ?"

—"হাঁ দেখেচি।"

—"তবে তার হাত থেকে ত্রাণ পাবার সাধনা থাক আমার আপন হাতেই। সে অজিতেরো নয়, অবনীশ বাবুরো নয়।

হঠাৎ এলো উত্তেজনা।

—"না না, শোনো অভিধা। কেন নষ্ট করবে আপন শক্তি। সেই সঞ্চয় থাকনা জমা দেশের বাণিজ্যেই। দেশের মুক্তি কী চাইনে?"

—"দেশের মুক্তি চাই বলেই কী চাই? সে তো তাকে বোধ করেচি বলেই।"

—"ঠিক্ বলেচ, ঠিক। এইতো তোমার বুদ্ধি হয়েচে শান্ত।"

—"আমি শান্তই আছি।" অভিধা হাসলে। "কিন্তু, সঞ্চয় কী? মানুষের আসনজোড়া অপমানের তলে মাথানত না করবার লেশতম প্রয়াসও কী নয় দেশের সঞ্চয়? আর দেশ বলে কাকে? সে-কী মাটি, সে-কী পাথর? আমার প্রিয়জনের মর্মভূমি কী নয় দেশের মর্মভূমি?"

চোখ উঠল জলজলিয়ে, ললাট উঠল কেঁপে। বললে—"আমি দেখেচি অজিতকে। কী প্রচণ্ড

বন্ধনে বাঁধা। রাষ্ট্রিক বন্ধনে, সামাজিক বন্ধনে, আর্থিক বন্ধনে। এমন কী ভাগ্যদেবতার হাত থেকে দেহখানার 'পরেও ত[illegible]স পেড়েছে অজস্র।" জলজ্বলে চোখের 'পরে পড়ল চকিত মেঘের ঈষৎ আভাস [illegible] ছলোছলো [illegible] বাঁধন খসাবার কাজে কিছুও কী পারব না আনতে? আমি তো [illegible] বাঁধন [illegible] দেশের [illegible] খসানো।"

এক মুহূর্ত চুপ ক[illegible] থেকে বললে—"কিছু পূর্বেই বলে গেছেন, ঘর চাই আমার, আমি মেয়ে। [illegible] থাক তার কোনোদিনের জন্যে। শুধু বলতে চাই—আমার অজিতকে চাই।"

[illegible] তুমি শক্তি ক্ষয় করবে অজিতের জন্যে?"

—"হাঁ। কিন্তু, সে ক্ষয় বলে নয়। সার্থক হতে হবে আমাকে, সার্থক হতে হবে আমার অজিতকে।"

—"অভিধা।" যেন বাজ পড়ল ঘরে। "এ তোমার আপনাকে ভোলানো। তোমার অন্ধ আবিষ্টতা তোমার মৃত্যু। সার্থক হতে চাও যদি এসো বহুজনের মাঝখানে। প্রতিভার সার্থকতায় একজন মিথ্যে।"

—"কিন্তু, অবনীশ বাবু?"

—"সে তো এক নয়। সে তোমার বহুজনের দ্বারকে রোধ করবে কী বলে! তোমার দুঃখ থেকে তোমাকে সে [illegible] করে বাঁচুক—সার্থক হও তুমি। [illegible]র ঘরছাড়া সেই ক্যাপাটাকে ঘর দাও অভিধা। ধন্য হোক অবনীশ।"

অভিধা হাসলে, আশ্চর্য সেই হাসি। বললে—"মাষ্টারমশাই, আমার দুঃ[illegible] হরণ করবেন কী করে তিনি? [illegible]র কাকে দেবো আমি ঘর? ফুটো ঘটিতে জল ঢালবার প্রয়াসকে বলব কী?"

—"অসাধ্য সাধন।"

অভিধা দৃঢ়স্বরে বললে—"না, সে কোনো সাধনাই নয়। আমার জীবন দিয়েই আমি ব'লে যাব, [illegible] ডাক পৌঁছেচে আমার জীবনে। আমার বহুজন আহ্বানের প্রাঙ্গনভূমিতে সেই হয়েচে আমার সঙ্গী।"

—"অসম্ভব।"

—"অসম্ভবই। সম্ভবের সাধনাকে একটি জীবনে নিয়েছিলেন বলেই ব্যর্থ হোতে হোল।"

—"কী! এতবড় অশ্রদ্ধা!"

—"অশ্রদ্ধা নয়, অভিজ্ঞতা।"

—অভিজ্ঞতা! অর্জন করেচ কার জীবন থেকে?" দাঁতে দাঁত চেপে বললেন—"আমার।"

অভিধা [illegible] বললে—"[illegible] আপনার।"

[illegible]। আলুথালু [illegible] রইলেন অধ্যাপক। তারপরে গেলেন বাহির হয়ে। যাবার কালে বলে গেলেন—"[illegible]

এইথানে সংক্ষেপে অধ্যাপকের জীবন-নাট্যের একটু পটভূমিকার আভাস দিয়ে রাখি।

অধ্যাপকের জীবনে সবচেয়ে যে রস প্রধান সে তাঁর রোমান্স [illegible] সুর-পেয়ালা [illegible] তাঁর জীবনে। কেবলি উপচে গেল, আকার পেল না। কিশোরকাল থেকে শেলী কীটসে [illegible] লেগেচে দোলা। প্রথম যৌবনে, বয়স যখন আঠারো, মানসী পরিকল্পনা তিলতিল করে মূর্তিধরার আকাঙ্ক্ষায় একটা অদৃশ্য বাষ্পবেগে পূর্ণকরে তুলচে গভীর-গহন-লোক, তখন হোলো ওঁর বিবাহ। [illegible] বৃষ্টি পড়চে ঝপঝপিয়ে। পালকি বেহারা পলাতক। দশ মাইল পথ ভেঙে চল্‌তে হোলো। বিবাহের [illegible] চন্দন-আঁকা কপালে, মালাগলায় চলেছেন ঘোড়ায় চড়ে। ঘোড়া ছুটচে টগবগিয়ে, মনে জাগচে কালিদাস, যেন পার হয়ে চলেছেন কোন্ বিরহ-লোক।

শেষে দেখা গেল তাঁর স্ত্রীর স্বভাব হোলো একেবারে তাঁর উল্টো। ঢিলেঢালা ভাবখানা নয় তাঁর [illegible] শক্ত, আঁট মুঠি। যা বোঝেন ভালো করেই বোঝেন, যা বোঝেন না, সেই আভাস-ইংগিতের বাষ্পবেগের ঠাঁই নেই তাঁর ঘরে। অধ্যাপকের সংসার হোলো ভালো। স্ত্রীও হ'তেন যদি ঢিলেঢালা তবে ভাঙাকুলোর হাওয়া লাগত তাঁর সংসারে। অতি দুর্দশার দিনে ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসারতরণীর হালচেপে ধরে উত্তীর্ণ করেচেন অধ্যাপক-গৃহিনীই—এমন কি স্বামীকে [illegible] সেজন্য অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আছে আজো স্বামীর মনে। তবু বোধকরি তাঁর ভেতরে ভেতরে কোথায় একটা ঠোকর লাগত। পাওয়া গেল তো; জলধারা পাশে বালুতট কিন্তু কোনখানে, কোনখানে সেই গঙ্গাযমুনার ধারাসঙ্গম? একদা বলেছিলেন স্ত্রীকে—আমার ফেরবার প্রতীক্ষা কোনোদিন দেখতে পেলুম না তোমার মধ্যে। রোজই দেখতে পাই সংসারের কাজে। [illegible] তো জানো, তার স্ত্রী গা ধুয়ে উঠে 'পরে কালোপেড়ে শাদা শাড়ী, সকলকে লুকিয়ে রেখে আসে একমুঠো ফুল বিছানার পাশে। তিনি বল্‌লেন—ছিঃ ছিঃ গলায় দড়ি আমার, স্বামী ভুলোতে হবে। তারপরেই উঠে গেলেন রান্নাঘরের কাজে।

অধ্যাপক এই গল্পটি বারবার করে করেচেন অভিধার কাছে [illegible] চেয়েছেন তাঁর স্ত্রীর মহিমা। অভিধা মনে মনে হেসেচে। মনে জানে, যদি ভুলোতেন স্ত্রী, হতেন খুশি। দেহকে সুন্দর করা যে কেবলি ভোলানো নয়, সে-যে আপনাকে মেলে ধরা সে অভিধার মতো অধ্যাপকও জানেন। তাইতো এই শেষবয়সে [illegible] দিন দেখেন শাদাশাড়ীর কালো রেখায় ভরা পাড় অভিধার অংগে, পরিষ্কার মুখে ললাট অনাবৃত এলো খোঁপার গুচ্ছ, খুশিতে বলে ওঠেন—বাঃ।

এরপরে দেশের চিত্তভূমিতে মুক্তিকামনার ঢেউ যখন জাগল, অধ্যাপক পড়্‌লেন ঝাঁপিয়ে। অভিধার মনে হয়েচে দেশমুক্তিকামনার গহনগভীর-তলে জড়িয়েছিল অধ্যাপকের অতৃপ্ত রোমান্সরসের আকুল-বন্ধতা। সেইটেই ছাড়া পেতে চেয়েচে এমনি ব্যাকুলবেগে। মোটা মাইনের [illegible] দিকে দিকে রব উঠ্‌ল,—আশ্চর্য। যে বাণী দিতে লাগলেন বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তার ভাবে, আবেগে [illegible] জন। তাঁর অংগুলী হেলনে তাঁদের অনেকে উঠ্‌ল, ছুট্‌ল, মর্‌ল। তারা প্রশ্ন করেনি, তর্ক করেনি। স্থির বিশ্বাস

নিয়ে আদেশ ...লেন ... রেছো। শেষপর্যন্ত পচেছে কারাগারে। সে অপূর্ব। দেশে দেশে তরুণচিত্তজয়ের আনন্দ, ... র। কারাগা... র ভাষা। এমনি করে বয়স গেল চল্লিশের ঘাট পেরিয়ে পঞ্চাশের দিকে। তাঁর জীবন... একটু ... র ঝলকানি।

...য়েছেন পূর্ববঙ্গের ... দেশে। উঠেছেন অপরিচিত বাড়িতে, তাঁর পরিচয় তাঁদের কাছে বড়ো নামের ... ক্ষরে। ভক্তিতে অভিভূত তাঁরা। সেই সময়ে দেখ্‌তে পেলেন পঁচিশ বৎসরের অবিবাহিতা তরুণীকে। ... আগুনের মতো। গ্রামগ্রামান্তর থেকে তরুণ তরুণী ফিরচে তাঁর পাশে। তনুদেহলতা ক্ষিপ্রবেগে তন্মুতন্ম ... ত ওষ্ঠে নির্দেশের ইংগিত। সেই মেয়ে এসে ওঁকে প্রণাম করলেন। ভেতরটা উঠ্‌ল কী করে। তাঁর সংগে কাজের বন্ধনে যোগ হোলো। দেশকে নিয়ে তাঁর যে উন্মাদনা এই মেয়েটিকে নিয়ে তার চেয়ে লেশমাত্র কম নয়। কী ভাবনা, কী বেদনা, কী নিরতিশয় সংশয়। কী করে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবেন কারাগার থেকে, কী করে দেখ্‌বেন তাঁর বিধবা মাকে, এই তাঁর উদ্বেগ। এদিকে রান্নাঘরে চপ গড়্‌বার কাজে তার স্ত্রীর ভুরু উঠল ক্ষেপে। মেয়েটিকে যখন আনলেন সংসারে কিছু দুর্দশামোচনকল্পে, স্ত্রী সরাসরি বললেন মেয়েটিকে, এই যদি তোমার মনে, তবে করো তোমরা ঘর। আমি কী তোমাদের জোড়াতালি ... কেউ, আমাকে দিয়ে ... সে চল্‌বে না। মেয়েটি আর একবার প্রণাম জানিয়ে বললেন—"...নি আমার বড়োদাদা।" ধাক্কা লাগল যেন, অধ্যাপকের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগ্‌ল। তবু জায়গা রইল জীবনে, এই সান্ত্বনা। তখন বছর পাঁচ, ছয় কেটেচে, ...বাপরে কাট্‌ল সাত, আট বৎসর। খবর পেয়েছেন মেয়েটি দীর্ঘকাল কারাগারে। ইতিমধ্যে সহকর্মীদের সংগে তাঁর ... বিরোধ। পদত্যাগপত্র ... দিয়ে বসেচেন আপন সম্মান রক্ষা করে। তারিপরে দেখা দিল ইস্কুল গড়বার ... । সেই ইস্কুল গড়্‌বার কাজে ...র তরুণীব্যূহকে দর্শন করে অধ্যাপক-গৃহিণীর ধিক্কার জাগল দাম্পত্যে।

...দন মালী ... অভিধার কাছে। বল্‌লে—"বাবুর অসুখ।"

ঘরে ঢুকে অভিধা চ... । একদিনের মধ্যে এ-কী বদল করে দিয়েচে মানুষকে। চুপসে গেছে মুখ, আর্ত-বেদনা দুটি চোখে, কালো ...দরটানা বুক পর্যন্ত। পাশে বসে কপালে হাত রেখে স্নিগ্ধকণ্ঠে ...শুধোলে—

"কেমন আছেন?"

অধ্যাপক কেঁদে উঠলেন হু হু করে—"আমাকে ছেড়ে যেয়ো না তুমি। অভিধা, তোমাকে ছেড়ে যে আমি বাঁচিনে। বলো, তুমি রাগ করোনি?"

অভিধা মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌লে—"না, করিনি।" যে আঘাত দিয়েচে আপন হাতে তারি ক্ষতচিহ্ন দেখ... ক করলে এই রোগশয্যাতে ... ক্ষত দেবে জুড়িয়ে।

... গেছে কেটে। অন্ধকার ঘন হয়ে নেমে আস্‌ছে। সন্ধ্যা উৎরোবার মুখে। আলো হয়নি ...। অভিধা অধ্যাপকের বুকে হাত বুলিয়ে চলেছে নীরবে। কিছু আগে সে কিছু বলেছে, ধরাগলার

সেই গুঞ্জন গুণগুণিয়ে ফিরছে অধ্যাপকের মনে। মন উঠেছে ছলছলিয়ে। জানলা দিয়ে দেখা যায় ছিন্নমেঘের অন্তরালে বাঁকা শ্রাবণী-চাঁদ। হঠাৎ দুর্বল ডানহাতখানি আস্তে বাড়িয়ে দিয়ে অভিধার দিকে, মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন,—"মা, আমি স্বীকার করলুম অজিতকে, ... তুমি ... তুমি আমার আর কোথাও বাধবে না।"

তারপরে দুর্বলকণ্ঠে দিয়ে চললেন তাঁর পরিকল্পনা। কী তার উৎসাহ, কী সুন্দর ... সারবার পরে কী ক'রে বেড়াবেন তাঁরা।" এ পাশে তাঁর অভিধা, ও পাশে অজিত। ... আয়োজনে আহ্বানক তিনি, দুটি মাত্র তাঁর অতিথি। তিনজনের সেই ছুটি-উৎসবে ... কোথায়ো। ক্যারিয়ারে থাকবে লুচিতরকারি, কোনোদিনো রুটি-কলা, কোনদিনো বা দই-চিঁড়ে। তারি সংগে ঢাকা ঘটিভরা জল, পকেটে ছোট এলাচের কৌটো, একটা গেরুয়া-রঙা খদ্দরের থলে তাঁর আপন হাতে। ঝিরঝিরে জলবওয়া-বালুদেখা নদীতীরে মুখধুয়ে বসবেন তিনজনে মহুয়া-বটের মিলোল-ছায়াতে। সেই ছায়া-ঘনানো নেশাভরানো ছায়ায় অভিধা খাবার ভাগ করচে শালপাতে। মুখে তার খুশি, খুশি পড়চে ঝরে খাবার-ভাগ করা আঙুলের ডগা দিয়ে। খাওয়া সেরে খদ্দরের-থলে থেকে বেরুবে অভিধার লেখা খাতা, পড়বেন—

মধ্যে অনন্ত পারাবার—

এ পারে তার একজন

অন্যজনা আরেক পারে।

পড়তে পড়তে হঠাৎ কখন উঠে যাবেন অধ্যাপক। অসমাপ্ত হবে সমাপ্ত। ওদের হাত কখন পড়বে হাতে।"

অকস্মাৎ গলায় তাঁর লাগল যেন বেদনা। তারে ... দিলেন ... খুশির ... বলে উঠলেন—

"ক্ষণকালের রাগিনী ধরিয়ে যখন দেখা দেবেন ফের, ... উঠবে থলে—ঘটি—ক্যারিয়ার, শুরু হবে নদীতীর ধরে যাত্রা। ফেরার কালে অভিধার ক্লান্ত-নিবিড় কণ্ঠে লাগবে উদাস-মধুর-পূরবী—"এইতো আমার আনন্দরে

এইতো আমার আনন্দ।"

একেবারে স্তব্ধ হলেন অধ্যাপক, তার গুনগুনানি ... থেমে। বাইরে শোনা গেল কার পদশব্দ। ঢুকল অজিত। কী হোল যেন, ... নামল ঝড়। ক্ষীণ দুর্বলতর দেহে শয্যাতল-লীন অধ্যাপক অকস্মাৎ সেই অন্ধকারেই ছুটে গেলেন বেরিয়ে। অবাক লাগল অজিতকে ... একবার এসেছিল দেখা করতে। সেদিনেই জেনেচে প্রার্থনায় না, তার দর্শন ... ইচ্ছে করেই ... তাকে দাবী করে। আজকে ওকে নাড়া লাগল।

দেখা দিত পলকে অক্টোপাসের লালাসিক্ত চট্‌চটে একটা উন্মত্ত আলিঙ্গন [illegible]। তবু তারোপরেও তো পড়েচে গোধূলি-বেলাকার শেষ রক্তিমরাগ, সজল আঁখি কোণে [illegible], হাতের [illegible] আশ্বাসনা। মনে মনে জপেচি— জয় হোক, জয় হোক এই সুন্দরে [illegible] মানতে পারবনা ওকেই মানুষের একান্ত বলে। মানুষের জিৎ তো এই [illegible]

আমার জন্যে রচিত হয়েছে নিন্দার নরকলোক। একদা যে মেয়ে ছিল নন্দন লোকের নন্দিনী, [illegible] প্রথমা, সেই অতি অনিন্দনীয়ার ধরা পড়েচে অতি নিন্দনীয়া দিক্। বিশ্বাস করতে [illegible]। তবু বিশ্বাস করতেই হোলো শেষে।

উলটো দিকের দেখায় দেখা গেল তাকে দশের ভিড়ের তলায়, নোংরা নর্দমার ধারে। কাদা ছুটেছে তার। ঘরে ঘরে যে আসন ছিল পাতা, ধুলোয় লুটোল তারা। ভাবনা কোরোনা অজি, ভয় নেই আমার তার জন্যে। ভাবনা কোরো যে, বিশ্বাস ভাঙল। ভাবনা কোরো যে, দেখতে পেলেম মানুষের ভালোবাসাকে মানুষের অতৃপ্ত চিত্তের অন্ধ-ক্ষুধায় পায়ের তলায় মুখ থুবড়িয়ে পড়তে।

আমি বুঝতে পেরেচি, অধ্যাপক চেয়েছিলেন আমাকে। সেই চাওয়াকে জোর করে [illegible] বলতে তাঁকে বাধিয়েছিল তাঁর বয়সে। যদি তাঁর [illegible] মাপ থাকত [illegible] মাপের [illegible] কিছুতে হার মানাত না তাঁকে। দু'হাত তুলে বলতেন—মাভৈঃ, জয় হোক আমার অভিধার। বয়সের বিস্তীর্ণ ব্যবধানটাই বেড়া লাগাল তাঁর [illegible]চিতে। তোমাকে সত্যি বলি অজিত, [illegible] কিছুতে কিছুতে বাজেনি। মানুষের [illegible]কাটিহারা যে মাপ রয়েচে মনে মনে, লোকে লোকে, তাকে দেখতে পেয়েছি [illegible]। শুধু কাঙালপনা আমাকে সয়না। কোনোদিনো যদি সময় আসে তোমার কাছ থেকে দূরে আসার, নিশ্চিত বলছি, ফিরব প্রসন্ন মনে। বলব—জয় হোক অজিতের। বলব—যে অজিত [illegible] মধ্যে জয় হয়েচে তার, অভিধাকে ছাড়িয়েও রয়েচে যে অজিত আজ তারো [illegible] জয়। [illegible] খুশির [illegible]

আমি যে দেখলাম ওঁর কাঙালপনা। উনি চেয়েছিলে[illegible]ক নিবিড় [illegible] ব্যক্তিস্বরূপের সেই চাওয়ায় দেখা দিতে চায় কুশ্রীতা। তিনি [illegible] জানতেন, আমার যে-পালে হাওয়া লেগেচে তার দিকে, তার রঙখানা শাদা। তাই ঠিক করেছিলেন আমাকে গ্রহণ করে [illegible] আদর্শের মাঝখানে। ভেবেছিলেন অভিধার সংগ রইল তাঁর আপন স্বপ্নলোকে। যেন ত[illegible]ছিল [illegible] হবে সব কুশ্রীতা। কিন্তু অজিত মানুষের আদর্শ তো মানুষেরি আপন মাপে তৈরী। সেখানেও যে বলি চলে মানুষের সেও সংঘাতিক। একমাপে তো সবাইকে [illegible]টে না।

একথাও বলব যে অধ্যাপক ভালোবেসেছিলেন আমাকে। সেই ভালোবাসা ভালোলাগার দিকে। তাঁর মনের মধ্যে আমার দিকে [illegible] অন্যায়ের বোধ সে তাঁর [illegible], সেখানে দৃষ্টি ছিল জাগ্রত। ভেবেছিলেন দেহেতেই চলে অমিতাচার। কিন্তু আমি যে মুক্তির সূত্রপাত [illegible] ফেলা বাসনার মত্ততার আবেশ থেকে—যে জালে অন্ধ তিনি [illegible]তে

পেতেন অভিধাকে, তাঁর আদর্শের হাড়িকাঠে মাথা গলিয়ে নয়, তার আপন আদর্শের সৃষ্টিকে উত্তীর্ণ [illegible] প্রস্তুতাতে, যদি [illegible] বেশি জায়গা দিতে পারতেন জীবনে।
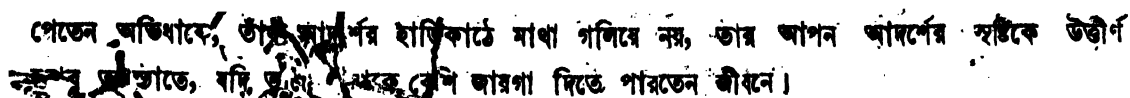
[illegible] সেই [illegible] দেখতে পেয়েচ অজিত। প্রণাম করি, তোমার নির্মলদৃষ্টিপাতকে। তোমাকে [illegible] দেখতে [illegible]লেন [illegible], আমাকেও না। এই ক্ষোভ আমার। যদি পারতেন, তাহলে সংগ-লোভাতুর তাঁর তোমাকে মনে হোতনা দৃঢ়বদ্ধ-মুষ্টিখোলা অভিধাকে দূরে সরাবার দ্বন্দ্বীরূপে।

মিথ্যে [illegible] কয়চি। অজি, এইতো বঞ্চনার বেদনা। জীবনের মর্মমূলে যার শেকড়ে শেকড়ে জোগান চলেনি [illegible]নের রসের, সে ছায়া মেল্‌বে কোন্ শূন্যপানে?

তাই পণ করেচি, আমার প্রবাসিনী তপস্বিনীকে মুক্তি দেবে আমার নিবিড় সংগ-পিয়াসিনী। সে যদি না দেয় বাঁধন খুলে তার বাঁধন জড়াবে পাকে পাকে, প্রবাসিনীকে বাঁধবে ধুলোয়, তার তপ হবে মাটি। আমি বাঁচাবই তাকে, এই আমার অহংকার। আমি জাঁক করে বলেচি—অজি, এই আমিই আমি, এই অভিধা।

তোমার কাছে মিনতি রইল এই অভিধার কাছে পৌছবার। যে অভিধা কাছের আর যে অভিধা দূরের তাকে [illegible] যেন [illegible] মেলবার অবকাশ। জয় হোক্ সেই নির্মল দিগন্তের আর জয় হোক্ অভিধা-অজিতের। ইতি।

অভিধা

[illegible] মালী [illegible]ল...তাঁর বুকে লীলা করচেন [illegible] ভৈরবী...

[illegible] এক পা তোলাতে [illegible] হচ্ছে নতুন বিশ্ব...আর এক পায়ের পতনে ধ্বংস হচ্ছে বিশ্ব...

কৈলাসে শিব আছেন [illegible]...নন্দী কাছে আছে।

এমন সময় নীচের দিক থেকে একটা শব্দ এলো।

শিব চোখ খুলে নন্দীকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের শব্দ নন্দী?

নন্দী বলে, রাবণ জন্মগ্রহণ করলো, তাই শব্দ!

শিব চোখ বুঁজলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা শব্দ হলো।

শিব জিজ্ঞাসা করলেন, নন্দী, এবার কিসের শব্দ?

নন্দী বলে, রাবণ মারা গেলো, তারি শব্দ!

[illegible] দ্রষ্টব্য:—[illegible] সংখ্যায় "জওহরলাল" রচনায় ছয় পৃষ্ঠায় "[illegible]পকুমারী"র স্থলে মুদ্রাকর-প্রমাদরূপে "স্বরূপরাণী" মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে।

থেকে বাংলা দেশের দক্ষিণাংশে সুন্দরবন অঞ্চলের ৯০০০ একর (প্রায় ২৭০০০ বিঘে পরিমাপ জমি—এই গোসাবা দ্বীপ ১৪৩নং ১৪৯নং লাট) বন্দোবস্ত করেন। সে সময় এ অঞ্চলে ছিল গভীর জঙ্গল। হিংস্র জন্তুর একক সাম্রাজ্য। জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ। কিন্তু হ্যামিলটন তাঁর প্রজ্ঞার দূরবীণ দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন—এই মানবকণ্টক সেই একদিন জন পদধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠবে। সঙ্গে নিলেন একদল বেকার শিক্ষিত যুবক এবং কিছু সংখ্যক কুলি মজুর।

সুরু হল জঙ্গল অভিযান। মাচায়-বাঁধা জীবন। এক একদিন রাত্রে দাউ দাউ করে আগুনে ঝলসে উঠত গহন অরণ্যের চির অন্ধকার। আর সেই সঙ্গে হিংস্র জন্তু জানোয়ারের মিলিত গর্জ্জন ও আর্ত্তনাদ। এইভাবে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে বন জঙ্গল কেটে পত্তন করা হ'ল ভাবীকালের ক্ষুদ্র উপনিবেশ। কলকাতা থেকে সরবরাহের ব্যবস্থা হ'ল—প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র, খাবার-দাবার, ঔষধ ইত্যাদি। বন্যার হাত থেকে গড়ে ওঠা সম্ভাবনাকে রক্ষা করবার জন্যে জমিতে বাঁধ দিয়ে ও নিচুস্থানে মাটি ফেলে বাসোপযোগী করা হল কিছু জায়গা। ইতঃস্তত ছড়ানো ঘর বাড়ীতে সুরু হ'ল নতুন জীবন। অবশ্য এর জন্য খেসারতও দিতে হল। অনেক প্রিয় সহকর্ম্মীকে হারাতে হ'ল বাঘ আর কুমীরের মুখে। তবুও দমল না সেই নতুন অভিযাত্রীর দল। হাট-বাজার বসিয়ে, পানীয় জলের ব্যবস্থা করে, নতুন মানুষ এনে এক নতুন পৃথিবী গড়ে তুলল তারা। সুরু হল সাধারণ জীবন যাত্রা।

প্রত্যেকের নামে কিছু কিছু চাষের জমি দেওয়া হ'ল বিনা খাজনায়। ঠিক হ'ল চাষের কিছু অংশ তারা নিজের পাবে আর বাকী অংশ জমিদারকে দেবে। এইভাবে নতুন পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলে একদল লোককে নতুন সম্ভাবনার পথে এগিয়ে দিলেন ড. সাহেব।

অবশেষে ১৯০৮ খৃঃ এই বিরাট কর্মময় জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি স্বদেশের পথে যাত্রা করেন। তাঁর সর্ব্বশেষ অনুরোধ হল গঠনমূলক এই নবোদ্যমকে কোন প্রকারেই যেন ব্যর্থ হতে দেওয়া না হয়।

১৯০৯ খৃঃ লোক গণণায় দেখা যায়—তখন গোসাবার লোক সংখ্যা ছিল ৯০০ জন। তার মধ্যে ১০০ জন কুলি, ৩০০ জন কর্মচারী, বাকী সব স্থায়ী বাসিন্দা। ক্রমে সহদ্বীপ সাতজেলিয়াও (১৩০০০ একর জমি প্রায় ৩৯০০০ বিঘা) আলো পেল গোসাবার কল্যাণে। আরো নতুন লোক এল, গম গম করে উঠল অতীতের শ্বাপদসংকুল নির্জ্জন অরণ্য অঞ্চল। এরপর ধীরে ধীরে প্রাথমিক বিদ্যালয়, মধ্য ইংরাজী-বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি সর্বপ্রকারের সুবন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে এক সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত হল স্যার ডেনিয়েলের আদর্শে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে স্যার হ্যামিলটন আবার ফিরে এলেন গোসাবাতে। গোসাবা ও পশ্চিম আরামপুরকে নিয়ে একটা ক্রেডিট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা হল। পরে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ঐ ব্যাঙ্কটি গোসাবা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে পরিণত হল। তারপর একে একে গড়ে উঠল গ্রাম পঞ্চায়েত, আদর্শ কৃষিফার্ম, সমবায় ভাণ্ডার ও ছোট ছোট কুটীর শিল্প। এইভাবে ক্রমশঃ গোসাবার নাম বাংলাদেশ ছাড়িয়ে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ল। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এমনকি তৎকালীন বাংলার গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন এলেন এর শ্রীবৃদ্ধি দেখতে, আর তাঁদের পাদস্পর্শে সমবায়তীর্থে পরিণত হল গোসাবার ভূমি।

এই পুণ্য-ভূমি গোসাবার অগ্রগতির পথে যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগীতা তাঁদের নাম আজ বিশেষ করে মনে পড়ে—তাঁরা হচ্ছেন এই ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীনলিন চন্দ্র মিত্র, তাঁর সহকারী শ্রীসুধাংশু মজুমদার ও তদানীন্তন বঙ্গের সমবায় সমিতির রেজিষ্ট্রার শ্রীযামিনী ভূষণ মিত্র। তাই যামিনী বাবুর স্মৃতিকল্পে ওখানকার ধানকলের নামকরণ হয়েছিলো যামিনী রাইস্ মিল। এইভাবে নানা বিষয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকে এই সমবায় পল্লী। সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তার ভবিষ্যৎ। এইবার আবার স্বদেশে ফিরবার কথা ভাবলেন স্যার ডেনিয়েল এবং ১৯৩৮ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন—সঙ্গে নিয়ে গেলেন গোসাবার সামান্য পরিমাণ মাটি, আর পেছনে রেখে গেলেন তাঁর এই অবিনশ্বর কীর্ত্তি। অন্তরে বোধ হয় শুনতে পেয়েছিলেন মৃত্যুর পদধ্বনি। তাই জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর আত্মীয়বর্গকে যে তাঁর মৃত্যুর পর যেন এই মাটি তাঁর বুকের উপর দিয়ে তাঁকে কবরস্থ করা হয়। কারণ এই মাটিতেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন তাঁর জীবনের আনন্দ ও আত্মার শান্তি।

বেশীদিন আর অবসর জীবন যাপন করা তাঁর ভাগ্যে ঘটল না। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর ৭৯ বৎসর বয়সে নিউমনিয়া রোগে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। খবর পৌঁছতেই গোসাবার ঘরে ঘরে যেন মৃত্যুর স্তব্ধতা নেমে এল।

কাহিনী শুনতে শুনতে আমরাও সকলের অলক্ষে কিছুটা নিজেদের সত্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম। এই মহানুভব ব্যক্তির প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল আমাদের অন্তর।

গোসাবা আমাদের মুগ্ধ করেছে; কিন্তু যখনই ডাক এলো 'বন্দর ছাড়ো যাত্রীরা সবে জোয়ার এসেছে আজ' তখন আর অপেক্ষা করিতে পারলাম না। বিয়োগান্ত কাহিনীর মধ্যে পুরাতন বছরকে হারিয়ে ফেললাম বটে কিন্তু তার মধ্যে যে নূতনত্বের সন্ধান পেলাম সেই দিয়ে নূতন বছরকে স্বাগত জানালাম। পরে গোসাবাকে শেষ বিদায় জানিয়ে আমরা ফেরার পথে পাড়ি জমালাম।